উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ পাল

মহাশয়কে

গ্রামের এক চাষীর ছেলে আয়ান। মাঠে গরু-ছাগল চড়িয়ে তার সময় কাটত। জমির খাজনার রসিদ থাকা সত্বেও লেখাপড়া না জানার জন্য বাপকে অপমানিত হ[illegible]য়েছিল। তাই সেইদিনই বাপ কিনে এনেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [illegible]ভাগ আর শ্লেট-পেন্সিল, পরদিনই বাবা তাকে পাশের গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সেখানে অমর মাস্টারের সাহচর্য তাকে উচ্চাকাঙ্খী করে তুলল। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে হাইস্কুলে ভর্তি হল। মায়ের ইচ্ছে ছিল স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে ছেলে চাকরি করুক। কিন্তু সে চাকরি না নিয়ে কলেজে ভর্তি হল। ভর্তি হল বটে কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারল না। হাই স্কুলেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছিল, কলেজে সে রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ল। ক্লাস ছেড়ে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়ল। মোহভঙ্গ হতে দেরী হল না, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। পরীক্ষায় পাশ করলেও ফল ভাল হল না। এম. এস-সি পড়া হল না। তবুও সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে এম. এ পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করল। কিন্তু সুখি হতে পারল না। সে ভালবাসত কাকলিকে, অবস্থার গতিতে বিয়ে করতে বাধ্য হল রিনাকে। কেন? তার ফল কি হল? সেটাই এই উপন্যাসের বিষয় ....

নজরুল ইসলাম

এক

দুই বিলের মাঝে তিন পাড়ার গ্রামটির নাম বাঘডাঙা। লোকে বলে আগে ওখানে নদী ছিল। নদীর ভেতর থেকে যখন একটা ডাঙা জেগে ওঠে তখন সেই ডাঙার জঙ্গলে একদল বাঘ এসে জোটে। তাই সবাই বলত বাঘডাঙা। তারপর আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু বাঘডাঙা নামটা থেকেই যায়। এগুলি অবশ্য আয়ানের মনগড়া কথা। এরকম অনেক কথাই সে মনে মনে বানিয়ে নেয়। তেমনি লোকেও তাকে আয়ান বানিয়ে দিয়েছে। ইব্রাহিম তার বড়ছেলের নাম রেখেছিল আইনুদ্দিন। কিন্তু মা ছেলের অতবড় নাম ধরে ডাকতে পারে না। সে ডাকে শুধু আইন বলে। পাড়া-প্রতিবেশিরা সেটাকে আর একটু পবিবর্তিত করে বলে আয়ান। আয়ান এ গ্রামে বাঘ দেখেনি। তবে বাঘডাঁশা দেখেছে। তখনও বিলের ধার দিয়ে মাটি তোলা রাস্তাটা হয়নি। দরগাতলার বনের ভেতর দিয়ে পথ ছিল। সেই পথ দিয়ে সে বিকেলবেলায় সেখপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে তেঁতুল গাছটার নিচের পুকুর থেকে একটা হট্‌টিটি 'টি টি' করে উড়ে পালাচ্ছে। নিচের দিকে তাকাতেই আয়ান দেখে কুকুরের থেকে একটু বড় একটা জানোয়ার জিভ বের করে জল খাচ্ছে। তার সারা গায়ে ছোপ ছোপ দাগ। তাকে কেউ বলে দেয়নি। তবু সে দেখা মাত্র বুঝতে পেরেছে যে, ওটা বাঘডাঁশা। আর বোঝামাত্রই পিছন ফিরে চোঁ চাঁ দৌড়। আয়ান জানে যে বাঘডাঁশা মানুষ ধরে না। ছাগল-মুরগি ধরে খায়। কিন্তু বলা তো যায় না। বড় মানুষ না হোক, ছোট ছেলে পেলে ধরতেও পারে। তাই আয়ান একা একা বনের দিকে যায় না। আজও যায়নি। সকালে বাসি ভাত খেয়ে সে হাঁসকলমের মাঠে বাবার জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে হালসানার চাকরানের জমি থেকে বলদদুটোর জন্য ঘাস কেটে এনেছে। তারপর দুপুরে খেসারীর রুটি খেয়ে ছাগল চরাতে বেরিয়েছে।

ইব্রাহিম মাঠ থেকে ফিরে লাঙলটা নামিয়ে রেখে বলদ দুটোকে খুঁটিতে বাঁধছিল। গ্রামের চৌকিদার জংলী এসে বলল, 'তুমার তালতালার ভুঁয়ের পাঁচ বছরের খাজনা বাকী। খাজনাডা দিয়্যা দিতে বল্যাছে।' ইব্রাহিমের মাথায় বাজ পড়ল। সে গতবারেই খাজনা দিয়েছে। পাঁচ বছরের খাজনা কি করে বাকী হয়? সে হাঁড়ি ঘেঁটে ঘেঁটে রসিদগুলো বের করল। কিন্তু সে পড়তে পারে না। গতবারের রসিদ কি করে বের করবে? অগত্যা কাগজগুলো নিয়ে হাজির হল মালেক বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। তিনপাড়ার মধ্যে তিনিই একমাত্র লোক যিনি কিছুটা লেখাপড়া জানেন এবং জমির রেকর্ড, খাজনার রসিদ এসব দেখতে পারেন। এমন কি খবরের কাগজও পড়তে পারেন। কিন্তু তিনি ইব্রাহিমকে বসতে বলে অপরিচিত কয়েকজন লোকের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বসে থেকে থেকে ইব্রাহিমের কোমর ব্যথা হয়ে গেল। সে উসখুস করতে লাগল। কিন্তু বিশ্বাসেরও কথা শেষ হয় না। পড়তে না পারার জন্য ইব্রাহিমের মনটা টনটন করে ওঠে। আজ যদি সে পড়তে পারত, তাহলে তো তাকে এভাবে বসে থাকতে হতো না। বাবা তো তাকে উজীর পন্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু কেন যে মরতে সে কুমীর ধরা দেখতে গিয়েছিল?

তখন তাদের এই বিলে অনেক কুমীর থাকত। আর সন্ধ্যা হলেই কুমীরেরা গরু-ছাগল

ধরার জন্য বিল থেকে উঠে লোকের গোয়ালে ঢুকে পড়ত। কুমীরে ছাগল ধরে নিয়ে খেয়েছিল বলেই নাকি এই বিলের নাম ছাগলখালির বিল। আর লোকেও লোভী কুমীরকে খুব জব্দ করত। মুরগি মেরে কয়েকখানা খুব বড় বড় বড়শি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। তারপর বড়শীগুলোকে শক্ত সুতো বেঁধে কলার ভাসানের সঙ্গে আটকে দিত। মুরগি পেয়েই কুমীর গপ্ করে গিলে নিত। আর সঙ্গে সঙ্গে গলায় বড়শি বিঁধে যেত। কুমীরটা যন্ত্রণায় ছোটাছুটি শুরু করত। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে টেনে তুলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হত। একদিন এই কুমীর মারা দেখতে গিয়েই তার পাঠশালায় যেতে বেজায় দেরি হয়ে গেল। এটা উজীর পণ্ডিতের কাছে বেজায় খারাপ নজীর। ফলে তার পিঠে বেতের ছড়িও নজীর সৃষ্টি করল। বাড়িতে ফিরেই তার জ্বর এল। সে ছিল মায়ের আদরের দুলাল। মা বলল, 'ঐ খুনে উজীরটা কবে আমার ছেলেটাকে মার‍্যাই ফেলবে। তার থাক্যা কাজ নাই আর পাঠশালায় যায়্যা।' ইব্রাহিমের কোনদিনই পড়তে ভাল লাগত না। মায়ের প্রস্তাবে সে খুশিই হয়েছিল। বাবা আপত্তি করেছিল। কিন্তু মায়ের মুখের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। সেদিন তার মাকে কত ভাল লেগেছিল। অথচ আজ মনে হয়, বাবার কথা শুনে সে যদি পড়াশোনাটা করত!

বুকের মধ্যে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বিশ্বাসের বৈঠকখানায় বসে বসেই সে প্রতিজ্ঞা করে, তার ছেলেকে সে লেখাপড়া শেখাবে। বৈঠকখানায় তখনও কথাবার্তা চলছে। কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি না ফিরে সোজাসুজি ডোমকলের বাজারে যায়। হারান পালের দোকান থেকে একখানা 'চার পয়সার বই' আর শ্লেট-পেনসিল কিনে বাড়ি রওনা হয়।

অনেকক্ষণ হল ডোমকলের বাজার ইব্রাহিম পিছনে ফেলে এসেছে। এখন সে মাঠের রাস্তার ওপর দিয়ে আচ্ছন্নের মত হাঁটছিল। হঠাৎ দেখে আয়ান রাস্তার ওপর বসে খানিকটা কাদা নিয়ে বাঁশি তৈরি করছে। আর ছাগলগুলো বুনো কুলের পাতা খাচ্ছে। বাবাকে দেখে আয়ান উঠে দাঁড়ায়। ইব্রাহিম পকেট থেকে বইটা বের করে ছেলের হাতে দিল। আয়ান ভেবেছিল, জিলিপি না হলেও একটা লজেঞ্চুস অন্তত হবে। সেই আশায় সে হাত বাড়িয়েছিল। তাই বই দেখে সে ভারী হতাশ হল। বাবা বলল, 'তুমি আজ থাক্যা পোড়বা।' ছেলে জানতে চাইল, 'পঢ়হ্যা কি হবে?' বাবা উত্তর দিল, 'ঘর-বুঝ হবে। খাজনার রসিদ দ্যাখা হবে।' 'রসিদ কারা দ্যায়?' ছেলের এ প্রশ্নের উত্তর আর দেওয়া হল না। ইব্রাহিম দেখল, বড়বিলের ওপার থেকে একটা কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশটাকে ছেয়ে ফেলছে। গাছগুলো সব নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পাতাও নড়ছে না। মনে হচ্ছে বিশাল মেঘটাকে যেন গাছগুলো টেনে টেনে নিচে নামাচ্ছে। সারি সারি সাদা বক উড়ে যাচ্ছে। কথায় বলে, মেঘের বুকে বক উড়লে নাকি 'বঘাঢল' মারে। ছাগলগুলো কান খাড়া করেছে। গাছে গাছে পাখিগুলো আশংকাসূচক চিৎকার করছে। তার মানে এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। দেখতে দেখতেই দু-এক ফোঁটা জল পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছাগলগুলো ব্যা ব্যা করতে করতে লেজ তুলে ছুটতে লাগল। শুধু ধাড়ী ছাগলটা বাচ্চা দুটোকে রেখে যেতে পারছে না। ইব্রাহিম ছেলের হাতে শ্লেটখানা দিয়ে ছাগলের বাচ্চা দুটোকে কোলে নিয়ে ছুটতে লাগল। বাড়ি ফিরে দেখল সালমা ততক্ষণে গরুগুলোকে বাইরে থেকে গোয়ালে তুলেছে। গরুগুলো গোয়ালে উঠে গা ঝাড়ছে।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে সালমা কেরোসিন তেলের লম্প জ্বেলে ছেলেকে পড়াতে বসালো। বইয়ে হাত দিতেই তার শ্বশুরের কথা মনে পড়ে গেল। তাকে কত স্নেহ করত লোকটা। সালমা জানে না, ও দুনিয়ায় সে কেমন আছে। ভালই থাকবে। অত ভাল লোককে কি আল্লা কষ্ট দিতে পারে? শ্বশুরের কাছেই সালমা সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল। তার বাবা-মা তাকে ভালবাসত। কিন্তু লেখাপড়া শেখায়নি। শেখাবেই বা কি করে? মাত্র ন' বছর বয়সেই সে এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। শাশুড়ি ছিল খাড়েদজ্জাল। ভোরবেলা ঝুঁঝকি থাকতে উঠেই ধান ভানা, থালা-বাসন মাজা শেষ না হলে আর সেদিন সকালবেলাকার খাবার জুটত না। তারপর আছে গোয়াল কাড়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া। ঝাঁট দেবার পর সামান্য গুছ্না থাকলে আর রক্ষে নেই। কথা শুনতে হবে। আবার ফের ঝাঁটও দিতে হবে। এসবেরও আগে তাকে স্নান করে নিতে হবে। কারণ আবিল গায়ে সংসারের কাজ করলে নাকি সে সংসার উচ্ছন্নে যায়। সালমা বুঝতে পারে না, গা আবিল হয় কি করে। একদিন শাশুড়িকে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিল। শুনে শাশুড়ির কি ঝাঁঝ — কচি খুকি! আমার সঙ্গে মস্করা! ওসব ন্যাকামী শ্বশুড়ের সঙ্গে কোরো। শ্বশুর কিন্তু কিছু বলত না। তাকে বলত— তোমার শাশুড়ির কথায় উত্তর কোরো না। কাজগুলো ভালভাবে কোরো। তাহলে তো আর কিছু বলতে পারবে না। আর সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে একটু বোসো। আমি তোমাকে নাম-ঠিকানা লেখা এসব শিখিয়ে দেব। সালমা তাই করত। সব কাজ শেষ হলে শোওয়ার আগে একটা কেরোসিনের লম্প জ্বেলে নিয়ে শ্বশুরের কাছে বসত। শ্বশুর বইটা খুলে বলত— বল মা, স্বরে অ, স্বরে আ। শাশুড়ি জ্বলে উঠত— আদেখ্‌লাপনা দেখে আর বাঁচি ন্যা। ছেল্যা মেয়্যা গ্যালো তল। এখন বোকে পড়হিয়ে উনি মুক্তার করবেন। সালমারও বুক দুরুদুরু করত। তবে শাশুড়ির কথা শুনে নয়— ইব্রাহিমের কথা ভেবে। শুতে যেতে দেরী হলে আজকাল বড্ড রাগারাগি করে লোকটা। তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অক্ষরগুলোর উপর আঙুল দিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকেই সে বলত— স্বরে অ, স্বরে আ। আজ ছেলেকে পড়াতে গিয়ে বার বার তাই তার স্বর্গত শ্বশুরের কথা মনে পড়ছে। শ্বশুরের মতোই সে বইটা খুলে ছেলের আঙুলটা অক্ষরের ওপর নিয়ে গিয়ে বলল— বল বাবা, স্বরে অ, স্বরে আ।

আয়ান দেখল যে বইটাকে যত খারাপ ভেবেছিল তত খারাপ নয়। এতে অনেক ছবি আছে। সাপটা তার ভাল লাগল না। তবে আমটা সুন্দর। ইঁদুরটাও ভাল। আর একটা কত বড় হাঁড়্যাবাজ। মায়ের স্বরে অ, স্বরে আ তার কানে গেল না। সালমা দেখল, ছেলে শুধু ছবি দেখছে। সে তখন বলল— অ-এ অজগর।

আয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল— অ-এ অজগর। মা এই সাপটা অজগর? অজগর কোথায় থাকে? মা বলল— পাহাড়ে। আ-এ আম। ছেলে বলল— আ-এ আম। হ্রস্ব-ই-তে ইঁদুর। হ্রস-সাইতে ইঁদুর। দীর্ঘ-ঈ-তে ঈগল পাখি। দীর্ঘয়ীতে ঈগল পাখি। মা, হাঁড়্যাবাজকে ঈগল পাখি বলে ক্যানে?

মা বলল— লেখাপড়হা কোললে তাই বলে।

এইভাবেই কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ান অক্ষরগুলো চিনে নিয়ে ক, র, করো; ধ, র, ধরো; কা, ক কাক ; না, ক নাক; শুরু করল। কিন্তু সেখানেও মুশকিল। সে কিছুতেই বুঝতে পারে

না, ক, র যদি করো হয় তবে কা, ক কাকো হবে না কেন? মাকে জিজ্ঞেস করে।

মা বলে— আমি অতো জানি ন্যা বাপু। তোর দাদো ওরকম বোলতো। ওরকমই হয়। তা ওরকম করেই আয়ান 'চার পয়সার বই' শেষ করল।

মা বলল— এবের পোঢ়হতে হবে দুতিয়্যা ভাগ।

বাবা নিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য, এই নতুন বইটাও আয়ান পড়তে পারে। আয়ান দেখল উপরে লেখা আছে বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। অবশ্য এ বইয়ের বানানগুলো অনেক বড় বড় এবং কি রকম খচমচ। তবুও অনেকগুলো আয়ান পড়তে পারে।

কিন্তু মা বলল — আমি বাপু আর পারব না। কাল থাক্যা তোর জবামামীর কাছে যাস। আমি বোল্যা রাখ্যাছি।

জবামামী পাড়ার জামসেদ মামার স্ত্রী। জামসেদ মামা মায়ের আপন ভাই তো নয়ই, গ্রাম সম্পর্কের ভাইও নয়। তবুও অনেক দূরের সম্বন্ধ ধরে মা যখন তাকে ভাই বলে তখন আয়ানকে মামা বলতেই হয়। আর সেই সূত্রেই জবা তার মামী। তবে জবামামীর আরেকটা পরিচয় আছে। তার বাবা শিক্ষক। তিনি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তাই বিয়ের আগে জবামামী প্রাইমারী স্কুল পাস দেওয়ার পরও হাইস্কুলে এক ক্লাস পড়েছে। আবার জবামামী দেখতেও খুব সুন্দরী। বেশ ফরসা। তাই পাড়ার মহিলা মহলে সে এক দেবী বিশেষ। জামসেদ মামাও তাকে সমীহ করে চলে। এহেন জবামামীর কাছে পড়ার প্রস্তাবে আয়ান খুশিই হল। কিন্তু তার প্রচণ্ড লজ্জা করে। একা একা গিয়ে সে কথা বলবে কি করে? অগত্যা তার মা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। জবামামী তো হেসেই খুন, আমাকে আবার লজ্জা কিসের? আমি তো তোমার মায়ের মতোই । মা-ও হাসতে লাগল। মা-টা যেন কি! আয়ানের যে লজ্জা করে সেটা বলার কি দরকার ছিল? আয়ান মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। জবামামী ওকে চৌকির ওপর নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ বইটা খুলে বলল— পড় দেখি। আয়ান পড়তে শুরু করল-ঐ, ক্য, ঐক্য ; বা-ক্য বাক্য ; মা-ণি-ক্য মাণিক্য ; জবামামী খুশি হয়ে আয়ানের মাথায় হাত দিল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল— বুবু, তোমার আয়ান তো ভালই পড়তে পারছে। তাহলে ইব্রাহিম ভাইকে বোলো একটা ধারাপাত আনতে। ধারাপাত আনাই ছিল। আয়ান সেটা বের করে ধরল। জবামামী ধারাপাত খুলে বলল— পড় একে চন্দ্র। আয়ান বলে— একে চন্দ্র। দুইয়ে পক্ষ, দুইয়ে পক্ষ। এরকম ভাবে দশ পর্যন্ত পড়িয়ে জবামামী রান্নাঘরের দিকে গেল। আয়ান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়তে লাগল।

জবামামীর মেয়েটা বয়সে হয়ত আয়ানের থেকে বছর খানেকের ছোটই হবে। সে এতক্ষণ একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সব কিছু দেখছিল। মা রান্নাঘরে যেতেই সে চুপি চুপি এসে আয়ানের কাছে দাঁড়াল। তারপর এক ছোঁয়ে তার ধারাপাতের প্রথম পৃষ্ঠার খানিকটা নিয়ে উধাও। ঘটনার আকস্মিকতায় আয়ান বিহুল। নিজের অজান্তেই সে অস্ফুটে চিৎকার করে ফেলেছে। সে চিৎকার শুনে জবামামী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হেনা তখন খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ধারাপাতের ছেঁড়া পাতাটা নিয়ে হাসছে। হাঁ, জবামামী হেনা বলেই সম্বোধন করল মেয়েকে। বলল— তুমি যদি এ রকম কর, তাহলে আয়ান ভাই ভাববে, তুমি ভারী অভদ্র। কিন্তু হেনা পাত্তা দিল না। আয়ানের সাধের নতুন বইটা ছিঁড়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই তার খুব মন খারাপ। কিন্তু জবামামীর কাছে পড়তে এসেছে। আর ছিঁড়েছে তারই মেয়ে। তাই সে কিছু বলতেও পারছে না। তার হয়ে অবশ্য জবামামী অনেক বকল। আয়ান আবার পড়তে লাগল। কিন্তু বই ছেঁড়ার ভয়টা গেল না। সেটা আর কোনদিনই যায়নি। জবামামীর কাছে আয়ান যতদিন পড়েছে তাকে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হয়েছে, হেনা কখন এসে বই ছিঁড়ে দেয়। শেষে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, হেনা বই ছিঁড়তে না এলেই আয়ানের অস্বাভাবিক লাগত। কিন্তু হেনা তাকে কখনও হতাশ করেনি। সপ্তাহে অন্তত একটা বই সে ছিঁড়তই। তখন তার বই ছেঁড়া বন্ধ করার জন্য জবামামী এক উপায় বের করল। আয়ান পড়তে এলেই সে হেনার হাতে একটা বই দিয়ে একসঙ্গে বসিয়ে দিত। আয়ানের কাছে পড়া বলে নেওয়ার জন্য হেনা আর বই ছিঁড়ত না। ছিঁড়ত না, তবে আয়ানের সব সময় ভয় করত, এই বুঝি ছিঁড়ে দেয়। কিন্তু এই ভয়ের মধ্যেও আয়ানের দ্বিতীয় ভাগ পড়া শেষ হয়েছিল। শেষ হয়েছিল যোগ শেখাও। জবামামী সেদিন বিয়োগটা শিখিয়ে দিয়ে বলল— গুণ ভাগ বাবা আমি ভুলে গেছি, তুমি মালেক সাহেবের কাছে শিখে নিও।

আয়ান মাকে এসে কথাটা বলল। মা বলল — তা যাবি বিস্‌স্যাসের কাছে। খায়্যা তো আর লিবে না। বোলবি, নানা, আমাকে শিকিয়্যা দাও। আয়ানের সাহস হল না। সে বলল— তাহলে তুমি সাথে চল। কিন্তু মা বউমানুষ, বিশ্বাসের কাছে যায় কি করে? মাথায় এক বুদ্ধি এলো। সে আয়ানকে সাথে করে নিয়ে গেল বিশ্বাসের নতুন বউয়ের কাছে। বলল— মাহোই, আমার ব্যাটা তাহোয়ের কাছে গুণ-ভাগ শিকতে চায়। মাহোই সেকথা শুনে আয়ানকে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে গেল। মালেক বিশ্বাস তখন একটা চেয়ারে বসে ঢুলছিল। স্ত্রীকে কাছে আসতে দেখেই সে চোখ তুলে তাকাল। স্ত্রী বিনা ভূমিকায় বলল— ইব্রাহিমের ব্যাটা আস্যাছে। তোমার কাছে গুণ শিখবে। বিশ্বাস আয়ানের দিকে তাকাল। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে জিজ্ঞেস করল— তুই যোগ-বিয়োগ জানিস? আয়ান ঘাড় নাড়ল। নামতা জানিস? আয়ান আবার ঘাড় নাড়ল। তখন বিশ্বাস আয়ানের কাছ থেকে শ্লেট-পেনসিল নিল। শ্লেটের উপর পাঁচ লিখে তার নীচে চার লিখল। নীচে একটা দাগ দিয়ে বলল— বল, চার পাঁচে কত হয়, বল। আয়ান বলল— চার পাঁচে কুড়ি। বিশ্বাস দাগের নীচে কুড়ি লিখে বলল— তাহলে পাঁচ আর চারের গুণফল হল কুড়ি। এই হল গুণের আসল নিয়ম। এবার শুধু শিখতে হবে একের বেশি অঙ্ক থাকলে কি করতে হবে। সে এবার শ্লেটে বারো লিখে নিচে তিন লিখে দাগ দিল। কিন্তু হঠাৎ করে সে ঝিম মেরে বসে গেল। একটু পরে বলল— প্রেসার আছে তো। মাথা ঘুরছে। তুই এখন যা, কাল সকালে আসিস। বাকীটা শিখিয়ে দেব। আয়ান পরের দিন সকালে এসে গুণ শিখল। গুণ শেখা হয়ে গেলে সে ভাগ শিখতে লাগল। একটা ভাগ করা হয়েছে। আয়ান আরেকটা ভাগ করছে, এমন সময় বৈঠকখানায় এল সাম-মহাম্মদ। আয়ানের মোটেই ভালো লাগল না। আয়ানকে এখানে দেখে সে যেন বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তি সহকারেই সে বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করল— ছোঁড়াডা কে? এখ্যানে কি কোরছে? বিশ্বাস বলল— ইব্রাহিমের ব্যাটা, অঙ্ক শিখতে আস্যাছে। সাম-মহম্মদের কোন ভাবন্তর হল না। সে একটু চুপ করে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, খুব গম্ভীরভাবে বলল— মালেক, কাঁটার মুখ ছুঁচল্যা কোরো না। আয়ানের মনে হল, লোকটার নির্ঘাত মাথা খারাপ। নাহলে ওরকম কথা বলে?

কাঁটার মুখ ছুঁচলো করতে হবে কেন? কাঁটার মুখ তো ছুঁচলোই থাকে। কিন্তু সেকথা সে মুখ ফুটে বলতে পারল না। মালেক সাহেবও কিছু বললেন না। সাম-মহাম্মদ উঠে চলে গেল।

দুই

বাঘডাঙা গ্রামের তিনটি পাড়া। ছাগলখালির বিলের ধার ঘেঁষে ভুবনডাঙা থেকে জয়রামপুর যে রাস্তাটা গেছে, তার পাশে ভুবনডাঙার দিকে সেখপাড়া বা স্যাকপাড়া। এ পাড়ার সব লোকই সেখ বলে বোধহয় এরকম নাম। এই রাস্তারই পাশে জয়রামপুরের দিকে পশ্চিমপাড়া। এ পাড়ার বেশিরভাগ লোকের উপাধি মণ্ডল। স্থানীয় লোকেরা উচ্চারণ করে মুনডোল। এই পাড়াতেই থাকে মালেক বিশ্বাস। গ্রামের মধ্যে তার অবস্থা সব থেকে ভালো এবং তার বাড়ি পাকা। তবে তার দল-মজলিস আলাদা। একই পাড়ায় দুটি আলাদা দল থাকায় দুটি পাড়া হয়ে গেছে। মুনডোল পাড়া আর বিসস্যাস পাড়া। উত্তরে বড়বিলের ধারে আছে মুল্লাপাড়া। এখানে যারা বাস করে তাদের অধিকাংশের উপাধি মোল্লা বা মুল্লা। মাঠের মধ্যে বলে একে মাঠপাড়াও বলে।

গ্রামের সব লোকই চাষী। তবে এক মালেক বিশ্বাস ছাড়া তাদের কারোরই প্রয়োজনীয় চাষের জমি নেই। গ্রামের মাঠের অধিকাংশ জমির মালিক ভগীরথপুরের বাবুরা, না হয় ডোমকল বা বাজিতপুরের ব্যবসায়ীরা। তাই লোকেরা সারা বছর খেটে ফসল ফলায়, কিন্তু ফসল তোলার সময় নিজেদের 'কিসস্যান ভাগারু'র অর্ধেক রেখে বাকী অর্ধেক জমির মালিক 'রাজভাগরুর'কে দিয়ে আসতে হয়। গ্রামে এমন কিছু লোক আছে যাদের এক কাঠাও জমি নেই। মাঠে যখন কাজ থাকে তখন মুনিস খাটে। একবেলা খাবার জোটে। যখন কাজ থাকে না তখন তাও জোটে না। কাঁচি বা দাউলি বগলে নিয়ে গ্রাম থেকে রওনা হয়ে যায়। যায় অন্য কোথাও মুনিস খাটতে। কেউ যায় দক্ষিণে, কেউ উত্তরে, কেউ শহর পেরিয়ে রাঢ়ে। লালগোলা লাইনের ট্রেনে যাঁরা কলকাতা-বহরমপুরের মধ্যে যাতায়াত করেছেন, তাঁরা এই হতভাগ্যদের দেখে থাকবেন। একটা কাস্তে বা নিড়ানী হাতে নিয়ে স্টেশনের কাছে এরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে এই আশায় যে, কেউ সেই দিনটার জন্য তাকে কাজে নেবে। সারাদিন কাজ করার পর কারও বারান্দায় বা কোন গাছতলায় রাতটা কাটিয়ে পরের দিনের কাজের জন্য অপেক্ষা করে। এভাবে খেয়ে না-খেয়ে কিছু টাকা রোজগার করে আবার গ্রামে ফেরে। হয়ত তখন গ্রামের মাঠেও কাজ লেগেছে। মালেক বিশ্বাসের ষাট-সত্তর বিঘে জমি আছে। তবে সে জমি তিনি নিজে আবাদ করেন না। ভাগে দিয়ে রেখেছেন। তার থেকে তিনি রাজভাগারুর যে অংশ পান তাতেই বেশ ভালভাবে চলে যায়। কিন্তু যারা জমি ভাগে চাষ করে তাদের ভালভাবে চলে না। বছরের কোন সময় তাদের দু'মুঠো ভাত জোটে। কোন সময় তাও জোটে না।

আয়ানের বাবা ইব্রাহিম এরকম একটি চাষী ঘরের লোক। তারা তিন ভাই— ইব্রাহিম, ইস্রাফিল এবং ইসমাইল। তবে লাঙল মাত্র একখানা। তাদের নিজের জমি পাঁচ-সাত বিঘে। আরও বিঘে দশেক জমি ভাগে চাষ করে। ফসল ভাল হলে ঘরের খেয়েই চলে যায়। কিন্তু

কোন কারণে আবাদ খারাপ হলেই কিনতে হয়। আর তখনই হয় মুশকিল। কারণ বাড়িতে খাবার লোক আট-দশজন। বাড়ির মুনডোল ইব্রাহিম তখন মাথা স্থির রাখতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি সে কোনদিনই সংসারী ছিল না। খুব ছোটবেলায় উজীর পণ্ডিতের মার খেয়ে সে পড়াশোনা ছেড়েছিল। কিন্তু মাঠের কাজ সে শেখেনি। গিয়ে ভিড়েছিল গ্রামের গুণাইযাত্রা দলে। তার গলাটা ছিল ভাল। আর সেই সুবাদে সে 'ছুকরা' সাজত। ইব্রাহিমের বাবা ইছারুদ্দিন এসব একদম পছন্দ করত না। সে সংসারের দিকে ছেলের মন ফেরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করল। বিয়ে হল। কিন্তু ইব্রাহিমের ছুকরা সাজা বন্ধ হল না। তাকে বকাবকি করতে করতেই বাবার মৃত্যু হল। তখন সংসারের সব দায়িত্ব তারই ঘাড়ে এসে পড়ল। এবার কিন্তু ছুকরা সাজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। কারণ গান করে বেড়ালে আর বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না।

ইব্রাহিম শুনেছে, তাদের অবস্থা নাকি আগে ভাল ছিল। অনেক দিন আগে তাদের এক পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'বারাম মাহাজোন'। তার অনেক টাকা-পয়সা, বাসন-কোসন ছিল। কিন্তু বিশ্বাসদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। লালু বিশ্বাস আর ভুলু বিশ্বাস, দুই ভাইয়ে তাকে ব্যারাম মহাজন বলে উপহাস করত। তাদের জব্দ করার জন্য সে লালু এবং ভুলু নামে দুটো কুকুর পুষেছিল। তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে ডাকত— লালু তু— , ভুলু তু— । তারা প্রথমে কুকুর দুটোকে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। তখন নাকি থানার সঙ্গে সাট করে তারা বারাম মহাজনকে জব্দ করার জন্য ডাকাত ডেকে এনেছিল। ডাকাতরা এসে প্রথমে কুকুর দুটোকে মেরে ফেলেছিল। তারপর থালা-বাসন টাকা-পয়সা সব লুট করে নিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আর যাবার সময় বারাম মহাজনকে হাত-পা বেঁধে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছিল। সেই লুটকরা কাঁসার বাসনের কিছু কিছু এখনও নাকি বিশ্বাসদের ঘরে আছে। তবে সে অনেক দিন আগের কথা এবং তার কোন প্রমাণ নেই। বাবা যখন মারা যায় তখন ইব্রাহিমদের অবস্থা আর ভাল ছিল না। মা তার আগেই মারা গেছে। তখন সবে ইস্রাফিলের বিয়ে হয়েছে, ইসমাইল তখনও বেশ ছোট। তার থেকেও ছোট্ট ছিল বোন দুটো। সালমাই তাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। আর ইব্রাহিম দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে। মাত্র মাস কয়েক আগে ছোট বোনটার বিয়ে হয়েছে। তবে এর মধ্যে ওলোটপালোটও হয়ে গেছে। ইস্রাফিলের বউ বসন্ত হয়ে মারা গেছে। ইসমাইলের বউ 'বাপের বাড়ি' গেছে । কিন্তু আর আসছে না। ইব্রাহিম লোক পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা বলে দিয়েছে, শরীর খারাপ, এখন পাঠাতে পারবে না। তাই আজ ইসমাইলকে পাঠিয়েছে, দেখে আসার জন্যে।

ইসমাইল যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিল তখন মাসুদ তার বাড়ির সামনের মাচায় বসেছিল। তাকে দেখে সে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো ইসমাইল, কুণ্ঠে গেলছিল্যা?' ইসমাইল লাজুক লাজুক মুখ করে বলল, 'আপনার বউমার শরীর খারাপ। তাই দেখতে গেলছুনু।' 'এখন ক্যামুন আছে?' 'ভাল।' 'আর তোমার শাউড়ী?' অর্থাৎ শাশুড়ি। শাশুড়িকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা কাকা-জ্যাঠাদের মৌলিক অধিকার। তাই মাসুদও শাশুড়িকে নিয়ে পড়ল। ইসমাইলের হাসিঠাট্টা একদম ভাল লাগছিল না। কারণ শাশুড়ির কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছিল, 'আমার ঝিটি তোমার ভাজের ফাই-ফরমাশ খাটতে পারবে না। মেয়ে যদি চাও, তবে

ভিনো হও।' তার বউ তাকে কিনা বলল, 'বাড়ির একপাল লোকের কাজ আমি করতে পারব না। একঠে থাকলে আমি আর যাব না।' সে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মাসুদ ছাড়ার পাত্র নয়। সে বলল, 'ঘুড়াডা বাঁধো বাবা। একচিল বসো। তুমার শ্বশুরবাড়ির কথা দু-চারড্যা আমরাও শুনি।' অগত্যা ইসমাইলকে বসতে হল। কথায় কথায় মাসুদ জিজ্ঞেস করল, 'তুমার শ্বশুর মেয়ে পাঠাতে চায় না ক্যানে?' ইসমাইল চমকে উঠল, মাসুদচাচা কি করে জানল যে, তার শ্বশুর মেয়ে পাঠাতে চায় না! মাসুদ তার ভাব বুঝতে পেরে, মুখে এক ঝলক তৃপ্তির হাসি টেনে বলল, 'বাপু, মানুষের চলা দেখলেই আমি বুঝতে পারি। তা তারা কি বুলছে?' ইসমাইল তখন খুলে বলল তারা কি বলেছে। মাসুদ শুনে খুশি হল। বলল, 'তারা বাপু ঠিকই বুলছে। বাড়িতে সবকিছু তুমার সুমান সুমান। জমিও পাবা সুমান সুমান। তুমার বড় ভাইয়ের খাওয়ার লোক ছড়া। আর তুমার মাত্রো দুট্যা। তাহলে ভিনো হলে তো তুমার দু পয়সা জমবেই।' ইসমাইলের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। সে বলল, 'তাই বলে ভায়ে-ভায়ে আলাদা হয়্যা যাবো?' মাসুদ একটু হাসল, 'ভাই ভাই কবে একসাথে থাকে? কথায় বলে— ভাই-ভাই, ঠাঁই-ঠাঁই। তুমার বাপরা একসাথে ছিল? আমরা একসাথে আছি? কেউ থাকে না বাপু। কেন থাকবে? এই যে তুমার বড়ভাই ছেলেকে পড়হাচ্ছে। বড় হয়ে তুমাকে দেখবে?' আশ্চর্য, ইসমাইল কোনদিন এভাবে ভেবে দেখেনি। অথচ শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও ঠিক এই কথাগুলোই বলছিল। আর কথাগুলো তো ঠিকই। সে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মাসুদের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল।

ইব্রাহিমদের অবস্থা তার বাবার সময়েও তেমন ভাল ছিল না। তবে বাবা ইছারুদ্দিন কিছুটা লেখাপড়া জানত। তাই জ্ঞাতি-গুষ্টির লোকেরা তাকে মানত। তার মৃত্যুর পরে ইব্রাহিম সে স্থান নিতে পারেনি। এখন মুনডোল পাড়ার মোড়ল নাদের বক্স। সেও ইব্রাহিমের মতোই লেখাপড়া জানে না। তবে তার মাথাটা খুব পরিষ্কার। আর কূট বুদ্ধিতে এ তল্লাটে কেউ তার সমকক্ষ নয়। বুদ্ধিও যেমন, কথাবার্তাও বলে তেমনি বুঝেসুঝে। সে তার নিজের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল। বড় ছেলে কাদের বক্স স্কুলেও গিয়েছিল। কয়েক ক্লাস পড়েও ছিল। কিন্তু তারপর আর এগুতে পারেনি। তাই আয়ান যখন লেখাপড়া শিখছিল তখন সে খুশিই হয়েছিল। মালেক বিশ্বাস নিজে কিছুটা লেখাপড়া জানে। সে নিজের ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাবার জন্য স্কুলে পাঠিয়েছিল। মাস্টারদের অনেক দুধ-ঘি-মাছ-ডিমও খাইয়েছিল। আর সে সবের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মাস্টাররা তাকে ক্লাসের পর ক্লাসে তুলেও দিয়েছিল। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় গিয়ে সব বিষয়ে ফেল। ওই স্কুলের ইতিহাসে এটা নাকি একটা রেকর্ড। তাই আয়ান যখন তাড়াতাড়ি গুণ-ভাগ শিখে নিচ্ছিল তখন মালেকের কেমন ভাল লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পাড়ার সকলেরই সে রকম ভাল লাগেনি। মাসুদের ভাল লাগেনি। সাম-মহম্মদেরও ভাল লাগেনি। তারা ভাবছিল যে, মুনডোল পাড়ার আয়ান যদি লেখাপড়া শিখে নেয়, তাহলে ওপাড়ার লোক ওকে দিয়েই জমির কাগজপত্র দেখিয়ে নেবে। তাদের কাছে আর আসবে না। আর তখন তাদেরকে এমন মানবেও না। সাম-মহম্মদ সেদিন কথাটা মালেককে বলেও ছিল। কিন্তু মালেক কোন উত্তর করেননি। অতএব এর বিহিত তাদেরকেই করতে হবে। তারা ভেবে দেখেছে যে, ইব্রাহিমরা তিন ভাই যদি আলাদা হয়ে

যায় তাতে ইব্রাহিমের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে আর সে ছেলেকে পড়াতে পারবে না। বিকেলবেলায় সাম-মহম্মদ মাঠ দেখতে বেরিয়েছিল। লগরাতালার মাঠে তার জমি দেখে সে তালতালার দিকে আসছিল। তালতালার মাঠে তার জমির পাশে ইব্রাহিমদের জমি। সাম-মহম্মদ দেখল যে ইস্রাফিল একা একা জমিতে নিড়ানী দিচ্ছে। সে দেখল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। এক পা-দু'পা করে সে আলের উপর বাবলা গাছটার নিচে এসে বসল। ইস্রাফিল একবার তাকিয়ে দেখে আবার নিড়ানী চালাতে লাগল। এমনিতেই সে লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কম। আর কাজের সময় গল্প-গুজব একদমই পছন্দ করে না। কিন্তু সাম-মহম্মদের কথা বলা দরকার। সে গায়ে পড়েই কথা শুরু করল, 'ইস্রাফিল যে একলা একলাই ভুঁই লিড়াচ্ছো গো। বাড়িতে কি আর কেহু নাই?' ইস্রাফিলকে বাধ্য হয়ে কথা বলতে হল, 'না চাচা, বড় ভাই বাজারে গেলছে। আর ইসমাইল শ্বশুরবাড়ি।' 'কাজের সুমায় সবাই বেড়িয়্যা বেড়াচ্ছে। আর তুমি একলা খাট্যা মোরছো?' কথাটা ইস্রাফিলের মনে লাগল। জমিতে এখন অনেক ঘাস হয়েছে। সে চায়নি ইসমাইল এখন শ্বশুরবাড়ি যাক। কিন্তু বড় ভাই তাও পাঠালো। ইসমাইলকে তো পাঠালোই আবার নিজেও বাজারে চলে গেল। সাম-মহম্মদ বুঝল কাজ হচ্ছে। সে আবার বলল, 'তুমার মাগ নাই, ছেলে নাই, তুমি একলা মানুষ। তুমি অতো খাট্যা মরো ক্যানে? তুমার খাবে কে?' ইস্রাফিলের মনে হল সাম-মহম্মদ চাচা ঠিক কথাই বলছে। তার মনের ভাব আঁচ করে সাম-মহম্মদ তার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল, 'আমার কাছে বাবা অলায্য কথা পাবানা। উচিত কথা বোলি বোল্যা লোকে দেখতে পারে না। তা আমার আর কি? তুমাদের ব্যাপার তুমরা বুঝো?' সাম-মহম্মদ চলে গেল। ইস্রাফিল ভাবল সে একলা মানুষ, অথচ মাঠের কাজ করে সব থেকে বেশি। বড় ভাইয়ের ছড়া খাওয়ার লোক। ইসমাইলেরও দুট্যা। তাহলে সবার জন্য সে খেটে মরে কেন? সে আলাদা হয়ে খাটলে তো তার অনেক-টাকা-পয়সা জমবে। সে ঘাসগুলো বেঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়িতে তখন ইসমাইলের সঙ্গে বড় ভাইয়ের কথা হচ্ছিল। ইব্রাহিম বুঝছিল যে ভিন্ন হয়ে যাওয়াতে তার ভাই ইসমাইলেরও মত আছ। তাই সে বলল, 'তোর শ্বশুররা যখুন বোলছে যে ভিনো না হলে মেয়ে পাঠাবে না ; তুই ভিনো হয়ে যা। তুই মেয়ে ছাড়া থাকবি তা তো হয় না।' ইব্রাহিম আশা করেছিল যে ইসমাইল মুখে অন্তত এর প্রতিবাদ করবে। কিন্তু, না। সে কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় ইস্রাফিল এসে ভুসির ঘরে ঘাসের বোঝা ফেলল। ইব্রাহিম তাকেও ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ইসমাইল তো ভিনো হবে, তুই কি কোরবি?' ইস্রাফিলও কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ইব্রাহিম আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুইও ভিনো হোবি?' ইস্রাফিল তবুও কিছু বলল না। ইব্রহিম বুঝল সেও ভিন্ন হতে চায়। তার মাথার মধ্যেটা কিরকম করে উঠল। ভায়েরা ভিন্ন হতে চাইছে। অথচ সে ব্যাপারটা আঁচ করতেই পারেনি। সে কোন কথা না বলে বাড়ির ভেতরে চলে এলে। সালমা এতক্ষণ বেড়ার আড়াল থেকে ভায়েদের মধ্যেকার সব কথা শুনছিল। এবার ইব্রহিমকে সামনে পেয়ে মনের ঝালটা প্রকাশ করে ফেলল, 'আমি বোলেছিনু না, ভিনো কোর‍্যা দ্যাও। বলে আমি বড়ো ভাই হোয়ে ক্যামুন কোর‍্যা ভিনো কোর‍্যা দিবো? এখুন হোলো তো সুখ।' ইব্রাহিম কোন জবাব দিল না। সে বাড়ির সবকিছু ভাগ করতে শুরু করে দিল। বাড়িতে ধান চাল যা ছিল সমান

তিনভাগ করে দিল। জমির যে দিকটা ভায়েরা চাইল সেদিকটাই তাদের দিয়ে দিল। হাতে গোটা তিরিশেক টাকা ছিল। দুই ভাইকে দশ টাকা করে দিয়ে দিল। তারপর বলল, 'তাহলে এবার তুরা একটা কোর‍্যা আখা কাট্যা লে।' ইসমাইল একটা উনুন কেটে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

পরের দিন সে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে ছোট বউ। আর এল তার শাশুড়ি। সঙ্গে গুচ্ছের হাঁড়ি-কুড়ি আর থালা বাসন। দুদিন থেকে মেয়ের ঘর বসিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। ইসমাইল ইব্রাহিমের কাছে গিয়ে বলল, 'মার যেসব গয়না ছিল, তার ভাগও আমাকে দিতে হবে!' ইব্রাহিম চমকে উঠল। মার গয়না! মার গয়না আছে কোথায় যে সে ভাগ দেবে? মার গয়না বলতে তো ছিল এক জোড়া মাক্‌ড়ি, একছড়া মাদুলী আর দু'গাছা চুরি। চুরি দু'গাছা তো মা ছোট বোনকে দিয়েই গিয়েছিল। বড় বোনের বিয়ের সময় মাকড়ি দুটো ভেঙে দুল গড়িয়ে দিয়েছে। আর ছোট বোনের বিয়েতে মাদুলী ছড়া ভেঙে একটা মালা দিয়েছে। এ তো ইসমাইলও জানে। কিন্তু ইসমাইল বলল, 'আমরা কাজ কর‍্যাছি। টাকার অভাব ছিল না, তাহলে গয়না ভাঙা হোলো ক্যানে? আমাদেরকে ভাগ দিতে হবে।' দু'দিন পরে ইস্রাফিলও এসে একই কথা বলল। কিন্তু ইব্রাহিমের কাছে সত্যি কোন গয়না ছিল না। তাই সে গয়নার ভাগও দিতে পারল না। তখন ইসমাইল আর ইস্রাফিল ঠিক করল যে তারা মানুষ ডাকবে।

মানুষ ডাকা ব্যাপারটা শুধু বাঘডাঙা নয়— এ তল্লাটে বরাবরই আছে। যখনই কোন ব্যাপার নিয়ে পাঁচজনের সিদ্ধান্তের প্রশ্ন ওঠে, তখনই মানুষ ডাকা হয়। দশের সব লোককেই ডাকা হয়। তবে প্রধানত সিদ্ধান্ত নেয় মোড়লরাই। ছোটখাটো ব্যাপার হলে দশের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দরকার হলে অন্য দশের লোকদেরও ডাকা হয়। বিশেষ বিশেষ জটিল ব্যাপারে অন্য গ্রামের মোড়লদের ডাকার দৃষ্টান্তও আছে। এ দশের মুনডোল নাদের বক্স চায় না যে তার দশের ব্যাপার অন্যদের কাছে যাক। সেজন্য সে যতটা পারে বুঝিয়ে সমঝিয়ে রাখে। তার ইচ্ছে ছিল এ ব্যাপারটাও দশের মধ্যে মিটে যাক। কিন্তু মাসুদ চাচা ইসমাইলকে আগেই 'কুঁস' দিয়ে রেখেছিল, 'নাদের মুনডোল তো তুমার ভায়ের দিকে কথা বুলবে। তুমি গুটা গাঁয়ের লোককে ডাকো।' তাই ইসমাইল গোটা গ্রামের লোককেই ডাকল।

এই কদিন থেকে কি হচ্ছে তা আয়ান কিছুই বুঝতে পারছে না। কখনও বাবজী ছোট বাবজীর সঙ্গে বকাবকি করছে। কখনও আবার মা ফিসফিস করে কি বলছে। মা ভাত রান্না করছে। কিন্তু কাউকে ডেকে খেতে দিচ্ছে না। ছোটমা এসেছে। কিন্তু মা কিছুতেই ছোটমার কাছে যেতে দিচ্ছে না। ছোটমা আলাদা একটা উনুনে রান্না করছে। কিন্তু তাকে খেতে ডাকছে না। বাড়িতে ধান চাল যা আছে সব বের করে মাপা হচ্ছে। ছোটবাবজী তার সঙ্গে কথাই বলছে না। বাবার মনটা খুব খারাপ। সব সময় ঝিম মেরে বসে থাকছে। কারও সঙ্গে বেশি কথা বলছে না। তার সঙ্গে তো নয়ই। মার সঙ্গেও না। মাও তার সঙ্গে বেশি কথা বলছে না। আয়ানের একদম ভাল লাগছে না। তাই সে মাকে কিছু না বলে চুপি চুপি বাইরে এল। দেখে ছোটবাবজী খাল্যা আম গাছটার নিচে পাটি পাড়ছে। এইমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। এরই মধ্যে কে দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেছে। আয়ান কাউকে কিছু না বলে গাছটার কাছে চলে এল। তার ছোটবাবজী তখনও পাটি পেড়ে চলেছে। আয়ান আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'এতো পাটি কি হবে গো,

ছোটবাবজী?' ছোটবাবজী উত্তর দিল, 'মানুষ বসবে?' 'কিসের মানুষ?' 'বিচ্যারের ?' 'কিসের বিচ্যার গো?' এ প্রশ্নের উত্তর ইসমাইল দিতে পারল না। এই ছোট বাচ্চাকে সে কি করে বোঝাবে, বিচার কিসের। সে বলল, 'তুই এখুন বুঝতে পারবি ন্যা। বড়ো হো, তাহোলে বুঝতে পারবি।' আশ্চর্য, আয়ানকে সবাই তাই বলে। মাকে সকালে জিজ্ঞেস করেছিল। মাও তাই বলেছে। আচ্ছা বড় হতে কতদিন লাগে? সে একবার ভাবল সেকথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ততক্ষণে তার আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে গেছে। সে বলল, 'আজ তুমি যখুন ভাত খাচ্ছিল্যা আমাকে ডাকল্যানা ক্যানে গো?' এই প্রশ্নে ইসমাইলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত ছেলেটা তার সঙ্গেই খেত। তাই আজ সকালে ওকে দাঁড়িয়ে রেখে খেতে তারও খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু পাশেই তার স্ত্রী বসেছিল। ভাইপোর সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা সে পছন্দ করে না। তাছাড়া সে নিজে থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। পাছে তাকে ডাকলে যদি বড়ভাজ আবার কথা শোনায়। তাই সে ডাকতে পারেনি। কিন্তু কষ্ট অনুভব করেছে। তাই এই সন্ধ্যাবেলায় আয়ান যখন তাকে ঐ কথাটাই বলল, সে আর থাকতে পারল না। দুহাতে আয়ানকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'কাল আবার ডাকব। তুই আসবি তো?' আয়ান কোন উত্তর দেওয়ার আগেই মা চেঁচিয়ে তাকে ডেকে উঠল, 'আইন বাড়ি আয় বোলছি।' ইসমাইল তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দিল। তবুও মার রাগ মেটে না। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'ছেল্যার মুখের চারড্যা ভাতের লাগ্যা ভিনো হওয়া। আবার আদিক্ষেতা দেখো না।' ভয়ে আয়ানের বুক ধুক ধুক করতে লাগল। কাছে আসতেই পিঠে একটা চাপ্পড় পড়ল। তারপর হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে মা বলল, 'বোলেছি না, আমাকে না শুদিয়্যা হ্যাংলার মতো যার-তার কাছে যাবি ন্যা।' আয়ানের মনে হল মার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। না হলে সে তো যার-তার কাছে যায়নি। সে গেছে ছোটবাবজীর কাছে। কিন্তু মুখে সেকথা বলতে পারল না। চুপচাপ খেতে বসে গেল। কিন্তু খাওয়ার পর অনেকবার বলাতেও শুতে গেল না। বলল যে সে বিচার দেখবে। কাছেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইব্রাহিম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মজলিসে হাজির হল।

আয়ান দেখল মজলিসে অনেক লোক। নাদের বক্স আছে। মালেক বিশ্বাস আছে। সেখপাড়া থেকে অধার সেখ এসেছে। এসেছে মাঠপাড়ার আবিদ হোসেন মোল্লাও। সকলেই দলে দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। ইসলামপুরের বাস অ্যাক্সিডেন্ট, ভুবনডাঙার ডাকাতি, হাসানপুরের হাবুল্লা মুল্লার আজান, ভগীরথপুরের বঙ্কুবাবুর বাড়ির মামলা, আবাদের জন্য মাঠে ঘাসের আধিক্য— আলোচনার মধ্যে অনেক কিছুই আছে। হঠাৎ অধার সেখ কথা শুরু করাতে সব আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তার বয়সই বোধহয় সব থেকে বেশি। চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে। তার গায়ের রঙও সাদা। সে কাপড়ও পরে আছে সাদা। সমস্ত শরীরে শুভ্রতা যেন তাকে একটা আল্লাদা আভিজাত্য দিয়েছে। সে নাদেরের দিকে ফিরে বলল, 'সবাই তো চলে এসেছে। এবার আমাদের কেন ডেকেছ বল।' নাদের বক্স ইসমাইলকে ডাকল, 'মজলিস ক্যানে ডাক্যাছিস বল্।'' কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। সে বলল, 'মাতোর ভাই বোলবে।' মাতোর ভাই অর্থাৎ ইস্রাফিল বলল, 'মার গয়না ছিল। বড় ভাই তার ভাগ দিছে না।' মালেক বিশ্বাস জিজ্ঞেস করল,

'তুমার মার কি কি গয়না ছিল?' ইস্রাফিল বলল, 'মাকড়ী, চুরি, মাদুলি— সব সুনার।' আবিদ হোসেন এবার ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করল। ইব্রাহিম বলল যে মার গয়না বোনেদের বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে। সেকথা ইসমাইল ও ইস্রাফিলও স্বীকার করল। কিন্তু তাদের বক্তব্য টাকা থাকতেও ওগুলো ভাঙা হয়েছে, তাদের ফাঁকি দিয়ে টাকা জুয়া করার জন্য। সাম-মহম্মদ ইস্রাফিলের কথা সমর্থন করল, 'ঠিক। তখুন উয়াধের অবস্থা ভালো ছিলো।' মাসুদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'উয়ার পরেও যখুন গয়না ভাঙিয়াছে, তখুন ইব্রাহিমের তার দাম দ্যাওয়া উচিত।' নাদের মুনডোল এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। সে এবার বলল, 'ইব্রাহিম তার মায়ের গহনা বোনেদের বিহেতে খরোচ কোরেছে; একথা তো আপনারা মানছেন?' সবাই একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ তা বটে। তখন সে আবার প্রশ্ন করল, 'বোন ইব্রাহিমের একার; না তিনজনের?' সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে বোন তিন ভায়েরই। এবার সে শেষ প্রশ্ন করল, 'মার গহনা তিন ভায়ের। মার প্যাটের বোনও তিন ভায়ের। মায়ের গহনা বোনের বিহেতে খরোচ হয়েছে। তাহোলে তার আবার ভাগের প্রশ্ন আসছে ক্যানে?' আরও কিছুক্ষণ বিচার চলল, কিন্তু কেউই তার এ প্রশ্নের আর উত্তর দিতে পারল না। বরং সবারই মনে হল তাদের বৃথায় ডেকে হয়রান করা হচ্ছে। মজলিস ভেঙে গেল। যাবার সময় মাসুদচাচা ইসমাইলের কানে ফিসফিস করে বলে গেল, 'আমি আগেই বুল্যাছিনু, ঐ নাদের ব্যাটাই সব গন্ডগোল করবে।' ইসমাইল কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ পাটি তুলতে লাগল। আয়ান বিচার দেখে বাড়ি ফিরল। সে দেখল যে অন্য সবাই, এমন কি মালেক বিশ্বাসও খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ ভাবে কথা বলে। কিন্তু নাদের বক্স মোটেই তা করে না। থেমে থেমে, আস্তে আস্তে করে, একটা একটা করে, গুছিয়ে কথা বলে। আর এমন কথা বলে যে কেউ তা কাটতে পারে না। আয়ান ঠিক করল, সে বড় হয়ে নাদের বক্সের মতো কথা বলবে।

তবে আপাতত তার বাব্যা ভিন্ন হওয়ায় তার কাজ বাড়ল। এখন শুধু গরুর জন্য ঘাস কাটলেই চলে না, তাকে গরু চড়াতেও হয়। সেদিন সে তাদের গরু দুটি নিয়ে সেখপাড়ার দিকে আসছিল। এদিকে বিলের ধারে পুকুরের পাড়গুলোতে যে ঘাস হয়েছে সেখানে চরাবে। হঠাৎ দেখল কয়েকজন ছেলেমেয়ে জামাকাপড় পরে, বই-শ্লেট নিয়ে ভুবনডাঙার দিকে যাচ্ছে। সকলেই বিশ্বাসপাড়ার। তার মধ্যে মালেক বিশ্বাসের এক মেয়েও আছে। আর আছে আবুল। আবুল তার থেকে বছর খানেকের বড় হবে। সে জিজ্ঞেস করাতে আবুল বলল যে তারা ভুবনডাঙায় স্কুলে যাচ্ছে। আয়ান বুঝতে পারে না স্কুলে গিয়ে কি হয়। থাকতে না পেরে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে। তার কথা শুনে ওরা হেসে ওঠে— হি হি হি। স্কুলে গিয়ে কি হয় তাও জানে না। হি হি। স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখায় তাও জানে না। হি হি হি। লেখাপড়া [illegible] স্কুলে কি গুণ-ভাগও শেখায়? এবার উত্তর দেয় মালেক বিশ্বাসের মেয়ে মিলি 'যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সব শেখায়।' তারপর সে চোখ দুটো বড় বড় করে হাত দুটো নেড়ে বলে, আরও কত কি শেখায়। ভাগ শেখায়! তাহলে সে স্কুলে কেন যাবে না। দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরেই সে বলল, 'আমি স্কুলে যাব।' ইব্রাহিমের খুব ইচ্ছে যে ছেলের ঘরবুঝ হোক। কিন্তু ছেলেকে স্কুলে পাঠালে বাড়িতে কেউ থাকবে না। তাহলে গরুই বা চড়াবে কে? আর মাঠে পানি খাবার দেওয়ারই বা কি হবে? কিন্তু আয়ানই তার সমাধান করে দিল। সে বলল

যে সকালবেলায় সে মাঠে খাবার দিয়ে গরুর ঘাস কেটে এনে স্কুলে যাবে। আর বিকেল বেলায় স্কুল থেকে ফিরে গরু চড়াবে। কিছু অসুবিধা হবে বটে। কিন্তু তবুও সে আয়ানকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হল। ছেলেটা তাও ঘরবুঝ হবে। খাজনার রসিদ দেখার জন্য আর তাহলে লোকের কাছে যেতে হবে না। কিন্তু আয়ান স্কুলে যাবে কার সঙ্গে? আয়ান একাই যেতে রাজি ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম রাজি হল না। যে বিকেলবেলায় নাদের ভাই-এর কাছে হাজির হল। নাদের বক্সের প্রথম ছেলের লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি। দ্বিতীয় ছেলে বইয়ের কাছেই যায়নি। তৃতীয় ছেলে প্রায় আয়ানের সমবয়সী। সে প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হল। ঠিক হল পরের দিন নাদের বক্সের বড় ছেলে কাদের বক্স আয়ানদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসবে।

তিন

পরের দিন মা তাকে তার হাফপ্যান্ট এবং জামা পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিল। আয়ান তার শ্লেট-পেনসিল, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ আর নবধারাপাত বগলে নিয়ে কাদের বক্সের সঙ্গে স্কুলে রওনা হল। কাদেরের ছোট ভাই আফতার আয়ানের প্রায় সমবয়সী। কাদের তাকেও সঙ্গে নিল। সেখপাড়া পেরিয়ে তারা এসে পড়ল পাকা রাস্তায়। এই পাকা রাস্তাটা নাকি ডোমকল থেকে অনেক দূরে গড়াইমারী পর্যন্ত গিয়েছে। তারা পাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ দেখে সামনের দিক থেকে একটা বাস প্যাঁক প্যাঁক, পোঁ-প্যাঁক করতে করতে এসে মোড়ের মাথায় থামল। একজন বাসের ভিতর থেকে নেমে এল। জনা-দুয়েক ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাদের বলল এটা বহরমপুর যাবে। আয়ান জিজ্ঞেস করল বহরমপুর যায় কেন? বহরমপুর কতদূর? কাদেরের মনে হল প্রথম প্রশ্নটা একেবারে অবাস্তব। সে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিল, বহরমপুর পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল হবে। আয়ান জানতে চাইল, মানে তের কোশ। তার নানীর বাড়ি জলঙ্গী পাঁচ কোশ। তার মানে বহরমপুর জলঙ্গী যতদূর তার দুগুণেরও বেশি দূর। আয়ানের মুখে কৌতুহল, কিন্তু কাদের ভাবে এসব কথা অবান্তর। আয়ান দেখে রাস্তার পাশে খুঁটির মাথায় টিনের উপরে কারা বড় বড় করে লিখেছে 'ভুবনডাঙা'। আয়ানের জানতে ইচ্ছে করে কারা লিখেছে এমন করে। আর কেনই বা লিখেছে। ওদের কি শ্লেট-পেনসিল নেই? কিন্তু সংকোচে কাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। শুধু পুজো আর মহরমের সময় সে গ্রামের বাইরে গেছে। রথের সময়ও এই ভুবনডাঙায় এসেছে। তখন রাস্তায় অনেক লোক থাকে। এরকম ফাঁকা ফাঁকা পাওয়া যায় না। তাই আয়ানের আজ ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু এটা আবার কি? সেই খুঁটির উপর টিনে তার 'চার পয়সার' বইয়ের মতো ছবি এঁকে রেখেছে। তবে বইয়ে লেখাটা উপরে থাকে, ছবিটা নিচে। কিন্তু এখানে ছবিটা উপরে আছে, লেখাটা নিচে। ছবিতে একটা পুচকে মেয়ে বেনী দুলিয়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে ছোটার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে লেখা আছে, 'সামনে স্কুল'। ও, তাহলে তারা স্কুলে চলে এসেছে। হ্যাঁ, তারা স্কুলের কাছে চলে এসেছে।

আয়ান দেখল স্কুল বলতে পাকা রাস্তার দক্ষিণে ধারে একটা খড়ের চালাঘর। সে ঘরের কোন পাশে বেড়া নেই। আর তার নিচে কোন মানুষজনও নেই। একটা কাঁঠাল গাছের নিচে

একটা টিনের চেয়ারে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁর চারপাশে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ মাটির উপরই বসে পড়েছে। অন্য একটা কাঁঠাল গাছের তলায় একজন অল্পবয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁকে ঘিরেও কয়েকজন ছেলেমেয়ে বসে আছে। চেয়ারে বসে আছেন, এঁরা নিশ্চয় মাস্টার। আয়ানদের নিয়ে কাদের বক্স প্রথমে ছোকরা মাস্টার মশায়ের কাছে গেল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলল, 'স্যার এদের ভর্তি কোরব।' মাস্টার মশায় মুখ না তুলেই বললেন, 'হেডমাস্টারের কাছে যাও।' আয়ানরা এবার হেডমাস্টারের কাছে গেল। হেডমাস্টার মশাই কাদেরের কথা শুনেই উঠে গেলেন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে একটা লম্বামতো লাল খাতা বের করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'নাম কি? বাবার নাম? ঠিকানা? বয়স?' তিনি এক এক করে জিজ্ঞাসা করেন আর খাতায় লিখে যান। আফতারের হয়ে গেলে এবার আয়ানের পালা। হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম?' কাদের আয়ানের পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল, 'বল।' আয়ান বলল, 'আয়ান।' 'আয়ান কি?' আয়ান উত্তর দিল, 'আয়ান, আর কিছু না।' 'আচ্ছা, বাবার নাম কি?' 'ইব্রাহিম' 'ইব্রাহিম কি?' আয়ান এবার বুঝতে পারল, সে বলল, 'ইব্রাহিম মুনডোল।' হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'কথাটা মুনডোল নয়, মণ্ডল।' 'কিন্তু সবাই তো মুনডোলই বলে?' হেডমাস্টার মশাই আয়ানের সুরে বললেন, 'সবাই তো ঠিক কথাটা জানে না। তাই বলে। তুমি জেনে গেলে। এখন থেকে ঠিক কথাটাই বলবে।' আয়ানের হেডমাস্টার মশাইকে ভারী ভাল লাগল। সে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ ঠিক কথাটাই বলবে। হেডমাস্টার মশাই এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়স কত?' আশ্চর্য, বয়স কত তা আয়ান কি করে বলবে? সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হেডমাস্টার মশাই তখন কাদেরের দিকে তাকালেন। কাদের বলল, 'ছ বছর হবে।' তিনি ছ বছর লিখে নিলেন। ভর্তি হয়ে গেলে কাদের বাড়ি চলে গেল। হেডমাস্টার মশাইও ছেলেমেয়েদের টিফিনে ছেড়ে দিলেন। কয়েকজন ছেলে গিয়ে খাট্যা বা বুড়ি খেঁলতে লাগল। দুজন মেয়ে ঘর কেটে খোলাম ছুঁড়ে ঘর খেলতে শুরু করল। আর বাকী ছেলেমেয়েরা শুধু হৈ হৈ করে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। হেডমাস্টার মশাই তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

হেডমাস্টার মশাই মুখে একটি হাসি এনে বললেন, 'এসো আমরা আলাপ করি। আমার নাম অমর পাল। তোমার নাম কি যেন বললে...। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আয়ান। আচ্ছা আয়ান, তুমি অ আ এসব অক্ষরগুলো চেন?' আয়ান আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। 'তুমি পড়তে পার?' আয়ান আবার ঘাড় নাড়ল। হেডমাস্টার মশাই এবার জানতে চাইলেন, 'তুমি কি কি বই পড়েছ?' আয়ান বলল, 'চার পয়সার বই, দ্বিতীয় ভাগ, নবধারাপাত।' 'আচ্ছা তুমি তো অনেক পড়েছ।' এই বলে হেডমাস্টার মশাই তাঁর ব্যাগ থেকে একটা ঝকঝকে রঙিন বই বার করে বললেন, 'পড় দেখি বইটার নাম কি?' আয়ান বড় বড় অক্ষরের লেখাটা সহজেই পড়ে ফেলল 'নতুন পড়া।' হেডমাস্টার মশাই তখন বইটা খুলে একটা পৃষ্ঠার ওপর হাত দিলেন। আয়ান দেখল সেখানে একটি নদীর ছবি আঁকা। মাস্টার মশাই বললেন, 'পড়ে শোনাও দেখি।' আয়ান বইটা নিয়ে পড়তে লাগল। 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে। বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।' মাস্টার মশাই বললেন, 'থাক আর পড়তে হবে না।' আয়ান বইটা উল্টেপাল্টে

দেখতে লাগল। ভারী সুন্দর বইটা। অনেক ভালো ভালো ছবি আছে। আর গল্পটা কি সুন্দর। তবে, দ্বিতীয় ভাগ বা নবধারাপাত তো অতো সুন্দর নয়। আয়ানের মনে হচ্ছিল তার এরকম একখানা বই থাকলে খুব ভালো হয়। কিন্তু অমর মাস্টার কি তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন! তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বইটা তোমার খুব পছন্দ?' আয়ান মাথা নাড়ল— হ্যাঁ। অমর মাস্টার বললেন, 'ঠিক আছে, বইটা তোমাকে দিলাম।' কি আশ্চর্য। আয়ানের বিশ্বাসই হচ্ছিল না এত সুন্দর একটা বই মাস্টারমশাই তাকে দিয়ে দিলেন। মাস্টারমশাই কি ভালো! মাস্টারমশাই না হয় ভালো। কিন্তু মা বলে যে দাম না দিয়ে অন্যের জিনিস নিতে হয় না। সে বাড়িতে নিয়ে গেলে মা যদি বকে। আয়ান কথাটাই মাস্টারমশাইকে বলল, মাস্টারমশাই আয়ানের সুরে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার মাকে এর দাম দিয়ে দিতে বোলো। তাহলে তো আর কোন ঝামেলা থাকছে না। আচ্ছা তুমি অঙ্ক জান?' আয়ান এখন খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।' 'কি কি অঙ্ক জান?' 'যোগ বিয়োগ, গুণ— এক ঘরের ভাগও জানি।' মাস্টারমশাই তার শ্লেটখানি নিয়ে একটা বিয়োগ করতে দিলেন। আয়ান সেটা করে ফেলায় তিনি খুবই খুশি হলেন, তাকে কাছে টেনে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভালো করে পড়াশোনা কর, তুমি জীবনে উন্নতি করবে।' আয়ান কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, আচ্ছা। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না।

মাস্টারমশাই তাকে ছেড়ে দিয়ে একটা ঝোলানো থালার উপর একটা কাঠের হাতুড়ি পেটাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি বললেন 'টু এবং থ্রীর ছেলেমেয়েরা সেকেন্ড মাস্টারমশায়ের কাছে যাও। ফোরের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি পড়। ওখানে বসে কালকের বাক্যগুলো লেখ। আর ওয়ানের ছেলেমেয়েরা ওখানে বস।' আয়ানকে তিনি ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসিয়ে দিলেন। সকলের সঙ্গে আয়ানও তাঁর দিকে মুখ করে বসে পড়ল। তিনি এবার তাঁর ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা বোর্ডের মতো জিনিষ বের করে কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে দিলেন। আয়ান দেখল শিংওয়ালা দুটো পাখি আঁকা আছে। আয়ান শিংওয়ালা পাখি কোনদিন দেখেনি। তাই তার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু নিচে যে কবিতাটি লেখা আছে সেটি সুন্দর। মাস্টারমশাই বোর্ডের কাছে একটা কাঠি নিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর ছড়ার এক-একটি শব্দের উপর কাঠি রেখে এক-একজনকে পড়তে বললেন। সবটা পড়া হয়ে গেলে সকলকে একসঙ্গে তাঁর সাথে বলতে বললেন। তিনি সুর করে পড়তে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা তাঁর সাথে পড়তে শুরু করল— হাটটিমাটিম টিম/তাদের খাড়া দুটো শিং/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তারা হাটটিমাটিম টিম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়াটা তাদের মুখস্থ হয়ে গেল। মাস্টারমশাই তাদের ছুটি দিয়ে দিলেন। আয়ান বাড়ি ফিরল। কিন্তু মনটা পড়ে থাকল অমর মাস্টারের কাছে। সে মার কাছে পড়েছে। জবামামীর কাছেও পড়েছে। কিন্তু পড়ার সময় বোঝা যায় যে তারা পড়াচ্ছে। কিন্তু অমর মাস্টার এমন করলেন যে, আয়ানের মনেও হল না তিনি পড়াচ্ছেন। মনে হল তারা মজা করছে। অথচ পড়া হয়ে গেল।

অমর মাস্টার এরকমই করেন। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের পড়িয়ে দেন। অবশ্য তিনি কখনও কখনও তাদের সঙ্গে খেলাও করেন। পরের দিন টিফিনের সময়ই

তিনি ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বললেন— আজ তোমাদের সঙ্গে রুমাল চোর খেলব। সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। আয়ানও। কিন্তু সে জানে না, এ খেলা কি করে খেলতে হয়। অমর মাস্টারমশাই শিখিয়ে দিলেন। তারপর তিনি একজনকে ডাকলেন, 'কল্পনা, তুমি গিয়ে ঐ কাঁঠাল গাছের ওপাশে দাঁড়াও।' আয়ানের বয়সী একটি মেয়ে দল ছেড়ে গিয়ে কাঁঠাল গাছটার ওপাশে দাঁড়াল। কিন্তু সে চুপ করে দাড়িয়ে থাকছে না। এদিকে কি হচ্ছে দেখার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। অমর মাস্টার বললেন, 'না, এদিকে তাকিও না। তুমি পিছন ফিরে দাঁড়াও।' তারপর তিনি আয়ানদের একসঙ্গে জড়ো করে আয়ানের প্যান্টের পকেটে একটা রুমাল ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর তাদেরকে গোলকরে বসিয়ে দেওয়া হল। সকলের বসা হয়ে গেলে মাস্টারমশাই কল্পনাকে ডাকলেন, 'কল্পনা এসো।' কল্পনা কাছে আসতেই সকলে অমরবাবুর সঙ্গে গান গাইতে লাগল— ইস্তী বিস্তী, একজন নাঁকিসুরে গাইছিল গান, তাই শুনে ইস্তী বিস্তীর উড়ে গেল প্রাণ। গান চলতে লাগল। আর কল্পনা গোলকরে বসা ছেলেমেয়েদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কল্পনা তার কাছে আসতেই গানের সুর চড়ে গেল। কল্পনা আরও অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু গানের সুর হঠাৎ নেমে গেল। কল্পনা তখন আবার আয়ানের কাছে ফিরে এল। আবার গানের সুর চড়ে গেল। কল্পনা তার মাথায় হাত দিল, জামার পকেটে হাত দিল, মুখে হাত দিল। গানের সুর একই রকম থাকল। কিন্তু কল্পনা যেই তার প্যান্টের পকেটে হাত দিল, সুর আরও চড়ে গেল। সে তখন ডান পকেট থেকে হাত সরিয়ে বাঁ পকেটে নিয়ে গেল। গানের সুর আবার নেমে গেল। তখন সে আবার ডান পকেটে হাত দিল। গানের সুর আবার চড়ে গেল। কল্পনা তখন আয়ানের প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিয়ে রুমালটা বের করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। কল্পনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চোরকে ধরেছে। নিয়ম অনুসারে এবার আয়ানের পালা। কিন্তু অমর মাস্টার খেলাটা আজকের মত এখানেই শেষ করলেন। তিনি বললেন, "আজকে আর একটা মজার খেলা হবে।" এবার তিনি তাঁর ঝোলা থেকে কতকগুলি কার্ডবোর্ডের টুকরো বের করলেন। যার প্রত্যেকটাতে কিছু লেখা আছে। সবাই তাঁর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিল। তিনি বললেন, 'আমরা এগুলিকে সাজিয়ে কিছু শব্দ করতে পারি যার অর্থ হয়।' সবাই তাঁর দিকে তাকাল। তিনি ডাকলেন, 'অঞ্জলি,' অঞ্জলি এসে সাজাল 'ইস্কুল'। তিনি বললেন, 'ঠিক হয়েছে, কিন্তু আরগুলো।' অঞ্জলি আর পারল না। তিনি শৈলেনকে ডাকলেন। শৈলেন এসে সাজাল 'ভুবন'। তারপর যাকেই ডাকলেন, একটা করে শব্দ সাজিয়ে দিল। তখন তিনি ডাকলেন কল্পনাকে। বললেন, সবগুলোকে সাজাতে হবে। কল্পনা খানিকক্ষণ চেষ্টা করে সাজিয়ে দিল— 'ভুবনডাঙাপ্রাইমারীস্কুল।' অমর মাস্টার সকলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, ঠিক হয়েছে?' সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, 'ঠিক হয়েছে, স্যার' কল্পনার মুখ আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু আয়ান একটু এগিয়ে এসে বলল, 'একটা ভুল আছে, স্যার।' সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল, অমর মাস্টার বললেন, 'তাহলে ভুলটা ঠিক করে দাও।' আয়ান এসে প্রাইমারী-র আগে ও পরে একটু করে ফাঁক দিয়ে সাজাল ভুবনডাঙা প্রাইমারী স্কুল। সকলেই বুঝতে পারল সত্যি একটা ভুল ছিল। অমর মাস্টার আয়ানের পিঠে একটা উৎসাহসূচক থাপ্পড় দিলেন।

পরের দিন ছিল শনিবার। অমর মাস্টারের স্কুলে শনিবার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে হয় না। শনিবার 'সাপ্তাহিক আসর'-এর দিন। এ আসরে কেউ গান গেয়ে শোনায়, কেউ নাচে, কেউ গল্প বলে, কেউ বক্তৃতা করে, কেউ কবিতা শোনায়, কেউ বা কোন মহান ব্যক্তির জীবনী বলে। ইনফ্যাণ্টের একটি মেয়ে হাত নেড়ে নেড়ে নাচ করে দেখাল। ক্লাস ফোরের একটি ছেলে নেতাজীর জীবনী বলল। তাদের ক্লাসের তনুজা কি সুন্দর গান করল— 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' আবুল একটা ছড়া বলল। আর কল্পনা? কল্পনা তার ছোট ছোট করে ছাটা চুল দুলিয়ে চোখ উল্টিয়ে ঠাকুরমার মত গলা করে একটা গল্প বলল। শিয়ালের গর্তে ভুল করে একটা ছাগলছানা ঢুকে পড়েছে। শিয়াল কিছু বুঝতে না পেরে গেছে বাঘমামার কাছে পরামর্শ নিতে। বাঘমামা সবকিছু না দেখে পরামর্শ দিতে পারে না। কিন্তু সে দেখতে যখন যাবে তখন শিয়াল যদি তাকে একা ফেলে পালিয়ে না যেতে পারে তাই তার লেজের সঙ্গে শিয়ালের লেজ বেঁধে নিয়েছে। কিন্তু ছাগলছানা বড় সেয়ানা। সে বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে শিয়ালকে বলল— তুমি একটা অপদার্থ। আমি বললাম, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে; অন্তত চারটে বাঘ নিয়ে এসো। তা কিনা মাত্র একটা বাঘ এনেছ! যেই না শোনা অমনি বাঘ তীর বেগে ছুটে পালাতে আরম্ভ করেছে। বাঘ যত জোরে ছুটছে শিয়াল তত বেশি আছাড় খেয়ে চিৎকার, করছে— বাবা মোলাম গো; মামা বাঁচাও! বাঘ মনে করছে বোধ হয় বেটা তাকে মারার জন্য এখনও তাড়া করছে বলে শিয়াল চিৎকার করছে। সে আরও জোরে ছুটছে। শিয়ালের আরও বেশি ছ্যাচড়া লাগছে। সে আরও জোরে চিৎকার করছে। বাবা মোলাম গো; মামা বাঁচাও। গল্প শুনে সকলে খুব হেসে উঠল। আয়ানেরও ভালো লাগল। ছাগলছানাটার আচ্ছা বুদ্ধি তো! সে ঠিক করল পরের সপ্তাহিক আসরে সে আরও মজার একটি গল্প বলবে। কিন্তু অমর মাস্টার বললো, 'না, পরের আসরে তুমি বিদ্যাসাগরের জীবনী বলবে।' তিনি আয়ানকে তার জন্য একটা বই দিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়তে গিয়ে আয়ান অবাক হয়ে যায়। এত অবস্থা খারাপ যে পড়ার জন্য আলোও জোটে না। সেই অবস্থা থেকেও পরিশ্রম করে সে দশজনের একজন হয়েছিল। বিদ্যাসাগর পারলে সে কেন পারবে না? অমর মাস্টার বললেন নিশ্চয় পারবে। তবে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। অমর মাস্টারের কথা শুনে আয়ান উৎসাহ পায়। মন দিয়ে পড়ে আর অঙ্ক করে। স্কুলে যেটা পড়ানো হয়, বাড়িতে গিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে দেখে। দেখতে দেখতে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা চলে এল। ফল বেরোলে দেখা গেল আয়ান ফার্স্ট হয়েছে। সে বাঙলায় পেয়েছে পঞ্চাশের মধ্যে আটচল্লিশ এবং অঙ্কে পঞ্চাশে পঞ্চাশ। সঙ্গে সঙ্গে সারা স্কুলে সে পরিচিত হয়ে গেল। তাদের ক্লাসে তার পরেই নম্বর ছিল কল্পনার। ছুটির পরে কল্পনা আয়ানকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। আয়ান দেখল কল্পনাদের বাড়িটা মালেক বিশ্বাসের বাড়ির থেকেও বড়। আর বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। কি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে। সে বিলে কলমীর ফুল দেখেছে। কুমড়োর ফুলও দেখেছে। তবে এরকম ফুল দেখেনি। কল্পনা সব কিরকম নাম বলল— গাঁদা, দোপাটি, জিনিয়া, গোলাপ আরও কত কি যেন। অতশত কি মনে থাকে! কিন্তু তার খুব ইচ্ছে হল যে, তাদের বাড়িতে ফুলের বাগান করে। কল্পনাকে বলতে সে কতকগুলো বীজ দিল— দোপাটি, গাঁদা আর জিনিয়ার। কিন্তু আয়ানের সব থেকে ভালো

লাগছিল গোলাপ ফুল। সে বলল— আমাকে গোলাপ ফুলের বীজ দে। কিন্তু তার কথা শুনে কল্পনা হেসে উঠল। দূর বোকা, গোলাপ ফুলের বীজ হয় নাকি? গোলাপের ডাল লাগায়। এই বলে সে ভেতর থেকে একটা ছুরি এনে গোলাপের ডাল কাটতে লাগল। ডালটা আয়ানের হাতে দিয়ে বলল— লাগিয়ে রোজ জল দিস, তাহলেই পাতা ছাড়বে। গোলাপের ডালটা হাতে নিয়ে আয়ান বাড়ি রওনা হল। কিন্তু আজ বাড়ি ফিরতে তার অনেক দেরি হয়ে গেল।

আয়ান স্কুল থেকে ফিরে গরুগুলো চরাতে যায়। কিন্তু আজ সে ফিরে দেখল গরুগুলো নেই। মা বলল, 'সবাই আইলো। তুই কি কোরছিলি? তোর ব্যাটা রাগ কোরে লিয়্যা গেলছে। আর বোল্যা গেলছে যে কাল থাক্যা আর স্কুল যাত্যা হবে না।' আয়ানের মনে হল, ভারী ভুল হয়ে গেছে। কল্পনার সঙ্গে ওদের বাড়ি যাওয়া ঠিক হয়নি। ফার্স্ট হয়ে সে কিনা ভেবেছিল বাড়িতে সবাই খুশি হবে। তা কি না উল্টে তার স্কুল যাওয়া বন্ধ! অবশ্য এর পেছনে কারণ আছে। আয়ানের সঙ্গে আফতার ভর্তি হয়েছিল। সে বাংলা, অঙ্ক সব বিষয়েই শূন্য পেয়েছে। মালেক বিশ্বাসের মেয়ে মিলি আয়ানদের সঙ্গে পড়ে। সে শূন্য পায়নি। তবে ফেল করেছে। সাম-মহম্মদের ভাইপো আবুল পাস করেছে। কিন্তু নম্বর খুব কম। ফলে তাদের সকলেরই মন খারাপ। আরও খারাপ এইজন্য যে তাদের গ্রামেরই আয়ান খুব ভাল নম্বর পেয়েছে। আয়ানের ফিরতে দেরি দেখে চিন্তিত বাবা ওদের বাড়িতে গেছে। সকলের কাছ থেকেই জেনেছে যে আজ স্কুল অনেক আগে ছুটি হয়ে গেছে। তাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে আয়ান ওদের বাড়িতে গেছে। শুনে বাবার মাথায় হাত। গরীব মানুষের ছেলের পক্ষে এ যে ঘোড়া রোগ। এরকম হলে তো তার ছেলে আর কোন কাজ করবে না। কাজ নেই স্কুলে গিয়ে। স্ত্রীকে বলে দিয়েছে কাল থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ। দুদিন আয়ানের স্কুল যাওয়া হয়নি। অভিমানে সেও কিছু বলেনি। রাগে রাগে অনেক বেশি করে ঘাস কেটেছে। খুব তাড়াতাড়ি মাঠে খাবার দিয়েছে। আর বিকেলবেলায় গরু চরিয়েছে। তৃতীয় দিনেও সে সকালে উঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। ঘাসের বোঝা ভুসির ঘরে ফেলেই দেখে অমর মাস্টার তাদের দরজার কাছে সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর মা বেড়ার আড়াল থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। বৈঠকখানায় একটা পাটি পাতা আছে। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই ওখানে বসেননি। আয়ান আসতেই মা বলল, 'টপ কোর‍্যা যা। তোর ব্যাটাকে ডাক্যা আন গ্যা যা।' আয়ান ছুটল বাবার কাছে লগড়া তালার মাঠে। মাস্টার আস্যাছেন। ইব্রাহিমের যেন বিশ্বাসই হয় না। সে লাঙল রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। হ্যাঁ সত্যিই অমর মাস্টার তার পালঙ্গায় দাঁড়িয়ে আছেন। এসব ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা ইব্রাহিম জানে না। তার ভারী অস্বস্তি লাগে। সে শুধু এসে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অমর মাস্টারই কথা শুরু করেন, 'চাষ কেমন হচ্ছে?' জমির 'জো' ভাল আছে? ইব্রাহিম বুঝতে পারে না মাস্টারের জমির জো-এ কি কাজ। কিন্তু তবুও স্বস্তি পায়। বলে, 'জি আজ্ঞে, জো খুব ভালো'। তবে আর দুদিন দেরি হোলেই টানিয়্যা যাবে।' এবার অমর মাস্টার আসল কথায় আসেন, 'আমি এসেছি আয়ানকে নিতে। আপনার ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। অঙ্কে পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ পেল। আর সেদিন থেকেই আপনি স্কুল বন্ধ করে দিলেন।' ইব্রাহিম আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

তার ছেলে ফার্স্ট হয়েছে! কই তা তো কেউ তাকে বলেনি। আর শুধু সেদিনকার দেরির কথাই মনে পড়ল। বলল, 'হুজুর আমরা চাষা মানুষ। বাড়িতে গরু-ছাগল আছে, ছেলে স্কুলে গেলে সংসার চলে না। অমর মাস্টার বললেন, 'কেন চলবে না? এই তো আয়ান ঘাস কেটে এল। এখন স্কুলে যাবে। স্কুল থেকে ফিরে আবার কাজ করবে।' ইব্রাহিম কি করে বোঝাবে যে চাষীর বাড়িতে কাজ কত। কিন্তু এতক্ষণে তার খেয়াল হয় যে মাস্টারমশাই এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মাস্টারমশাই আপনি বসুন।' কিন্তু মাস্টারমশাই বসেন না, 'আয়ানকে না পাঠালে আমি বসব না।' ইব্রাহিম কি করে? এতবড় একজন মানী লোক যখন বলছে তখন কি না পাঠিয়ে পারে? সে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'যা, টপ্ কোর‍্যা গা ধু-য়্যা। কাপুড় পোরহ্যা যা।' আয়ান স্নান করতে চলে যায়। এবার সালমা ইব্রাহিমকে বাড়ির মধ্যে ডেকে পাঠায়। 'মাস্টারমশাই আস্যাচেন। খুশি হোয়্যা হাতে তো কিছু দিতে হয়।' হ্যাঁ, কথাটা ইব্রাহিমের ঠিক বলেই মনে হয়, 'কিন্তু কি দ্যাওয়া যায়। সালমাও বুঝতে পারে না. "কি দ্যাওয়া যায়।' ভাবে কি দেওয়া যায়। হঠাৎ তার চোখ চলে যায় চালের উপর। একটা মিষ্টি কুমড়ো পেকে আছে। সেটা পেড়ে সে ইব্রাহিমের হাতে ধরিয়ে দেয়। ইব্রাহিম সেটা এনে মাস্টারমশায়ের সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলতে যায়। অমর মাস্টার বাধা দেন, 'না, এসব কিছু লাগবে না।' ইব্রাহিম ছাড়ে না, 'ইডা যোদি না ল্যান তাহোলে বুঝবো আপনি এখুনও রাগ কোর‍্যা আছেন।' অমর মাস্টার আর আপত্তি করতে পারেন না। তিনি সাইকেলের কাছে এগিয়ে যান। তাঁর আসার খবর পেয়ে এ গ্রামের তাঁর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরাও এসে হাজির হয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই প্রায় সমস্বরে আবেদন করছে, 'স্যার আমাদের বাড়ি চলুন, স্যার আমাদের বাড়ি চলেন।' এদের মধ্যে মালেক বিশ্বাসের মেয়ে মিলিও আছে। কিন্তু অমর মাস্টার আর কারও বাড়ি গেলেন না। বললেন, 'আজ স্কুলের বেলা হয়ে গেছে। চল সব স্কুলে যেতে হবে।' তিনি সাইকেলে চাপলেন। আয়ান ততক্ষণে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এসেছে। সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলে রওনা হয়ে গেল। সে আর কিছুতেই স্কুল থেকে ফিরতে দেরি করে না। কারণ দেরি হলেই বাবা স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেবে। আর একটু আধটু দেরি হলেও ইব্রাহিম আর ছেলের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার কথা ভাবে না। কারণ তাহলেই অমর মাস্টার এসে হাজির হবেন। ছেলের কাজ তো পাওয়া যাবেই না বরং তার দিনটাও নষ্ট হবে। তার থেকে স্কুল থেকে এসে যা কাজ করে সেই ভালো।

চার

আয়ান যে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে এবং সে দুদিন স্কুলে না যাওয়াই অমর মাস্টার যে তাকে নিতে তাদের বাড়িতে এসেছিলেন কথাটা ক্রমে জানাজানি হয়ে যায়। প্রথমে পাড়া, তারপর পাড়া থেকে সারা গ্রামে। গ্রামে এ নিয়ে কানাকানি শুরু হয়। এরকম ঘটনা এর আগে বাঘডাঙায় আর কখনও ঘটেনি। বাঘডাঙা চাষাদের গ্রাম। ভদ্দরলোকরা এখানে আসে না। তারা চাষ করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়। কিন্তু যখন ধান মাড়া হয় জমির

মালিক এসে বসে থাকে, পাছে বর্গাদার তার ভাগ কিছু মেরে দেয়। আর আসে পাওনাদার। কেউ হয়ত ধারে একটা কাপড় এনেছে। ঠিক সময় মত তার দাম শোধ করতে পারেনি। তখন তাগাদা দিতে আসে। তাও মালিক আসে না, আসে তার লোক। অমর মাস্টার রাজভাগারু বা পাওনাদার না হয়েও তাদের গ্রামে এসেছেন। তাও এসেছেন ইব্রাহিমের বাড়িতে। তাহলে তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাদের বাড়িতেও ভদ্দরলোকেরা আসবে। মাসুদ আর সাম-মহম্মদ এই কথাটাই অলোচনা করছিল। তারা ঠিক করল যে তাদের ছেলেমেয়েদেরও স্কুলে পাঠাবে। পরের দিন থেকে মাসুদের ছেলে পচা এবং সাম-মহম্মদের ছেলে ছানুও স্কুলে যেতে লাগল। মিলি, আবুল আর আফতার তো আগে থেকেই যেত। সেখপাড়া থেকেও সাহেদ, সাদেক, নকীব প্রভৃতি অনেকে যাওয়া শুরু করল। কিন্তু পরীক্ষায় কারুও ফল ভালো হল না। এমনকি আবুল আর সাদেক ছাড়া কেউ পাসই করতে পারল না। নাদের ছেলেকে মাঠের কাজে লাগিয়ে দিল। মাসুদ আর সাম-মহম্মদ শলা-পরামর্শের জন্য গেল মালেক বিশ্বাসের কাছে। আলোচনায় বোঝা গেল যে বাড়িতে কেউ দেখিয়ে দেওয়ার না থাকাতেই এরকম হচ্ছে। অবশ্য মিলির ক্ষেত্রে সেকথা খাটে না। কারণ মালেক বিশ্বাস নিজেই তাকে দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে মিলি তার কাছে একদম বসতে চায় না। অতএব দেখিয়ে দেওয়ার লোকের দরকার। ঠিক হল জাইগীর রাখা হবে। ডোমকল হাই স্কুলে কোন হোস্টেল নেই। ফলে দূর দূর গ্রাম থেকে যারা পড়তে আসে তাদের খুব অসুবিধা হয়। মাসুদ যোগাযোগ করে এরকম গোটা তিনেক ছেলে যোগাড় করে ফেলল। তারা মাসুদ, সাম-মহম্মদ আর মালেক বিশ্বাসের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করবে। আর অবসর সময়ে তাদের ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দেবে। কিন্তু তাতেও তাদের ফল ভাল হল না। ওদিকে আয়ান বারবার ফার্স্ট হতে লাগল। ফার্স্ট হয়েই সে থ্রী থেকে ফোরে উঠেছে। মাসুদ বলত অমর মাস্টার ওকে নম্বর বেশি করে দিয়ে দেয়। কথাটা সাম-মহম্মাদেরও ঠিকই মনে হয়েছে।

অমর মাস্টার বলতেন, 'শুধু অন্যদের ইচ্ছে থাকলেই হবে না। যে পড়াশোনা করবে, তারও আগ্রহ থাকা দরকার।' সে আগ্রহ আয়ানের ছিল। ছিল বলেই থ্রীতে ইংরেজি পড়ানো শুরু হতেই সে অক্ষর এবং উচ্চারণ এত ভালভাবে শিখে নিয়েছে যে সে এখন যে কোন সাধারণ ইংরেজি পড়তে ও লিখতে পারে। তাছাড়া কাল, কারক এগুলি শিখে নেওয়ায় সে ইংরেজি ছোট ছোট বাক্যও তৈরি করতে পরে। শনিবারে সাপ্তাহিক আসরের কল্যাণে সে অনেক মহাপুরুষের জীবনী জেনে গেছে, কিছু কবিতা মুখস্থ হয়েছে, তার থেকেও বেশি হয়েছে বড় হওয়ার বাসনা, হয়েছে অমর মাস্টারের কাছে গল্প শুনে শুনে। অমর মাস্টার খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। আজও বলছিলেন। আফ্রিকার এক জঙ্গলে কয়েকজন শিকারি গিয়েছিল শিকার করতে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদল নেকড়ের সঙ্গে দেখল একটা সতের-আঠার বছরের উলঙ্গ মেয়েকে। শিকারিদের কৌতূহল হল। তারা মেয়েটিকে উদ্ধার করল। কিন্তু মেয়েটি কাপড় পরতে চায় না। কোন ভাষা বুঝতে পারে না। এমন কি দুপায়ে চলতে পারে না— চলার সময় হাতসুদ্ধ ব্যবহার করে নেকড়ের মত। চারপায়ে চলে। কিন্তু তাকে অনেকদিন ধরে মানুষের মধ্যে রাখতে সে আস্তে আস্তে সব শিখল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়

মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয় তার উপর সেই পরিবেশের প্রভাব পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যদি আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মাতেন তাহলে তিনি এরকম কবিতা লিখতে পারতেন? না। আবার এটাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সকলেই রবীন্দ্রনাথ হয়নি। কারণ মানুষের উপর যেমন পরিবেশের প্রভাব পড়ে, তেমনি ঐকান্তিক ইচ্ছে থাকলে মানুষ পরিবেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আয়ান ভাবতে থাকে সে পরিবেশকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায়। ভাবতে ভাবতে বৃত্তি-পরীক্ষা এগিয়ে আসে। ভুবনডাঙা স্কুল থেকে আয়ানরা এবার বারজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে। অমর মাস্টার জানেন আয়ান ফার্স্ট ডিভিশন পাবেই। তবে অন্যরা কি করবে সে ব্যাপারে তার নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে রেখা, শিখা আর বিপদ। এত বুঝিয়েও এদের মাথায় যেন কিছুই ঢুকতে চায় না। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সকলকে নিয়ে বসেন। অন্যদের দেখাদেখি যদি কিছু উন্নতি হয়। হয়ও। একে অপরের দেখে খানিকটা শিখে নেয়। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত মনে করিয়ে দেন কোথায় কোথায় ভুল হতে পারে। তারপর ঠিক হয় পরীক্ষার কদিন সকলেই সকালে উঠে কল্পনাদের বাড়িতে চলে আসবে। ওখান থেকে হেডমাস্টার মশাই পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবেন।

প্রথম পরীক্ষা সোমবার, বাংলা। আয়ান সকালে উঠে চলে আসে কল্পনাদের বাড়িতে। অমর মাস্টার ইতিমধ্যেই অন্যদের নিয়ে বসে গেছেন। আয়ানও গিয়ে একপাশে বসে যায়। অমরবাবু খুব সাধারণ ব্যাপারগুলো বলে যান। হঠাৎ একসময় তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, আটটা বেজে গেছে, এবার যেতে হবে। কল্পনা সাবানের কেসটা নিয়ে বাড়ির পুকুরে নামে। আয়ান সাথে সাথে যায়। হাতে লাগা কালিটা ধুয়ে ফেলে। কল্পনা পুকুর থেকে উঠে আসে। ও বেরিয়ে এলে অমরবাবু তাদেরকে নিয়ে হাজির হন ডোমকল হাই স্কুলে। ওখানেই ওদের সিট পড়েছে। পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অমর মাস্টার দাঁড়িয়ে থাকেন। আয়ানরা বের হলে কে কিরকম লিখেছে জেনে তবে বাড়ি ফেরেন। এই করতে করতে পরীক্ষা শেষ হয়। ফল বের হলে দেখা যায় ভুবনডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুল থেকে সবাই পাস করেছে। আর আয়ান ছাড়াও কল্পনা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে।

তাদের বিদায় উপলক্ষে অমর মাস্টার একটা বনভোজনের আয়োজন করলেন। সব ছাত্র-ছাত্রী চার আনা করে চাঁদা দিল। আর প্রত্যেকে বাড়ি থেকে একমুষ্ঠি চাল আর একমুষ্ঠি ডাল নিয়ে এল। বেগুন ভাজা আর খিচুড়ি হল। সেকি উৎসাহ! কেউ উনুন তৈরি করে। কেউ খড়ি কুড়িয়ে আনে। কেউ পাতা কেটে আনে। আবার কেউ যায় রান্না করতে। রান্না শেষ হলে সকলে একেসঙ্গে বসে খায়। তারপর শুরু আসর। তনুজা গান করে। কল্পনা কবিতা শোনায়। আর সবশেষে আয়ানের বক্তৃতা। অমর মাস্টার ধরা গলায় কয়েকটি কথা বলেন। তারপর সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আয়ানের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেন, "আমি তো বেশি কিছু শেখাতে পারলাম না। অনেক কিছু শেখার আছে। অনেক বাধা আসবে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই হবে জয়।'

পাঁচ

সাহস করে এগিয়ে গেলেও সকলের জয় হয় না। আয়ানের ছোটবাবৃজী ইসমাইলেরও হয়নি। তার মাজ্ বাবৃজী ইস্রাফিলেরও হয়নি। ইস্রাফিলের স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেপিলেও নেই। সে ভাগে যে গরুটা পেয়েছিল তা বিক্রি করে দিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে তার জমি সে লাঙ্গল কিনে চাষ করেছে। সার দিয়েছে। নিজের জমি নিড়ানোর পর অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজও করেছে। ভাল দেখাশুনা হওয়ায় ফসলও হয়েছিল ভালো। ফলে তার নিজের খাওয়া-দাওয়ার পরও বেশ কিছু ধান, ছোলা, মশুর উদ্বৃত্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার জন্য যে মালেক বিশ্বাসের মত 'দুন্যা' লাগান দিতে শুরু করল। 'দুন্যা' লাগান আর কিছুই নয়– অভাবের সময় গরীব মানুষেরা ধনীদের দুয়ারে খাবারের জন্য গেলে ধনীরা তাদের কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য এই শর্তে দেয় যে, ফসল উঠলে তার দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে। কিন্তু তারা আদায় করার কৌশল জানে। ইস্রাফিল তা জানে না। ফলে তার ধার কেউ শোধ দিল না। ফলে তার সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল। রাগে দুঃখে সে গুম হয়ে রইল। সে গরীব হয়ে গেল। সাহস করে এগিয়ে গিয়েও ধনী হওয়া তার হল না।

ইসমাইলের অবস্থা আরও খারাপ। দুধ খাবে বলে ভাগের সময় সে গাই গরুটা নিয়েছিল। আবার চাষের জন্য কিছু ভাগের জমিও নিয়েছিল। কিন্তু জমি চাষ করতে হলে লাঙ্গল চাই। আর লাঙ্গল টানার জন্য মোষ বা গরু চাই। তালতালার জমির যে অংশটা সে ভাগে পেয়েছিল তা মালেক বিশ্বাসের কাছে বিক্রি করে সে দুটো বলদ কিনেছিল। কিন্তু সে ও তার স্ত্রী দুজনেই ছিল খুব ছেলেমানুষ। গরু-বাছুরের ঠিক ঠিক যত্ন-আত্তি করতে জানত না। তাছাড়া সারাদিন মাঠের কাজ করার পর তার পক্ষে গরুর দিকে নজর দেওয়ার মতো তেমন সময় থাকত না। আর তার স্ত্রী নজর দেওয়ার যে দরকার আছে তাই মনে করত না। ফলে কয়েকমাসের মধ্যেই বলদ দুটো পরপর মারা গেল, আর গাইটা পাতলা পায়খানা করে মরার মতো হয়ে রইল। বাকী জমিটুকু সে আর কিছুতেই বেচতে চায় না। অথচ বলদ কিনতেই হবে। না হলে আবাদ হবে না। তারা খেতেও পাবে না। সে অনেকের কাছে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু খালিহাতে কেউ টাকা ধার দিতে চায় না। অবশেষে ভগীরথপুরের মিলন হালদারের কাছে বাকী জমিটুকু বন্ধক দিয়ে বলদ কিনল। কথা হল সুদসমেত টাকা ফেরত দিলেই জমি ফেরত দিয়ে দেবে। সুদের হার একশ টাকায় মাসে ছটাকা। অর্থাৎ বছরে শতকরা বাহাত্তর টাকা। আর দেওয়া এবং নেওয়া দুই সময়েরই রেজিস্ট্রি খরচ যে টাকা ধার নিচ্ছে তার। রেজিস্ট্রি হল বিক্রি কবলা। এভাবে যারা জমি বন্ধক দেয় তারা কেউই আর ছাড়াতে পারে না। ইসমাইলও পারেনি। তিন বছরে সুদ, আসলের ডবলেরও বেশি হলে মিলন হালদার জমি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য লোককে ভাগে দিয়ে দিল। তখন তার বলদ দুটো বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কিন্তু তখনও তার স্ত্রীর চৈতন্য হল না। সে বলদ বিক্রি করা টাকা দিয়েই এমন ভালমন্দ খেতে শুরু করল যে অল্পদিনের মধ্যেই সে টাকা শেষ হয়ে গেল। ইসমাইল মাঝে মাঝে জমি চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ করত। কিন্তু তাতে তার স্ত্রীর কোন দুঃখ ছিল না। সে বলত, 'যাদের জমি নাই তারা কি বাঁচ্যা নাই।' তারাও বেঁচে আছে। কিন্তু কি করে আছে। তারাও এখন

সেইভাবে বেঁচে আছে। যখন কাজ থাকে, ইসমাইল মুনিষ খাটে। একবেলা খাবার জোটে। যখন কাজ থাকে না, তখন তাও জোটে না। ইতিমধ্যে তাদের দুটি মেয়ে হয়েছে। খেতে না পেলে করুণ মুখ করে বসে থাকে। খেতে না পেয়ে ইসমাইলেরও শরীরটা ভেঙে গেছে। ইব্রাহিম একবার বলেছিল, 'ছোড়াদের কষ্ট আর দেখতে পারা যায় না ; এবারে একঠে কর‍্যা লিই।' কিন্তু সালমা কিছুতেই রাজী হয়নি। সে বলেছে, 'দোহা দুধ আর বাটে সাঁদায় না। ভাঙ্গা মুন জুড়া লাগে না। উয়াধের উপুর আমার মুন ভাঙ্গ্যা গেলছে। আর তুমি লিজ্জে থাক্যা তো ভিনো কোর‍্যা দ্যাওনি। উরাই আমার ছেল্যাদুট্যাতে সব খায়্যা লিবে বোল্যা ভিনো হয়েছে। আবার একঠে ক্যানে? আমি কাহুকে একঠে লিবো না।' কথাটা ঠিক, তাই ইব্রাহিম আর কোন কথা বলতে পারেনি। শুধু ভায়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেয়েছে। আরও কষ্ট পেয়েছে মেয়ে দুটির জন্যে। খাবার সময় হলেই ছোট মেয়েটি এসে হাজির হয়। সালমা পছন্দ করে না। বকাবকি করে। চলে যেতে বলে। কিন্তু কিছুতেই যাবে না। চুপ করে বসে চুকচুক করে তাকাবে। একদিন রেগে গিয়ে সালমা বলেছিল, 'ছুচ্ দিয়্য প্যাটটাই ফুট্যা কোর‍্যা দিবো।' শুনেই সে ছুটে পালিয়েছিল। সেই থেকে সে সুঁচের ভয় করে। তাই খাবার সময় এলে তাকে শুনিয়ে কেউ না কেউ সুঁচের কথা তোলে। ভয় পেয়ে মেয়েটি ভীত খরগোশের মত পালিয়ে যায়। তারপর বাইরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখে ইসমাইলের বুকটা টনটন করে ওঠে। তার মনে হয় কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করা দরকার ঠিক করতে না পেরে মাসুদচাচার কাছে হাজির হয়। মাসুদচাচা বলে, 'তুমার টাকা জমবে কি কোর‍্যা বুলো? তুমার বড়োভাই জমানো টাকাপয়সা সব মার‍্যা দিলো। গয়নাগুলোরও ভাগ দিলো না। সেই সব টাকা ছিলো বুল্যাই তে ইব্রাহিমের অবস্থা অতো ভালো হয়েছে।'

কিন্তু ইব্রাহিমের অবস্থাও কি ভালো হয়েছে? ভাগের সময় সে একটা বলদ পেয়েছিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে আরেকটা বলদ কিনেছিল। তাই দিয়ে সে নিজের বিঘে তিনেক জমি ছাড়াও ছ-সাত বিঘে জমি ভাগে চাষ করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাকে একাই সব কাজ করতে হয়। পয়সার অভাবে মুনিষ লাগাতে পারে না। আর নিজেরও কাজ করার অভ্যাস নেই বলে বেশিক্ষণ কাজ করতে পারে না। লাঙ্গল বা নাঙলে দেওয়া ঠিকমতো হলেও নিড়ানো ঠিকমত হয় না। আবাদ কোনবারই ভালো হয় না, যা হয় তাতে খাবারে টানাটানি পড়ে। ধার করতে হয়। ফসল হলে ধার দিতেই ফুরিয়ে যায়। আবার অভাব দেখা দেয়, অথচ খাবার লোক ছ-সাতজন। কিছুতেই চলে না। কোনদিন হয়ত এক পোয়া চাল জুটল। ঐ রান্না করে সকলে ভাগ করে খেল। আবার কোনদিন আধসের আটা। রুটি করলে হবে না। তখন জলে গুলে সিদ্ধ করে ভাগ করে খেল। কোনরকমে দিন চলে যায়। তবুও ইব্রাহিম ভাবে এবার তার দুঃখের দিন শেষ হবে। ছেলেটা বড় হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল পাস করেছে। ঘরবুঝ হয়ে গেল। এবার তাকে মাঠের কাজে নামাবে। দুই বাপ-ব্যাটায় কাজ করলে তার আর অভাব থাকবে না।

রান্নাঘরে সালমা রান্না করছিল। পাশে বসে ইব্রাহিম একটা বিড়ি ধরিয়ে আরাম করে টানছিল আর তার ভাবনার কথা স্ত্রীকে বলছিল। আয়ান এসে মার আঁচলের খুট ধরে খানিক নাড়ানাড়ি করল। তারপর বলল, 'ছাব্বিশ টাকা লাগবে?' 'ছাব্বিশ টাকা কিসে লাগবে?' ইব্রাহিম জানতে চাইল। আয়ান বলল, 'হাইস্কুলে ভর্তি হব।' শুনেই ইব্রাহিম চটে উঠল, 'হাই

স্কুলে ভর্তি হোবি তো ছাব্বিশ টাকা লাগবে কে বোলেছে?' আয়ান বলল, 'অমর মাস্টার খোঁজ নিয়েছেন।' অমর মাস্টারের নাম শুনে ইব্রাহিম ক্ষেপে গেল, 'এই অমর মাস্টারডাই যতো লষ্টের গুড়া! এরপর অমর মাস্টারের কাছে গেলে তুমার ঠ্যাং ভাঙবো।' আয়ান ভয় পেয়ে গেল। সালমা বলল, 'অতো চিল্লাছো ক্যানে? হাই স্কুলে পাস করে চাকরি টাকরি কোরলে কি তুমি টাকাগ্যালা অমর মাস্টারকে দিবা, না তুমি লিবা?' কিন্তু ইব্রাহিমের রাগ পড়ল না। 'চাষার ছেলে চাকরি! চাষার ছেলে কি জদ-ব্যালেস্টার হবে?' সালমা তাতেও দমল না। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বলল, 'হাতেও তো পারে।' ইব্রাহিম বুঝতে পারল, ভর্তির ব্যাপারে তার স্ত্রীরও প্রশ্রয় আছে। তাই সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ওখান থেকে উঠে চলে যেতে যেতে বলে, 'হোতে পারে, তুমরা মা-ব্যাটায় যা পারো করো। আমি উয়ার মধ্যে নাই। আমি টাকা দিতে পারবো না।' আয়ান চুপ করে বসে থাকল। সালমাও কোন কথা না বলে তরকারি তেলে দিতে লাগল। গরম তেলের উপর পড়ে তরকারিটা চ্যাঁক-ছুক করে উঠল। মায়ের মনও গুমোট দেখে আয়ান এখান থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল।

সালমা ভাবতে লাগল কি করা যায়। তার স্বামী তো বলেছে সে টাকা দিতে পারবে না। দেবেই বা কোথা থেকে? তার কাছে এখন সত্যিই তো টাকা নেই। অথচ ছেলেটাকে ভর্তি করতে হবে। প্রথমে তারও এতটা ইচ্ছে ছিল না। ইব্রাহিমের মত সেও ভেবেছিল যে আয়ান এবার মাঠের কাজ করবে। কিন্তু সে হঠাৎ সেদিন খবর পেল যে তার খালাতো ভাই সুবেজ একটা চাকরি পেয়েছে। সুবেজ তো ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিল। আর ক'ক্লাস পড়লে আয়ানও তো ম্যাট্রিক পাস করবে। তাহলে সেও একটা চাকরি পাবে। তখন তো তাদের আর কোন অভাব থাকবে না। তাহলে আর কটা বছর না হয় তারা কষ্ট করেই থাকবে। সে ইব্রাহিমকে বোঝালো। অনেক কষ্টে তাকে রাজী করানো গেল। কিন্তু টাকা কোথায়? সে ব্যাপারী ডেকে একটা ছাগল বেঁচে ফেলল। তিরিশ টাকা দাম হল। চার টাকা রেখে ছাব্বিশ টাকা আয়ানের হাতে দিয়ে দিল। আয়ান অমর মাস্টারের চিঠি নিয়ে হাইস্কুলে হেমন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করল। হেমন্তবাবু নাকি অমর মাস্টারেরও মাস্টার। সেই স্কুল যখন থেকে চালু হয়েছে তখন থেকেই আছেন। হেমন্তবাবু চিঠি পড়েই তার দিকে তাকালেন। তারপর তাকে অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। তার ভর্তির ব্যবস্থা গয়ে গেল।

আয়ান ভর্তি হয়ে 'বুক-লিস্ট' নিয়ে এল। হেমন্তবাবু বলেছেন, আগামী সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হবে। তার আগে বইগুলো জোগাড় করে নিতে হবে। আয়ান এসে মাকে বলল সেকথা। সালমার তো মাথায় হাত, বইয়ের কথা তার মাথায়ই আসেনি আগে। এখন হাতে তো মাত্র চারটে টাকা আছে। সে ভাবতে লাগল, কি করা যায়। কিন্তু ভেবে কোন পথ বের করতে পারল না। রাতে ইব্রাহিমের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সে কথাটা পাড়ল। ইব্রাহিম আবার অসন্তুষ্ট হয়ে ইঠল, 'দ্যাখো, ল্যাখাপড়া যাধের ম্যালা টাকা আছে তাধের জন্য। আমি টাকা কুঠে পাবো?' সে এরকম বলল বটে। তবে বিড়ি টানতে টানতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'এক কাজ করো। মস্‌সী কড়া বিক্রি কর‍্যা দ্যাও।' কিন্তু সালমা রাজী হতে পারল না, 'এবার তো আবাদের যা হাল, তাহলে ছেল্যাপুল্যা আষাঢ়মাসে না খায়্যা মোর‍্যা যাবে।' ইব্রাহিম বলল, 'কথাডা তো ঠিক। কিন্তুক আর যে কিছু

নাই।' সালমা বলল, 'তার থেক্যা এক কাজ করো।' 'বলো'। 'কাঁসার ডাবোর দুটো বেঁচে দ্যাও।' ইব্রাহিম হ্যাঁ-না কিছু বলল না। বলতে পারল না। বাবার আমল থেকেই থালা-বাসন তাদের বেশি ছিল না। কাঁসার বলতে ছিল পাঁচ-ছটা থালা, কয়েকটা গ্লাস আর এই ডাবোর দুটো। মাঠে খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য কেনা। তবে সে যখন তার বাবাকে লুকিয়ে রাতে যাত্রা করতে যেত তখন মা এই ডাবোরেই তার খাবার ঢেকে রাখত। রাতে গান শেষ হলে সে ঘুমঘুম চোখে এই ডাবোর থেকে খাবার খেত। বাবা জানতে পারলে তাকে তো বকতেনই, মাকেও বাদ দিতেন না। তাই ডাবোর দুটোর প্রতি তার একটা কিরকম অন্তরের টান আছে। সালমাও সেকথা জানে। তাই বলল, 'ঠিক আছে। আধ মন মসসীই বিক্রি করে দ্যাও।' মুসুরিই বিক্রি করা হল। আর সে টাকা দিয়ে আয়ানের ক্লাস ফাইভের বই কেনা হল।

ছয়

সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হল। কিন্তু জমল না। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকেই সরস্বতী পুজো। তখন থেকেই তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। তারও আগে আছে তেইশে জানুয়ারী, নেতাজীর জন্ম-জয়ন্তী। ক্লাসে নোটিশ এল এই বিদ্যালয়ে আগামী তেইশে জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হবে। সেই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা প্রভৃতিতে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে চায় তারা যেন উনিশ তারিখের মধ্যে তাদের শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে নাম দেয়। শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে আয়ান বক্তৃতার জন্য নাম লেখাল। কিন্তু লিখিয়েই তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কারণ এতদিন পর্যন্ত সে যে সব বক্তৃতা করেছে তা সব প্রাইমারী স্কুলের সাপ্তাহিক আসরে। সেখানে সবাই তার চেনা। আর এখানে প্রায় সবাই তার অচেনা। তরপর আবার বলছে যে মাইকে বক্তৃতা দিতে হবে। ভয়ে ভয়ে সে কি কি বলবে তা ভালভাবে মুখস্থ করল। তারপর সন্ধ্যার পর মাঠে গিয়ে একটা বাবলার চারাকে শ্রোতা করে গোটা বক্তৃতাটা শোনাল। সে দেখল যে প্রমিস কথাটা বলতে গিয়ে তার একটু বাধো বাধো ঠেকছে। সে ঐ জায়গাটা পাঁচ-সাত বার বলে ঠিক করে নিল। বাড়ি ফিরে সে খেতে বসেছে। মা বলল, 'কিরে? তুই নাকি এখন গাছের সাথে কথা বোলিস!' আয়ান সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করল, 'গাছের সাথে আবার কেউ কথা বলে নাকি?' 'কিন্তু রাখোলদার ছোড়া তো তাই বলল। তুই নাকি সলড়াতালার মাঠে একটা গাছের সাথে হাত নেড়ে কি সব বলছিলি?' আয়ান বুঝল, রাখোলদারটা তাকে দেখে ফেলেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য বলল, 'আমি তো পড়া মুখস্থ হয়েছে কি না তাই দেখছিলাম।' মা বলল, 'তাই বল্। রাখোলদার ছোড়া বলল—তুমার ব্যাটা পাগোল হয়ে গেছে, একটা বাভলা গাছের কাছে ভুল বোকছে।" রাখোলদারটার প্রতি আয়ানের ভারী রাগ হল। কিন্তু সে আর কিছু বলল না। কাল সকালেই বক্তৃতা। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বই নিয়ে বসলেও সে মনে মনে বক্তৃতাটা আর একবার আউড়ে নিল।

সকালবেলায় স্কুলে এসে আয়ান দেখল স্কুলের গেটের কাছে বারান্দার ধার ঘেঁষে পাশাপাশি দুটো চৌকি পাতা হয়েছে। তার উপরে রঙিন কাপড়ের মতো কি একটা দেওয়া

হয়েছে। ছেলেদের কেউ বলছে কম্বল, কেউ বলছে কার্পেট।' কার্পেট না কম্বল আয়ান বুঝাতে পারে না। কারণ দুটোর কোনটাই সে চেনে না। বরং জিনিসটা শতরঞ্চির মতো লাগছে। তাদের বাড়িতে শতরঞ্চি একটা আছে। তা সে কম্বল, কার্পেট বা শতরঞ্চির মতো যাই হোক তার উপরে একটা টেবিল রাখা আছে। টেবিলটা একটা ফুলের ছবিওয়ালা কাপড় দিয়ে মোড়া। ওটাকে নাকি টেবিল ক্লথ বলে। ছেলেমেয়েরা তাই বলছে। আয়ান ভাবে ওর বয়সী ছেলেমেয়েরা কত জানে। অথচ সে জানে না। আচ্ছা নেতাজী কি অত সব জানত। টেবিলের উপর নেতাজীর একটা সুন্দর বাঁধানো ছবি রাখা আছে। তার পাশে আগরবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে আবার বলছে ধূপবাতি। তাহলে ধূপবাতি আর আগরবাতি কি এক জিনিস আয়ান বুঝতে পারে না। তবে এক জিনিসই মনে হয়। টেবিলের পেছনে একটা চেয়ার পাতা আছে। তবে পাশে একটা হারমোনি। একটা মেয়ে বলল ওটা হারমোনিয়াম। তাহলে কি হারমোনি-র শুদ্ধ কথা হারমোনিয়াম! কিন্তু তাদের গ্রামে হারমোনিই বলে। তাহলে গ্রামের লোকেরা ঠিক বলে না। অমব মাস্টার বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষ তো শুদ্ধ কথা শেখার সুযোগ পায় না। তারা শুদ্ধ-অশুদ্ধ যা শোনে তাই শেখে। সেও শিখেছে। তাতে কি হয়েছে? সে সুযোগ পেয়েছে শুদ্ধ কথা শিখে নিচ্ছে। পেছনে বারান্দায় কাছে অনেকগুলো চেয়ার রাখা ছিল। মাস্টারমশাইরা ওখানে এসে বসলেন। একটা প্যান্ট পরা ছেলে এসে লোহার রডের সাথে বাঁধা একটা নলে টোকা দিয়ে বলতে লাগল, 'হ্যালো! টেস্টিং— ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর-ফাইভ-সিক্স। হ্যালো টেস্টিং।' তাহলে ওটাই মাইক। অবশ্য সেগুন গাছটায় একটা চোঙা মতো কি লাগানো আছে। ওখানেই জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে। নলটা থেকে একটা তার নিয়ে গিয়ে চোঙাটার সাথে লাগানো কেন? মাইকে কথা বলার জন্য নলে প্রথমে টোকা দিয়ে নিতে হয়? কিন্তু ঐ তো তাদের বাংলার মাস্টার কথা বলছেন। কিন্তু তিনি তো নলটায় টোকা দিলেন না। নলটার কাছে মুখ নিয়ে গিয়েই বলতে লাগলেন। তাহলে কি টোকা না দিলেও হয়। সে কি টোকা দেবে না? কিন্তু তাহলে যদি তার কথা কেউ শুনতে না পায়! কিন্তু ঐ তো বাংলার মাস্টারের কথা শোনা যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুখদেব বিশ্বাসকে অনুরোধ করছি।' আরেকজন মাস্টার বললেন, 'আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাতে তালি দিতে লাগল। আয়ানও দিল। তাহলে এই সময় হাততালি দিতে হয়। একজন ফরসা গোলগাল মুখওয়ালা লোক এসে সামনের চেয়ারটিতে বসলেন। তাহলে ইনিই হেডমাস্টার। অমর মাস্টার বলেছিলেন হেডমাস্টারকে বাংলায় প্রধান শিক্ষক বলে— হেড মানে প্রধান, আর টিচার শিক্ষক। কিন্তু হেডটিচার না বলে হেডমাস্টার বলে। কেন বলে তিনি বলেননি। আয়ান দেখল একটা পুচকে মেয়ে একটা ফুলের মালা এনে হেডমাস্টারের গলায় পরাতে যাচ্ছে। কিন্তু সে এত ছোট যে চেয়ারে বসা হেডমাস্টারের গলা নাগাল পাচ্ছে না। হেডমাস্টার তখন মালাটা হাতে করে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন, সবাই হাসতে লাগল। আর একটি মেয়ে একটা বড় মত মালা এনে সামনে দাঁড়ালো। হেডমাস্টার সেটা নিয়ে নেতাজির ছবির উপর দিলেন। তারপর গিয়ে আবার চেয়ারে বসলেন। বাংলার মাস্টারমশায় এবার মাইকের কাছে এসে বললেন, 'সভাপতির অনুমতি নিয়ে বলছি।' আশ্চর্য, সভাপতি তো

চেয়ারে বসেই আছেন, উনি সভাপতির কাছে গেলেন না। সোজা মাইকের কাছে এলেন, আবার বলছেন— সভাপতির অনুমতি নিয়ে বলছি। উনি অনুমতি কখন নিলেন? তাহলে কি এরকমই বলতে হয়! মিথ্যা মিথ্যা করে বলতে হয়! তিনি বললেন, সভাপতির অনুমতি নিয়ে বলছি। এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সঙ্গে সঙ্গে একজন মেয়ে এসে হারমোনিয়ামটার পাশে বসল। একজন ছেলে ডুগি-তবলায় হাত দিল। তাদরে পেছনে আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে গা ঘেষাঘেষি করে বসল। গান শুরু হল, 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর।' আয়ানের ভালো লাগল না। এবার বাংলার মাস্টার এসে ঘোষণা করলেন, 'এবার আবৃত্তি করে শোনাবেন দশম শ্রেণীর ছাত্র পার্থপ্রতিম সান্যাল।' একটি শার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরা ছেলে এসে আবৃত্তি শুরু করল। আয়ানের খুবই ভালো লাগছিল। কি সুন্দর কথাগুলো। আর ছেলেটা কি আবেগ দিয়ে বলছে, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।' সত্যি আবৃত্তি শুনে যেন প্রাণ জেগে উঠছে। কিন্তু এরপর আর শোনা হল না। একজন বড় মতো ছেলে এসে তাকে বলল, 'রেডি হো, এবার তোকে ডাকবে।' আয়ান রেডি হতে লাগল। সে প্রথম দিকের কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক মনে আছে। সে বলবে, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী...।' অমর মাস্টার বলেছিলেন, বড়দের শ্রদ্ধেয় বলতে হয়। আর ছোটদের স্নেহের। কিন্তু এখানে তো কেউ তার ছোট নেই। তাহলে স্নেহের বলবে না। কিন্তু কি বলবে? বলবে, 'আমার সহপাঠীবৃন্দ, এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ।' কিন্তু তার মনে হল কথাটা পরপর দুবার ভালো লাগছে না। তাহলে কি করা যায়? সে সহপাঠীবৃন্দ না বলে সহপাঠিগণ বলবে। তারপর...? আয়ান দেখল বাংলার মাস্টারমশাই মাইকে বলছেন, 'এবার নেতাজীর জীবনের কিছু কথা বলবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আইনুদ্দিন।'

আয়ান তাড়াতাড়ি করে উঠে এল। কিন্তু তার বুকের ভিতর তখন কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। কান গরম হয়ে উঠছে। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা দশ-এগার বছরের ছেলে সোডায় কাচা কোঁচ্কানো হাফশার্ট আর হাফপ্যাণ্ট পরে স্টেজে উঠছে। মুখটা কচি কচি। তাতে ভয় বাসা বেঁধেছে, না প্রতিশ্রুতি তা বোঝা যাচ্ছে না। সে মাইকের কাছে আসতেই একটা ছেলে মাইকের নলটা নীচে নামিয়ে আটকে দিল। সে ডান হাতটা তুলে দুটো টোকা দিল। দেখল মাইকে টকটক করে শব্দ হচ্ছে। সে বলতে শুরু করল, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, আমার সহপাঠীগণ এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ। (শ্রোতৃবৃন্দ কথাটার উচ্চারণ কিরকম জড়িয়ে গেল।) 'আজকের দিনেই কটকের এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষের গৌরব, মহান তেজস্বী পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর পিতার নাম ছিল জানকীনাথ বসু ।....' এরপর একে একে নেতাজীর বংশ-পরিচয়, বাল্যকাল, শিক্ষালাভ এবং আই. সি. এস. পাস করার কথা বলে গেল। এখন তার কণ্ঠস্বর পরিস্কার। বরং আয়ান এখন হেসে হেসে বক্তৃতা করছে। আসলে তাঁর হাসি পাচ্ছে। আই. সি. এস-এর উপর চোখ পড়লেই তার হাসি পায়। কি বোকাটাই না সে ছিল। প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় বইয়ে আই. সি. এস. দেখে তার মনে হয়েছিল ওটা ভুল ছাপা হয়েছে। আসলে তো এটা

আই. এস. সি.। কিন্তু অত পড়াশোনার পর নেতাজী আই. এস. সি. কেন পাস করতে গেল আয়ান সেটা কিছুতেই বুঝতে পারত না। তাই একদিন অমর মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল। অমর মাস্টার জানিয়েছিলেন যে ওটা আই. এস. সি. নয়— আই. সি. এস.-ই। পুরো কথা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। ওটা স্কুল-কলেজের পরীক্ষা নয়—চাকরির জন্য পরীক্ষা। আই. সি . এস. পাস করে লোকে বড় বড় চাকরি পায়। আয়ান বলল, 'নেতাজী আই. সি. এস. হয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশি শাসকদের গোলাম হয়ে জীবন কাটাতে তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। তাই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। ইংরেজরা তাকে গৃহবন্দী করে, নজরবন্দী করে রাখল। কিন্তু পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বিদেশে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তুললেন বিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজ। আর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন— 'গিভ মি ব্লাড, আই প্রমিস ইউ ফ্রিডম।' তাই শুধু এরকম অনুষ্ঠান করলেই নেতাজীকে সম্মান জানানো হবে না। নেতাজীকে সম্মান জানাতে হলে তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। দেশকে ভালবাসতে হবে। দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে।" দুহাত তুলে একটা ছোট্ট নমস্কার করে সে চলে এল। প্রচণ্ড উৎসাহে সকলে হাততালি দিতে লাগল। সমস্ত সভাকে যেন সে জয় করে নিয়েছে। আর তার ভয় করছে না। আর তার কান গরম হচ্ছে না, বরং কি রকম একটা শান্তি শান্তি ভাব লাগছে। সে তার আগের জায়গায় গিয়ে বসতে যাচ্ছিল। একজন ছেলে এসে বলল, 'তোকে রহমান সাহেব ডাকছেন।' আয়ান ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু রহমান সাহেব কে তা তো সে জানে না। সে কি করবে ভাবছিল। এমন সময় দেখল মাস্টারদের মধ্যে একজন লোক তাকে হাত তুলে ডাকছেন। আয়ান আস্তে আস্তে তার সামনে এগিয়ে গেল। তিনি আয়ানের ঘাড়ে স্নেহের সঙ্গে হাত দিয়ে বললেন, 'কোন্ স্কুল থেকে এসেছ।' আয়ান বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর আগেই পাশে থেকে হেমন্তবাবু বললেন, 'ও ভুবনডাঙ্গা স্কুল থেকে এসেছে।' রহমান সাহেব হেমন্তবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ও, আপনি ওকে চেনেন?' হেমন্তবাবু বললেন, 'না, চিনি না, ভর্তি হওয়ার দিনই আলাপ হল।' রহমান সাহেব আবার আয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' আয়ান বলল, 'বাঘডাঙ্গায়'। 'তোমার বাবা কি করেন।' 'মাঠে কাজ করে।' 'আচ্ছা আচ্ছা। তোমাকে এই বক্তৃতা কে শেখালেন?' আয়ান এবার খুশি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'অমর মাস্টার। আমাদের স্কুলে যে রোজ শনিবারে সাপ্তাহিক আসর হত।' রহমান সাহেব এবার হেমন্তবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন, 'আচ্ছা হেমন্তবাবু, অমর মাস্টার কে?' 'ঐ যে বাজিতপুরে বাড়ি। আমাদের স্কুলেরই ছাত্র। খুব ভাল মাস্টার। ছেলেমেয়েদের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে পড়ায়।' হেমন্তবাবু উত্তর দিলেন। রহমান সাহেব বললেন, 'এখন বসগে পরে আবার কথা বলব।' আয়ান নিজের জায়গায় ফিরে এল। তখন স্টেজে দুটি মেয়ে নাচ করছে। আয়ানের আপশোস হচ্ছে মেয়ে দুটির নাম জানা হল না। খুব সুন্দর নাচছে কিন্তু। সে মনযোগ সহকারে নাচ দেখছিল। কিন্তু পাশ থেকে কে যেন তাকে একটা ধাক্কা দিল। আয়ান ঘুরে তাকাতেই বলল, 'তুই বই থেকে মুখস্থ করেছিলি, নারে?' তার থেকে একটু দূরে বসা আর একটা ছেলে অমনি বলে উঠল, 'ও তো শুনলেই বোঝা যায় মুখস্থ করা।' ওপাশ থেকে আর একটা ছেলে বলে উঠল, 'মুখস্থ করে এসে আবার....।' তারপর চারদিক থেকে একটা একটা

করে অবজ্ঞাসূচক শব্দ উঠতে লাগল। আয়ানের ভারী রাগ হল। সে যে স্টেজে উঠে ভালো বলেছে তা এরা সহ্য করতে পারছে না। তাই তাকে উপহাস করে তৃপ্তি পেতে চাইছে। পাশের ছেলেটা আবার বলে উঠল 'মুখস্থ করা'। আয়ান এবার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মুখস্থ করাই তো। কারও সম্পর্কে জানতে হলে তো হয় বই পড়তে হবে, না হয় যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে শুনতে হবে। (কথাগুলি আয়ানের অমর মাস্টারের কাছেই শেখা) আমি বই পড়েছি। তা না হলে আমি কি নেতাজীর বন্ধু না সহদর? যে সব জেনে বসে থাকব।' ছেলেগুলো এরকম উত্তর আশা করেনি। তাই একদম চুপ করে গেল। আয়ানের মনে হল, অমর মাস্টার তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন। আজ যদি অমর মাস্টার এখানে থাকতেন তাহলে খুব ভাল হত। আয়ানের চিন্তায় বাধা পড়ল। সভাপতির বলা শেষ হয়েছে। বাংলার মাস্টার সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতেই সকলে উঠে দাঁড়াল। আয়ানও উঠে পড়ল। সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। একটা সুখ-সুখ স্পর্শ সারাটা পথ অনুভূতিতে লেগে রইল। মাকে গিয়ে বলতে হবে যে সে আজ মাইকে বক্তৃতা করেছে। সে হাসিমুখেই বাড়িতে ঢুকল।

কিন্তু আয়ান দেখল তার বাবার মুখ ভারী গম্ভীর। কিছুক্ষণ আগেই আবুলের সাথে ইব্রাহিমের দেখা হয়েছিল। আবুলের কাছ থেকে জেনেছে যে আজ স্কুল ছুটি। সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হয়েছে যে আয়ান কাজের ভয়ে ছুটির দিনও স্কুলের নাম করে ডোমকলে গেছে। স্ত্রীকে সেকথা বলতে গিয়েছিল। কিন্তু সালমা মানতে রাজী হয়নি। বলেছে, 'দ্যাখো গা, আবুলই হয়ত পড়হার ভয়ে স্কুলে যায়নি।' এই নিয়ে একদফা কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে। সেইজন্য ইব্রাহিমের মেজাজ খারাপ ছিল। তাই ছেলে বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মুখ গম্ভীর করে সে জিজ্ঞেস করল, 'আজ তো স্কুল ছুটি ছিলো। তা ডোমকলে তোর কি কাজ ছিলো?' আয়ান উত্তর দিল, 'আজ যে নেতাজীর জন্মদিন।' 'স্কুলে ছুটি ছিল কি না?' 'হ্যাঁ ক্লাস হয়নি।' 'তাহোলে তুই গেলি ক্যানে?' 'বারে, আমার যে বক্তৃতায় নাম ছিল।' ইব্রাহিম ছেলের কথা বুঝতে পারে না। বক্তৃতা তো পার্টির লোকেরা করে, তাও ভোটের সময়, তাতে তার ছেলের নাম থাকবে কেন? সে বলে, 'বক্তৃতায় তোর নাম থাকবে ক্যানে?' আয়ানও বুঝতে পারে না তার বাবাকে ব্যাপারটা সে কি করে বোঝাবে। তাই সে শুধু বলে, 'তুমি শুধিয়ো না, হেডমাস্টার ছিলেন, অন্যান্য মাস্টাররা ছিলেন, তুমি রহমান মাস্টারকে চিনো, রহমান মাস্টারকে শুধিয়ো।' রহমান মাস্টার— সে তো পার্টি করে। ইব্রাহিম ভাবে তাহলে কি তার ছেলেও পার্টি করছে! সে বুঝতে পারে না। অসহায়ের মতো সালমাকে ডাকে। সালমাও বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে যে স্কুলে আয়ানের একটা কাজ ছিল। কিন্তু সেটা কিরকম কাজ তারা বুঝতে পারে না।

সাত

আয়ানদের বাড়িটা বাঘডাঙ্গা গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। এখান থেকে দুটো রাস্তা ডোমকলের দিকে গিয়েছে। দুটোই গিয়ে উঠেছে ডোমকল-গড়াইমারী পাকা রাস্তায়। একটি রাস্তা ছোট বিলের ধার দিয়ে সেখপাড়া হয়ে ভুবনডাঙ্গায় গিয়েছে। আরেকটি রাস্তা বড়বিলের

ধার দিয়ে মাঠপাড়ার পাশ দিয়ে ডোমকলের দিকে গিয়েছে। বড়বিলের ধারের এই রাস্তা দিয়েই ডোমকল তুলনায় কাছে হয়। কিন্তু আয়ান সচরাচর ও রাস্তায় যায় না। ছোটবিলের ধারের রাস্তা দিয়েই সে ভুবনডাঙ্গায় প্রাইমারী স্কুলে যেত। এখনও ঐ রাস্তা দিয়েই যায়। তারপর কল্পনাদের বাড়ির কাছ দিয়ে শিয়ালমারী নদীর ধার ধরে যে রাস্তাটা ডোমকলে গিয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়। ভুবনডাঙ্গা থেকে যারা ডোমকল হাইস্কুলে যায়, তারাও ও রাস্তা হয়ে যায়। কল্পনাও যায়। আজও যাচ্ছিল, আয়ানের সাথে দেখা হয়ে গেল। কল্পনা আজ একটা সুন্দর কলাপাতা রঙের জামা পরেছে। খুব পরিষ্কার আর মসৃণ। কি করে যে এত পরিষ্কার করে! সে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই হয় না। অনেক করে সাবান দিয়েছে। যখন সাবান দিয়েছে, তখন মনে হয়েছে পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু শুকুতে দিলেই সেই কিরকম কোচকানো কোচকানো হয়ে যায়। ম্যাটমেটে হয়ে যায়। কিছুতেই সুন্দর মসৃণ হয না। তাই একদিন কল্পনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর জামা কি করে পরিষ্কার করিস রে? এত সুন্দর হয়।' কল্পনা তার চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'ও মা! আমি পরিষ্কার করবো কেন? আমি ধোবা নাকি? ধোবায় পরিষ্কার করে।' আয়ান বুঝতে পারেনি। তার জামা তো হয় সে, না হয় তার মা পরিষ্কার করে। তাহলে তারা কি ধোবা, আয়ান বুঝতে পারেনি। সে বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল। মা বলেছিল, 'লিজের কাপড় ধুলে ধুবা হয় না। ধুবারা পয়সা লিয়্যা পরের কাপুড় ধয়।' 'তাহলে আমার জামা-প্যান্ট ধোবা বাড়ি দাও না কেন?' আয়ান জানতে চেয়েছিল। মা বলেছিল, 'আমাদের যে অতো পয়সা নাই। আর তোর জামা-প্যান্ট একজুড়া। ধুবার বাড়ি দিলে তখুন কি পিন্ধিবি?' আয়ান আর কিছু বলতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে তার একটা মাত্র জামা। তাদের বেশি টাকা-পয়সা নেই। তাই তার জামা-প্যান্ট তাকে নিজে কাচতে হয়। তাই তা অতো সুন্দর হয় না। কল্পনার জামাটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে নিজের জামার দিকে তাকায়। সেই একইরকম, কিরকম জড়ো জড়ো, ম্যাটমেটে। তারা গরীব তাই। বুকের ভিতর তার কিরকম একটা কষ্ট হয়। আগে এরকম হত না। এখন হয়। সে মুখে কিছু বলতে পারে না। পাশাপাশি হাঁটে। একসময় স্কুলে পৌঁছে যায়। কল্পনা তার সেকসানে চলে যায়। আয়ান তার সেকশানে আসে।

ডোমকল স্কুলে এবার ক্লাস ফাইভে দুশো চুয়ান্ন জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের ভাগ করা হয়েছে পাঁচটা সেকশানে। অথচ স্কুলে ঘরের অভাব, তাই স্কুলের মাঠে কটা চালা ঘর করে তাদের বসানো হয়েছে। পাঁচটি ঘরে পাঁচটি সেকশান। একটি সেকশান মেয়েদের। আর চারটি ছেলেদের। আয়ান প্রথম দিকে ভর্তি হয়েছিল বলে 'এ' সেকশানে পড়েছে। কিন্তু ভুবনডাঙা প্রাইমারী স্কুলে থেকে আসা কেউ এ সেকশানে নেই। নেই অন্যান্য গ্রামের স্কুল থেকে আসা ছেলেও। এ সেকশানের প্রায় সব ছেলেই ডোমকল বাজারের, না হয় বাজিতপুরের। তাদের প্রায় সকলেরই জামা-কাপড় ধোয়া আর পায়ে জুতো বা চটি। আয়ানের জামা-প্যান্ট সোডায় কাচা আর পা খালি। তাই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আয়ানের সংকোচ হয়। আগে এরকম হত না। মা সেদিন বলার পর থেকে হয়। মনে হয় ওদের অনেক টাকা-পয়সা আছে, আয়ানদের নেই। তবে আয়ানের সান্ত্বনা এই যে একটা ব্যাপারে ওরা আয়ানকে হটাতে পারে না—অঙ্ক কষতে আর পড়া বলতে। মাস্টারমশাই ক্লাসে

যে কোন অঙ্ক দিলে সে সবার আগে করে ফেলে। আর পড়া একদম ঠিক ঠিক বলে দেয়। সেইজন্যই মাস্টারমশাইরা তাকে ভালবাসেন আর তার সহপাঠীরা ফার্স্ট বেঞ্চে তার পাশে বসতে চায়। এমনকি নেতাজীর জন্মদিনে যে ছেলেগুলো তার প্রতি টিপ্পনি কাটছিল তারাও এখন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। ওদেরই একজন হরিদেব দত্তরায়। ওর বাবা নাকি এখানকার পোস্ট অফিসে কাজ করেন। ছোটখাট খুটখুটে ছেলেটা। সেদিন টিফিনে তার কাছ এসে বলেছিল, 'তোদের স্কুলে কি কি ছড়া বানিয়েছিস, বল্ দেখি।' আয়ান বলতে পারে নি। তখন সে আবার বলেছিল, 'আমাদের স্কুলে একটা বানিয়েছি, শুনবি?' আয়ান সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়েছিল। সে বলেছিল, ' ইতিহাসে পাতিহাস, ভূগোলেতে গোল ; অঙ্কতে মাথা নাই, হয়েছি পাগোল।' শুনে আয়ান হেসে উঠেছিল। তার ভালো লেগেছিল না খারাপ লেগেছিল সে ঠিক করতে পারেনি। তবে অদ্ভুত লেগেছিল। আর তার পর থেকেই হরিদেবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল আশীষের সঙ্গেও। তবে অন্যভাবে। আশীষের বাবা ছিল ডোমকল হাসপাতালের ডাক্তার। সে খুব সুন্দর জামা-কাপড় পরে ভালো করে চুল আঁচড়ে, পালিশ করা জুতো পরে স্কুলে আসত। কিন্তু পড়াশোনাও করত। সে আয়ানের কাছে আয়ানদের গ্রামের কথা জানতে চাইত। আয়ানও তার কাছ থেকে তাদের বাড়ির কথা জেনে নিত। তাদের আসল বাড়ি কান্দীতে। মামার বাড়ি কলকাতায়। সে অনেকবার কলকাতায় গিয়েছে। ট্রেনে চড়েছে, হাওড়ার ব্রীজ দেখেছে, বিমানবন্দরে গিয়ে এরোপ্লেনও দেখেছে। আয়ানের মনে হত আশীষ অনেক কিছু দেখেছে। তারও দেখতে ইচ্ছে করত। কিন্তু দেখার উপায় তো ছিল না। তাই আশীষকে জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিত, 'আচ্ছা ট্রাম কি রকম বললি? চিড়িয়াখানায় কটা বাঘ আছে রে? তুই যাদুঘর দেখেছিস?' আর এই করতে করতেই তারা বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আশীষ চলে গেল। তার বাবা নাকি বহরমপুরে বদলি হয়েছেন। তাই সেও বাবার সঙ্গে বহরমপুরে চলে গেল।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল আয়ান অঙ্কে একশ-তে একশ পেয়েছে। সব বিষয় মিলিয়েও সে ফার্স্ট হয়েছে। সেকেণ্ড হয়েছে বি সেকশানের অনুপ। থার্ড হয়েছে তাদের সেকশানেরই মনতোষ। কল্পনা পাশ করেছে, কিন্তু স্ট্যান্ড করতে পারেনি। নেতাজীর জন্মদিনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আয়ান একবার স্কুলে পরিচিত হয়েছিল। এবার পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য আরও ভালো করে পরিচিত হল। হেমন্তবাবু খুব খুশি হলেন। আয়ান একদিন অমরবাবুকে খবরটা দিতে গেল। তিনিও খুশি হলেন। বললেন, "এটা খুব সামান্য ব্যাপার। আরও ভালভাবে পড়শোনা কর, যাতে ফল আরও ভালো হয়।' আয়ান সত্যিই চেষ্টা করল। বাৎসরিক পরীক্ষাতেও সে প্রথম হয়ে সিক্সে উঠল। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে আয়ান একটা কবিতা আবৃত্তি করল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মৃত্যুঞ্জয়'। আবৃত্তি শেষ করে সে চলে আসছিল। হেমন্তবাবু বললেন, 'কোথাও যাস নে। এখুনি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। তুই প্রাইজ পাবি।' আয়ান প্রথম হয়েছে বলে নাকি তাকে প্রাইজ দেওয়া হবে। কিন্তু ভুবনডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলেও তো সে ফার্স্ট হত। কিন্তু প্রাইজ দেওয়া হয়নি তো। অবশ্য অমর মাস্টার আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বলতেন, 'চেষ্টা কর, আরেকটু ভাল করতে হবে।' আয়ান অপেক্ষা করে। অন্যদের নাম ডাকতে ডাকতে একসময়

তারও নাম ডাকা হয়। আয়ান স্কুল ইন্সপেক্টারের হাত থেকে প্রাইজ নেয়। রঙিন কাগজে মোড়া সুন্দর একটা বই। 'শ্যামলী'। দেব সাহিত্য কুঠিরের 'শ্যামলী'। আয়ান মোড়কটা খুলে ফেলে। গন্ধটা ঠিক সেই রকম। অমর মাস্টার প্রথম যে বইটা দিয়েছিলেন 'নতুন পড়া' সেইরকম। তার জীবনের প্রথম প্রাইজ। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাদের গ্রামের কেউ এই অনুষ্ঠানে আসেনি। আয়ান বইটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

আট

এ বছরটা যেন বাঘডাঙ্গা গ্রামে সাক্ষাৎ অমঙ্গল নিয়ে এসেছে। সারা চৈত্র-বৈশাখ মাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। সারা মাঠ শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। মাটি ফাঁক হয়ে গেছে। তার বুকে এতটুকু রস নেই। রৌদ্রের তাপ এত বেড়েছে যে, একটু বেলা হলে আর রাস্তায় বেরুনো যায় না। মাথার উপরে সাক্ষাৎ যমের মতো সূর্য— মাথার ঘিলুটুকু পর্যন্ত গলিয়ে দিতে চায়। পায়ের নিচের ধুলি মুড়ি ভাজার চাড়ের চেয়েও গরম— পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। তাপের চোটে গাছের পাতা ঝরে গেছে। তাই গাছের নিচেও ছায়া মেলে না। দুপুরবেলায় ঝাঁয়াল ওঠে। গরম বাতাসের দমকা চোখ-মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যায়। দূর মাঠ থেকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসে 'আঁউড়ী বাঁউড়ী'। পরিত্যক্ত কাঠি আর গাছের ঝরা পাতাগুলোকে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে একসময় ঢুকে পড়ে পাড়ার মধ্যে। কারও কাপড় ধরে টানাটানি করে, কারও চালের খড় ওলট-পালট করে দেয়। বৃষ্টির আশায় লোকে 'দধিকাদা' খেলে। একে অপরের গায়ে ঠাণ্ডা কাদা মাখিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় সুর করে ভারবোল গান গায়। ভালভাবে গান গেয়ে যখন কিছু হয় না, তখন এর-ওর পেছনে লাগে। ওদের কি করে বিশ্বাস হয়েছে, গালাগালি দিলে বৃষ্টি হয়। তাই খিটেখিটে মেজাজের লোকদের খুঁচিয়ে গালাগালি শোনে। গ্রামের ফৈমুদ্দিন বোধ হয় সব থেকে বয়স্ক লোক। তার আশি-নব্বই বছর বয়স হয়েছে, নড়তে চড়তে পারে না। এই বয়সে সে আরেকটা বিয়ে করেছে। ছেলেমেয়েও হচ্ছে। এই সব ব্যাপার নিয়ে ছড়া বাঁধে। 'ফৈমুদ্দিন চাচা, ব্যারাম বাঁচা....' ফৈমুদ্দিনকে শুনিয়ে শুনিয়ে তারা গান করে। ফৈমুদ্দিন তাদের বাপ-দাদা-চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। ওরা শুনে আশা করে এবার নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। কিন্তু বৃষ্টি হয় না। আকাশে এক চিল্‌তে মেঘও চোখে পড়ে না। বুড়োরা এ-ওকে ফিসফিস করে বলে, 'পাপ, বুঝলে না, পাপ। কলিকালে কেউ ধম্মকম্ম করে? বুড়ো বাপ-মাকে দেখে? দেখে না। জোয়ানী পায়্যাছে তো ভাবে কি না পায়্যাছে। আল্লাও দিয়্যাছে গজোব। বুঝ এবের।' কথাটা এক-কান দু-কান হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে সারা পাড়ায়। পাড়া থেকে সারা গাঁয়ে। বুঝলে না পাপ। কি পাপ তা তারা ঠিক বোঝে না। কিন্তু বোঝে যে একটা কিছু করা দরকার। তারপর একদিন সমস্ত গাঁয়ের লোক 'কাঠ-ফাটা' রোদের মধ্যে মাঠে জড়ো হয়। ছোটছোট ছেলেমেয়েদেরও সঙ্গে নেয়। 'আমরা অন্যায় করতে পারি। কিন্তু ওরা তো করেনি। আল্লা উয়াদের কষ্ট নিশ্চয় দেখতে পারবে না। উয়াদের মুনাজাত মানতেই হবে।' আয়ানকেও যেতে হয়। আগুনের গোলার মতো সূর্যের নিচে, পাষাণের মতো শক্ত, উত্তপ্ত মাঠের মাঝে তারা খুদার কাছে মুনাজাত-এ বসে

যায়। বলে 'আল্লা পানি দ্যাও। তুমার বান্দারে বাঁচাও।'

দূরে আসগর বিশ্বাসের বাড়ির উপর একখানা 'ম্যাঘ' দেখা যায়। তার মানে, আল্লা তাদের মুনজাত কোবুল করেছে। মেঘটা ক্রমশ বড় হতে থাকে। এক গ্রাম লোকের মনের মধ্যেও একটুখানি আশাও বাড়তে থাকে। এক্ষুনি সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে যাবে, তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে। ধরিত্রীর বুক ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু না। পরমুহূর্তেই মেঘখানার নীচে লকলকে আগুনের শিখা লাফিয়ে ওঠে। বাঁশের 'গিরা ফাটার' ফটাস্ ফটাস্ শব্দ হয়। সবাই বোঝে সর্বনাশ হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে সবাই ছুটতে থাকে সেই দিকে। তারা যখন গিয়ে পৌঁছায় তখন আসগর বিশ্বাসের বাড়ি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। পাশের আরও তিনটে বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। মেয়েরা বাড়ির গরু-ছাগলগুলিকে সব ছেড়ে দিয়েছে। ওগুলো এদিকে ওদিকে এলোমেলো দৌড়চ্ছে। ছেড়া কাঁথা, পাটি, ধামায় করে কোন শস্য যে যা পারছে বাইরে নিয়ে আসছে। কেউ কেউ বালতিতে জল ভরে এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করছে। কিন্তু আগুনের কাছাকাছি যেতে পারছে না। রোদের তাপে খড়-বাঁশ-চাল সব শুকিয়ে বারুদের মতো হয়ে আছে। কাজেই কোথাও একটি ফুলকি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে। বাঁশের গিরা ফঠাস্ করে ফেটে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। আগুনের শিখা লক লক করে লাফিয়ে উঠে কিছু আগুনের টুকরো আকাশে ছেড়ে দিচ্ছে। বাতাস যেন আগুন বয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য ঘরের উপর ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটাও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পাঁচ-সাতটা বাড়ি জ্বলছে। সে আগুন আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। কুকুরগুলো কিছু বুঝতে না পেরে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করছে। কাকগুলো কা-কা করে এগাছ থেকে ওগাছে বসছে।

যে ঘরে আগুন লেগেছে সে ঘর বাঁচানোর কোন সম্ভাবনা নেই, তাই লোকেরা যে ঘরগুলোতে এখনও আগুন লাগেনি সেগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক এসে গেছে। তারা কাঁথা পাটি যা পাচ্ছে তাই জলে ভিজিয়ে চালের উপর দিচ্ছে। আগুনলাগা ঘরের কাছে দাহ্য কোন বস্তু থাকলে যতটা পারছে সরিয়ে ফেলছে। আর বাতাসে উড়ে এসে কোথাও আগুনের টুকরো পড়লে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে জল দিচ্ছে। কিন্তু এত করেও কয়েকটা ঘর ছাড়া আর কিছু বাঁচানো গেল না। গোটা বিশ্বাসপাড়া এবং পূবের কয়েকটা বাড়ি ছাড়া মণ্ডলপাড়ার সমস্ত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আসগর বিশ্বাসের বাড়িতে আগুন লেগেছিল সবার আগে। তাই তার কাঁথা-কাপড়-গরু-বাছুর, খাবার-দাবার কিছু বাঁচেনি। এমন কি তার সাত-আট বছরের মেয়েটা ঘরে শুয়েছিল। সেও পালাবার সময় পায়নি। নিষ্ঠুর আগুন তাকেও গ্রাস করেছে। আগুন নিভে গেলে ছাইয়ের মধ্যে থেকে বিকৃত মৃতদেহটা বের করা হয়েছে। দেখে চেনার উপায় নেই। হাত পা পুড়ে কুকড়ে শরীরের সঙ্গে লেগে গেছে। মাথাটা বাঁশের গিরার মতোই ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়েছে। আসগার বিশ্বাসের বউ বুক চাপড়ে, মাথা ঠুকে কাঁদছে। আর বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। অন্য মেয়েরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মালেক বিশ্বাসের বাড়ি পাকা। কিন্তু তার ভুসির ঘর আর ধানের গোলায় খড়ের চাল ছিল। পুড়ে গেছে। অন্য বাড়িগুলোতে আগুন লেগেছিল কিছু দেরিতে। সেই অবসরে

তার বাড়ির গরু-ছাগলগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে। বিছানা কাপড় বা গৃহস্থালির খুঁটিনাটি জিনিসপত্তর সব সরিয়ে নিয়েছে। আয়ানদের বাড়িটা ছিল পাড়ার একপাশে। তাছাড়া তাদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বাঁশঝাড়। কাজেই তাদের বাড়ির চালে আগুন আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। সালমা সেই অবসরে গরুগুলোর দড়ি খুলে দিয়েছে, ছাগলগুলোকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। থালা-বাসন, বিছানা-কাঁথা, ধামা-ডাগরা প্রভৃতি এমনকি আয়ানের পড়ার বইগুলি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিলের ধারে রেখে এসেছে। আর ধান গম এগুলি মাটির কুঠিতে মুখ বন্ধ করা ছিল বলে চালটা পুড়লেও নষ্ট হয়নি।

এতক্ষণ আগুনের দাপাদাপি, মানুষের লাফালাফি আর জন্তু-জানোয়ারের ছোটাছুটিতে এক আগুন ছাড়া অন্য কিছুর কথা কারও মনে আসেনি। আর সবাই আগুন নেভানোর জন্য ছোটাছুটি করছে— কেউ এক বালতি জল নিয়ে, কেউ একখানা ভেজা কাঁথা নিয়ে আবার কেউ বা খালি হাতে চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। হঠাৎ আগুন নিভে যাওয়ায় এখন সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শুধু আধপোড়া বাঁশের রুয়্যাগুলো ধোঁয়া ছাড়ছে। গরু-ছাগলগুলো যে যার বাড়ির ফিরে এসে পা ঠুকছে। কুকুরগুলো ছাই শুঁকছে। আর কি করবে ঠিক করতে না পেরে পেছনের পা তুলে মূত্র ত্যাগ করছে। তারপর পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। হঠাৎ তাদের মনে পড়ল যে শুধু তাদের ঘরবাড়িই পোড়েনি পাড়ার একটি মেয়েও পুড়ে মারা গেছে। তার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তখন কেউ কোদাল নিয়ে ছুটল কবরস্থানে। কবর খুঁড়তে হবে। কেউ দা নিয়ে গেল বাঁশ ঝাড়ে। বাঁশ কাটতে। কেউ সেই বাঁশকে কেটে ছোট ছোট করে খাপাচি করল। কেউ ছুটল ডোমকলে। কফিন আনতে হবে। কেউ সেই বিকৃত মৃতদেহটাকে স্নান করিয়ে কফিন পরিয়ে দিল। এবার মৃতদেহের পিছনে লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল 'জানাজা' পড়তে। তারা মৃতার আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করল। তারপর চারজন ওটাকে ঘাড়ে তুলল। খানিকটা দূরে এসে তারা ঘাড় বদল করল। ওরকম আরও দুবার ঘাড় বদল করে মৃতদেহ পৌঁছল কবরস্থানে। মৃতদেহ কবরে নামিয়ে দেওয়া হল। যে লোকটি মেয়েটিকে শেষ শয্যায় শুইয়ে দিতে নেমেছিল সে এবার কফিন খুলে শেষবারের মতো মুখটা দেখালো। আসগর বিশ্বাস এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে ভেঙে পড়ল। লোকটি উঠে এল। খাপাচিগুলো পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। তারপর মাটি চাপা দিয়ে সবাই মিলে আর একবার হাত তুলে প্রার্থনা করল। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল। আয়ানের সমস্ত মনটা কেমন অবশ অবশ মনে হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, এই আজও মেয়েটা ছিল। তারা যখন মাঠে যাচ্ছিল তখনও ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। তাকে বনের মধ্যে পুঁতে রেখে সবাই চলে গেল। সে যদি আজ মরে যায়, তাহলে তাকেও তো ওরকম কবর দিয়ে সবাই চলে যাবে। তার একদম ভালো লাগে না। আচ্ছন্নের মতো সে বাড়ি ফিরে আসে।

সালমা ততক্ষণে উঠোনের খানিকটা জায়গা থেকে ছাই সরিয়ে পরিষ্কার করেছে। সেখানে একটা পাটি পেড়ে ছেলেমেয়েদের বসিয়েছে। রাতে থাকবার খাঁচা না পেয়ে মুরগিগুলো যেখানে সেখানে বসে পড়েছিল। সে ধরে ধরে নান্দ দিয়ে ঢেকেছে। দুটো এখনও পেয়ারা গাছটার মগডালে উঠে বসে আছে। সালমা অত চেষ্টা করেও নামাতে পারেনি। ইব্রাহিম বলদদুটোকে আমগাছের নিচে বেঁধে রেখেছে। ছাগলের ঘরটাও পুড়ে গেছে। তাই

ছাগলগুলোকেও রাতের মত বাইরেই খুঁটো পুতে বাঁধা হয়েছে। এখন সালমা উনুনটা পরিষ্কার করছে। রান্না করতে হবে। সকালে বাসি ভাত খাওয়ার পর সারাদিন আর কারও পেটে কিছু পড়েনি। বিলের ধারের পাটকাটির পালা থেকে পাটকাটি নিয়ে এসে উনুন ধরিয়ে দিল। উনুনের আগুনের আলোয় ছেলের মুখের দিকে চোখ পড়তেই সালমা চমকে উঠল, 'কি রে, কি হয়েছে? তোর মুখ এতো শুকন্যা ক্যানে?' আয়ান সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা মা, আমি মরে গেলে, তোমরা আমাকে কবরে রেখে আসবে?' 'বালায় যাট, তুই মরবি ক্যানে।' সালমা ছেলেকে বুকে টেনে নিল। গালে মুখে চুমো খেয়ে জিজ্ঞেস করল 'কেনরে, কি হয়েছে?' আয়ান বলল, 'তাহলে যে মিনিকে কবরে রেখে দিল।' সালমা বুঝতে পারল, কি হয়েছে। সে বলল, 'মিনি যে আগুনে পুড়্যা গেছল। নাহলে তো এখন বাড়িতেই থাকতো। যা তুই হাতমুখ ধুয়্যা লে। এক্ষনি ভাত হয়্যা যাবে।' আয়ান বালতি থেকে জল নিয়ে হাতমুখ ধুতে গেল।

পরের দিন একটা জীপগাড়ি এসে থামল মালেক বিশ্বাসের বাড়ির সামনে। তার থেকে নামলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টবাবু আব ডোমকল থানার বড় দারোগাবাবু। তাঁরা বিশ্বাসের পাকা বৈঠকখানায় বসলেন। কটা বাড়ি পুড়েছে, কার কার কি কি ক্ষতি হয়েছে, লিখলেন। খানিকক্ষণ খোশগল্প করলেন। না না করেও কয়েক প্লেট মিঠাই-মণ্ডা আর মুরগির ডিমভাজা খেলেন। তারপর আবার জীপগাড়িতে চেপে চলে গেলেন। তাঁরা কেনই বা এসেছিলেন আর কিই বা করে গেলেন তা এক মালেক বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ জানল না। মালেক বিশ্বাস কাউকে কিছু বলল না। ফলে যে যার সুবিধামতো ভেবে নিল এবং অপরের সঙ্গে দেখা হলে বলতে লাগল। কেউ বলল, 'এবের আসগর বিস্স্যাসের বোডাকে ধরবে।' কেউ বলল, 'নারে কার কি কি পুড়্যাছে লিখ্যা লিয়াছে। রিলিপ দিবে, রিলিপ।' কেউ বলল, 'রিলিপ না কোচু দিবে! তাহলে এতোদিন দিতোক।' এতদিন না দিলেও কিন্তু সত্যি সত্যি রিলিফ নিয়ে একদল লোক এল। তারা এসে আবার উঠল সেই মালেক বিশ্বাসের বাড়ি। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে গল্প-গুজব করে ফিরে গেল। মালেক বিশ্বাস পাড়ার লোকেদের ডেকে কাউকে একটা প্লাস্টিকের ত্রিপল কাউকে এক প্যাকেট গুঁড়া দুধ দিল। কেউ গিয়ে নিয়ে এল। কেউ আনতেই গেল না। বলল. 'এক গাড়হী জিনিস আলো। আর আমার ব্যালায় এক প্যাকেট দুধ।' কেউ বলল, 'এক গাড়হী কি বলছো ভাই অন্তত পাঁচ গাড়হী হবেনা বটেক। তবে মোষের গাড়হীর পাক্কা তিনগাড়হী হবে।' দুয়েকবেলা বলাবলি করল। তারপর আসল কাজে মন দিল।

যাদের ঘর পুড়েছিল তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হল, কি করে তাদের ঘর খাড়া করা যায়। ইব্রাহিমের মতো যাদের ঘরের দেওয়াল মাটির, তাদের ভাবনা আরও বেশি। কারণ এখন যে কোন দিন বৃষ্টি হতে পারে। আর তা যদি দেওয়ালের উপর কিছু ঢাকা দেওয়ার আগেই হয় তাহলে ঘরের দেওয়ালটাও গলে যাবে। তাছাড়া বৃষ্টি হলে তো তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। এমনকি গরু-ছাগলগুলোকেও তোলার জায়গা নেই। অতএব ঘরের চাল করতেই হবে। তার জন্য দরকার বাঁশ, দঁড়ি আর খড়। বাঁশ ঝাড়ে আছে। কয়েকটা কাটা যাবে, বাতা সে নিজে চাছতে জানে। করে নেবে, সালমার বুদ্ধিতে খানিকটা পাটও বেচেছে। দড়িও হয়ে যা'

কিন্তু খড়ের কোন উপায় নেই। বাড়িতে ধানের যে পুয়াল আর আউড় ছিল তাও পুড়ে গেছে। কাজেই খড় কিনতেই হবে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। কিছু যে বিক্রি করবে, তাও নেই। কাজেই ইব্রাহিমকে ছুটতে হল মহাজনের কাছে।

গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোকে অভাব কখনও ছাড়ে না। তাই মহাজনকে তারা ছাড়তে পারে না। অভাবের সময় তারা মহাজনের কাছেই যায়। আর এরকম দুর্যোগের দিনে তো না গিয়ে কোন উপায়ই থাকে না। তাই প্রত্যেকেরই একজন না একজন মহাজন থাকে। ইব্রাহিমেরও আছে। তার মহাজনের নাম কমল হালদার। ভগীরথপুরের ভৈরব নদীর তীরে তার একটা সোনার গয়না তৈরির দোকান আছে। তবে তার আসল ব্যবসা সুদের কারবার। কিন্তু সে কারবারের জন্য যাতে সরকারকে কোন কর দিতে না হয় তার জন্য সোনার দোকানটা 'ফর শো'। কমল হালদারের কাছে টাকা ধার করতে যেতে হলে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হয়। জমির দলিল তার সব থেকে পছন্দ। তা না হলে সোনার গয়না। তাও না হলে অন্তত কাঁসার থালাবাসন। সুদের হার বছরে শতকরা বাহাত্তর টাকা। তবে সে বলে ভালো, 'সুদের হার খুবই কম– টাকায় ছ পয়সা।' যেন এর থেকে কম সুদের হার দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। যারা টাকা ধার নেয় অভাবে পড়েই নেয়। বছর ঘুরতেই সুদে-আসলে টাকা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আসলই দিতে পারে না তো সুদসমেত দেবে কি করে? তাই তার কাছে যে জিনিস একবার এসে পৌছায় তা আর ফেরৎ যায় না। ইব্রাহিমও জানে একথা। কিন্তু তার প্রিয় ডাবোর দুটো সে প্রাণে ধরে কিছুতেই বেচে ফেলতে পারে না। কমল হালদার ওজন করে দেখে। তারপর বলে, 'এতে কুড়ি টাকার বেশি দেওয়া যায় না।' ইব্রাহিম ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, 'উটাতে তো খ্যাড় হবে না।' 'আপনি যখন এসেছেন আমি পঁচিশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু না, তার বেশি কিছুতেই দিতে পারব না।' ইব্রাহিম চুপ করে বসে থাকে। কমল হালদার লাল একটা খাতা বের করে কি সব লিখতে থাকে। তারপর লোহার সিন্দুকটার দরজা খুলে পঁচিশটা টাকা বের করে ইব্রাহিমকে দেয়। ইব্রাহিম হাত পেতে সেই টাকাটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। আয়ানকে সঙ্গে করে গরুর গাড়ি নিয়ে যায় জিৎপুরের শালবনের বনে। কুড়ি টাকার খড় কিনে আনে। সঙ্গে দুজন মুনিষ নিয়ে কয়েক দিনে শোওয়ার ঘরটা ছেয়ে ফেলে। কিন্তু গোয়াল ঘর বা রান্নাঘর ছাওয়ার মত আর খড় থাকে না। তখন হালকা হালকা পাটকাঠি বেছে খড়ের মত করে দিয়ে রাখে। কয়েকটা তালপাতা কেটে ছাগলের ঘরে দেয়। অন্যরাও ইব্রাহিমের মতোই ধার-দেনা করে জোড়াতালি দিয়ে তাদের ঘরগুলো ছেয়ে নেয়।

কিন্তু এ পাড়ায় আগুনের পোড়া দাগটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সেখ পাড়ায় কলেরা দেখা দেয়। গতকাল পায়খানা আর বমি করে মারা গেছে আজাহার। আজাহার আয়ানের সঙ্গে প্রাইমারী স্কুলে পড়ত। আয়ান বলেছিল, দেখতে যাবে। কিন্তু মা কিছুতেই যেতে দেয়নি। মা বলেছিল, 'এখুন উ পাড়ায় যা-ত্যা হয় না।' ছোট মা এসে মার কানে কানে বলেছিল. জানিস, 'কাল রাতে তোর দেওর, মাঠপাড়া থাক্যা আসছেলো, দেখে ঐ গলাদোড়্যার এখ্যানে সদো কাপুড় পরহ্যা একটা সুন্দোর মেয়ে দাড়িয়ে আছে।' আয়ান দেখল, মা শুনে যেন কিরকম চমকে উঠল। ছোট মা বলে চলল, 'তোর দেওরকে দেখে নাকি মেয়েডা মুক ঘুরিয়্যা স্যাকপাড়ার দিকে চলে গ্যালো।' মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আর খ্যানা এ পাড়ার দিকে না

আসে। ও তো মেয়ে নয় রাক্কুসী। যার দিকে তাকাবে হাগ্যা-মুত্যা-বুমি কোর‍্যা তার জানডা চল্যা যাবে।' আয়ানের গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে ঐ মেয়েটাই কলেরা, যখন যেখানে যায় সেখানেই কলেরা হয়। যার দিকে তাকায় সেই মরে যায়। এখন যদি মেয়েটা এসে তার দিকেই চায়। কিন্তু ছোট বাব্‌জী দেখেছে, মেয়েটা সেখপাড়ার দিকে গিয়েছে। ছোট বাব্‌জী এরকমই দেখে। সেবার জয়রামপুর থেকে সাঁঝের বেলা ফিরছিল। পথে শিশুবাগানের কাছে গোদানু দেখেছিল। আয়ান জানত না গোদানু কি। ছোট বাব্‌জী বলেছিল, 'এই মুটা গলাকাটা।' তারপর হাত দুটে একসঙ্গে নাড়াতে নাড়াতে বলেছিল, হাত দুট্যা এরকম করতে করতে ছুটে বেড়ায়। সামনে যাকে পায় চাপ্যা ধরে। তারপর কাটা গলা দিয়্যা—' আয়ান আর শুনতে পারেনি। ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মাও এরকম অনেক গল্প বলে। মা বলে, 'তোর দাদো তো পরজগার লোক ছিল।' পরজগার কি আয়ান বুঝতে পারে না, 'মা, পরজগার কি?' মা বলে 'যারা নমাজ পড়হে রুজা করে, ধম্ম-কম্ম করে তাদের পরজকার বলে। তোর দাদো পরজগার ছিলো। সেজন্য ভূত-পেতনি কিছু কাছে ভিড়তে পারতো না। কিন্তুক পেছুও ছাড়তো না— কি কোর‍্যা ফাঁদে ফেলবে। তোর দাদো বাজার থাক্যা আসছোলো। সামেদের বাঁশঝাড়ের কাছে অ্যাস্যা দেখে একটা বাঁশ রাস্তার উপুর ঝুল্যা পড়্যাছে। তোর দাদো বুঝতে পার‍্যাছে, ও ঐ ওদের কারবার। যদি নিচ দিয়ে আসতে যায় চাপা দিয়ে মারবে। আর যদি ডিঙিয়ে আসতে যায়, তুল্যা ফেলে দিবে।' আয়ানের মনে হয় ভূতগুলোর তো ভারী বুদ্ধি! মা বলে, 'তোর দাদো তখন যেই দুয়া পড়ে ফু দিয়্যাছে অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উপুরে উঠে পড়্যাছে।' আর পেতনিগ্যালো চ্যা চ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়েছে। আয়ান ভাবে সেও দাদোর মতো খুব পরজগার হবে। আর ভূত-পেতনিগুলোকে জব্দ করবে। আর ঐ কলেরাওয়ালী মেয়েটাকেও তাড়াবে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, আপাততঃ কলেরা সেখপাড়ায় চেপে বসেছে। দুপুরের মধ্যে নাজিত মারা গেল, বিকেলের দিকে তার বড় ছেলে ছকোত। তার বাড়ির আর সকলেই পায়খানা আর বমি করতে শুরু করল। পরের দিন সকালে নাজিতের ছোট ছেলেটাও মারা গেল। আজ্জানের ছেলেটা বমি করতে শুরু করল। কইমুদ্দিনের মাও পায়খানা করতে লাগল। গোটা গ্রামটা ভয়ে শিউরে উঠতে লাগল। গ্রামে কোন ডাক্তার নেই। গ্রামের লোকের তেমন অবস্থাও নেই যে 'ভিজিট' দিয়ে ডোমকল থেকে ডাক্তার ডেকে আনবে। ডোমকলে একটা হাসপাতাল আছে। কিন্তু বছর খানেক হল আশীষের বাবা ট্রান্সফার হয়ে যাবার পর আর কোন ডাক্তার আসেনি। কাজেই গ্রামের লোকেরা বিনা চিকিৎসায় মরতে লাগল। কলেরায় কি করতে হয় তা তারা জানে না। কে কতকাল আগে বলেছিল, কলেরার রুগি জল চাইলে দিও।' তাই তারা রোগি যত জল চাইল, দিল, রোগি জল খেয়ে জল বমি করে করে মরতে লাগল। ভয়ে কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। যার পালাবার কোন পথ নেই সে ঘরে বসে বসে মৃত্যুর জন্য দিন গুনতে লাগল। সারাটা গ্রামে একটা থমথমে ভাব। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু একটাই আলোচনা— আর কার কার বমি হতে শুরু হয়েছে, আর কে কে মরেছে। তারপর আস্তে করে বলে, 'পাপ! বুঝলে না, পাপ। কলিকালে কেউ ধম্মকম্ম করে না, আল্লার নাম ল্যায় না। তাই আল্লা 'গজোব' পাঠাচ্ছে। 'পাপ!' তাই পাপ কমানোর জন্য তারা ঘনঘন নামাজ পড়ে, মসজিদে

গিয়ে জোরে জোরে আজান দেয় আর মৌলবী ডেকে 'মোলুদ' পড়ায়। আর তখন পাপের মতোই কালো একখানা মেঘ আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেখা দেয়। মেঘটা বড় হতে হতে সূর্যটিকে ঢেকে ফেলে। নেমে আসে মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড়। ঘর ভাঙে, চাল ওড়ে, গাছপালা ভাঙে, আর ছাগলখালি জলে ভরে ওঠে। বাঘডাঙ্গার লোক সব কিছু ভুলে মাঠের কাজে নেমে পড়ে। আর আশ্চর্যরকমভাবে সেখপাড়ায় কলেরায় মরা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু আবার মাঠে মাঠে আলোচনা শুরু হয়, 'পাপ! এত পাপ সহাবে ক্যানে? অধবাঙ্গ হয়েছে।' পাশের লোকটি ভুরু কুচকায়, 'কার রে?' প্রথম লোকটি উপহাসের হাসি হেসে বলে, 'এই জানিস ন্যা? মালেক বিসস্যায়ের। যেমন কম্ম তেমনি ফল। এখুন বুঝো।' আয়ান মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা অধরাঙ্গ কি?' মা বলেছিল অনেক পাপ করলে হয়। কিন্তু তার মা বলতে পারেনি মালেক বিশ্বাস কি এমন পাপ করেছে। বলেছিলেন হেমন্তবাবু। বলেছিলেন, অধরাঙ্গ নয়— অর্ধাঙ্গ। প্যারালিসিস, প্যারালিসিস হলে শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে যায়। তাই বলে অর্ধাঙ্গ। একটা অসুখ। এর সঙ্গে পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। আয়ান এসে মাকে বলেছিল। মা বলেছিল, 'তা হবে। তাহোই তো খুব খারাপ লোক ছিল না। তাও ক্যান যে ঐ অসুখ হোলো। তা যা-না একদিন, দেখে আয়, তোখে তো অঙ্ক শিখিয়েছ্যোলো।' আয়ানের কথাটা ভালো লাগে। সে মনে মনে ঠিক করে সত্যি একদিন যাবে দেখতে।

আয়ান যখন মালেক বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছল তখন দুপুর। মিলি বাড়িতে ছিল না। পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। মিলির মা রান্নাঘরে রান্না করছিল। আয়ান জানে না মালেক বিশ্বাস কোন্ ঘরে আছে। তাই সে কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। আর ঠিক করতে না পেরে সে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিলির মা মাছে হলুদ মাখাচ্ছিল। আয়ানকে দেখতে পেয়েই বলল, 'কিরে, কখন আসলি?' আয়ান উত্তর দিল, 'এই এক্ষনি।' 'কিছু বলছিস?' না, আয়ান তো কিছু বলছে না। সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি নানাকে দেখব।' মিলির মা বলল, 'ঐ, ঐ ঘরে আছে। কিন্তু তুই একলা গেলে তো ওর কথা কিছু বুঝতে পারবি ন্যা। একটু থাম, আমি মাছটা তেলে দিয়ে নিই।' 'আচ্ছা।' আয়ান দাঁড়িয়ে থাকল। মিলির মা বলল, 'কিরে দাঁড়িয়ে ক্যানে? বস।' আয়, এখানে এসে এই টুলটায় উপর বস।' আয়ান কিছু না বলে গিয়ে টুলটাতে বসল। মিলির মা কড়াতে তেল ঢালতে ঢালতে বলল, 'মিলি তো বলছিল, তুই এবারও ফার্স্ট হয়েছিস, অঙ্কতে একশ পেয়েছিস।' আয়ান কোন উত্তর দিতে পারছিল না। কারণ মিলির মা আনমনে কড়াতে অনেক বেশি তেল ঢেলে দিচ্ছিল। একবার সে ভাবল যে বলে। কিন্তু আবার ভাবল নিজেই নিশ্চয় দেখতে পাবে। কিন্তু মিলির মা অতটা তেল ঢেলেছে দেখেও কমালো না। তার মানে সে তেলটা আনমনে নয়, ইচ্ছা করেই ঢেলেছে। তেলটা গরম হলে মাছের টুকরোগুলো কড়াইতে ছেড়ে দিল। মাছগুলো তেলের মধ্যে ডুবে গেল। আয়ান ভাবল মিলির মা নিশ্চয় মাছ রান্না করতে জানে না। আয়ান যে দেখেছে মা কি করে মাছ রান্না করে। একটুখানি তেলের উপর মাছগুলো দিয়ে দুয়েকবার নেড়ে নিতে হয়। তারপর তাতে লঙ্কা-লবণ আর হলুদ মেশানো জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হয়। কিন্তু মিলির মা মাছগুলোকে একটা থালায় তুলে নিল। তারপর কড়ায়ের অতোখানি

তেলের মধ্যে পেয়াজ কাটা এবং আরও অনেক কি সব বাটা দিল। তারপরে মাছগুলি দিয়ে একটুখানি জল দিল। তারপর ওপরে একটা ঢাকনা চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'চল।' মিলির মার পিছনে পিছনে আয়ান এসে সেই ঘরটায় ঢুকল যেখানে মিলির বাবা মালেক বিশ্বাস শুয়ে আছে। আয়ান প্রথমে চিনতেই পারেনি। মুখটা কেমন বাঁকা হয়ে গেছে। ডান হাত-পা নাড়তে পারছে না। একটা আধময়লা বিছানায় উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে। মিলির মা গিয়ে একটু সোজা করে বসালো। বলল, 'ইব্রাহিমের ব্যাটা, তুমাকে দেখতে আস্যাছে।' মালেক বিশ্বাস হু হু করে কাঁদতে লাগল। কান্না শেষ করে তাকে কাছে ডাকল। বাঁ হাতটা তুলে আয়ানের মাথায় দিল। তারপর কি যেন বলল। আয়ান বুঝতে পারল না। মিলির মা বলল, 'আবার আসতে বলছে।' আয়ান বলল, 'আসব, নিশ্চয় আসব।' মিলির মা এবার আবার তাকে আগের মত করে শুইয়ে দিল। আয়ান বিদায় নিয়ে মিলির মার সাথে বাইরে এল। তার বারবার সেই আগের মালেক বিশ্বাসের কথা মনে হচ্ছিল। লোকটা কি ছিল, আর কি হয়েছে, কেন এমন হয়! আয়ান কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।

জবামামীদের বাড়ি মিলিদের বাড়ির পাশেই। আয়ান এই জবামামীর কাছে দ্বিতীয় ভাগ এবং ধারাপাত পড়েছিল। তারপর প্রাইমারী স্কুলে থাকতে মাঝে মাঝে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আর এদিকে আসেনি। আসা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ বাড়ির এত কাছে এসেও দেখা না করে গেলে কোনই কৈফিয়ৎ থাকবে না। তাই আয়ান মিলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেনাদের বাড়িতে ঢুকল। জবামামীরা তখন খেতে বসেছে। জবামামী আদরের সুরে বলল, 'এতদিন পরে মামীকে মনে পড়ল ছেলের!' আয়ান সত্যি অনেকদিন আসেনি। মামীও অবশ্য আয়ানদের বাড়ি যায়নি। কিন্তু সে শিষ্য। কাজেই তার পক্ষে সে অজুহাত চলে না। তাই সে কিছুই বলতে পারল না। শুধু মুখের ভাবটা একটু লজ্জিত লজ্জিত করল। মামী বলল, 'বস।' হেনা এসে চৌকিটার উপর একটা পাটি বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কোন কথা বলল না। আয়ান কাছে ডাকল। কিন্তু হেনা এল না। বরং সে রান্নাঘরের কাছে জবামামী যেখানে খাচ্ছিল সেখানে চলে গেল। জবামামী বলল, 'ডাকছে যা না।' তবুও হেনা এল না। জবামামীর এবার বোধহয় খেয়াল হল। খুব তাড়াতাড়ি বলল, 'আয়ান এসো আমাদের সঙ্গে দুটো ভাত খাও।' আয়ান বলল, 'না, মামী। আমি খেয়ে এসেছি।' এটি কিন্তু মিছে কথা। আয়ান যখন বাড়ি থেকে বের হয় তখন তাদের রান্নাই চড়েনি। তবুও সে বলল খেয়ে এসেছে। এটাই বলতে হয়। কারও বাড়িতে গিয়ে বলতে নেই যে বাড়ি থেকে খেয়ে আসেনি। তাছাড়া সত্যি কথা বললে কি মামী ছাড়ত। তাই আয়ান ভাত না খেয়েও বলল খেয়েছি। মামী তাড়তাড়ি খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে আয়ানের কাছে এল। হাসিমুখে বলল, 'তুমি তো অঙ্কে একশ পেয়েছ। তার মানে খুব ভাল অঙ্ক শিখছ। হেনাটা এবার ফোরে উঠল। কিন্তু ভাগ করতে পারে না। একসময় দেখিয়ে দিও তো।' আয়ান বলল, 'আমি এখনই দেখিয়ে দিতে পারি।' মামী বলল, 'দাও তো, এই হেনা শ্লেট পেনসিল নিয়ে আয়।' কিন্তু হেনা এল না। মামী দুয়েকবার ডেকে হাল ছেড়ে দিল। আয়ান বলল, 'মামী আমি তাহলে আজ যাই।' মামী বলল, 'এস, কিন্তু একেবারে ভুলে যেও না। মাঝে মাঝে এসো।' আয়ান বলল, 'আসব।' তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

নয়

গরমের ছুটির পর ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। যাণ্মাষিক পরীক্ষারও আর বেশি দেরি নেই। তবুও ঘর পোড়ার পর আয়ান ক'দিন স্কুলে যেতে পারেনি। কিন্তু আর কামাই করা যায় না। এ ক'দিনও সে কামাই করত না। কিন্তু তার গায়ে দেওয়ার জামা ছিল না। জামাটা চালের বাতায় গোঁজা ছিল। তাড়াতাড়িতে তার মা দেখতে পায়নি। তাই ঘরের সঙ্গে ওটাও পুড়ে গিয়েছিল। খালিগায়ে তো স্কুলে যাওয়া যায় না। তাই এ ক'দিন তার স্কুলে যাওয়া হয়নি। স্কুলে যাওয়া হয়নি, তাই সবসময় ছটফট করেছে, আর মার কাছে ঘুরঘুর করেছে। ঘুরঘুর করেছে আর বলেছে, 'বাব্জীকে বলো না।' কিন্তু বাব্জীকে আর বলতে হয়নি। ইব্রাহিম নিজে থেকেই শুনেছিল। আর শুনে ধার করেই একটা জামা এনে দিয়েছে। গোপী দত্তের দোকান থেকে কাপড় কিনেছে—বাকীতে। তারপর সেলাই করতে দিয়েছে, তাও বাকীতে। পাট উঠলে শোধ করতে হবে। জামা হাতে পেয়ে আয়ানের বুকটা খুশিতে ভরে উঠল। সে স্নান-খাওয়া করে স্কুলের জন্য রওনা হয়ে গেল।

স্কুলের কাছে আসতেই ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। মানে সাড়ে দশটা বাজল। এখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হল। এবছর থেকে এই হয়েছে। ডোমকল হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এত বেড়েছে যে, সকলের জায়গা হচ্ছে না। তাই ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত মেয়েদের জন্য একটা আলাদা স্কুল করা হয়েছে। পরে বাড়ি করা হবে। আপাতত এই বাড়িতেই ক্লাস হচ্ছে। তাই হাইস্কুল যখন দুপুরে হয়, মেয়েদের বালিকা বিদ্যাপীঠের ক্লাস তখন সকালবেলায় হয়। আবার, হাইস্কুলের ক্লাস যখন সকালবেলায় হয়, বালিকা বিদ্যাপীঠের ক্লাস তখন দুপুরবেলায় হয়। এখন আয়ানদের ক্লাস দুপুরে হবে। তাই ওদের ছুটি হয়ে যাচ্ছে। আয়ান গেটের কাছে আসতে দেখল কল্পনা ও তনুজা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বেরুচ্ছে। আয়ান একবার তাকাল। কল্পনাও একবার ফিরে তাকল। আয়ান একবার মনে করল কথা বলবে। আবার কি মনে করে বলল না। সোজা গিয়ে ডানপাশে তাদের ক্লাসঘরটায় ঢুকে পড়ল। কয়েকজন মাত্র ছেলে এসেছে। আয়ান তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল এই ক'দিন কি কি পড়া হয়েছে। এই করতে করতেই প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা মাঠের মধ্যে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। মাস্টারমশাইরা এসে সামনে দাঁড়ালেন। পাশে উঁচু ক্লাসের মেয়েরা। স্কুলে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে প্রার্থনা করা হয়। মেয়েরাই গায়। তার সঙ্গে কয়েকটি ছেলে গলা মেলায়। তারপরে উঁচু ক্লাসের একজন জয় হিন্দ্ বলে, ঘুরে ক্লাসে চলে যায়। আয়ানও আসে। একটু পরেই হাজিরা খাতা নিয়ে নরেশবাবু ক্লাসে ঢোকেন। আয়ানরা উঠে দাঁড়ায়, নরেশবাবু বসলে বসে। নরেশবাবু ওয়ান, টু, থ্রী করে রোল কল করেন। ছেলেরা উঠে কেউ প্রেজেন্ট স্যার, কেউ ইয়েস স্যার, কেউ বা শুধু জী বলে। নরেশবাবু ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে যান। তখন ক্লাস টেনের শিশির এসে বলে, 'তোমার নাম আয়ান তো? একটু বাইরে এস।' আয়ান তার পেছনে পেছনে বাইরে এল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ টিফিনের সময় আমাদের ছাত্র ফেডারেশনের একটা মিটিঙ আছে।

ঘোষালবাবুর বাসায়। রহমান সাহেব তোমাকেও যেতে বলেছেন।' আয়ান বুঝতে পারে না ছাত্র ফেডারেশন কি। আর তাকে কেন থাকতে বলেছেন? তাই সে ছেলেটিকে জিজ্ঞেসই করে ফেলে। ছেলেটি বলে, 'ছাত্র ফেডারেশন ছাত্রদের একটা সংগঠন। তুমি মিটিংএ গেলেই বুঝতে পারবে।' ছেলেটি চলে যায়।

ঘোষালবাবুর বাড়ি স্কুলের কাছেই। টিফিন হতেই আয়ান সেখানে গিয়ে হাজির হয়। দশ-বারজন ছেলে-মেয়ে ইতিমধ্যে এসে গেছে। তার মধ্যে ক্লাস টেনের সেই শিশিরও আছে। আয়ান যেতেই শিশির বলল, 'বস'। সে তার পাশে একটা জায়গা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। আয়ান বসতেই অন্য একটা ছেলে তার হাতে একটা রসিদ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'চার আনা পয়সা দাও।' আয়ানের কাছে পয়সা নেই। সেকথা জানাতে সে বলল, 'নেই, আচ্ছা পরে দিও।' আয়ান রসিদটা পকেটে রাখল। আলোচনা শুরু হল। বড় ছেলেরাই সব বলল, আয়ান শুনল। কি করে সব ধর্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একতা আনা যাবে, কি করে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু আর্থিক সাহায্য করা যাবে এইসব আলোচনা। আয়ানের খুব ভাল লাগল, এসব তো ভাল কাজ। আয়ান খুশি হয়ে ক্লাসে ফিরল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। টিফিনের সময় আয়ান বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। ক্লাস নাইনের রেজাউল এসে তাকে বাইরে ডাকল। 'আমরা এই স্কুলে ছাত্র পরিষদ খুলছি। তুমি আমাদের সদস্য হও।' আয়ান বলল, 'আমি তো সদস্য আগেই হয়েছি।' রেজাউল ভ্রূ কুঁচকাল। তারপর পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে দেখতে লাগল। ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'না তো, তোমার নাম নেই।' আয়ান ভেবে পায় না, তা কি করে হয়! সে এই সেদিন মেম্বার হল। আর আজই নেই! ঐ ছেলেটি যে বলল এক বছরের জন্য। সে তাড়াতাড়ি ক্লাসে ঢুকে বইয়ের পাতার মধ্যে থেকে রসিদটা বের করে এনে রেজাউলের হাতে দিল, 'এই দেখুন।' রেজাউল দেখে খুশি হল না। বলল, 'তুমি ছাত্র ফেডারেশনের মেম্বার হয়েছ। ছাত্র ফেডারেশন মানেই তো সি.পি.এম, চীনের দালাল, রাশিয়ার চর। রাশিয়া হাঁচলেই ওদের সর্দি লেগে যায়। তুমি ওদের সাথে গিয়েছ? ওরা তো দেশের শত্রু। বিশ্বাসঘাতক...' রেজাউলের চাপা রাগটা কিছুতেই কমে না। আয়ান বুঝতে পারে না সে কি করবে। শুধু অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে আপনারা কি? রেজাউল একটু খুশি হয়ে বলতে শুরু করে 'আমরা ছাত্র পরিষদ, জাতীয় কংগ্রেস আর কি! আমরা জাতীয়তাবাদী, আমাদের দেশের পক্ষে যা মঙ্গল আমরা তাই করি। তার জন্য রাশিয়া বা চীনের দিকে তাকিয়ে থাকি না। তুমি আমাদের সঙ্গে চলে এস। ওরা বিশ্বাসঘাতক।' আয়ান মেনে নিতে পারে না ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা তো সেদিন ভালো কাজের কথাই বলছিল, রেজাউল সেরকম কোন কাজের কথা বলছে না। শুধু বলছে ওরা বিশ্বাসঘাতক। আয়ানের মোটেই ভালো লাগছে না রেজাউলের কথা। রেজাউল বোধহয় তা বুঝতে পারল। তাই রসিদটা আয়ানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রেজাউল চলে গেল। কিন্তু তার কথাগুলো আয়ানের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। রেজাউল বলে গেল, সে ছাত্র ফেডারেশনের মেম্বার হয়েছে। বলে গেল ফেডারেশন মানেই তো সি.পি.এম.। তাহলে কি সে কিছু না বুঝেই পার্টি করতে লেগেছে। কিন্তু তার বাবা তো

তাকে পার্টি করতে বার বার মানা করেছে। বলেছে 'ঐ দ্যাখো রহমান মাস্টার। পার্টি লিয়্যা এমুন মাত্যা থাকে যে বাড়িতে খাবার জোটে না।' রহমান মাস্টারের কথা আয়ান জানে না। তবে সে এমন কিছু করেনি যাতে তার ক্ষতি হয়। তবে কেন বাবা পার্টি করতে মানা করে! আয়ান ঠিক বুঝতে পারে না। ঠিক করতে পারে না কি করবে। না ঠিক করতে পেরে মিটিঙয়ের দিন চলে যায়। ইতিমধ্যে সে আরও কয়েকটা মিটিঙে গিয়েছে। সব কথা সে বুঝতে পারেনি। যতটা বুঝতে পেরেছে তাতে আলোচনার বিষয় মোটামুটি একইরকম। শুধু শেষের দিন একটা নতুন বিষয় উঠেছে। হাইস্কুলের হেডমাস্টার ইস্কুলের উন্নতির জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না। তাই হেডমাস্টার পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এবারের মিটিঙে বেশ কয়েকজন মাস্টারমশাইও ছিলেন। মিটিঙ থেকে ফিরেই আয়ান ক্লাসে ঢুকেছিল। ক্লাস তখন শুরু হয়ে গেছে। শিশিরদা এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। একটুখানি দাঁড়িয়েই মাস্টারমশাইকে কি বলল। মাস্টারমশাই বললেন, 'আয়ান, তোমাকে ডাকছে।' আয়ান বাইরে এল। শিশিরদা এসে তার খুব কাছে দাঁড়াল, তারপর বলল, 'ইজ্রায়েল আল-আক্সা মসজিদের উপর বোমা ফেলেছে। প্যালেস্টাইনের লোকেদের উপর বর্বর অত্যাচার করেছে। তার জন্য আমাদের রাজ্য কমিটি আগামী কাল সব স্কুল-কলেজে স্ট্রাইক ডেকেছে। কাল স্কুলের মাঠে পিকেটিং করতে হবে। আমরা আসব। তুমি সাড়ে নটার মধ্যে চলে আসবে। আর তোমাকে একটা ছোটখাট বক্তৃতাও দিতে হবে। কি বলবে, ছুটির পর ঘোষালবাবুর বাড়িতে বসে ঠিক করব।' কথা শেষ করেই শিশিরদা হনহন করে চলে গেল। আয়ানের কোনরকম সুবিধা-অসুবিধা আছে কিনা, আয়ান আসবে কিনা কিছুই জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করল না। আয়ানের মনে এই প্রথম দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এতদিন সে যথারীতি ক্লাস করেছে আর মিটিঙের দিন মিটিঙে গেছে। তার বাইরে তাকে কিছু করতে হয়নি। কিন্তু আগামী কাল তাকে পিকেটিং করার জন্য সাড়ে নটার মধ্যে আসতে হবে। শুধু তাই নয়, একটা বক্তৃতাও করতে হবে। কি করবে সে ভাবতে লাগল। সব মিটিঙেই গিয়েছে। হঠাৎ করে কাল আসবে না বললেও খারাপ দেখায়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটির পর সে ঘোষালবাবুর বাড়িতে হাজির হল। অন্যরা আগেই এসে পড়েছিল। তার যাওয়ার পরপরই শিশিরও হাজির হল। আলোচনা শুরু হল।

ঠিক হল সাড়ে নটার মধ্যেই গেটের সামনে হাজির হতে হবে। সকাল বেলায় মেয়েদেরও স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কাজেই স্কুল থেকে বাইরে আসবার কেউ থাকবে না। তাই গেটে তালা লাগিয়ে দিতে হবে। মাস্টারমশাইরা কেউ ভিতরে যেতে চাইলে খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু কোন ছাত্রকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গেটের দায়িত্ব দেওয়া হল শিশিরের উপর। দশটা নাগাদ একটি-দুটি করে ছেলেমেয়ে আসতে থাকবে। তখন তাদেরকে বললেই হবে। কিন্তু সাড়ে দশটা পৌনে এগারটা নাগাদ একসঙ্গে অনেক ছেলেমেয়ে আসবে। তারা গেটের কাছে আসার আগেই যাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারে তার জন্য গেটের একটু দূরেই আমাদের কয়েকজন ছেলেমেয়েকে বক্তৃতা শুরু করতে হবে। তাহলে যারা আসবে তারা গেটের কাছে না গিয়ে প্রথমেই ওখানে যাবে। তাহলে আমাদের কাজ সুবিধাজনক হবে। বক্তৃতার দায়িত্ব

থাকল স্বপনের উপর। স্বপনের পর বক্তৃতা করবে আয়ান, তারপর শিশির। বক্তৃতার মূল সুর হবে, 'সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের উপর জুলুমের প্রতিবাদে এই ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।' আয়ান ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। বার বার শিশিরদাকে জিজ্ঞেস করে। শিশিরদা যতটা পারে বলে। তরপর বলে স্বপন। বলে, কিছু সংগ্রাম তো করতেই হবে। আয়ান সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বুঝতে পারে না সংগ্রামটা ঠিক কার বিরুদ্ধে।

দশ

আয়ান ঘোষালবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরুল তখন বেলা পড়ে এসেছে। পৌষ মাসের দিন। তাই তখনই শীত-শীত করছে। আয়ান তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। আয়ান দেখেছে জোরে জোরে হাঁটলে শরীরটা বেশ গরম লাগে। কানে-মুখে তখনও শীত লাগে বটে কিন্তু কাবু করতে পারে না। আয়ান বড় বড় ধাপ ফেলে হাঁটতে থাকে। ক্রমে ভুবনডাঙা পেছনে ফেলে সে এসে পড়ে তাদের গ্রামের বিলের ধারের রাস্তার ওপর। সূর্যটা তখন হাঁসের ডিমের বড় কুসুমের মত শান্ত হয়ে নেমে পড়ছে জয়রামপুরের মাঠের মধ্যেকার তালগাছটার মাথার ওপরে। তালগাছটা যেন আয়ানের কতকালের চেনা। ঈদের চাঁদ দেখার জন্য চেয়ে থাকতে থাকতে কতবার দেখেছে যে চাঁদটা উঠে ঐ তালগাছটার একটা পাতার ফাঁকে ঝিকমিক করে হাসছে। তা দেখে খুশিতে সেও হেসে উঠেছে। 'দেখ না মা, দেখ না। ঐ যে, ঐ যে তালগাছটার ডানদিকের পাতাটার উপরে আঙুলের সোজা তাকাও না। আমি সবার আগে দেখেছি। আমাকে কিন্তু কাল চার আনা পয়সা বেশি দিতে হবে।' ইব্রাহিম ততক্ষণে চাঁদটার দিকে মুখ করে আজান দিতে শুরু করেছে। ঈদের চাঁদ দেখলে যে আজান দিতে হয়। আজান শুনে সবাই বুঝতে পারে যে, চাঁদ উঠেছে। সবাই তখন ঐ তালগাছটার দিকে তাকায়। আবার কখনও সে মাঠে গরু নিয়ে গিয়েছে। আর চরাতে ভালো লাগছে না। সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসবে। সে বার বার তালগাছটার দিকে তাকায়। না এখনও সূর্যটা তালগাছের মাথার উপরে আসেনি। তখন কিছুতেই আসতে চায় না। অথচ এখন আয়ান একটুও চায়নি। বরং একটু পরে সন্ধ্যা হলেই তার সুবিধা হয় ভেবেছে। তবুও সূর্যটা তালগাছটার ঠিক মাথার উপরে চলে এসেছে। এখন আস্তে আস্তে ওর লাল আভাটা চলে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে পাটে বসে যাবে, অর্থাৎ এক্ষুনি সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আয়ান আরও জোর হাঁটতে থাকে। সেখপাড়াকে অতিক্রম করে গলাদোড়্যার কাছে আসতেই দেখে বিলের মধ্যে একটা নৌকার উপর দু'তিনটে ছেলে ঝগড়া করছে। হঠাৎ দেখল দুজনে একটা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। ছেলেটা জল থেকে উঠে দাঁড়িয়েই গালিগালাজ শুরু করল, 'স্যাক তো স্যাক, একবারে বাদ্যা।' নৌকার উপর থেকে উত্তর এল, 'চাষা, বুদ্ধিনাশা/ঘরে আগুন বাহারে বাসা। 'জলের মধ্যে থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর, 'আর তুরা, স্যাক স্যাক স্যাক/উপোর দিকে পুঙা কোর‍্যা চ্যারাক জ্বাল্যা দ্যাখ।' নৌকার উপর থেকে কোন জবাব আসার আগেই আয়ান হাঁক দিল, 'তোরা কারা রে? বিলের মধ্যে মারামারি করছিস?' জলের মধ্যেকার ছেলেটা বলল, 'দ্যাখ

না বড়ভাই, আমি লা লিয়্যা বন্‌শী দিছ্নু। ঐ স্যাকপাড়্যারা আস্যা আমাকে ফেলে দিলো।'

আয়ান বুঝল এটা তাদের পাড়ার ইসবের ছেলে। কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই নৌকা থেকে উত্তর এল, 'দ্যাখো না আয়ান চাচা, আমরা বন্‌শী দিবো বোল্যা ভিড়িয়্যা থুয়্যাছি। আর আমাদের পাড়া থাক্যা চুরি কোর্যা লিয়্যা পালিয়্যা আস্যাছে।' আয়ান দু'পক্ষকেই ধারে আসতে বলল। ওরা ধারে আসতে লাগল। আয়ান দেখল নৌকার উপর যে ছেলেটা কথা বলছিল ওটা সাদেকের ভাই।

ফাল্গুন-চৈত্রমাসে বিলের সব জল শুকিয়ে গেলে লোকেরা বিলের জমিগুলোকে পরিষ্কার করে চাষ করে। তারপর বৈশাখ মাসের দিকে বৃষ্টি হলে বাঘ্‌ড়্যা, অলোচ, ভুতরাজ, বেতাই এবং যেখানে জল তুলনায় কম হয় সেখানে মুড়কিমালা প্রভৃতি ধানের বীজ বুনে দেয়। ধানের চারা বেরিয়ে গেলে এক-আধবার নিড়িয়ে দেয়। শামা ঘাস বা ঝাড়া ধানের চারাগুলোকে তুলে গরুর খাবার করে। তখন আসল ধানের চারাগুলো বাড়তে থাকে। বৃষ্টি হলেই বিলে জল জমতে থাকে। যত জল জমে, ধানের গাছ্‌গুলো তত জলের ওপরে বেড়ে ওঠে। আট হাত দশ হাত জলের ওপরেও এই ধানগাছ্‌গুলো বেড়ে উঠতে পারে। একমাত্র খুব বড় ঢল মারলে, ধানগাছ্‌গুলোর সব পাতা হঠাৎ করে ডুবে গেলে ওগুলো আর বাড়তে পারে না। তা না হলে আস্তে আস্তে যতই জল বাড়ুক এই ধানগাছ্‌গুলো তাতে ডুবে যায় না। জলের উপরে জম-জমাট হয়ে বেড়ে ওঠে। কার্তিক মাসের দিকে শিষ বেরুতে শুরু করে। আর অঘ্রান মাসে ধান পেকে সারা বিলটা ধানে ধানে ভরে যায়। তখনও এক কোমর জল থাকে। তার ওপর ধানের গাছ্‌ এত ঘন থাকে যে, পায়ে হেঁটে ঐ ধান কাটা যায় না। তখন জয়রামপুর, ভগীরথপুরের জেলেরা তাদের নৌকাগুলো এনে এই বিলে ফেলে। গরুর গাড়িতে করে যখন নৌকাগুলো আনে তখন গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলা লেগে যায়। কে কত আগে কিভাবে চড়বে তার জন্য হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ধানকাটা শুরু হওয়ার আগেই নৌকা আনলে জেলেরা নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে রেখে যায়। কিন্তু গ্রামের ছেলেরা সেগুলিকে কিছুতেই ডুবে থাকতে দেবে না। টেনে তুলে জল ছেঁকে চড়তে শুরু করবে। ছেলেমেয়েরাই বেশি চড়ে। তবে কখনও কখনও বয়স্ক লোকেরা, এমনকি বুড়ো-বুড়ীরাও চড়ে। 'আমার এতো বুয়াস হোল। কতো চড়্‌হ্যাছি। আমি আর কি লায়ে চড়্‌হবরে? চল তা বুলছিস যখুন, চল।' এই বলে চড়ে বসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখন খুব জোরে ঠেলা দিয়ে হো হো করে হাসতে থাকে। একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। আয়ানও করেছে। এক-একদিন একেবারে সন্ধ্যাবেলাতেই পূর্ণিমার চাঁদ পুবের আকাশে উঁকি দিয়ে ঢলঢল করে হাসতে থাকে। গেরস্থালির কাজ শেষ করে নববধূ তখন দেওরের কাছে আব্দার করে, 'এই আজ আমাকে এট্টু লায়ে চড়্‌হাবা?' দেওররা তো 'চড়্‌হাতেই' চায়। কিন্তু ভাই যদি বকে? ভায়ের অনুমতি পেলেও মার কাছে যেতে হয়। তাও চড়ায়। চাঁদের আলো বিলের ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর পড়ে চকচক করে। বুনো হাঁসের দল উড়ে এসে ঝুপঝাপ পড়তে থাকে। টুবটুবিটা টুবটুব করে একটানা ডেকে চলে। নৌকায় চড়ে তখন কত কি ইচ্ছে করে।

বাঘডাঙ্গা গ্রামের কারও নৌকা নেই। কিন্তু তিন-চার মাস ধরে তাদের বিলে নৌকা থাকে। অনেক নৌকা আসে। জয়রামপুরের আনন্দ হালদারের নৌকা আসে। লোকটি খুব

ভালো। আয়ান তাকে কাকা বলে। ভগীরথপুরের গোপাল হালদারের নৌকাও আসে। ইব্রাহিমই তাকে কাকা বলে। তাই আয়ান বলে দাদো। গোপাল হালদার বলে, 'কিরে লাতি, কেমুন আছিস?' এরা খুব ভালো লোক। নৌকা ডুবায় না। বলে, 'চড়্‌হবি চড়। দেখিস য্যানো ভাঙ্গে না।' সবাই চড়ে বেড়ায়। কেউ কেউ কিছু কাজও করে। রাতে কারও হাঁসগুলো বিল থেকে না উঠলে, তেড়ে তেড়ে ওঠায়। কেউ বা নৌকায় চড়ে মাছের জন্য বন্‌শী দিয়ে বেড়ায়। ধানকাটা শুরু হলে সকালবেলায় উঠে গ্রামের লোকেরা নৌকার ওপর উঠে বসে। নৌকার মালিক লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নৌকাটাকে ধানের ক্ষেতের পাশে নিয়ে যায়। তখন লোকেরা নৌকায় বসে বসেও ধান কেটে আঁটি বাঁধে। খানিকটা কাটা হয়ে গেলে নৌকাটাকে ঠেলে দেয়। এইভাবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ধান কাটা চলে। ধানের আঁটিতে নৌকা ভর্তি হয়ে গেলে নৌকা ডাঙ্গার ধারে আসে। প্রতি কুড়ি আঁটিতে এক আঁটি নৌকার মালিকের জন্য রেখে বাকিটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে খোলায় তোলা হয়। খোলা খুব কাছে হলে আর গরুর গাড়িতে তোলাও হয় না— নৌকা থেকে একদম খোলায় নিয়ে গিয়ে নামানো হয়। নৌকার মাঝি তার ভাগের আঁটিগুলো কারো খোলায় তুলে রেখে, নৌকায় ঝরে পড়া ধানগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। তখন বিলের সমস্ত নৌকার মালিক গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। আর যে নৌকায় যেদিন যে পাড়ায় ধান কাটা হয় সে নৌকা সেদিন সেই পাড়ার ছেলেরাই দখল করে বসে। সেই নৌকাটা সেদিন সাধারণত সেই পাড়াতেই থাকে। দুপক্ষের কথা শুনে আয়ান জানল যে, নৌকাটা সেখপাড়ায় ছিল। সাদেকের ভায়েরা বন্‌শী ফেলার জন্য নৌকাটা ভিড়িয়ে বন্‌শীর ডালি আনতে গিয়েছিল। এদিকের ইসবের ছেলেটা এ পাড়ায় কোন নৌকার দখল না পেয়ে ও পাড়ার দিকে ঘোরাফেরা করছিল। আর নৌকাটা যেই ফাঁকা পেয়েছে অমনি নিয়ে চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু খানিকটা আসতেই সাদেকের ভায়েরা এসে ধরে ফেলেছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর ধাক্কাধাক্কি। অবশেষে এক পক্ষের জলে পতন।

আয়ান ওদের ডাঙ্গায় আসতে বলেছিল। কিন্তু এদেরকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারে না। সাদেকের ভায়েরা নৌকাটা ভিড়িয়ে রেখেছিল। কাজেই নৌকাটা ওদেরই পাওয়া উচিত। আবার ইসবের ছেলেটা যখন নিয়ে আসছিল, তখন নৌকায় কেউ ছিল না। কাজেই নৌকাটা পড়ে আছে ভাবতে কোন অন্যায় নেই। দ্বিতীয়ত, এই শীতের সন্ধ্যায় সে জলে ভিজে থরথর করে কাঁপছে। আয়ান একদম ন্যায়বিচার করতে চায়। কিন্তু ন্যায়বিচার অনেক সময় খুবই কঠিন। সেই কঠিন কাজটা করার জন্য আয়ান সাদেকের ভাইদের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে। ও নৌকাটা অন্যায় করে এনেছে। কিন্তু তাই বলে এমন করে কাউকে জলে ফেলে দেয়? ও যদি ডুবে মরে যেত?' ওরা আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এই সম্ভাবনাটা ওদের ধারণায় আসে না। বাঘডাঙ্গায় কোন ছেলেমেয়ের ধারণাতেই আসে না। এখানে দুধ না ছাড়তেই ছেলেমেয়েরা মায়ের কোলে চড়ে ঘাটে আসে। আর হাঁটতে শিখলেই জল খেতে খেতে একদিন সাঁতার শিখে নেয়। তাই জলে পড়ে ডুবে মরার সম্ভাবনা ওদের ধারণাতেই আসে না। তবুও ওরা বুঝতে পারে যে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আয়ান ওদের মনের অবস্থা বুঝে বলে, 'যাও, আর ঝামেলা কোরো না। বাড়ি যাও। না হলে ও তোমার বাপের কাছে গেলে

খুব মার খাবে।' এ সম্ভাবনাটা ওরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারল। কারণ এ গ্রামে ছেলে-ছেলেতে ঝগড়া করলে বাবা-মা'রা এখনও নিজের ছেলেকেই শাসন করে। সাদেকের ভায়েরা সন্তুষ্ট হল না। কিন্তু লগিটা ঘাড়ে করে চলে গেল। অন্যপক্ষ নৌকা পেয়ে সন্তুষ্ট হলেও শীতে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আয়ান বাড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন তার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। আয়ান দেখেছে একই পাড়ার দুটো ছেলে যখন ঝগড়া করে তখন তো পাড়ার কথা উঠতে পারে না। কিন্তু দুই পাড়ার দুটো ছেলে ঝগড়া করলে প্রথমেই কেন পাড়ার কথাটা ওঠে? একই ধর্মের দুটো লোক যখন মারামারি করে তখন কেউ তাদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুটো লোকের মধ্যে মারামারি হলেই কেন প্রথমে ধর্মের কথা ওঠে? আয়ান কিছুতেই এটা বুঝতে পারে না। আয়ান বুঝতে পারে না, দুটো পাড়া এত কাছাকাছি হওয়া সত্বেও কেন এত ফারাক। আয়ান দেখেছে দু পাড়ার কথাবার্তায়ও অনেক ফারাক। উনুনকে তাদের পাড়ার লোক বলে আখা। কিন্তু সেখপাড়ার লোক বলে চুল্হ্যা। তাদের পাড়ায় লোক বলে আমাধের। কিন্তু সেখপাড়ায় লোক বলে আমাথের। আর এই দুই পাড়ার লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়া বিয়ে-শাদীর কোন সম্পর্ক নেই। সেখপাড়ায় লোকেদের আত্মীয়-স্বজন সব বাটিকামারী, কালুপুর, হাসানপুর বা কাপাসডাঙ্গায়। এই গ্রামগুলোতে আবার তাদের পাড়ার কারও কোনরকম আত্মীয় নেই। অনেক দিন ধরে এরকমই চলে আসছে। কিন্তু কেন এরকম হয়?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে কখন বাড়ির কাছে চলে এসেছে বুঝতে পারেনি। এখন তাকাতেই দেখল তাদের ঠাকুরের ভুঁইয়ের ধানকাটা হয়েছে। এ জমিটা আগে ছিল ভুবনডাঙ্গার পানকৌড়ি ঠাকুরের। তাই মা বলে ঠাকুরের ভুঁই। আয়ানও বলে ঠাকুরের ভুঁই। অবশ্য এখন আর জমিটা ঠাকুরদের নেই। তারা জমিটা বিক্রি করে দিয়েছে ভগীরথপুরের একজন লোকের কাছে যে তার নিজের নাম বলে শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ব্যানার্জি। সে আগে ভগীরথপুরের জমিদারদের সেরেস্তায় কাজ করত। এখন আর জমিদারি নেই। কাজেই সে কাজ নিয়েছে লালবাগের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সেখানে সে কেরানির কাজ করে। তা ওই গ্রামের চাষা ভুষোর কাছে সেটাই অনেক। তাই সে বাবু। শ্রীযুক্তবাবু রামচন্দ্র ব্যানার্জী। সেই শ্রীযুক্তবাবু রামচন্দ্র ব্যানার্জী একটা টুলে সমাসীন হয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে আর বলছে, 'একটু তাড়াতাড়ি কর, না হলে অনেক রাত হয়ে যাবে। সবাই তাড়াতাড়ি করছে।' মলনে পাঁচ-সাতটা গরু জোড়া হয়েছে। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গরুগুলিকে ঘোরানো হচ্ছে। 'মেহের' করা হয়েছে তাদের বৃদ্ধ গাইটাকে। মেহের সব থেকে বামদিকে থাকে বলে সব থেকে কম পথ হাঁটতে হয়। ইব্রাহিম গরু ঘোরাচ্ছে। ইসমাইল আর আজবার ধানের আঁটিগুলি এনে 'ভাঙছে'। আরও জনা তিনেক লোক কান্ধাল দিয়ে লাড়া দিয়ে দিচ্ছে। আয়ান সোজাসুজি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়ে জামা-প্যান্ট ছাড়ল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে আবার বাইরে এল। তখন ধান মাড়াই হয়ে এসেছে। সবাই মিলে কান্ধাল দিয়ে পোয়ালগুলোকে ধান থেকে আলাদা করছে। তারপর জড়ো করেই মাপতে লাগবে। আয়ান বাড়ি থেকে বস্তা আর মাপের হাঁড়্যা নিয়ে এল। আজবার ধান মাপতে লাগল। এক মণ ধানে পাঁচসের মিজে আলাদা করে রাখে। এই মিজে যারা ধান কাটাই মাড়াই করেছে তারা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে

ভাগ করে নেয়।

ধান মাপা হয়ে গেল। তার ভাগের ধান তার বস্তায় ভরে তুলে রাখা হয়েছে। এবার শ্রীযুক্ত বাবুর বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু রাত হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সাইকেল আছে। সাইকেলে ডায়নামোও আছে। ডায়নামোর আলোতে রাস্তা দেখা যায়। অন্ধকার পালায়। কিন্তু ভূত পালায় না। যদি পাশ থেকে এসে চেপে ধরে! তাছাড়া ভগীরথপুর যেতে হলে যেতে হবে সেই শিশুবাগানের উপর দিয়ে, যেখানে ইসমাইল নাকি সাঁঝের বেলাতেই গোদানু দেখেছিল। উপস্থিত সব লোকই স্বীকার করল যে ওখানে শুধু গোদানু নয়, আরও অনেক কিছুই আছে। শ্রীযুক্ত বাবু সেকথা শুনে আরও কাবু হয়ে গেল। ইব্রাহিম বলল, 'চলুন আপনাকে শিশ্যাবাগান পর্যন্ত আগিয়্যা দিয়্যা আসি গ্যা।' কিন্তু বাবু আশ্বস্ত হল না। জয়রামপুরের পরও একটা বড় মাঠ আছে। আর ওখানে রাস্তার উপর বিরাট বড় একটা পাকুড় গাছ আছে। ঐ পাকুড় গাছটাও নাকি ভাল নয়। জোছনা রাতে একটা কালো বিড়াল নাকি ওখানে ঘোরাফেরা করে। আর একলা মানুষ পেলেই হঠাৎ করে একেক রকম আকার নেয়। বাবু নাকি একথাটা অনেকের কাছেই শুনেছেন। কাজেই শুধু শিশুবাগান পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই হবে না— একজন কাউকে তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে। আয়ানকে লক্ষ্য করে ইব্রাহিম বলল, 'তুই যা। রাতটা ওখানে থেকে যাবি। সকালে উঠে চলে আসবি।' আয়ানের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাল সকাল সাড়ে নটার মধ্যে তাকে স্কুলের গেটে পৌঁছতে হবে। কাজেই সে বলল, 'আমি যেতে পারব না।' কিন্তু তাহলে কে যাবে? আয়ান না গেলে ইব্রাহিমকেই যেতে হবে। কিন্তু বাড়িতে এখনও অনেক কাজ বাকী। এখনও গরুর জন্য ঘাসগুলো চুর করা হয়নি। তাছাড়া তার এখনও স্নানও করা হয়নি। ধান মাড়াইয়ের পর স্নান না করলে যে সমস্ত শরীর ধানের শুলে কুট্‌কুট্‌ করবে। কাজেই আয়ানকেই যেতে হল।

আয়ান জামা-প্যান্ট পরে এলে সে সাইকেলে হাত দিল। তারপর ডায়নামোটা চালিয়ে সে সাইকেলে উঠল। আয়ান পেছনের ক্যারিয়ারে উঠে বসল। সে হাতে একটা ছোটমত লাঠি নিয়েছে। পথে যদি সাপ-টাপ পড়ে। তাছাড়া ভূতেরাও নিশ্চয় লাঠিকে ভয় করে। কিন্তু একটু পরেই তারা শিশুবাগানের কাছে চলে এল। দুধারে অনেক বড় বড় শিশুগাছ। একধারে একটা বড় শহরাগাছ। ভূতেদের নাকি শহরাগাছ খুব প্রিয়। কিন্তু সে কিছু দেখতে পায় না। দেখতে পায় না, কিন্তু ভয় করে। মনে হয় এই বুঝি একটা গোদানু হাত নাড়াতে নাড়াতে তাকে এসে জড়িয়ে ধরে! মনে হয় এই বুঝি একটা ভূত গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে তাদের মাথায় পড়ে। হঠাৎ বামদিকের জঙ্গলে একটা সড়সড় শব্দ হল। আয়ানের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আয়ান দেখল বাবুও সেদিকে তাকাচ্ছে। যেই তাকানো অমনি হুড়মুড় করে পড়া। যেই পড়া অমনি একটা শিয়াল সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল। আয়ান উঠেই ধর ধর করে ওঠার পেছনে ছুটল। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই দেখল তার হাতের লাঠিটা নেই। সে ফিরে এসে দেখল লাঠিটা সাইকেলের পাশেই পড়ে আছে। আয়ান সেটা তুলে নিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে তার কান গরম হয়ে গেছে। সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। ওই অবস্থাতেই সে আবার ক্যারিয়ারের উপর উঠে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা জয়রামপুরে এসে পড়ল। আয়ান সম্বিৎ ফিরে পেল। বাবু বলে উঠল, 'তোমার তো দারুন সাহস! ওই বনের মধ্যে একটা জানোয়ার যাচ্ছে।

আর তাকে তাড়া করছ?' আয়ান বুঝতে পারল যে, সে যে ভয় পেয়েছিল বাবু তা বুঝতে পারেনি। উল্টে তাকে খুব সাহসী মনে করেছে। আয়ান উৎসাহী হয়ে ওঠল, 'লাঠিটা পড়ে গিয়েছিল, তাই। না হলে দিতাম বসিয়ে এক বাড়ি।' সাইকেল চলতে থাকল। একসময় জয়রামপুর শেষ করে তারা মাঠের মধ্যে চলে এল। ক্রমে সেই পাকুড় গাছটা দেখা দিল। আয়ান এবার হাতের লাঠিটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল। কিন্তু হঠাৎ সাইকেলটা থেমে গেল। আয়ান দেখল বাবুর চোখ খানিকটা দূরে রাস্তার ওপরে। দেখল রাস্তার পাশে কি যেন একটা সাদা মতো বসে আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু নড়ছে। আয়ান বুঝতে পারে না, ওটা কি হতে পারে। বাবু তো বলছিল ওখানে একটা কালো বিড়াল থাকে। অবশ্য হঠাৎ হঠাৎই আকার বদলায়, কিন্তু সে তো একলা মানুষ পেলে— তারা তো দুজন আছে। বাবু বলল, 'দেখ তো, ওটা কি আছে!' আয়ান তো দেখতেই চায়। কিন্তু ওটা যদি সত্যি সেই কালো বিড়ালটাই হয়! তার গা শিউরে উঠল। কিন্তু একটু আগেই বাবু তাকে খুব সাহসী বলে মনে করেছিল। এখন সে না গেলে তো ভাববে ভীতু। সে এগুতে লাগল। কিন্তু ভয়ে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। তবুও যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল শুধু সে যে সাহসী এটা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু ওটার কাছে যেতেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে জোরে বলে উঠল, 'এটা একটা আকন্দ গাছ'। তখন বাবু এগিয়ে এল। তারা সাইকেলে চড়ে যেতে শুরু করল। খানিকক্ষণ পর তারা ডাড়ার ধারে চলে এল। ভৈরব নদী থেকে জল এই ডাড়া হয়ে বিভিন্ন বিলে যায়। আবার নদীর জল কমলে সেই সব বিলের জল এই ডাড়ার পথে নদীতে নামে। বাবু 'রামরতন' বলে ডাকতে একজন লোক ওদিক থেকে একটা নৌকা নিয়ে এল। তারা ডাড়া পার হয়ে ওপারে গেল। ওপারে একটুখানি গিয়েই বাড়ি পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত বাবুর বাড়ি। সেও প্রাণ ফিরে পেল।

দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে একজন মহিলা দরজা খুলে দিল। বাবু সাইকেলটা বাইরে রেখেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আয়ান ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে ঢুকল না। তার যেন কেমন সংকোচ হল। সেই ভদ্রমহিলা তার দিকে কিরকম করে তাকিয়ে আছে। আর তাকে তো বাড়িতে ঢুকতে বলেনি। সে কি করবে বুঝতে পারে না। বুঝতে না পেরে অস্বস্তি লাগে। সেই অস্বস্তি নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকল। দরজার পাশে দাঁড়ানো মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কে?' 'যে আমাদের জমি ভাগে চাষ করে তার ছেলে।' উত্তর পেয়ে মহিলা চলে যায়। আয়ান একা একা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ চাপা গলার কথাবার্তা তার কানে আসে। মহিলা বলছে, 'ও রাতে থাকবে কোথায়? যা অপরিষ্কার, সব নোংরা হয়ে যাবে।' আয়ানের খুব খারাপ লাগল। সে নিজের জামা-প্যান্টের দিকে তাকাল। সে তো কালই এগুলো সাবান দিয়ে কেচেছে। তাহলে মহিলা তাকে অপরিষ্কার বলছেল কেন? আবার চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আর বাড়িতে ঢোকালেই তো এটা-ওটা ছুঁয়ে দেবে।' আমি বাবা অতসব ধোয়াধুয়ি করতে পারব না।' পুরুষ-কণ্ঠ উত্তর দেয়, 'বাইরের ওই ঘরটায় থাকবে।' খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার মহিলা-কণ্ঠ, 'ওকে খেতে দিতে হবে তো?' সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরুষ-কণ্ঠ, 'দেওয়া তো উচিত।' 'তাহলে এখন আবার রান্না চড়াতে হবে। কিন্তু ঝি তো চলে গেছে।' 'তাহলে থাক, আর দরকার নেই।' 'রাতে না খেয়ে থাকবে?' 'ও ওদের অভ্যাস আছে,

কিছু হবে না।' 'কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি বলবে?' 'কাল সকালে কিছু খাইয়ে দিলেই হবে।' তারপর আর কোন কথা নেই। শুধু থালা-বাসনের ঠুনঠান শব্দ কানে আসতে লাগল। এমন সময় ঘাটের সেই রামরতন এসে বাড়ি ঢুকল। কি কথা হল আয়ান কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর সে দুটো ছেঁড়া বস্তা নিয়ে এসে বলল, 'চল'। আয়ান তার পেছন পেছন চলতে লাগল। পাশের একটা ঘরের বারান্দায় এসে সে বস্তা দুটো রেখে বলল, 'এখানে শুয়ে পড়।' এই বলেই সে চলে গেল। ওদিকে দরজা বন্ধের শব্দ হল।

আয়ানের চোখ ফেটে জল এল। তারা গরীব বটে, তবুও এভাবে সে কোনদিন রাত কাটায়নি। তারা মাটির ওপর শোয়, কিন্তু পাটি পেড়ে শোয়। পাটির ওপর কাঁথা পড়ে। তারপর শুয়ে গায়ে দেয় ধুকড়া। তার মা কাঁথার ওপর ছেঁড়া কাপড় লাগিয়ে লাগিয়ে মোটা করে দুতিনটে ধুকড়া তৈরি করেছে। তারা তাই গায়ে দেয়। খুব গরম হয়। কিন্তু শুধু দুটো বস্তার ওপর সে কি করে ঘুমুবে? পাকা মেঝেটা এমনি ঠাণ্ডা যে পায়ে ঝিম ধরে যাচ্ছে। এই মেঝের ওপর সে কি করে শুয়ে থাকবে? তাছাড়া তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। যখন যে স্কুল থেকে ফিরেছিল তখন রান্না শেষ হয়নি। তারপর বস্তা আনা, গরু বাঁধা এসব করতে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, খাওয়ার ফুরসত হয়নি। সে জানে অন্য লোকের বাড়ি গেলে নিজের বাড়ির থেকে ভালো খেতে দেয়। তাদের বাড়িতেও যখন কেউ আসে তাকেই সব থেকে ভালো খাবারটা দেওয়া হয়। তার ওপর বাবুরা তো বড়লোক। তাই সারাটা রাস্তা যখনই তার ভূতের ভয় একটু কম হয়েছে তখনই মনে হয়েছে যে আজ সে খুব ভালো ভালো খাবার খাবে। সে কথা মনে পড়তে তার আবার কান্না পেল। সে তো নিজে থেকে আসেনি। বাবুই তাকে পাহারা দেবার জন্য নিয়ে এসেছে। সে কত কষ্ট করে সারা রাস্তা এল। এরা এখন তাকে দুটো বস্তা দিয়ে এই পৌষ মাসের শীতের রাতে একটা ফাঁকা বারান্দা দেখিয়ে দিল! তাদের বাড়িতে গরু-বাছুরগুলোকেও এর থেকে ভালভাবে রাখা হয়। গরুগুলিকে ঘরে তুলে ঘর গরম রাখার জন্য সাঁঝাল জ্বেলে দেওয়া হয়। গরুগুলোর গায়ে বস্তার তৈরি ঝুল পরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি কুকুরটাকেও শোবার জন্য শীতের রাতে একটা বস্তা দেওয়া হয়। কুকুরটাকেও বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হয় না। তাহলে কি এই বাবুরা আয়ানের মত মানুষকে কুকুরের থেকেও নিচুস্তরের ভাবে! আয়ান আর ভাবতে পারল না। বস্তা দুটোকে জড়ো করে তার ওপরে বসল। কিন্তু হু হু করে উত্তুরে হাওয়া দিতে লাগল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। সে আর বসে থাকতে পারল না, রাগে দুঃখে অভিমানে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক করল সে রাতেই বাড়ি ফিরবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিশুবাগানের কথা মনে পড়ল। রাস্তার মধ্যেকার ঐ পাকুড় গাছটার কথা মনে পড়ল। যদি সামনে ভূত পড়ে! এক মুহূর্তের জন্য সে থামল। তারপর মনে করল, ভূত পড়ে পড়বে। ঐ ভূতগুলো নিশ্চয় এই বাবুদের থেকে খারাপ নয়।

আয়ান জানে জোরে জোরে ছুটলে শরীর গরম হয়, সে জোরে জোরে ছুটতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ডাঙার ধারে এসে পড়ল। সে দেখল অনেকগুলি নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু কোন মানুষ নেই। এবারে সে মুশকিলে পড়ল। এতক্ষণ একথাটা তার মনেই হয়নি। সে ভাবতে লাগল কি করা যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আসার সময় রামরতন বলে

ডাক দিতে একজন লোক এসেছিল। সে রামরতন বলে কয়েকবার ডাক দিল। নিস্তব্ধ ডাড়ার পাড়ে একটা গম্‌গমে প্রতিধ্বনি হল। কিন্তু কেউ এল না। এখন সে ভাবতে লাগল কোন নৌকা খুলে সে পার হবে কি না। ছাগলখালির বিলে সে অনেক নৌকায় চড়েছে। 'বাহিচ'ও খেলেছে। কিন্তু এই রাতে অপরিচিত স্থানে লোকের নৌকায় চড়তে তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। তার ভয় হল নৌকাটায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওটা ডুবে যায়! যদি নৌকায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোর বলে কেউ এসে তাকে পেটাতে শুরু করে! একবার ভাবল, তার থেকে সকাল পর্যন্ত বসে থাকাই ভালো। হাওয়া থাকলেও জলের কাছে বলে জায়গাটা কম ঠাণ্ডা। কিন্তু একটুখানি বসে থেকেই তার বিরক্তি ধরে গেল। আর রাত হয়েছে বলেই কি রকম ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। আয়ান হঠাৎ একটা নৌকায় উঠে বসল। তারপর লগিটা তুলে নিয়ে ঠেলতে লাগল। কিন্তু নৌকাটা এদিক-ওদিক করতে লাগল। তীর থেকে নড়ল না। মনে হল কে যেন নৌকাটাকে ডাঙ্গার দিকে টেনে ধরে আছে। আয়ানের হঠাৎ তলশুশুর কথা মনে পড়ে গেল। তলশুশুতে ধরলে নাকি একেবারে তলিয়ে নিয়ে চলে যায়। সে তড়াক্ করে ডাঙ্গায় লাফ দিল। ঠাণ্ডায় শক্ত মাটির উপর তার পায়ে খুব ব্যথা লাগল। সে নৌকাটার দিকে তাকাতে লাগল। না, ওটা ডুবছে না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল যে আরেকটা খুঁটির সঙ্গে নৌকাটা বাঁধা আছে। সে কেবল লগিটা তুলেছে। কিন্তু খুঁটির বাঁধন খোলেনি। তার ভয় কেটে গেল। সে এবার নৌকায় উঠে বাঁধনটা খুলে দিল। তারপর ঠেলা দিতেই নৌকা চলতে লাগল। কয়েকটা ঠেলা দিতেই সে ডাড়ার ওপারে পৌঁছে গেল। এবার লগিটা পুঁতে সে নৌকাটা বাঁধল। তারপর লাঠিটা হাতে নিয়ে চলতে শুরু করল। আশ্চর্য, এখন আর তার তেমন ভয় করছে না। মনে হচ্ছে সে যেন রাজপুত্তুর। ঝড়ে তার সপ্তডিঙা ডুবে গেছে। সঙ্গী-সাথী সব মরে গেছে ; শুধু সে বেঁচে আছে। চলেছে রাজকন্যার সন্ধানে। আর একটু এগুলেই যেন সেই রাজপুরী। যেখানে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। আচ্ছা, রাজকন্যা দেখতে কিরকম হয়? রাজকন্যারা কি কল্পনার মতো হয়? কিন্তু কল্পনা তো শ্যামলা, অত ফরসা নয়। আয়ান শুনেছে রাজকন্যারা দুধের মত ফুটফুটে ফরসা হয়।

সেই ফুটফুটে ফরসা রাজকন্যা শুয়ে আছে সোনার পালঙ্কে। তার মাথার দিকে সোনার কাঠি আর পায়ের দিকে রূপোর কাঠি। বদল করে দিলেই রাজকন্যা জেগে উঠবে। আচ্ছা, রাজকন্যা জেগে উঠলে আয়ান কি করবে? রাজকন্যাদের নিয়ে কি করে? খেলা করে! রাজপুত্তুরটা কি বোকা না! খেলার সাথী তো পাড়াতেই পাওয়া যায়। স্কুলেই পাওয়া যায়। তাহলে অত দূরে যাওয়া কেন? আয়ান কখনও ওরকম করবে না। সে বাড়ি ফিরবে।

আকাশে ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। অন্ধকার আর নেই। যেদিকেই তাকনো যায় এখন অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যেখা যায় সেই পাকুড় গাছটাও। কিন্তু আয়ানের আর তেমন ভয় লাগে না। চারিদিকে একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা। হঠাৎ করে মাঠের মধ্যে একটা হট্টিটি ডেকে উঠল। সেই ডাকটার রেশ অনেকক্ষণ ধরে আয়ানের কানে বাজতে লাগল। যখন রেশটা কেটে গেল আয়ান দেখল সে পাকুড় গাছটাকে পিছনে ফেলে এসেছে। সামনে জয়রামপুর গ্রাম দেখতে পেয়ে সে একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু গ্রামে তখন আর কেউ জেগে নেই। কেবল কয়েকটা কুকুর তাকে দেখে তাড়া করে এল। কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে পিছু পিছু এল। তারপর গিয়ে

আবার গোল হয়ে শুয়ে পড়ল। শুধু একটা খেকী কুকুর তার পিছু ছাড়ল না। খানিকটা পেছনে সরে যায়। আবার ঘেউ ঘেউ করতে করতে আসে। এই করতে করতে আয়ান শিশুবাগান পার হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কুকুরটা আর এল না । আয়ানের হঠাৎ যেন মনে হল পেছনের দিকে একটা গরু দৌড়ানোর মত শব্দ হচ্ছে। এবার আয়ানের ভয় করতে লাগল, সেই গোদানুটা নয় তো? সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে পারল না। যদি তাকাতেই ওটা চোখে পড়ে! মনে হল যেন শব্দটা তার কাছে চলে আসছে। সে আরও জোরে হাঁটতে লাগল। হ্যাঁ, এবার তাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। এবার জোরে ডাকলে মা'ও শুনতে পাবে। আয়ান এবার একটু ভরসা পেল। কিন্তু সে বাড়ির দিকে যেতে শব্দটা তার পেছনে পেছনে বাড়ির দিকে এল। সে বাড়ির কাছে এল, ফিরে দেখল তার পেছনে তাদের কালো বলদ, তার 'কালু'। গলায় তখনও দড়ি ঝুলছে। অর্থাৎ শিঙে করে দড়ি খুলে ফসল খেতে গিয়েছিল। আয়ান গিয়ে কালুর গলায় হাত দিল। কালু তার গায়ে মুখ ঘসে কি বলতে চাইল। আয়ান ওকে নিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকল।

গোয়ালে কালো বলদটাকে বেঁধে আয়ান উঠোনে এল। দেখল সকলেই ঘুমিয়ে আছে। মা-মা করে কয়েকবার ডাকতেই সালমা ধড়মড় করে উঠে পড়ল,' 'কে রে, আয়ান! তুই চল্যা আস্যাছিস? একলা একলা তোর ভয় করলো না?' আয়ান বলল, 'ভয় কিসের? আমার কাছে তো লাঠি ছিল।' সালমা ছেলের কথা শুনে থ হয়ে যায়। ওদের কথা শুনে ইব্রাহিমও উঠে পড়ল। আয়ান মাকে বলল তার খুব খিদে পেয়েছে। মা ভাত বেড়ে দিল। আয়ান খেয়ে শুয়ে পড়ল। সকালে যখন উঠল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আয়ান স্নান-খাওয়া করে স্কুলে ছুটল। একটু পরেই আর সকলে এসে গেল। আয়ান গতকাল রাতের ঘটনাটা শিশিরদাকে বলল। আয়ান দেখল, শুনতে শুনতে শিশিরদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তার কথা শেষ হলে শিশিরদা বলল, 'বড়লোকেরা আমাদেরকে ওরকমই ঘৃণা করে। এসবের বিরুদ্ধেই তো আমাদের সংগ্রাম। আর সেজন্যই আজকের স্ট্রাইক।' আয়ানও উৎসাহিত হয়ে উঠল। স্ট্রাইক করার জন্য তার মনে যে সামান্য সংকোচ ছিল তা দূর হয়ে গেল। সে স্বপনের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল স্কুল গেটের একটু দূরে, জনকল্যাণ সমিতির পাশে। সাড়ে দশটার সময় বেশি করে ছেলেমেয়ে আসতে শুরু করতেই স্বপন বক্তৃতা শুরু করল। স্বপনের পরেই বলতে শুরু করল আয়ান। সে চিৎকার করে করে বলতে লাগল— মানুষের ওপরে মানুষের অত্যাচারের অবমাননার বিরোধিতা করি। আজ ইস্রায়েল যা করেছে, আমরা যদি তার প্রতিবাদ না করি তাহলে এই নগ্ন অত্যাচার বেড়েই যাবে। আজ আক্রমণ অন্যের ওপর হয়েছে বলে যদি বসে থাকি, কাল আক্রমণ আমার ওপর হবে। তাই এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। আর তারই জন্য আসুন আমরা আজকের স্ট্রাইক সফল করে তুলি। আয়ান বক্তৃতা বন্ধ করতেই হাততালি পড়তে লাগল। শিশিরদা তার পিঠে সাবাস বলে একটা চাপড় দিল। তারপর নিজে গিয়ে বলতে লাগল। ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ি ফিরে গেল। কেউ স্কুলে ঢুকল না। আয়ানও বাড়ি রওনা হল।

এগারো

মালেক বিশ্বাসের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। এখন সে আর একদম নড়াচড়া করতে পারে না। শুধু হু হু করে কাঁদে আর সবাইকে দেখতে চায়। আয়ানকেও নাকি দেখতে চেয়েছে। আয়ান 'যাব' বলে এসেছিল। কিন্তু আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ এক পা দুপা করে সে মিলিদের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। মিলি আয়ানদের সঙ্গে পড়ত। কিন্তু একবার ফেল করে এখন তার এক ক্লাস নিচে পড়ে। এবার সে বালিকা বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়েছে। আয়ানকে দেখে মিলি ওর কাছে এল। আয়ান বলল, নানার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু মিলি যেতে রাজী হল না। তার শরীর খারাপ বলে এখন নাকি কেউ তার কাছে যায় না। তাই কাউকে কাছে পেলে সে আর ছাড়তে চায় না। তাই মিলি কিছুতেই গেল না। আয়ান ঘরটা জানত। তাই একা একাই গেল। কিন্তু ঘরের কাছে গিয়েই তার দম বন্ধ হয়ে এল। সমস্ত ঘরটায় বিশ্রী রকমের আঁশটে গন্ধ। আয়ান কোনরকমে দরজার কাছে এল। দেখল, মালেক বিশ্বাস পড়ে আছে। পড়ে আছে একটা প্লাস্টিকের সিটের ওপর। পরনের কাপড়ে এবং দু পায়ে পায়খানা লেগে আছে। তাতে ভন্ ভন্ করে মাছি বসছে। মশারি হয়ত একসময় খাটানো হয়েছিল, সেটা একপাশে পড়ে আছে। সমস্ত শরীর নিস্তেজ। শুধু চোখ দুটো পথের দিকে যেন তীরের মতো ছুটে আসছে। আয়ানকে দেখেই সে বাচ্চা ছেলের মতো হু হু করে কাঁদতে লাগল। আয়ানের কিরকম খারাপ লাগছিল। বিছানার কাছে যেতেও তার মন চাইছিল না। বিশ্রী রকমের ভ্যাপসা গন্ধ। তবু তাঁর কান্না দেখে আয়ানের মায়া হল। সে গিয়ে তার মাথার কাছে বসল। মাথায় হাত রাখল। মালেক বিশ্বাস আরও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কান্নার পর সে যেন কি বলতে চাইল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ক-অ-অ, অ-অ-অ একরম একটা শব্দ হল। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। যা শব্দ হল তা থেকে আয়ান কিছুই বুঝতে পারল না। সে আবারও চেষ্টা করল। কিন্তু আয়ান বোকার মত চেয়ে থাকল— কিছুই বুঝতে পারল না। সে আরও কয়েকবার বলার চেষ্টা করল। কিন্তু আয়ান কিছুতেই বুঝতে পারল না। তখন সে অসহায়ের মতো আবার দরজার দিকে তাকাতে লাগল। আয়ান খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে আসতে গেল। কিন্তু মালেক বিশ্বাস আবার এমনভাবে কাঁদতে লাগল যে, তার ওঠা হল না। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর একটা প্লাস্টিকের সিট আর একবালতি জল নিয়ে এল মিলির মা। আয়ান দেখল, মিলির মার শরীরটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। মুখটা বিপন্ন, চোখ দুটো বসা। মিলির মা আয়ানকে দেখে বলল, 'তুই কখন এসেছিস?' আয়ান বলল, 'খানিকক্ষণ আগে। উঠতে যাচ্ছিলাম তো নানা আবার কাঁদতে লাগল। তাই একটু বসে আছি।' মিলির মা বলল, 'ওই হয়েছে। কেউ আর আসে না তো। আমিও সবসময় থাকতে পারি না। তাই কাউকে পেলে আর ছাড়তে চায় না।' আয়ান বলল, 'তাহলে আমি এখন আসি।' আয়ান উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মালেক বিশ্বাস আবার কি যেন বলতে গেল। তার স্ত্রী আয়ানকে একটু দাঁড়াতে বলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ?' মালেক বিশ্বাস কি বলল। সেটা শুনে নিয়ে মিলির মা তার দিকে ফিরে বলল, 'তাকে পড়াশুনা করতে বলছে।' আয়ান একটু আশ্চর্য হল। এই মুমূর্ষু লোকটির

কাছ থেকে আয়ান এরকম উপদেশ আশা করেনি। আর এই কথাটিই নিশ্চয় সে তাকে এতক্ষণ এতবার করে বলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আয়ান বুঝতে পারেনি। তাহলে তো মালেক বিশ্বাস তাকে গুণ-ভাগ শেখানোর কথা ভোলেনি। কি কষ্ট লোকটার, যা বলতে চায় তাও বলতে পারে না। মালেক বিশ্বাসের কষ্টের ছোঁয়া আয়ানের মনটাকেও ছুঁয়ে যায়। সে মাথা নাড়ে। সে পড়াশোনা করবে। মালেক বিশ্বাস আবারও কি বলে ওঠে। মিলির মা আয়ানের দিকে ফিরে বলল, 'বিসস্যাস ওকে মাফ করে দিতে বলছে।' আয়ান বুঝতে পারে না যে তার সাথে মালেক বিশ্বাস কি অপরাধ করেছে যে সে মাফ্ করবে! কিন্তু সে কথা সে বলতে পারে না। বলে, 'মাফ্ করে দিলাম'। ভাবে তাতেও যদি সে একটু শান্তি পায়, পাক না! এরপর মিলির মা কাপড় পাল্টে দেবার জন্য বাক্স থেকে একখানা কাপড় বের করল। আয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার মনটা ভারী হয়ে থাকল। তার মনে পড়তে লাগল মালেক বিশ্বাসের আগেকার জীবনের কথা। সে যখন বৈঠকখানায় বসত পাড়ার বিভিন্ন লোক এসে জুটত তার সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য। কেউ আসত জমির কাগজ দেখাতে। কেউ বা আসত চিঠি পড়াতে। কেউ আসত তার পরামর্শ চাইতে। আবার অনেকে তার সাহায্য চাইতেও আসত। আয়ানও তার কাছে গুণ আর ভাগ শিখতে এসেছিল। তখন তাকে একটুখানি ফাঁকা পাওয়া মুশকিল ছিল। আজ সেই একই লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। কেউ তাকে দেখতেও আসে না। অন্য লোকের কথা দূরে থাক। তার নিজের মেয়েও তার কাছে যেতে চায় না। তাকে এখন সবাই এত ভালবাসে, কিন্তু তার এরকম অসুখ হলে তার কাছেও তো কেউ যাবে না। যাবেই না তো। সে তো মাত্র দুবার মালেক বিশ্বাসকে দেখতে এসেছে। না, সে এরকম চায় না। সে এমন কিছু চায় যাতে সব লোক ভালো হয়ে যায়। মালেক বিশ্বাস তার কাছে মাপ চাইল। সকলের কাছেই নাকি চাইছে। তার মানে তার নিজেরও ধারণা তার পাপের জন্যই এরকম হয়েছে। পাপ করলে কি এরকম হয়! সে কোনদিন পাপ করবে না। কিন্তু হেমন্তবাবু তো বলেছিলেন যে, এটা একটা অসুখ। পাপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তা হোক, তবুও আয়ান কোন পাপ করবে না।

মিলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আয়ান আস্তে আস্তে ঝিলের ধারে গেল। জল এখন অনেকটা কমে এসেছে। তবে শুকিয়ে যায়নি। আয়ান একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে পড়ল। একটা বক চুপ করে বসে আছে। পানকৌড়িটা কিন্তু বার বার ডুব দিয়ে আবার উঠছে। বাতরাজের ওপর একটা জলপিপি চড়ে বেড়াচ্ছে। আরও দূরে চা পাখিটা ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে কাদা খোঁচাচ্ছে। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে তালগাছটার মাথার ওপরে নেমে এসেছে। কয়েকটা পাখি ক্লান্ত পাখা মেলে পেছনের বাঁশঝাড়ের দিকে যাচ্ছে। আয়ানের কাছে সবই যেন কেমন ভাসা ভাসা লাগছে। কিছুই তার মনে দাগ কাটছে না। তার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে মালেক বিশ্বাসের কথা আসছে। এমন সময় সে দেখল তাদের পাড়ার পাগলী আল্লাকে গাল দিতে দিতে এ রাস্তায় আসছে। বুড়িটার বয়স আশি-পঁচাশি বছরের কম হবে না। জগতে তার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। ওর নাকি আটটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। এখন একজনও বেঁচে নেই। কেউ ছোট থাকতে মরেছে। কেউ বিয়ে হবার পর মরেছে। কিছুদিন হল তার স্বামীও মারা গেছে।

তার বাবা-মা অনেকদিন আগে মারা গেছে। ভাইবোনও কেউ নেই। অথচ সে মৃত্যু চেয়েও পাচ্ছে না। তাই যখন মন ভালো থাকে, ভিক্ষে করে। একবেলা রেঁধে বেড়ে খায়। যখন মেজাজ খারাপ হয়, তখন আল্লাকে গাল দেয়। এখনও দিচ্ছে। 'মুখপুড়া আল্লার মুখে আগুন। মুখপুড়া আমার থাক্যাও কানা। চোখে কিছু দেখতে পায় না। আমার জুয়ান জুয়ান ব্যাটাগ্যালাকে মালো। আর আমি যে গু ঘাটছি মুখপুড়া, কানা আমাকে দেখতে পায় না।' আয়ান বুঝতে পারে আল্লার ওপর পাগলী আজ খুবই চটেছে। জগতে আর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার তার কিছু নেই। একটা লাঠি ঠুক ঠুক করে মাটিতে ঠুকে সে হেঁটে চলেছে। সে নাকি চোখে দেখতে পায় না। তবে লাঠি হাতে করে সে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়াতে পারে। তাই দেখে কেউ কেউ সন্দেহ করে বলে, 'দেখতে পায় না, ওকথা ঠিক নয়। আসলে পাগলী চোখে ভালই দেখতে পায়।' সেকথা সে শুনতে পেলেই পাগলী রেগে আগুন হয়ে ওঠে, 'তোর যেন আমার মতোই হয়।' যে বলে তার বাবা-মা তখন ভয়ে শিউরে ওঠে, 'পাগলী, ও ছেলেমানুষ। কিছু বুঝে না, কিছু মনে করো না।' সবারই ধারণা পাগলী মুখে যা বলে তাই হয়। তাই পাগলী ভিক্ষে করতে গেলে কেউ তাকে ফেরায় না। যার বাড়িতে যা থাকে তাই দেয়। পাগলীও তাদের সাতরাজার মা হওয়ার আশীর্বাদ করে চলে যায়। সেটা অবশ্য কারও ক্ষেত্রেই ঠিক হয় না। তবু কেউ ভিক্ষে দিলেই পাগলী আশীর্বাদ করে। তারপর বাড়ি ফিরে রান্না করে খায়। আর বিরক্ত হলেই আল্লাকে গাল দেয়। এখনও দিতে দিতে আসছে। আয়ানের মনে হল সে বোধহয় 'মাঠের দিক' বসবে। এখন এখানে বসে থাকা ঠিক নয়। সে উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। তার মনে হতে লাগল পাগলীর বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই। তার নিজেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। তবুও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আর কষ্ট পাচ্ছে। আয়ানের ভালো লাগে না।

বাড়িতে এসে হাত মুখ-ধুয়ে খেতে বসতেই মা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি হয়েছে রে? মুক ক্যানে শুকন্যা লাগচে?' আয়ান মাথা নাড়ল। না, তার কিছু হয়নি। কিন্তু মা সন্তুষ্ট হল না। 'কদিন থাক্যাই দেখছি, তুই কোন কথা বলিস ন্যা। সব সময় ধন্দ হয়ে থাকিস।' আয়ান কোন কথা বলে না। তার কথা বলতে ভালো লাগে না। সে ভেবে পায় না মালেক বিশ্বাসের কথা কি করে বলবে। সে ভেবে পায় না পাগলীর কথা কি করে বলবে। তাই তার মার কথার সে উত্তর দিতে পারে না। চুপচাপ ভাত খেয়ে নিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তেও ভালো লাগে না। আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে ওই সব কথা ভাবতে থাকে।

তারপর ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেও জানে না। হঠাৎ মায়ের হৈ হৈ করে তারস্বরে চিৎকার শুনে আয়ান জেগে উঠল। উঠেই ঘুম ঘুম চোখে দেখল একটা লোক পালাচ্ছে। পালাতে গিয়ে বেড়ার কাছে সে একবার পড়ে গেল। কিন্তু উঠেই সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে গেল। মায়ের চিৎকার শুনে তার বাবা ইব্রাহিমও দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। ইস্রাফিলের দুন্যা লাগান কেউ ফেরত দেয়নি। তার ফলে সে ভেঙে পড়েছিল। সে লোকের কাছে বার বার গেছে। কিন্তু ধার শোধ করা তো দূরের কথা, অনেকেই তার ধার অস্বীকার

করেছে। ফলে সে ক্ষেপে গেছে। কিন্তু যে কথা তার মনে হয়েছিল তা সে বলতে পারেনি। তবে বলেছে এ সবই ওই ইব্রাহিমের জন্যই হয়েছে। ইব্রাহিমই নাকি সকলকে ফুসলিয়ে তার ক্ষতি করেছে। অতএব সে ঠিক করেছে ইব্রাহিমকে খুন করবে। লোকের মুখে একথা শোনার পর থেকে সালমা ইব্রাহিমকে বাইরে শুতে দেয় না। ঘরের মধ্যে শুয়ে হুড়ক্যা লাগিয়ে দিতে বলে। আজও ইব্রাহিম ওইরকম করেই শুয়েছিল। তার স্ত্রীর চিৎকার শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেই সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?' সালমা একটু দম নেওয়ার মত করে উত্তর দিল, 'ওই ইস্রা আস্যাছেলো। একহাতে হাঁস্যা আর একহাতে গাড়শা। চালের বাতা ধরে উপোরে উঠছিলো। হ্যাঁস্যা আর গাড়শা একহাতে লিতেই শব্দ হয়েছে। আর তাথেই আমার ঘুম ভাঙ্যা গেলছে। না হোলে এতোখুন'— সালমা আর বলতে পারে না। আয়ানের কাছে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়। সত্যিই তো তার মা না জেগে গেলে আজকে কি হত! ইব্রাহিম যেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারে না। সে ফ্যালফেলে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। সালমার চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে মেয়ে-মরদ সবাই এসে হাজির হয়েছে। তারা সালমার কথা শুনে কেউ বলল, 'তা হোতে পারে। ইস্রা ম্যালাদিন থ্যক্যাই বলছেলো'। কেউ কেউ বলল, 'এই সাঁজের বেলায়! আমার ভাই বিসস্যাস হচ্ছে না।' কেউ আবার ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ইস্রাইলের কাছেই গিয়ে হাজির হল। ইস্রাইল তখন জেগেই ছিল। সামেদ তাকে জিজ্ঞেস করল। প্রথমে সে কিছুক্ষণ কিছু বলল না। তারপর আপন মনেই বলে উঠল, 'গেলছুনু তো। কিন্তু মাগী জাগ্যা ছিলো।' তার মুখে এরকম কথা শুনে সকলেই অবাক। কাউকে খুন করতে গিয়েও যে কেউ এরকমভাবে বলে তা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কিন্তু সবাই এবার সালমার কথা বিশ্বাস করল। অনেকেই ইব্রাহিমকে বলল, 'থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি কর।' সালমারও সেই মত। কিন্তু ইব্রাহিম কিছুতেই রাজি হল না। সে বলল, 'বাবজী মরার সুমায় আমার হাতে দিয়্যা গেলছে। আমি কি কোর‍্যা ধোরিয়্যা দিবো? আর ধোর‍্যা লিয়্যা গেলে তো তখুন আমাকেই ছাড়াতে যাতে হবে। তাহোলে ধোরিয়্যা দিয়্যা কি হবে?' ইব্রাহিমের প্রশ্নের কোন উত্তর কেউ দিতে পারেনি। শুধু সালমা বলেছে, 'তুমার ভাইরা যখুন কেহ তুমার দিকে তাকাবে না, তুমি ক্যানে উয়্যাধের দিকে তাকাবা? উরা তুমাকে কাট্যা ফ্যালাবে, আর আমি দুয়্যারে দুয়্যারে ভিক্ক্যা কোর‍্যা ব্যাড়াবো?'

ইব্রাহিম সালমার কথার কোন উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু সে থানায়ও যায়নি। শুধু এবার বলে নয়। কোনও দিনই নিজের কোন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সে অন্য লোকের কাছে যায়নি। সেবার তার ছোট ভাই যখন মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিল তখনও সে থানায় যায়নি। সেদিনের কথা মনে হলে এখনও আয়ানের ভয়-ভয় করে। ইব্রাহিম সেদিন সফিদের ভুঁইয়ে লাঙ্গল জুড়েছিল। ভিন্ন হওয়ার সময় ওই জমিটার পূর্বদিকই তার ভাগে পড়েছিল। কিন্তু কেউ ইসমাইলকে বুঝিয়েছিল যে, জমির পূর্বদিকটার ফসল ভাল হয় বলে ইব্রাহিম নিয়েছে। আয়ান তখন তার বাবার কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। ইসমাইল কোথা থেকে এসে

বলল, 'পুবদিক আমাকে দিতে হবে।' ইব্রাহিম বলল, 'তুরাই ভাগ কোর‍্যা দিয়েছিস। চাষ দ্যাওয়া হয়্যাছে। এখন বোলল্যা তো হবে না।' কিন্তু ইসমাইল সে কথা শোনেনি। আবার বলেছিল, 'আমি ওসব কিছু জানি ন্যা। আমাকে পুবদিক দিতে হবে।' ইব্রাহিম ধমক দিয়েছিল, 'বেশি চিল্লাশ ন্যা, বাড়ি যা। পুবদিক তুই পাবি ন্যা।' যেই বলা ইসমাইল তার জামার মধ্য থেকে একটা কাঠের রুল বার করে ইব্রাহিমের মাথায় কয়েকটা বাড়ি বসিয়ে দিল। ইব্রাহিম মাথায় হাত দিয়ে লাঙ্গলের পাশেই বসে পড়ল। আয়ান চিৎকার করে উঠল। ইসমাইল সেই অবসরে বাড়িতে পালিয়ে গেল। আয়ানের কান্নাকাটিতে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। ইব্রাহিমকে ধরে বাড়ি আনা হল। ডাক্তার এল। মাথায় সেলাই পড়ল। ইন্‌জেকশন দিতে হল। লোকে বলল, 'থানায় যাও।' কিন্তু ইব্রাহিম কিছুতেই গেল না। উপরন্তু মারও খেল, জমিটাও ছোট ভাইকে দিয়ে দিল।

অবশ্য ইসমাইলের কাছেও সে জমি বেশিদিন থাকল না। সে ভালো আবাদ করতে পারছে না বলে সফিরা জমিটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য লোককে ভাগে দিয়ে দিল। জমিটা নিজে রাখতে পারল না। কিন্তু সেই জমির জন্য ইব্রাহিমের মাথা ফাটিয়ে দিল। ইব্রাহিম মার খেল। কিন্তু থানায় গেল না। সে আজও গেল না। আয়ান বুঝতে পারে না, তার বাবা যেটা করছে সেটা ঠিক, না তার মা যা বলছে সেটা ঠিক। শুধু এটুকু বুঝতে পারে ঘটনাক্রমে তার মায়ের ঘুম ভেঙে না গেলে আজ কি হত কিছুই বলা যায় না। উৎকণ্ঠায়, অস্বস্তিতে আয়ান আর শুতে পারে না। শুতে পারে না ইব্রাহিম আর সালমাও। পাড়া-পড়শীরা সকলেই আস্তে আস্তে চলে যায়। আয়ানরা বসে থাকে। আয়ানের মা ঘর থেকে ফালাটা বের করে ঘষতে থাকে— 'এবার এলে মেরেই ফেলব।' ইব্রাহিম কোন কথা বলে না। শুধু আস্তে করে বলে, 'তুরা শুয়্যা পড়।' আয়ানের ভাইবোনেরা যারা হৈ-হুল্লাতে উঠে বসেছিল, তারা শুয়ে পড়ে। কিন্তু আয়ানরা তিনজন আর শুতে পারে না।

জেগে থাকতে থাকতে একসময় রাতের আঁধার শেষ হয়ে যায়। পুবের আকাশ ফরসা হয়ে ওঠে। আরেকটা নতুন সূর্য ওঠে। কিন্তু আয়ানের মনের আঁধারের শেষ হয় না। মনের আকাশটা শান্ত হয়ে শান্তির সূর্যের জন্ম দেয় না। তার শুধুই মনে হয় দুনিয়াটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মানুষগুলো খারাপ হয়ে গেছে। ভালো হওয়া দরকার। আয়ান ভালো হতে চায়। কিন্তু সে জানে না, কি করে ভালো হতে হয়। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা যায়, মালেক বিশ্বাস মারা গেছে। তার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'মৌলুদ' হবে। এক মৌলবী সাহেব এসেছেন ধর্মকথা আলোচনা করতে। আয়ান মৌলুদ শুনতে যায়। মৌলবী সাহেবের কথা তার খুব ভালো লাগে।

একজন লোক এসেছে হজরত মহম্মদের কাছে। সে বলছে— আমি চুরি করি, রাহাজানি করি, ব্যাভিচার করি, মিথ্যা কথা বলি— সব করি। আমি আপনার শিষ্য হব। তবে এসব ছাড়তে পারব না। মহম্মদ খানিক ভাবলেন। তারপর বললেন— আমি তোমাকে শিষ্য করতে পারি। তুমি সব করতে পারবে। কিন্তু আমার শিষ্য হওয়ার জন্য একটা জিনিস তোমাকে ছাড়তে হবে।

লোকটি শুনে খুব খুশি হল। একটা ছাড়তে হবে। এটা আবার এমন কি কঠিন ব্যাপার। সে রাজি হয়ে গেল। বলুন, আমাকে কি ছাড়তে হবে? মহম্মদ বললেন— তোমাকে মিথ্যা কথা বলা ছাড়তে হবে, সব সময় সত্যি কথা বলতে হবে। লোকটি কথা দিল যে সে সব সময় সত্যি কথা বলবে। মহম্মদ তাকে শিষ্য করে নিলেন। লোকটি বাড়ি গিয়ে ভাবল, আজ রাতে চুরি করতে যাবে। কিন্তু তখনই তার মনে হল যে, তাহলে তার গুরু মহম্মদকে চুরির কথা বলতে হবে। সে চুরি করতে যেতে পারল না। পাড়ার একটি মেয়েকে তার ভালো লেগেছিল। সে ঠিক করল যে, আজ রাতে চুপিচুপি তার কাছে যাবে। কিন্তু যখনই তার মনে পড়ল যে, তাহলে তার গুরুকে সে কথা বলতে হবে। তখন সে আর যেতে পারল না। এইভাবে সে আর কোনরকম অন্যায় কাজই করতে পারল না। কালক্রমে সে মহম্মদের একজন খুবই বিশ্বস্ত শিষ্য হয়ে গেল। আয়ান মহম্মদের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। মৌলবী সাহেব বললেন— দুনিয়াতে যে এত মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে, তার কারণ মানুষ অধার্মিক হয়ে গেছে। মানুষ ধার্মিক হলে একদিকে যেমন দুনিয়ায় মারামারি, কাটাকাটি, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট থাকবে না, অপরদিকে পরকালে হবে স্বর্গলাভ। ধার্মিক মানুষ যাবে বেহেস্তে। আর অধার্মিক লোকের হবে অনন্ত নরক ভোগ। অধার্মিক লোক যাবে জাহান্নাম। মৌলবী সাহেব বেহেস্তেরও একটা সুন্দর বর্ণনা দিলেন। সেখানে গাছে গাছে সুন্দর সুন্দর ফুল। সেখানে শাখায় শাখায় রসালো ফল। আর সে ফল পাড়ার জন্য আপনাকে গাছে উঠতে হবে না। আপনি যখনই ইচ্ছে করবেন ফল নেমে আসবে আপনার কাছে। সেখানে সব সময় সুগন্ধযুক্ত বাতাস বয়। পুবের হাওয়া। সেখানটা সব সময় আলো ঝলমল করে। সেখানে চির বসন্ত বিরাজ করে। সেখানে আপনার যৌবন চিরকাল বজায় থাকে। আর আপনি যদি নারী হন, সেখানে আপনার পছন্দমতো পুরুষ পাবেন। আপনি যদি পুরুষ হন, আপনার মনমতো হূরী পাবেন। তারা পরীদের থেকেও সুন্দর। তারা চিরযৌবনা। আপনি যা চাইবেন তারা তাই করবে। আয়ান ঠিক করল, সে ধার্মিক হবে। মৌলবী সাহেব বললেন— ধার্মিক হতে হলে আল্লার উপর বিশ্বাস আনতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, রোজা করতে হবে এবং সাধ্য থাকলে হজ করতে হবে আর জাকাত দিতে হবে।

আয়ান নামাজ শিখতে লাগল। আল্লায় বিশ্বাস তার আগে থেকেই ছিল। বাড়ির লোকের দেখাদেখি সে রোজাও করত। তার টাকা-পয়সা নেই। কাজেই তার পক্ষে হজ বা জাকাতের প্রশ্নই ওঠে না। তাই সে নামাজ শিখতে লাগল। নামাজ শেখার জন্য সে গিয়ে হাজির হল ইমাজুদ্দিনের কাছে। ইমাজুদ্দিন তাকে কি করে নামাজ পড়তে হয় বলে দিল। সে আগেই কোরান পড়া শিখেছিল। স্কুলে ইংরেজি পড়া শেখার পর সে যখন ইংরেজি পড়ে বুঝতে পারত, তখন তার অন্য ভাষা শেখারও ইচ্ছে হত। সেই সময় মাঠপাড়ার রেজেল তাদের পাড়ায় দেদার বক্সের বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলায় আরবী পড়া শেখাত। অবশ্য তার স্কুলে ছেলের থেকে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ছেলেরা সারাদিন নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু মেয়েদের কাজ সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলাই শেষ হয়ে যেত। কারণ বাঘডাঙ্গায় রাতের রান্না-খাওয়া

সূর্য ডোবার সময়ই শেষ হয়ে যায়। তাই মা-বাপেরা ওই সময় মেয়েদের রেজেলের কাছে আরবী শিখতে পাঠাত। আয়ানের পরের বোন সুফিয়াও এখানে পড়তে আসত। আরবী শেখার লোভে আয়ানও এসে জুটেছিল। ছেলের আরবী পড়ার আগ্রহ দেখে বাবা-মা খুশি হয়েছিল। খুশি হয়েছিল গ্রামের লোকজনেরাও। তারা একবাক্যে স্বীকার করেছিল যে, ইংরেজি পড়লেও এ ছেলেটা নষ্ট হয়নি। রেজেলও খুব খুশি হয়েছিল আয়ানের মতো স্কুলে পড়া ছাত্র পেয়ে। সে খুব আগ্রহ সহকারে শেখাতে শুরু করেছিল— আলেপ, বে, তে। আয়ান সমান আগ্রহে দুলে দুলে পড়তে শুরু করেছিল আলেপ দু জবার আন, আলেপ দু জের ইন, আলেপ দু পেশ উন, আন, ইন, উন। ফলে মাস খানেকের মধ্যেই তার অক্ষর পরিচয় ও স্বরচিহ্নগুলির সম্বন্ধে ধারণা হয়ে গিয়েছিল। সে কোরান পড়তে পারছিল। কিন্তু কোরান পড়তে তার ভালো লাগত না। কারণ রেজেল শুধু কি করে পড়তে হয় তাই জানত। কি করে অর্থ করতে হয় জানত না। ইংরেজি পড়তে আয়ানের ভালো লাগত। কারণ সে তার অর্থ বুঝতে পারত। এমনকি ইংরেজিতে সে তার নিজের কথাও বলতে ও লিখতে পারত। কিন্তু আরবীর সে মানেই বুঝতে পারত না। তাই মাসখানেকের মধ্যেই সে আরবী পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তার সেই আরবী পড়াটা কাজে লাগল। কারণ— কোরান পড়তে গিয়ে তার অনেকগুলি সুরা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নামাজ পড়ার জন্য তাকে আর আলাদা করে সেগুলি মুখস্থ করতে হল না। সে একটা নামাজ শিক্ষার বই কিনে নিল। তারপর ইমাজুদ্দিনের কাছে দুয়েকদিন দেখে নিজেই নামাজ পড়া শিখে গেল।

আয়ান এখন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। আল্লার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তার বিশ্বাস সে বেহেস্তে যাবে। তাই সে রমজান মাসে রোজা করে। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে। স্কুলে পড়তে গিয়েও নামাজ কামাই করে না। হাফ প্যান্ট পরে নামাজ হয় না। তাই সঙ্গে করে লুঙ্গি নিয়ে যায়। টিফিনের সময় দুপুরের নামাজটা পড়ে নেয়। কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে জোর তর্ক লাগিয়ে দেয়। একদিন নামাজ পড়ে ক্লাসে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশবাবু সেকথা বলতে তার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিয়েছিল। মাস্টারমশাই বলে আয়ান তাঁকে কোন কড়া কথা বলতে পারেনি। তবে মনে মনে তাঁকে অধার্মিক চিহ্নিত করেছিল। অধার্মিক লোক দেখলেই আয়ান অসন্তুষ্ট হয়। তবে রাগ করে না। তাকে ধর্ম-কর্ম করার জন্য বোঝায়। গ্রামের লোকেরা ধন্য ধন্য করে। শুধু গ্রামের লোকে নয়— আশেপাশের দশটা গ্রামের লোক স্বীকার করে, ছেলে বল তো ইব্রাহিমের ব্যাটা আয়ান। যেমন লেখাপড়ায় মন, তেমনি ধর্মে-কর্মে মতি। আর ব্যবহার কি অমায়িক। হাটে-ঘাটে-মাঠে ওই এক কথা। মসজিদে মসজিদে ওই এক কথা। আয়ান স্কুলে গেলে জুম্মার নামাজ পড়ে ডোমকলেরই মসজিদে। আর বাড়িতে থাকলে যায় বোলতলায়। তাদের পাড়াতেও একটা মসজিদ আছে— মালেক বিশ্বাসের বাড়ির কাছে। কিন্তু তাদের দলের কেউ সেখানে নামাজ পড়তে যায় না। কবে কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য হলে নাকি মালেক বিশ্বাসের বাবা মণ্ডলপাড়ায় কাকে বলেছিল, 'আমার মসজিদ থাক্যা বার হয়্যা যাও।' সেই থেকে এ পাড়ার কেউ ওই মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না। আয়ানও যায় না।

আয়ান যায় বোলতলার মসজিদে। ছাগলখালি বিলের ধারে রাস্তার পাশে সেখপাড়ার আরম্ভ হতেই মিস্ত্রীর বাড়ির কাছে একটা মসজিদ আছে। সেই মসজিদের পাশে একটা বিরাট বকুল গাছ আছে। বকুলকে বাঘডাঙ্গার লোকেরা বলে বোল। আর তার থেকে এই মসজিদের নাম বোলতলার মসজিদ।

স্কুল ছুটি থাকায় আয়ান আজ বাড়িতে ছিল। তাই বোলতলার মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে এসেছে। নামাজ পড়তে এসেছে তাদের পাড়ার মোড়ল নাদের বক্স, সেখপাড়ার অধার সেখ, ইচ্ছারুদ্দিন মিস্ত্রী এবং আরও অনেকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় লোক ইচ্ছারুদ্দিন ফকির। কিন্তু সে ফকিরীর ব্যবসা করে না। কাঠের মিস্ত্রীর কাজ করে খায়। তাই লোকে বলে ইছাম্দ্দিন মিস্ত্রী। ইছারুদ্দিন গোরা বাজারের কানা ফকিরের শিষ্য। সে গোপন সাধনা করে বলে লোকের ধারণা। কিন্তু অন্যান্য পীরদের মতো সে শিষ্য করে তাদের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ায় না। তাই তাকে লোকে আরও বেশি শ্রদ্ধা করে। সে কখনও খারাপ কথা বা অন্যায় কথা বলেছে বলে লোকে শোনেনি। তাই সে কোন কথা বললে সকলেই মেনে নেয়। কিন্তু এ মসজিদের জুম্মার নামাজের খোতিবী বা নেতৃত্ব করে অধার সেখ। সেই বোধহয় গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তা ছাড়া সে আরবী, উর্দু প্রভৃতি লেখাপড়াও জানে। ফলে সেই এখন এই মসজিদের ইমাম। নাদের বক্সের সঙ্গে অধার সেখের মতের মিল হয় না। যে কোন মজলিসে দুজনে একসঙ্গে থাকলে কথা-কাটাকাটি হবেই। কিন্তু ইমামতির ব্যাপারে নাদের বক্সও অধার সেখকে মেনে নেয়। কারণ শুধু বয়সের দিক থেকে নয়— লেখাপড়ার দিক থেকেও সে অনেক উঁচুদরের লোক। সেই অধার সেখ কিন্তু আজ হঠাৎ করে আয়ানকে নামাজ পড়াতে বলল। সে বলল, 'আমার বয়স হয়েছে। কখন কি করি তার ঠিক নেই। এখন যাদের বয়স কম, যারা ঠিকভাবে চলাফেরা করে তাদেরই ইমামতি করা উচিত। তা আজ যখন আয়ান আছে, ওই করুক।' আয়ান কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। সে বলেছিল, 'আমি পারব না।' কিন্তু ইছারুদ্দিন ছাড়ল না। সে বলল, 'আমরা আছি। সবাই মিলে বলছি। পারবিন্যা মানে?' সে আয়ানকে ধরে তুলে দিল। আয়ান বাধ্য হয়ে খুতবা বা আল্লার প্রশংসাবাণী পড়তে লাগল। তারপর সে নামাজে দাঁড়াল। তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার বাবার, ঠাকুরদার বয়সের লোকেরা নামাজ পড়ল। আয়ানের একটা ভাবান্তর হয়ে গেল। সে ভালোভাবে চলছে বলে তো উপস্থিত সব লোক তাকে ইমাম বা নেতা বলে মেনে নিল। তাহলে তো ভালোভাবে থাকলে, ভালো কাজ করলে লোকে তার মূল্য দেয়। সে নামাজ পড়তে পড়তেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে সারাজীবন ভালো থাকবে। কখনও খারাপ হবে না। নামাজ শেষে সে সকলের মঙ্গলের জন্য মোনাজাত করল।

বারো

আজ রবিবার। দুপুরবেলায় আয়ান বৈঠকখানায় বসে ছিল। তার পরের বোন সুফিয়া এসে বলল, 'ভাই, ঘর কিনা কিনা খেলবি?' ঘর কেনা কেনা খেলতে আয়ানের যে খুব ভালো

লাগে তা নয়। কিন্তু এখন করার কিছু ছিল না। তাই সে রাজি হয়ে গেল। ল্যাংড়া আমগাছটার তলায় পাশাপাশি সাতখানা ঘর কেটে একখানা ঘরকে দুভাগ করা হল। তারপর একটা খোলামের টুকরো ফেলে, দম ধরে কিত্ কিত্ করতে করতে সব ঘরগুলি পরিক্রমা করে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে ওটাকে তুলে আনতে হবে। এইভাবে সব ঘরগুলিতে খোলাম ফেলা সম্পূর্ণ হলে ঘর কিনতে শুরু করবে। প্রথমে সুফিয়া খোলাম ফেলে ছো-কিত্ কিত্ করতে করতে এক পা তুলে লাফাতে লাগল। ফিরে এসে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে খোলামটাও তুলল। কিন্তু ঘরটা লাফিয়ে পার হতে গিয়ে দাগের ওপর পা পড়ে গেল। এখন জিভটা বের করে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। এবার আয়ানের দান। সে কিন্তু পরপর দুটি ঘর কিনে নিল। এরপর সুফিয়া দান পেলেও বলল, 'খেলব না।' পরপর দুটো ঘর আয়ান কিনে নেওয়ায় সুফিয়া আর লাফাতে পারছে না। কারণ খেলার নিয়ম অনুসারে অন্যের কেনা ঘরে পা দেওয়া যাবে না। আয়ান সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'যা, তোকে আমার একটা ঘর দিয়ে দিলাম।' এবার সুফিয়া খোলামটা হাতে নিল। কিন্তু খেলা শুরু করার আগেই আজবার এসে খবর দিল, 'রহমান মাস্টার আস্যাছে, বদ্‌রোজা সাহেব আস্যাছে। সব নাদের ভায়ের বৈঠকে বসে আছে। তুমাকে ডাকল।' আয়ান খেলা ফেলে নাদের বক্সের বৈঠকখানার দিকে রওনা দিল।

আয়ান দেখল বৈঠকখানায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদের মাঝখানে রহমান মাস্টার একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর পাশে অন্য একটা চেয়ারে সাহেবের থেকেও একটু বেশি বয়স্ক একজন লোক। আয়ানের মনে হল, তাহলে উনিই হবেন সেই বদ্‌রোজা সাহেব। সে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। রহমান সাহেব তাকে কাছে ডেকে ওই লোকটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার ছাত্র, আয়ান। খুব ভালো ছেলে। পড়াশোনায় ভালো। আবার ভালো বক্তৃতাও দেয়।' সঙ্গে সঙ্গে নাদের বক্স যোগ করল, 'আবার এদিকে নামাজ রোজাও করে। খুব ধার্মিক।' একথা শুনে রহমান সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। কিন্তু ওই লোকটির চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রহমান সাহেব বলতে লাগলেন, 'আমি তো আপনাদের মতো গরীব ঘরেরই ছেলে। গরীব মানুষেরই পার্টি করি। আপনাদের আশাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। দেখবেন আপনারা। আর কি বলব?' রহমান সাহেব আর কিছু বললেন না। এবার ওই লোকটি বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের দেশে মুসলমান ভাইদের অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের না আছে জমিজমা, না আছে কলকারখানার কাজ। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও চাকরি পায় না। অথচ আমি তো পাকিস্তানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার মুসলমান ভায়েরা কত উন্নতি করেছে। আমাদের এখানে মুসলমান ভাইদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করার আছে। এই যে এইসব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে তারা যাতে চাকরি পায়, তার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। আপনারা যদি ভোট দিয়ে সে সুযোগ আমাকে দেন তাহলে আমি আমার তরফ থেকে ইনসাল্লাহ আপ্রাণ চেষ্টা করব।' উপস্থিত লোকদের অনেকেই বলে উঠল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমরা আপনাকেই ভোট দিবো।' ওঁরা আর বসলেন না। সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে 'মোসাফা' করে উঠে পড়লেন। গ্রামের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। জীপটা স্টার্ট নিতেই কে একজন বলে উঠল, 'সব ভোটের সুমায় আলেই মুনে পড়ে। গরীব

মানুষের জন্য, মুসুলমান ভাইদের জন্য দরদ উথলিয়ে পড়ে। তারপর ভোটটা হয়ে যাক। আর চিনতেই পারবে না।' সবাই বলে উঠল, 'ঠিক কথা। আয়ান দেখল একটা লাল পাতলা কাগজের পোস্টার বৈঠকের দেওয়ালে কে সেঁটে দিয়েছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে এফ. এফ. এম. প্রার্থী সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে এবং ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে সি. পি. আই. (এম) প্রার্থী রহমান মাস্টারকে ভোট দিন। তাহলে রহমান সাহেবের সঙ্গের লোকটির নাম বদরুদ্দোজা। কিন্তু এফ. এম. এম. কি? আয়ান তো এরকম নাম এর আগে কোনদিন শোনেনি! সেখপাড়ার নাসির তারও আগে থেকে পার্টির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এফ. এম. এম. কিরে?' নাসির বলল, 'ফেডারেশন অফ মুসলিম মাইনোরিটি।' আয়ান বুঝতে পারে, সেই জন্যই লোকটি বারবার মুস্লমান ভাই, মুসলমান ভাই করছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে গিয়ে তিনি কি বলবেন? সেখানে গিয়ে মুসলমান ভাই মুসলমান ভাই করলে তো কেউ ভোট দেবে না। তাহলে কি উনি মুসলমান ছাড়া আর কারও কাছে ভোট চাইবেন না? গোপাল দাদো, আনন্দ কাকা— এদের কাছেও না? তাহলে তিনি পাশ করবেন কি করে! আর একটা কথা আয়ান বুঝতে পারে না, সি. পি. এম.'এর সঙ্গে এফ. এম. এম. কেন? কথাটা একদিন রহমান মাস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই আয়ান বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে দেখল, চার-পাঁচজন লোক তাদের বৈঠকখানায় আছে। জনা তিনকে একটা পাটির ওপর বসেছে। একজন একটা বধ্না নিয়ে পা ধুচ্ছে। আর একজনের হাতে তার মেজ ভাইটা এক বধ্না জল ধরিয়ে দিচ্ছে। তার বাবা শশব্যস্ত হয়ে সরবত নিয়ে আসছে। আয়ান বুঝতে পারল না, এরা কারা। সে বৈঠকখানায় না উঠে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। দেখল বাড়ির ভেতর মা রান্না-বান্না নিয়ে মহা ব্যস্ত। বাজার থেকে মাংস আনা হয়েছে। হাঁড়ি থেকে ডাল বের করা হয়েছে। আলু বের করা হয়েছে। উনুনে কড়া চড়িয়ে মা ডিম ভাজছে। কয়েকটা প্লেটের ওপর মিষ্টি তোলা আছে। মা একটা একটা ডিম ভেজে সেই প্লেটে তুলতে লাগল। আয়ান ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। মাকে জিজ্ঞেস করে জানল ওই লোকগুলো তার বোন সুফিয়াকে দেখতে এসেছে। বড় ঘরের দিকে তাকাতেই দেখল পাশের বাড়ির ফতেবুবু সুফিয়াকে নিয়ে বসেছে। তার মাথায় জবজবে করে তেল দিয়ে লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা হচ্ছে। পায়ে আলতা দেওয়া হয়েছে। তাকে একটা ভালো কাপড়ও পরানো হয়েছে। সেগুলো পরে সে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে। তার বাবা একবার বৈঠকখানায় যাচ্ছে, একবার বাড়িতে আসছে। আয়ানকে বাবা বলল নাদের মণ্ডলকে খবর দিতে। আয়ান যেতেই নাদের মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল। এল পাশের বাড়ির সামেদও। আয়ান যখন ফিরে আসছে তখন লোকগুলো খাচ্ছে। তার বাবা মাংসের বাটিটা নিয়ে চামচে করে তুলে দিতে যাচ্ছে, আর লোকগুলো 'আর লিবো না, আর লিবো না' বলে উঠছে। অথচ নিচ্ছে, দিলে খেয়েও নিচ্ছে। এই করে খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। তখন ফতেবুবু ধরে ধরে নিয়ে এসে তার বোনকে বৈঠকখানার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়াল। আয়ানের মা ওপাশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। লোকগুলোর মধ্যে যে

লোকটা একবারে টিঙটিঙে লম্বা সে গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খুকী, তুমার নাম কি?' কিন্তু সুফিয়া কোন কথা বলে না। নাদের মণ্ডল বলল, 'ভয় কি বল।' ফতেবুবু পিঠে হাত রেখে বলল, 'আমরা আছি, ভয় নাই! বল্।' ঘোমটাটা একটু নড়ে উড়ল। সে কি বলল বোঝা গেল না। সে লোকটি বুঝে থাকবে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমার বাপের নাম কি?' সুফিয়া এবারও কি বলল, আয়ান শুনতে পেল না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমাধের গাঁয়ের নাম কি?' এবার সুফিয়া বলল, 'বাঘডাঙ্গা।'

লোকটা এবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রান্না করতে পারো?' সুফিয়া ঘোমটা সমেত ঘাড়টা নাড়ালো। পারে। লোকটা এবার জিজ্ঞেস করল, 'কোচুর শাগে কত্খানি নুন দ্যায়, দেখাও ধিনি।' ফতেবুবু বলল, 'শাগে নুন দিতে হয় কিনা, বোল্।' সুফিয়া বলল, 'দিতে হয়।' লোকটি আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে সামনে ধরল, 'ধর'। কিন্তু সুফিয়া ধরল না। ফতেবুবু আবার মুখ খুলল, 'লে, লিতে হয়।' তখন সুফিয়া কাপড়ের মধ্যে থেকে তার ডান হাতটা বের করে কাঁপতে কাঁপতে টাকাটা ধরল। টাকা দেওয়া হয়ে গেল মানে, দেখা হয়ে গেছে। ফতেবুবু এবার তাকে যেভাবে এনেছিল ঠিক সেইভাবেই ধরে ধরে নিয়ে গেল। লোকটি বলল, 'মেয়ে আমাধের পছোন্দ। এবের আপনারা কবে যাবেন বোলুন।' এ পক্ষের হয়ে কথা বলছিল নাদের মণ্ডল। সে বলল, 'আমরা মেয়্যার বাপ। যেদিন বোলবেন সেদিনই যাত্যা হবে। আপনারাই বোলুন।' লোকটি বলে উঠল, 'আপনারা যদি কালই যাত্যা চান আমরা কালই রাজি।' বেড়ার ফাঁকের থেকে আয়ানের মা বলল, 'বড়ো ভাসুরকে বলো, কাল না। কাল বুললে, কালই হয়ে যাবে। পরশুদিন হোক।' বড় ভাসুর মানে নাদের মণ্ডল। আয়ান দেখেছে যে নাদের মণ্ডল কোন কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাদের বাড়িতে আসে। এসে বৈঠকখানায় বসে। তার বাবা থাকে বটে। তবে কথা হয় বেড়ার আড়াল থেকে মার সঙ্গে। আর মা যা বলে নাদের মণ্ডল তা শোনে। মার জেঠ্যা নাকি ছিল তাদের গ্রামের মোড়ল। তাই তাদের বাড়িতে মাঝে মাজে মজলিস বসত। আর সেই সব মজলিসের আলোচনা শুনে শুনে মা মজলিসী মানুষের মতো কথা বলতে শিখে গিয়েছিল। তাই নাদের মণ্ডল মাঝে মাঝে মার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসত। কিন্তু মা ভাসুরের সামনে বের হত না। বেড়ার আড়াল থেকে কথা বলত। আজও বলল। মার ধারণা, কাল বললে কাল কাল করে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই কাল না হয়ে পরশু দিন ঠিক হোক। নাদের মণ্ডল বলল, 'মেয়ের মা যখন বলছে, তখন কাল আর না। আমরা পরশুদিন যাবো।' আয়ানের বাবা এবার সকলের হাতে পান এনে দিল। লোকগুলো পান মুখে দিয়ে সাইকেলে চেপে চলে গেল।

পরশুদিন সুফিয়ার বর দেখতে গেল তিনজন— ইব্রাহিম, নাদের বক্স আর সামেদ। বর দেখে সন্ধ্যাবেলায় ফিরলে সালমা গিয়ে হাজির হল সামেদের কাছে। সামেদ গ্রাম সম্পর্কে তার ভাগ্নে। তাই সালমাকে সে ডাকে মামী বলে। সামেদ বলল, 'মামী, তুমার জামোয়ের শরীল-স্বাস্থ্য ভালোই। তুমার বেহায় লোকটাও ভালোই লাগল, তবে অবস্থা ভালো লয়।' অবস্থা খারাপ শুনে সালমা বেঁকে বসেছিল। ইব্রাহিম তাকে অনেক বোঝালো যে বেহাই লোকটা ভালো হবে। তাছাড়া শুধু পয়সা থাকলেই তো হল না। ব্যবহারটাও দেখতে হবে।

বেহাইয়ের ব্যবহারটা ভালো। সালমা ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'আমার মেয়ে যদি খাতেই না পালো, তো ব্যবহার ধুয়্যা কি পানি খাবো?' এবার ইব্রাহিমের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, 'থাকলো তোর বিটির বিহ্যা। তুই যেমুন কোর্য়া পারিস দিস।' সালমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমার বিটি, আর তুমার বিটি না?' ইব্রাহিম উত্তর দিল, 'আমার বেটি তো আমি বিহ্যা ঠিক কোর্য়াছি। আমি ওখ্যানেই বিহ্যা দিব।' সালমা আর কোন কথা বলল না। ঝাঁটাটা নিয়ে পালঙ্গা ঝাড় দিতে চলে গেল। কয়েকদিন মান-অভিমানে কাটল। তারপর একদিন সালমাও বিয়েতে মত দিল। সালমার মত নিয়ে ইব্রাহিম নাদের বক্সের কাছে গেল। ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

পরের মাসের পনেরো তারিখে বিয়ে হয়ে গেল। অবশ্য মালেক বিশ্বাসের মেয়ের যেভাবে বিয়ে হয়েছিল সেভাবে হল না। বাজনা বাজিয়ে পালকি চড়ে কেউ এল না। আলো জ্বালিয়েও কেউ এল না। একটা বাস কি, নিদেন পক্ষে একখানা রিক্‌শাও এল না। আয়ানের বোনের বিয়ে হয়ে গেল অত্যন্ত সাদামাটাভাবে। তিনখানা টাপা-দেওয়া গরুর গাড়িতে করে পঁচিশ-তিরিশ জন লোক এল। একটা গাড়ি থেকে টুপি মাথায় দিয়ে আয়ানের বয়সী বর নামল। তাকে বৈঠকখানার মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হল। অন্যান্য লোকেরাও হাত-পা ধুয়ে বৈঠকখানায় বসে পড়ল। আয়ানদের পাড়ার লোকেরা তসলা চাপিয়ে রান্না করছিল। তার উঠে এসে গ্লাসে করে সরবত দিতে লাগল। সেই লম্বা লোকটা একখানা গামছায় বেঁধে আলতা-চিরুণী-আয়না নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। সালমা গামছাটা দেখেই কাঁদতে লাগল। এইসব জিনিসগুলি সাধারণত একটি ছোট বাক্সে করে আনা হয়। যার যেরকম অবস্থা সেরকম দামের বাক্স কেনে। কিন্তু সুফিয়ার জন্য তাও কেনা হয়নি। সালমা দেখেই কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে তার পুরনো বাক্সটা বের করে দিল। সেই লম্বা লোকটা কিন্তু তাতে একটুও মন খারাপ করল না। বরং বলল, 'আমরা আনিনি তো, কি হয়েছে? আপনারা দিয়্যা দেন ক্যানে?' সালমা দিয়ে দিল। অন্য মেয়েরা সুফিয়াকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিল। রান্না হয়ে গিয়েছিল। বরযাত্রীদের আগে খাইয়ে দিয়ে পাড়ার লোকেরা খেয়ে নিল। না, ইব্রাহিম ভোজের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করতে পারেনি। কটা মাছ কিনেছিল। আলুর সঙ্গে তারই ভাজা করা হয়েছে আর ডাল। বোঝা গেল তা দিয়ে খেয়ে কেউই খুশি হল না। কিন্তু যা পারল খেল। ইমাজুদ্দিন এসে বিয়ে পড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা খুবই সোজা। একজন লোক দু'জন সাক্ষী নিয়ে এসে প্রথমে মেয়েকে তিনবার জিজ্ঞেস করল, তারপর ছেলেকে। ছেলে মেয়ে রাজি হলেই বিয়ে হয়ে গেল। ইমাজুদ্দিন খুতবা পড়তে লাগল। খুতবা পড়া হলে ছেলেপক্ষের লোকেরা যে বাতাসা এনেছিল তা সবার মধ্যে বিতরণ করা হল। তারপর বরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে কনে সঁপে দেওয়া হল। কনের নানী বিয়ে উপলক্ষে এসেছিল। সে কনের হাত বরের হাতের সঙ্গে ধরে বলল, 'এতদিন খাওয়ানু-দাওয়ানু, এখুন তুমার হাতে দিনু। এখুন মান-ইজ্জত সব তুমার হাতে। জাত বাঁচিয়ে বোকো আর চোখ বাঁচিয়ে মারো।' বরপক্ষের লোকেরা এবার বর-কনেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়িতে বলদ জুড়ল। সালমা ডুকরে কেঁদে উঠল।

তেরো

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ইব্রাহিম এবার ছেলের দিকে নজর দেবার সময় পেল। ইব্রাহিম দেখেছে তার বড় ছেলে আয়ান স্কুলে গিয়ে কিছু লেখাপড়া শিখছে বটে, কিন্তু সংসারের কোন কাজে তার মন নেই। ভালো করে লাঙ্গল বহাতে শেখেনি। ভুঁই নিড়াতে শেখেনি। পাট বিনাতে পারে বটে, কিন্তু পাট কাচতে শেখেনি। শিখবে কি করে? কোন কাজেই তার মন নেই। গরুর জন্য এক বোঝা ঘাস কেটে ব্যস, স্কুলে চলে যায়। আগে মাঠে ভাতটা দিয়ে আসত। এখন তাও যায় না। মেজ ছেলেটাই মাঠে খাবার নিয়ে যায়। তার খুব ভাবনা হয়। এ ছেলে কোন কাজ শিখল না। তার জোতজমিও নেই, যে বসে বসে খাবে। সে মরে গেলে এ ছেলে না খেতে পেয়েই মারা যাবে। সে ভাবতে থাকে, মাঠের কাজ এ ছেলেকে দিয়ে আর হবে না। কিছু একটা হাতের কাজ শেখাতে হবে। ভাবতে ভাবতে শবকত খলিফার কাছে গিয়ে বসে। শবকত দুহাতে কাপড় ধরে পা দুলিয়ে মেশিন চালিয়ে অনবরত কাপড় সেলাই করে যায়। ইব্রাহিম চুপচাপ বসে বসে দেখে। তারপর অনেকক্ষণ থেকেও যখন কোন কথা বলে না তখন শবকত নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'ইব্রাহিম ভাই, কিছু বোলছো নাকি?' ইব্রাহিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'বোলবো আর কি ভাই! আমার বড় ছেলেডা তো মাঠের কাজ কিছু শিকলো না। আর এখুন মাঠের কাজ কোরতেও পারবে না। তা আপনি যদি একচিন এই খলিফার কাজডাই শিকান।' শবকত কয়েক মুহূর্ত ভেবে নেয়। সেলাইটা থামিয়ে বলে, 'আপনার ছেলে তো এখনো পোড়ছে।' ইব্রাহিম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'পড়হ্যা তো আর প্যাটের ভাত হবে না। বাবুধের ছেল্যা না যে চাকরি পাবে। শবকত স্বীকার করে, 'সেকথা ঠিক। তা আপনার ছেলা যদি শিকতে চায়, আসতে বোলবেন। আমার কুনু আপত্তি নাই।

ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। আয়ানকে ডেকে কখন, 'কাল থাক্যা শবকত খলিফার কাছে কাজ শিকতে যাতে হবে। আমি কথা বোলেছি। শিকাবে বোলেছে।' আয়ান বাবার সামনে কিছু বলতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা সরে গেলে মায়ের কাছে গিয়ে খুনসুটি করতে লাগল, 'আমি অনেক পড়ব। আমি এখন খলিফার কাজ শিখব না। তুমি বাবজীকে বল না। আমি এখন কাজ শিখব না।' সালমা বিরক্ত হয়ে এসে স্বামীকে বলল, 'তুমি খামাকা ক্যানে কাজ শিক শিক কোরছো। উয়ার ভালো লাগে না। উ শিকবে না।' স্ত্রীর কথা শুনে ইব্রাহিমের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, 'তা শিকবে ক্যানে? লাট সাহেবের ব্যাটা যে। হাজার বিগে লাখরাজ আছে। আমি চোখ বুজলে বুঝবে ঠ্যালা।' সালমা চলে যাচ্ছিল। সালমার ওপরও ইব্রাহিমের রাগ হয়ে গেল। সে স্ত্রীর দিকে ঘুরে বলল, 'তুমার আস্কারা পায়্যা পায়্যাই ছেলেডা উচ্ছন্নে যাবে।' সালমা একবার চোখ দুটো কটমট করে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু কোন কথা না বলেই আবার বাড়ির ভেতর চলে গেল। ইব্রাহিম গোঁজ হয়ে বসে রইল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আয়ান ভয়ে ভয়ে গরুর নান্দে ভুসির ঘর থেকে শানি নিয়ে এসে দিল। শানিটা মেখে দিয়ে সে বালতি নিয়ে ফুলের গাছে জল দিতে গেল। কল্পনাদের বাড়িতে ফুলের বাগান দেখার পর থেকে আয়ান বাড়িতে একটা ফুলের বাগান করেছে। কচার ডালের খুঁটি পুঁতে কঞ্চির বেড়া দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়েছে। ঘেরা জায়গাটা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিয়ে তারপর ফুলের গাছ লাগিয়েছে। দোপাটি গাছগুলোতে লাল লাল অনেক ফুল

ফুটেছে। গাঁদার গাছগুলোও ভালো বেড়েছে। কিন্তু কল্পনার দেওয়া গোলাপের ডালটা পাতা ছাড়লেও ভালো বাড়ছে না। ফুলও খুব ছোট ছোট হচ্ছে। আয়ান গাছটার গোড়ার খানিকটা গোবর দিয়ে অনেকটা জল দিল। সে একটা বেল ফুলের গাছও পুঁতেছে। কিন্তু গাছটাতে এখনও ফুল ফোটেনি। ফুলের গাছে জল দেওয়া হলে আয়ান নান্দের কাছে একটা সাঁঝাল দিল। সাঁঝালটায় আগুন দিতেই ধুঁয়ো বেরিয়ে মশা-মাছি তাড়াতে লাগল। মা হ্যারিকেন ধরাল। আয়ান বই নিয়ে পড়তে গেল। ইব্রাহিম দাওয়ায় বসে ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে কোন কূল-কিনারা পেল না। ছেলের মতিগতি সে বাপ হয়েও কিছুই বুঝতে পারে না। মাঠের কাজ সে শিখল না, দলিল লেখা মুহুরী সে হল না, আবার খলিফার কাজও শিখতে চায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলে পড়বে। আরে বাবা পড়বি তো বটেই। কিন্তু তারপর কি করবি? আবারও বলে পড়বে। কিন্তু চাষার ছেলের তো পড়াতে পেট ভরে না। জমি চষাতে পেট ভরে। অবশ্য যাদের অনেক বেশি জমিজমা আছে তাদের কথা আলাদা। ওই যে মালেক বিশ্বাসের ব্যাটা খালেক। পড়াশুনা করেছে। বাবার অনেক জমি আছে। এখন বসে বসে খাচ্ছে। কিন্তু ইব্রাহিমের তো মাত্র তিন বিঘা জমি। ছেলেমেয়েদের দশ কাঠা করেও ভাগে পড়বে না। তার ছেলে কি করে খাবে? খেতে পাবে না। কষ্ট পেয়ে পেয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব তাকে কিছু করতেই হবে। অনেক চিন্তা করে ইব্রাহিম সিদ্ধান্ত করল যে, ছেলের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স হয়েছে। অথচ বিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই ছেলের সংসারে মন নেই। বিয়ে দিলে বাড়িতে বউ আসবে। তাহলে সে সংসারের কাজে মন দেবে। এতবড় একটা সমস্যার এত সুন্দর সমাধান করে ফেলায় সে আর দাওয়ায় একা একা বসে থাকতে পারল না। কথাটা সালমাকে গিয়ে বলল। সালমা মনে করে না যে, বিয়ে দিলেই ছেলের সংসারে মন হবে। তবে তার অন্যরকম একটা লোভ হয়। একটি লাল টুকটুকে বউ আসবে। আলতা পরে, মল পায়ে দিয়ে সারা বাড়ি ঝনঝন করে ঘুরে বেড়বে। ছেলেমানুষ, কিছু না বুঝে দেওর-ননদের সঙ্গে মারামারি করবে। কিন্তু সালমা একটুও বকবে না। তার শাশুড়ি যেমন তাকে বকত, সেরকম করে বকবে না। তবে চুলের যত্ন না নিলে, ভালো করে কথাবার্তা না শিখলে ভালবেসে সে অনেক করে বকবে। আর কোলের কাছে বউকে নিয়ে নিজেই মাথায় তেল দিতে বসবে। মাথায় তেল দিয়ে, চুল আঁচড়ে বিয়ানি করে ঝুঁটি বেঁধে দেবে। তারপর আদর করে বলবে, যাও, এবার মুখটা আয়নাতে দেখ। বউ লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে তখন বলবে, যাও, এবার বেড়াও গে। তাই সে স্বামীর কথায় সায় দেয়।

ইব্রাহিম আয়ানের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে লেগে যায়। বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজে, কিন্তু তার মনে কিরকম সন্দেহ হয়। দু-দুবার এই ছেলের জন্য কাজ শেখার কথা ঠিক করে তাকে বিফল হতে হয়েছে। আবার শেষে বিয়ে ঠিক করে ওরকম হবে না তো? সালমা আয়ানকে খেতে দিয়েছিল। ইব্রাহিম এসে বিনা ভূমিকায় বলল, 'আমি কিন্তু তোর জন্যে মেয়ে দেখছি। বিহ্যা করবি তো?' আয়ান কিছু বলার আগেই সালমা বলে উঠল, 'তুমি আচ্ছা মানুষ তো, উ কি ক্যোরে বোলবে, আমি বিহ্যা কোরবো?' আয়ান বলল, 'মা, আমি কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করব না।' ইব্রাহিম স্ত্রীর দিকে তাকাল। সালমা বলল, 'প্রথম প্রথম বিহ্যার কথা বোললে সবাই এরকম লজ্জা কোর‍্যা বোলে। উ কি বিহ্যা করব করে লাচবে।' আয়ান আবারও জোর দিয়ে

বলল, 'আমি কিন্তু বিহ্যা করব না।' ইব্রাহিম ভয় পেয়ে গেল। সে আবারও স্ত্রী মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সালমা এবার হেসে ফেলল। হেসে বলল, ' তুমার যখুন বিহ্যার কথা হয়্যাছিলো, তুমি কি বোলেছিলে যে আমি বিহ্যা করব? কিন্তু তার মানে কি এই ছেলো যে তুমার বিহ্যা করার মুন ছিলো না?'

ইব্রাহিম এবারে বুঝতে পারল, আর বুঝতে পেরে বাইরে চলে এল। তার বিয়ের কথা মনে পড়তে লাগল। তার বিয়ের কথা তার বাপ বলেনি। বলেছিল তার চাচা। বাবার তখন বিয়ের মতই ছিল না। ইব্রাহিমের তখন সত্যই মনে হয়েছিল, 'বাপ ঘোড়ার ডিম জানে, চাচা যা বলছে তাই ঠিক।' তার চাচা যখন তাকে ডেকে তার মত আছে কি না জিজ্ঞেস করেছিল, তখন মুখে সে খুবই আপত্তি করেছিল, না আমি এখন বিয়ে করব না। কিন্তু সত্যি সেটা তার মনের কথা ছিল না। মনে তখন তার অন্য কথা। বরং বলা যায় উল্টো কথা। সে তখন ভাবছে তার ভাবী বধূ কেমন হবে, কত তাড়াতাড়ি তাকে সে পাবে, প্রথম দিনে তাকে নিয়ে কি করবে...আরও অনেক কথা, সে সব এখন ভাবতেও লজ্জা লজ্জা করে। ইব্রাহিম নিজের অজান্তেই একবার ফিক করে হেসে ফেলল। সত্যি, তার মাথায় একদম কিছু নেই। সালমা বুঝিয়ে না দিলে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। সালমা যে কি করে বুঝতে পারে ; এখন অবশ্য সেও বুঝতে পারছে।

আয়ানের প্রথম বিয়ের কথা হচ্ছে। আয়ানের তো লজ্জা করবেই। আর লজ্জা করলে না না তো বলবেই। এবার সে বুঝতে পেরেছে। আর বুঝতে পেরে জোর দিয়ে মেয়ে খুঁজতে লেগেছে। ইব্রাহিম বাইরে চলে গেলে আয়ান আবারও বলল, 'মা, আমি কিন্তু সতি সত্যি বিয়ে করব না।' সালমার রাগ হয়ে গেল। বাপ-ব্যাটা সব একরকম। সে বলল, 'বিহ্যা কোরবি কি না কোরবি তা আমি কি জানি। বাবাকে বল গা।' এই বলে আয়ানের কাছ থেকে উঠে গেল। ঝাঁটাটা নিয়ে রাগে রাগে উঠোন ঝাঁট দিতে লাগল। আয়ান খাওয়া শেষ করে স্কুলে চলে গেল।

আয়ান যখন স্কুল থেকে ফিরল, তখন তার মেজকাকা ইস্রাফিল বিলের ধারে ফেলা পাটের আঁটির ওপর বসে বিড় বিড় করে কি বলছে, আর একদল ছেলেমেয়ে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারছে। সে একেকবার ঘুরে তাকিয়ে উঠতে যাচ্ছে। আবার না উঠেই বসে পড়ছে। ছেলেগুলোর কেউ কেউ বলছে, 'ডাড়া কাটবা?' কেউ বলছে 'আবুবকরের বিটিকে বিহ্যা কোরবা?' কেউ বলছে, 'স্যাকের বিটিকে বিহ্যা কোরবা?' কেউ বলছে, 'নাতু হাজীর বিটিকে বিহ্যা কোরবা?' ওরা সকলেই আশেপাশের গ্রামের অবস্থাপন্ন লোক। হয়তো ইস্রাফিলের এই রকমই একটা স্বপ্ন ছিল। ছোটবেলা থেকেই সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী ছিল। দুটো মানুষের কাজ সে একাই করতে পারত। বিয়ের পরই তার স্ত্রী বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিল। যখন ভিন্ন হয় তখন তার আশা ছিল যে, সে পরিশ্রম করে অনেক বড়লোক হবে। আবুবকর, পরেশ শেখ বা নাতু হাজীর মত বড়লোক হবে। তারপর তাদেরই কারোর মেয়েকে বিয়ে করে সুখি হবে। আরও বেশি টাকা জমলে সে বিলের জল আসা-যাওয়ার জন্য ডাড়া কাটবে। সেইরকমই সে পরিশ্রম করতে লেগেছিল। কিছু টাকা-পয়সা জিনিসপত্র জমিয়েও ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার আশায় সে সব টাকা-পয়সা, গম, মুসুরি, খেসারি সব দুন্যা লাগান দিয়েছিল। কিন্তু যারা নিয়েছিল তারা কেউ আর তাকে ফেরত দেয়নি। পরিকল্পনার আরম্ভেই সব এরকম বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল তার দাদা ইব্রাহিমের

জন্যই এরকম হচ্ছে। তাই সে ইব্রাহিমকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে আর কারো সঙ্গেই কথা বলত না, শুধু নিজের স্বপ্ন আর ব্যর্থতা নিয়ে নিজের মনেই নাড়াচাড়া করত। আর তা করতে করতে একদিন মনের ভারসাম্য হারিয়ে যায়। সে এখন কথা বলে। তবে আবোল-তাবোল কথা। কখনও বলে 'ডাড়া কাটবো', কখনও বলে 'আবুবকরের বিটিকে বিহ্যা কোরবো।' কখনও বলে 'পরেশ স্যাকের বিটিকে বিহ্যা কোরবো।' আবার কখনও বলে, 'নাতু হাজীর বিটিকে বিহ্যা কোরবো।' আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার পেছনে লাগে। এইসব কথা বলে ক্ষ্যাপায়। ঢিল ছুঁড়ে মারে। সে কখনও বসে বসে মার খায়। কদাচিৎ উঠে তাড়া করে। এখন সে বসে বসে মার খাচ্ছিল। আয়ানের দেখে মায়া হল। সে ছেলেমেয়েগুলোকে ধমক দিল। তারা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আয়ান জানে, এখন মেজকাকার প্রতিদিন খাবারই জোটে না। সে এখন ছোটকাকার সঙ্গে থাকে। কিন্তু ছোটকাকার নিজেরই খাবার জোটে না। তা তাকে দেবে কি! বাবা একদিন মাকে একত্র করে নেওয়ার জন্য বলেছিল। কিন্তু মা রাজি হয়নি। তবুও আয়ান আজ মাকে গিয়ে বলল, 'মা, মাজবাবজিকে আজ দুটো কিছু খাতে দিবা?' আয়ান মায়ের মুখের কথার মত করেই বলার চেষ্টা করল। কিন্তু মা বলল, 'না, খাবার থাকলে অন্য লোককে দিবো। তাও শোত্রুকে দিবো না।' আয়ান সব জানে। তাই মার ওপর রাগ করতে পারে না। তবুও তার মেজকাকাকে ওভাবে দেখে সে আজ কিছুতেই খেতে পারল না। সে আবার বলল, 'তুমি দিও না। তবে আমার খাবার থেকে একটুখানি দিলে রাগ কোরো না।' মা আর রাগ করল না। তবে আয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'খুব যে দরদ দেখছি। কিন্তু সেদিন যদি গাড়াশাখান গলায় বোসিয়্যা দিতোক তাহলে কি হতোক?' এই বলে সে ডাগড়া থেকে দু'খানি রুটি বের করে তার লওয়া ছেলের হাতে দিল। সে রুটি দু'খানা ইস্রাফিলকে দিয়ে এল। আয়ানের এই ভাইটিকে ইস্রাফিল খুব ভালবাসত। ভিনো হওয়ার কিছুদিন আগেই হয়েছিল। কিন্তু ভিন্ন হওয়ার পরও ইস্রাফিল ওকে নিয়ে গিয়ে কোলে নিত। তখনও তার মতিগতি ভাল ছিল। তারপর যে কি হল। সেসব কথা ভাবতেও আয়ানের খুব খারাপ লাগে। সব কিছু থেকেও ইস্রাফিলের আজ কিছুই নেই। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। খাবার জোটে না। না খেয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থকে। ছেলেমেয়েরা ঢিল ছুঁড়ে মারে। এর থেকে একেবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল। কিন্তু যা ভালো তা তো সব সময় হয় না। এমনি করে দিন চলে যায়।

সেদিন ছিল রবিবার। আয়ান বৈঠকখানায় বসে গত সপ্তাহে কি কি পড়া হয়েছে তা দেখছিল। এমন সময় শবকত খলিফা একটা সাইকেলে চড়ে এসে তাদের বৈঠকখানার সামনে নামল। তার সঙ্গে আরও চারজন লোক। শবকত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আয়ানের প্রতি ইশারা করল। আয়ানের পরিবেশটা একটু ভারী ভারী লাগল। সে মেঝেতে একটা পাটি বিছিয়ে দিল। তারপর বাড়ি থেকে বধ্‌না এনে কুয়ো থেকে পা ধোওয়ার জন্য জল এনে দিল। তখন শবকত খলিফা জিজ্ঞেস করল, 'ইব্রাহিম ভাই কোথায়?' আয়ান জানত না তার বাবা কোথায়, সে বাড়ির ভিতর ঢুকে মাকে জিজ্ঞেস করল। মা বলল, 'বড় ভাসুরের কাছে গেলছে। এক্ষুণি চল্যা আসবে।' আয়ানের সন্দেহটা পাকা হল। আয়ান মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কেন এসেছে?' মা একটু থেমে বলল, 'তোর বাবা বউ দেখে আস্যাছে। বউ পছন্দ হোয়েছে। তাই

ওরা তোখে দেখতে আস্যাছে।' আয়ান আর কোন কথা বলল না, বুঝল এখন কথা বলে আর কোন লাভ নেই। বুঝল এই জন্যই তার বাবা সকালে উঠে বাজার থেকে মিষ্টি এনেছে, মাংস এনেছে। সে কাউকে কিছু না বলে পেছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ইব্রাহিম বাড়িতে এল। লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নাদের মণ্ডল এল। সামেদ এল। সকলে মিলে গল্প করতে লাগল। ছাগলখালির বিলে এবার ধান কেমন হবে থেকে আরম্ভ করে পাটের দর কমে যাওয়া, সারের দাম বাড়া, ফাকু পণ্ডিতের ওষুধের জোর পর্যন্ত অনেক কিছু আলোচনা হল। আলোচনা শেষ হলে শবকত খলিফা বলল, 'তাহলে ছেলেডাকে একবার দেখতে হয়।' ঠিক কথা। তারা যদিও দেখেই নিয়েছে, তবু আনুষ্ঠানিক দেখা তো এখনও হয়নি। নাদের মণ্ডল ইব্রাহিমকে ডেকে বলল, 'আয়ানকে ডাক।' ইব্রাহিম বাড়ির মধ্যে গেল আয়ানকে ডাকতে। কিন্তু আয়ান তো বাড়ির মধ্যে নেই। সে সালমাকে জিজ্ঞেস করল। সালমা বলল, 'এই তো এখুনি বাড়িতে ছিলো। একদণ্ডে কুথায় গেল?' সে তার মেজছেলেকে বলল, 'দেখে আয় তো, তোর ভাই পাড়ায় গেলছে কি-না।' তাকে পাড়ায় খোঁজা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না। মাঠে লোক পাঠান হল। পাওয়া গেল না। পাড়ায় যে যে স্কুলে পড়ে তাদের সকলের বাড়ি বাড়ি খোঁজা হল, পাওয়া গেল না। তখন সালমা বুঝল যে আয়ান পালিয়েছে। ইব্রাহিম রেগে আগুন হয়ে উঠল। বলল, 'আমি আগেই বলেছ্নু।' সালমা কিছু বলতে পারল না। শুধু অপরাধীর মত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ইব্রাহিমের সেটা আরও অসহ্য লাগল। সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। নাদের মণ্ডলকে ডেকে আসল কথা বলল। নাদের মণ্ডল মাথায় হাত দিল। শবকতরা তাড়াতাড়ি করে বলল, 'অতো দেরি কোরছেন ক্যানে?' ইব্রাহিম কোন উত্তর দিতে পারল না। অবশেষে শবকত উঠে এল। তাকে আলাদা পেয়ে ইব্রাহিম কোনরকমে কথাটা বলে ফেলল। শবকত কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারল না। তারপর সে অন্যান্যদেরও একধারে ডেকে নিয়ে গেল। তাদেরকে কি কি বলল ইব্রাহিম শুনতে পেল না। ওরা ফিরে এসে সাইকেলে চেপে চলে গেল। যাবার সময় একটা কথাও বলে গেল না। ইব্রাহিম, সামেদ, নাদের মণ্ডল সবাই নিজেদের যারপরনাই অপমানিত মনে করল।

আয়ান গিয়ে উঠল পাশের গ্রামের তার ক্লাশের বন্ধু সফিউলের বাড়ি। সফিউল তার এক বছর আগে পড়ত। কিন্তু এবার ফেল করায় এক সঙ্গে হয়ে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বন্ধুত্ব খুব গভীর রূপ ধারণ করেছে। সফিউলের মা আয়ানকে খুব ভালবাসে। সফিউলের এক ভাই নাকি ঠিক আয়ানের মত দেখতে ছিল। কিন্তু সে অল্প বয়সেই মারা যায়। তাই আয়ান যেদিন প্রথম ওদের বাড়ি যায় আয়ানকে দেখে ওর মা চমকে উঠেছিল। তারপর তার চমক ভেঙেছে। কিন্তু ভালবাসা কমেনি। আয়ানকে পেলে সফিউলের মা একদম ছাড়তে চায় না। আজও ছাড়ল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে ওরা দুই বন্ধুতে আলাদা শুয়ে পড়ল। সফিউল বারবার জিজ্ঞেস করছিল 'তোর মন খারাপ কেন?' আয়ান কয়েকবার ভেবেছে যে, সব বলে দেয়। কিন্তু বলতে পারেনি। নিজের খুব গোপন ব্যাপারগুলি সে কাউকেই বলতে পারে না। সে চায় না যে, তার বিয়ের ব্যাপারটা তার খুব ঘনিষ্ট বন্ধুরাও জানুক। চায়নি এ ব্যাপারটা নিয়ে কেউ তাকে ঠাট্টা করার সুযোগ পাক। তাই সফিউল যতবার জিজ্ঞেস করছে আয়ান উত্তর দিয়েছে, 'না, তেমন কিছু ঘটেনি তো। কই আমার মন খারাপ?

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি তো, তারজন্য হবে বোধহয়।' সফিউল ভেবেছে হবে হয়ত। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে স্নান-খাওয়া করে সফিউলের একটা খাতা নিয়ে স্কুলে চলে এসেছে। সারাদিন ক্লাস করে বিকেলবেলায় বাড়ি।

চৌদ্দ

দেখতে দেখতে আয়ান এইট পাশ করে নাইনে উঠল। নাইন থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়বে, না আর্টস নিয়ে, ঠিক করতে হবে। কারণ এ স্কুলে ওই দুটো শাখাই আছে। শিক্ষক তাদের নেশা-ঝোঁক পরীক্ষা করার জন্য সকলকে একটা বড় ঘরে বসিয়ে চার-পাঁচটা প্রশ্নপত্রে টিকমার্ক দিয়ে নিলেন। তারপর কার কি পড়ার দিকে ঝোঁক তা বলে দিলেন। আয়ানের নাকি প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে ঝোঁক। আয়ানের ইচ্ছেও ছিল সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। এইটের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় 'জীবনের লক্ষ্য' রচনা এসেছিল। তাতে সে সবিস্তারে লিখেছিল যে, সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কেন হতে চায়, হলে দেশের কি কি কাজ করবে তাও লিখেছিল। তাই তার মনে হল যে, ঝোঁক পরীক্ষার ফল ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু এ স্কুলে প্রযুক্তিবিদ্যা পড়ানো হয় না। আর অন্য কোন স্কুলে গিয়ে পড়ার আর্থিক সঙ্গতিও আয়ানের নেই। তাই তাকে ঠিক করতে হবে সে আর্টস পড়বে, না সায়েন্স পড়বে। আয়ানের এমন কোন অভিভাবক নেই যিনি তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। তার মা-বাবার কাছে আর্টস বা সায়েন্স এগুলো কোনরকম অর্থ বহন করে না। তাই তাকে নিজে নিজেই ঠিক করতে হবে সে কি পড়বে। তার নিজের ইচ্ছে করে সে আর্টস পড়ে। কারণ সাহিত্য পড়তে তার ভালো লাগে।

মৌলবী সাহেবও তাকে আর্টস পড়ার জন্য উৎসাহিত করে। অবশ্য তার কারণ আলাদা। আর্টস পড়লে আয়ান আরবী পড়বে, সেজন্যই তিনি আর্টস পড়ার পক্ষে। ক্লাস সেভেন থেকেই বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়া একটি তৃতীয় ভাষা পড়তে হয়। আয়ানদের স্কুলে পড়ানো হয় সংস্কৃত আর আরবী। আয়ানের আগে থেকে কিছু পড়া ছিল বলে আর ধর্মের ভাষা বলেও সে আরবী নিয়ে পড়তে গিয়ে বুঝল যে, তার কিছুই শেখা নেই। শুধুমাত্র অক্ষরগুলো চিনে স্বরচিহ্ন দিয়ে কোরান পড়তে শিখেছে। কিন্তু সাধারণভাবে আরবী স্বরচিহ্ন দিয়ে পড়া হয় না। আর একটা কারণে তার আরবীর ওপর মোহ চলে গেছে। যখন সে আরবীর একদম কিছু মানে বুঝত না তখন আরবী বলতে একটা দারুণ ভাষা এবং কোরান বলতে বিরাট কিছু মনে করত। কিন্তু আরবী পড়তে গিয়ে যখন একটু একটু মানে বুঝতে পারল তখন মনে হল আরবী একটা সাধারণ ভাষা এবং কোরানও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো একটা সাধারণ বই। প্রতি রাকাত নামাজের সঙ্গে যে সুরটা আবৃত্তি করতে হয় অর্থাৎ আয়ান যে সুরটা সারাটা দিনে অন্ততঃ বিয়াল্লিশ বার আবৃত্তি করে তার মানে খুবই সাধারণ, সাদামাটা ধরনের। সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক এবং পরম করুণাময়, এইরকম। কেউ যদি এটা বিশ্বাসও করে, মনে উপলব্ধি করলেই তো যথেষ্ট। তার জন্য দিনে চল্লিশবার করে আবৃত্তি করতে হবে কেন? তাই মানে জানার পর নামাজ পড়া ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। তার

আর নামাজ পড়তে ভালো লাগত না। শুধু সব কিছুর মানে জানতে ইচ্ছে করত। তাই সে অনেক খোঁজ-খবর করে একটা বাংলায় অনূদিত কোরান যোগাড় করেছিল, সেটা পড়ে তার মনে হয়েছিল যে, কোরানে যা আছে তা ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের আরব দেশের সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হলেও আজকের দিনের বিশ্বের সব সমাজের জন্য সমান উপযোগী নয়। এমন কি এতে এমন অনেক বক্তব্য আছে যা আজকের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। তাই আরবীর প্রতি আগের মতো কোনরকম মোহ আয়ানের ছিল না। আর সেই জন্যই মৌলবী সাহেবের আর্টস পড়ার পক্ষে তার বক্তব্য আয়ানকে প্রভাবিত করল না। তার অন্যান্য শিক্ষকেরা তাকে সায়েন্স পড়ারই পরামর্শ দিলেন। তাদের বক্তব্য সায়েন্স পড়লে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়। সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে, ইচ্ছে হলে, আর্টসে যাওয়া যায়। কিন্তু আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করলে, ইচ্ছে করলেও আর সায়েন্স পড়া যায় না। তাদের এই যুক্তিটা আয়ানের ভালো লাগল। আয়ান ঠিক করল সে সায়েন্স নিয়েই পড়বে।

সায়েন্স নিয়ে অনেকেই পড়তে চায়। সায়েন্স পড়লে ভবিষ্যতে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হলে অনেক টাকা হয়। আবার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারলেও, নিদেনপক্ষে স্কুলের মাস্টারীটাও আর্টসের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাড়াতাড়ি পায়। কাজেই অনেকেই সায়েন্স পড়তে চায়। কিন্তু সবাই পড়তে পায় না। সায়েন্সে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস আছে। তার জন্য ল্যাবরেটরীর দরকার হয়। কিন্তু এ স্কুলে ল্যাবরেটরীর সুযোগ-সুবিধা সীমিত। তাই বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যায় না। এবারে ক্লাস নাইনে সায়েন্সে মাত্র পনেরো জনকে নেওয়া হয়েছে। ফলে যারা সায়েন্স পড়তে চেয়েছিল তাদের অনেকেই পায়নি। সফিউল পায়নি। কল্পনাও পায়নি। বালিকা বিদ্যাপীঠে মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানো হয়। তাই নাইন থেকে মেয়েরা হাইস্কুলে চলে আসে। কল্পনাও এসেছে। তবে সায়েন্স পায়নি— আর্টস নিয়ে ভর্তি হয়েছে।

আজ কল্পনা একটা সুন্দর শাড়ি পরে এসেছে। এ স্কুলের সব মেয়েরাই শাড়ি পরে আসে। কল্পনাও আসে। আজও এসেছে। শাড়ি পরে কল্পনাকে অনেকটা লম্বা মানে হচ্ছে। আয়ান নিজের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, সেও খানিকটা লম্বা হয়েছে। তবে তার তুলনায় কল্পনা যেন অনেক বেশি তাড়াতাড়ি লম্বা হয়েছে। ও হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে কেন একা একা দাঁড়িয়ে আছে? হঠাৎ আয়ানের কল্পনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে হল। সে এগিয়ে যায়। কিন্তু কি কথা বলবে ঠিক করতে পারে না, আবার কিছু না বলে ফিরে আসতেও সংকোচ হয়। তার মনে হয় সবাই যেন তাকে লক্ষ্য করছে। সে চট করে সরে গিয়ে দেওয়াল পত্রিকাটা দেখতে থাকে। নতুন হেডমাস্টার আসার পর প্রতিমাসে হাতে লিখে একটা করে দেওয়াল পত্রিকা বের করা হচ্ছে। এ মাসে আয়ানের একটা কবিতা বেরিয়েছে। আয়ান গিয়ে নিজের কবিতাটা দেখতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সান্ত্বনা বানানটা ভুল আছে। নিশ্চয় কপি করার সময় ভুলটা হয়েছে। সে পকেট থেকে পেনটা বার করে ত-এর নিচে ব-ফলাটা বসিয়ে দিল। পেনটা পকেটে রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে কল্পনা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি টেনে কল্পনা বলল, 'তোর কবিতাটা কিন্তু ভালো হয়েছে।' আয়ান কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারল না। না পেরে হঠাৎ বলে উঠল, 'তুই কিন্তু অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছিস।' কল্পনা অস্বীকার করল না। বলল, 'তুইও হয়েছিস'।

আয়ানের কিছু বলার ছিল না। কল্পনাই আবার কথা বলল, 'বাড়ি যাবি নে?' 'যাব, তবে বিতর্কটা দেখে যাব।' আয়ান উত্তর দিল। নতুন হেডমাস্টার আসার পর স্কুলে নতুন নতুন ব্যাপার হচ্ছে। আজও হবে একটা—বিতর্ক। হেডমাস্টার টেন-ইলেভেনের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বিতর্ক করাবেন। বিষয় ঠিক হয়েছে গ্রাম থেকে শহর জীবনই কাম্য। আয়ান এর আগে বিতর্ক দেখেনি। তাই ব্যাপারটা কি না দেখে আজ বাড়ি যাবে না। কল্পনার বিতর্কে আগ্রহ নেই। সে চলে গেল। একটু পরেই হেডমাস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যেখানে বসে ছিল সেখানে গেলেন। বিতর্ক শুরু হল। আয়ান বুঝল যে, বক্তৃতা আর বিতর্কে ফারাক এই যে, বিতর্কে শুধু সভাপতিকে সম্ভাষণ করতে হয়। আর বক্তৃতায় যেখানে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে হয়, বিতর্কে সেখানে শুধু পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে হয়। যেমন আজ টেনের ছেলেরা পক্ষে আর ইলেভেনের ছেলেমেয়েরা বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে। আয়ানের মনে হল সেও বিতর্ক করতে পারবে।

বিতর্ক শেষ হলে আয়ান বাড়ি রওনা হল। তখনও সামান্য বেলা আছে। বাড়ির কাছে আসতেই আয়ান দেখল যে, তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় অনেক লোক জমে গেছে। তাদের বাজিতপুরের ভাগারুর ছোট ছেলে অনবরত চিৎকার করছে। আর আশেপাশের লোক খুব উৎসুক হয়ে শুনছে: একপাশে তার বাবা দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা দূরে তার নতুন তাহোই মশায় বসে আছে। আজ তার বোনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিতে আসার কড়াল ছিল! তাহলে শ্বশুর মশায় নিজেই এসেছে। আমগাছটার নিচে টাপা দেওয়া গাড়িটা রাখা আছে। তার জোয়ালের কাছেও দুয়েকজন লোক বসে আছে। ভাগারুর ছেলেটা অনবরত লাফিয়ে যাচ্ছে। সে বলছে, 'আমি নিজে বস্তায় ধান পুরে গেলাম। ফাস্টোকিলাস ধান। আর বাড়িতে দিয়ে এলে পাতান্! আমার সঙ্গে জোচ্চুরী! যাচ্ছি থানায়। দেখাবো মজা। অ্যাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি! অ্যাঁ, সব পাতান!' এক কথা সে বারবার বলে যাচ্ছে। ইব্রাহিম কি বলতে গেল। কিন্তু সে শুনল না। আয়ান ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। সে বাড়িতে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল। মা বলল, 'পালের ভুঁইয়ের কাল ধান কাট্যাছে তা তো জানিস। তোর ব্যাটা আজ ধান দিয়্যা আস্যাছে। লোকটা আস্যা বোলছে— একটাও ধান নাই, সব পাতান দিয়া আস্যাছে।' আয়ান এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে ছেলেটা তখনও একইরকমভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে। আমগাছটার নিচে গাড়িতে বসে মাসুদ পাশের লোকটাকে বলছে, 'অতোডা তো ভালো নয়। একবারে পাতান্। পাতান্ দিবি দে, সঙ্গে দুট্যা ধানও দিলে তো আর কেহু বুঝতে পাতত না।' অর্থাৎ তারা ঐ ছেলেটার কথা বিশ্বাস করেছে।

আয়ান তার বাবার কাছে এগিয়ে গেল। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'যখন আপনি ধান নিয়ে যান তখন এ ছেলেটা বাড়িতে ছিল?' তার বাবা মাথা নাড়ল— না। 'তখন বাড়িতে কে ছিল?' তার বাবা উত্তর দিল, 'বড়দা'। 'তখন ধান দেখে নিয়েছে তো?' বাবা বলল, 'হ্যাঁ, আমি উয়াধের সামনেই ঢাল্যা দিয়েছি'। আয়ান এবার ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ধান যখন নিয়েছেন তখন তো দেখে নিয়েছেন, আপনার দাদা। কিছু যদি বলার তিনিই বলবেন। আপনি এত চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করছেন কেন?' ছেলেটা আয়ানের কথায় আরও জোরে চেঁচাতে লাগল, 'করব, বেশ

করব। আমার বাবার জমির ধান। আমি চেঁচামেচি করব না মানে!' আয়ান দেখল তার মুখ থেকে ভক ভক করে একটা বিশ্রি গন্ধ বেরুচ্ছে। বাজারে ফড়ে মদ খেয়ে যখন মাতলামি করে তখন তার মুখ দিয়ে ঠিক এরকম গন্ধ বের হয়। আয়ান বাবার কাছে এসে বলল, 'এ একেবারে মাতাল হয়ে আছে। আপনি বাজিতপুরে যান।' ইব্রাহিম জামাটা গায়ে দিয়ে বাজিতপুর রওনা হল। ইব্রাহিমের পেছন পেছন ছেলেটাও হাঁটতে শুরু করল। সাইকেলে না চড়ে সে হাঁটতেই লাগল। আস্তে আস্তে ভিড়টা কমে গেল। বসে থাকল শুধু তার বোনের শ্বশুর আর দেশের বাড়ির সামেদ। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। আয়ানও কোন কথা না বলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। জামাটা গায়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে যাবার জন্য রওনা হল।

আয়ানরা যখন বাজিতপুর পৌঁছল তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। বাড়ির দরজা খুলল পালের বউ। সেই বাড়ির গৃহিনী। তাদেরকে যেন সে আশা করেনি। তাই আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আয়ানরাও কি বলে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। ইব্রাহিম তার বাবার সঙ্গে আগেও এ বাড়িতে এসেছে। তখনও এই মহিলাই গৃহিনী ছিল। ইব্রাহিম একে জেঠিমা বলত। বলল, 'জেঠিমা, আজ সকালে আমি যে ধান দিয়ে গেলছি তা কি সত্যিই সব পাতান!' জেঠিমা কিছুই বুঝতে না পেরে তাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এই সময় তার বড় ছেলে বাড়িতে এল। আয়ানের বাবা এবার যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে তার কাছে গিয়ে বলল, 'বিহ্যানে আমি যে ধান দিয়ে গেনু তখুন তো আপনি ছিলেন।' সে বলল, 'হ্যাঁ ছিলাম, তা কি হয়েছে?' ইব্রাহিম বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু বলার আগেই সেই মাতাল ছোট ছেলেটা এসে হাজির হল। সে তখনও বকে চলেছে, 'অ্যাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি!....' ইব্রাহিমকে আর কিছু বলতে হল না। সেই সব বলে দিল। তখন জানা গেল যে ইব্রাহিম যে ধান দিয়ে গিয়েছে তা ছাদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে। ভূসি আর পাতানগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য একটা বস্তায় রাখা হয়েছে। দুপুরবেলায় ছোট ছেলেটা কোথা থেকে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঐ বস্তায় হাত দিয়ে পাতান দেখেছে। দেখে বাড়ির ভিতরেই বকবক করছিল। তার বড়দা রেগে ঘাড়ে হাত দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আর তারপরই এই কাণ্ড। বড়দা বলল, 'ইব্রাহিম, তুমি কিছু মনে কোরো না। অনেকটা পথ হয়রান হলে, ঐ কুলাঙ্গারকে নিয়ে আমাদেরও মান-সম্মান থাকল না।' জেঠিমাও বলল, 'বাবা, কিছু মনে কোরো না। রাতে তোমাদের অনেকটা অযথা হাঁটতে হল।' ইব্রাহিম ক্লান্তস্বরে বলল, 'জেঠিমা, হাঁটতে হোলো তাথে দুঃখু নাই। কিন্তু এক গিরাম লোকের সামনে, আমার মেয়্যার শ্বশুরবাড়ির লোকের সামনে আমার যে অপমানডা হোলো তার লাগেই দুঃখু।' বড়দা বা জেঠিমা কেউ কিছু বলল না। সেই মাতাল ছেলেটা তখনও সমানে বকে যাচ্ছে। ইব্রাহিমও আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল। অনেকটা পথ আসার পর আয়ান বলল, 'এদের জমিটা ভাগে করতে হবে না। ছেড়ে দেন।' ইব্রাহিম আরও খানিকক্ষণ চুপ করে হাঁটল। তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে বলতে লাগল, 'ছাড়্যা তো দিতে পারি। কিন্তু তিন বিঘে জমি চলে গেলে আর ধানের জমি থাকছে না। ধান না হোলে না খায়্যা থাকতে হবে।' আয়ান এর কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু তার মনে হয় যে, তারা গরীব বলেই ওই অপমান সইতে হচ্ছে। তার বাবার প্রতি তার খুব মায়া হয়। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলতে পারে না। শুধু সাথে সাথে হাঁটতে থাকে।

একসময় বাড়িতে পৌঁছে যায়। আয়ান দেখে সবাই চলে গেছে। আয়ানের ভারী খারাপ লাগে। সবাই জেনে থাকল যে, তার বাবা ভাগারুকে ধানের জায়গায় পাতান দিয়েছে। অথচ তার বাবা তো তা দেয়নি। তার বাবা সত্যিকার ধানই দিয়ে এসেছে। তার ইচ্ছে করতে লাগল যে, সে সবাইকে ডেকে আসল ঘটনাটা বলে। কিন্তু কেউ নেই। হায় একজন লোকও যদি থাকত। কিন্তু কেউ নেই।

কাল রাতে শুতে আয়ানের দেরি হয়েছিল। তাই সকালে উঠতেও দেরি হয়ে গেল। রবিবারের সকালটাই মাটি। অঙ্কের বইটা খুলতেই মনে পড়ল বীজগণিতের তিন-চারটে অঙ্ক হচ্ছে না। কিঙ্করবাবুকে আয়ান বলেছিল। কিন্তু স্কুলে সময় হয়নি। রবিবার সকালে কিঙ্করবাবু কতকগুলো ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। তাদের ক্লাসের সুদীপও পড়ে। আয়ানের মনে হল, এখন গেলে হয়। সে তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পড়ে তৈরি হয়ে নিল। বাড়িতে মাকে বলে হাঁটতে লাগল।

কিঙ্করবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখল, একটা চৌকির উপর গোটা সাতেক ছেলেকে নিয়ে কিঙ্করবাবু বসে আছেন। সুদীপও আছে। তাকে যেতে দেখেই মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি এসেছ! সুদীপের পাশে বস। সুদীপ, দেখ তো তোমারও ঐ অঙ্কগুলোই হচ্ছে না নাকি?' আয়ান সুদীপের পাশে বসল। হ্যাঁ, সুদীপেরও ঐ অঙ্কগুলো হয়নি। কিঙ্করবাবু বললেন, 'আচ্ছা দেখছি।' উনি অঙ্কের বইটা নিয়ে না হওয়া একটা অঙ্ক কয়েকবার পড়লেন। তারপর বইটা রেখে, একটা ছোট টিনের কৌটা থেকে খানিকটা নস্যি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে ধরে পর্যায়ক্রমে দুই নাকের মধ্যে দিয়ে, হেইচো করে হেঁচে উঠলেন। অঙ্কগুলো আরম্ভ করার আগে কিঙ্করবাবু যেন বুদ্ধির গোড়ায় একটু নস্যি দিয়ে নিচ্ছেন। নস্যি দিয়ে বারবার হেঁচে উঠছেন— হেঁইচো। তার হাঁচি আসার আগেই একটা লোক এসে উঠোনের মাঝে দাঁড়াল। তার হাতে একটা কাঁসার বধনা। সে বধনাটা ডান হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'বাবু, এই বধনাডা রাখ্যা আমাকে কুড়িড্যা টাকা দ্যান।' শুনে কিঙ্করবাবুর হাঁচি থেমে গেল। 'তুমি এখন যাও এখান থেকে।' কিন্তু লোকটি গেল না। সে বলল, 'বাবু বাড়িতে খাবার হয়নি। এড্যা রাখ্যা কুড়িড্যা টাকা দ্যান।' কিঙ্করবাবু বললেন, 'তুমি ভুল করছ, আমরা ওসব কারবার করি না। লোকটি যেন হতাশ হল। কিন্তু শেষ চেষ্টার মতো আবার বলে উঠল, 'বাবু, কাল যে আপনি বুললেন যে খালিহাতে টাকা দিতে পারব না। কিছু জিনিস বোন্ধুক দেওয়ার থাকলে লিয়ে আসো।' কিঙ্করবাবু খুবই বিরক্ত হলেন। 'যতো সব ঝামেলা। বুঝবে না সুঝবে না যেখানে সেখানে এসে ঝামেলা করবে।' কিঙ্করবাবু উঠে গেলেন। আয়ান লোকটির দিকে তাকাল। শীর্ণ চেহারা। পরনে একটা ছেড়া লুঙ্গি। গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল উস্কো খুস্কো। একটা কাঁসার বধনা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত এটাই তার শেষ সম্বল। এরপর আর বন্ধক দেবারও কিছু নেই। দুদিন খেতে না পেয়ে জল খাবার বধনাটাও বন্ধক দিতে এসেছে। কিন্তু কিঙ্করবাবু বন্ধক রাখলেন না। উঠে গিয়ে খুব বকাবকি করতে লাগলেন। লোকটি বিমূঢ়ের মতো কয়েকবার ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। কিঙ্করবাবু গিয়ে সদরের দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। আয়ানের চোখের সামনে তার বাবার ছবিটা ভেসে উঠল। তাদের মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য তার

বাবাকেও এরকম থালা-বাসন বন্ধক দিতে যেতে হয়। তার বাবাকেও কি এমনি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়? হয়ত হয়! আয়ানের মনে হল এইমাত্র তার বাবাকেই যেন উঠোন থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর তাড়িয়ে দিল কে? তারই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কিঙ্করবাবু। কিঙ্করবাবু এসে অঙ্ক বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু আয়ানের মাথায় কিছুই প্রবেশ করল না। তার শুধুই মনে হতে লাগল কিঙ্করবাবু তাহলে মহাজনী কারবার করেন। কিঙ্করবাবু কমল হালদারের মতোই সুদের কারবার করেন।

পনের

এর আগে আয়ান কখনও স্পোর্টসে নাম দেয়নি। সে যে পরিবেশে জন্মেছে সেখানে খেলাধূলার তেমন সুযোগ নেই। গ্রামে কোন খেলার মাঠ নেই। তার দরকার আছে বলেও লোকেরা মনে করে না। বরং যে ছেলে খেলাধূলা করে সময় নষ্ট করে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই সবাই মনে করে। তাই খেলাধূলার অভ্যাস আয়ানের হয়নি। খুব জোর কাজের ফাঁকে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে দু'দান ফুল খেলেছে, না হলে দু'দান হাডুডু বা চিক্কে। আর বাড়িতে বোনের সঙ্গে দাগ কেটে ঘর কিনা কিনা খেলেছে ক'দিন। এর বাইরে কোন খেলা সে জানে না। তাই সে স্পোর্টসে নাম দেয়নি। তবুও সে এবার ঠিক করল যে, এবার স্পোর্টসে নাম দেবে। কল্পনাও বলেছে সে নাম দেবে। সে কলসী দৌড়ে নাম দেবে। কিন্তু আয়ান কিসে দেবে? সে ঠিক করল যে দৌড় আর বর্শা ছোঁড়ায় নাম দেবে। নাম দিয়েও দিল। বড়দের গ্রুপে পড়ল। নাইন টেন ইলেভেনের ছেলেদের একটা গ্রুপ— এ গ্রুপ। এ গ্রুপের দৌড় আটশো মিটার। রজনীবাবু বুঝিয়ে দিলেন, একবার ঘুরে গিয়ে আরেকবার চক্কর দিয়ে আসতে হবে। আয়ান জানে দূরপাল্লার দৌড়ে দম রাখাটা বড় ব্যাপার। দম না থাকলে কখনও দৌড়ান যায় না। আয়ান ঠিক করল সে দম না হারিয়ে যতটা পারে ছুটবে। তারপর শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে।

রজনীবাবু তাদের লাইনের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর রুমাল নেড়ে ছোট্ট করে বললেন, 'গো'। সবাই দৌড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত দম রাখার জন্য সবাই খুব সচেতন। তাই প্রথমবার কেউ জোরে দৌড়তে চাইছে না। দেখলে মনে হয় যেন কে কত আস্তে চলতে পারে তারই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আয়ান কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় যোগ দিল না। সে খুব জোরে দৌড়ল না। কিন্তু হাঁফিয়ে না গিয়ে যতটা পারে নিজেকে এগিয়ে রাখল। একপাক শেষ হলে অন্যদের থেকে সে অন্ততঃ কুড়ি মিটার এগিয়ে থাকল। যারা বছরের পর বছর এ মাঠে দৌড় দেখছে তারা বলল, এবার শুরু হবে আসল দৌড়। এবার দেখবে এ ছোঁড়াটা কেমন লেজে গোবরে হয়ে সবার পেছনে যায়। এর দম তো শেষ। কিন্তু ওরা জানত না, চাষার ছেলের দম অত সহজে শেষ হয় না। আয়ানের দম শেষ হল না। সে আরও জোরে দৌড়তে লাগল। আর অতটা দূরত্ব রেখেই সে প্রথম হল। সফিউল ছুটে এল। কালাম ছুটে এল। স্কুলে এরা দুজনই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুদীপ, বরেন এদের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব আছে। তবে তা অন্যরকম —বন্ধুত্বের সঙ্গে সবসময় প্রতিযেগিতার ভাব। কে কার থেকে ভালো রেজাল্ট করবে সব

সময় সেই চিন্তা। কিন্তু কালাম বা সফিউলের সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক নয়। এখানে সম্পর্ক শুধু ভালোবাসার। প্রথম বন্ধুত্ব সফিউলের সঙ্গে। তারপর সফিউলের মাধ্যমেই কালামের সঙ্গে। এখন তাদের তিনজনের বন্ধুত্বের কথা স্কুলের সবাই জানে।

মাইকে নাম ডাকছিল। কালাম ওকে নিয়ে গিয়ে বিজয়-স্তম্ভের ওপর উঠিয়ে দিল। আনন্দটা কালামেরই যেন বেশি। আনন্দ আয়ানেরও হচ্ছিল। তবে তার মনে হচ্ছিল যে, অন্যরা হিসেবে ভুল না করলে হয়ত সে প্রথম হতে পারত না। কালাম জানতে চাইল ভুলটা কোথায়। আয়ান বলল 'দূরপাল্লার দৌড় মানে দম রেখে এগিয়ে যাওয়া, দম রাখার জন্য প্রতিযোগিতা করে পিছিয়ে থাকা নয়। অন্যান্য প্রতিযোগিরা তাই করছিল। ওরা কে কত পেছনে থাকতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় ছিল। ফলে এত পিছিয়ে পড়ল যে, আর কভার করতে পারল না।' কালাম এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওরা তিনজনে ওদিকটায় যেতে লাগল। ওদিকটায় তখন বাচ্চাদের জিলিপি দৌড় হচ্ছে। জিলিপিগুলো উঁচু করে ধরে নাড়ানো হচ্ছে। আর পেছনের দিকে হাঁতবাঁধা বাচ্চাগুলো লাফিয়ে উঠে মুখ দিয়ে ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। ঐ সবুজ জামা পরা ছেলেটা এবার পেরে গেছে। ও দৌড়চ্ছে। ও পৌঁছে গেল। ও ফার্স্ট হয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে তিন-চারজন ছুটতে লাগল। আয়ানরা এবার এদিকটায় এল। এদিকে মেয়েদের কলসী দৌড় শুরু হয়েছে । কলসী মাথায় নিয়ে মেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। স্বপনবাবু রুমাল নেড়ে 'গো' বলতেই সবাই কলসী মাথায় নিয়ে দৌড়তে লাগল। একটা কলসী পড়ে ভেঙে গেল। মেয়েটা থেমে গেল। ঐ আরেকটা ভাঙল। আরেকটা মেয়ে থেমে গেল। ঐ আরেকটা। যেন কলসী দৌড় নয়, কলসী ভাঙার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। যাঃ, কল্পনার মাথা থেকেও কলসীটা পড়ে গেল। কল্পনা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে গেল। আর মাত্র দুটো মেয়ে বাকী।

কিন্তু ততক্ষণে ওদিকে বর্শা ছোঁড়ার জন্য নাম ডাকছে। আয়ানরা ওদিকটায় গেল। বর্শা ছোঁড়া শুরু হল। কিন্তু আয়ান বর্শা ছোঁড়ার কায়দাটা রপ্ত করতে পারেনি। তাই বর্শা ছোঁড়াতে ভালো ফল করতে পারল না। এদিকটায় এবার মেয়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার হবে। তারই ঘোষণা চলছে। আয়ানরা এদিকটায় আসছিল। হঠাৎ কোথা থেকে শিশিরদা এসে উপস্থিত হল। শিশিরদা গত বছর স্কুল থেকে পাশ করে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে স্কুলে আসে। আয়ান ভাবল বোধহয় স্পোর্টস দেখতে এসেছে। কিন্তু শিশির অন্য কথা বলল। সে বলল রহমান সাহেব নাকি এক্ষুণি আয়ানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। খবরটা দিয়েই শিশির যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। আয়ান ভাবতে লাগল কি করবে।

ভোট হয়ে গেছে। রহমান সাহেব জিতে এম. এল. এ. হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। রহমান সাহেবের পার্টি এখন ক্ষমতায়। তাই রহমান সাহেবের অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। এখন সব মাস্টারমশাইরাই রহমান সাহেবকে খাতির করেন। অবশ্য তাতে রহমান সাহেবের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তিনি আগের মতোই পার্টি নিয়ে আছেন। সি. পি. এম. পার্টি। আয়ানও এখন কি করে এই পার্টির কাজের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। রহমান সাহেব বলেন, সি. পি. এম. গরীব মানুষের পার্টি। আয়ানরা তো গরীব। তাই এই পার্টি করে।

আয়ান খেলার মাঠ ছেড়ে রহমান সাহেবের বাড়িতে হাজির হল। দেখল সেখানে শিশির,

স্বপন এবং আরও কয়েকজন লোক বসে আছে। আয়ানকে রহমান সাহেব ডেকে বসতে বললেন। তারপর কথা শুরু করলেন, 'আমাদের পার্টির বিজয় উপলক্ষে জেলায় জেলায় বিজয় উৎসব পালন করা হচ্ছে। আমাদের জেলায়ও এই উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সেই উপলক্ষে আগামী রবিবার জনকল্যাণ মাঠে একটা জনসভা হবে। এতে আমাদের জেলা কমিটির লোকেরা আসবেন। রাজ্য কমিটি থেকেও দু'য়েকজন আসবেন। আমাদের দেখতে হবে যে, আমাদের জনসভায় যাতে যথেষ্ট জনসমাগম হয়। তাই প্রতিটি গ্রাম থেকে একটি করে মিছিল স্লোগান দিতে দিতে সভায় এসে মিশবে। তোমাদের গ্রামের মিছিলের ভার দেওয়া হয়েছে নাসিরের উপর। তুমি নাসিরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।' আয়ান বলল, 'স্যার, কোন চিন্তা করবেন না। নাসিরের উপর যখন ভার দিয়েছেন, তখন কোন ভাবনার কারণ নেই। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে মিছিলে অনেক বেশি লোককে সামিল করতে পারি।' নাসির ছেলেটাকে আয়ানের ভাল লাগে। একনিষ্ঠ কর্মী। আর কোনরকম অহঙ্কার নেই। একদম চুপচাপ কাজ করে। রহমান সাহেব আবার বললেন, 'আর হাঁ। খালেক বিশ্বাস আমাদের পার্টিতে আসতে চাইছে। ও কাজ করবে। ওকে ভালোভাবে ব্যবহার কোরো।' আয়ানের এই প্রস্তাবটা ভালো লাগল না। খালেক বিশ্বাসের অবস্থা অনেক ভালো। সে কংগ্রেস করত। সে গরীব নয়। তাহলে সে কেন তাদের পার্টিতে আসবে? তাহলে তাদের সংগ্রামটা আর কার বিরুদ্ধে হবে! লোককে আয়ানরা আর বোঝাবে কি বলে? সে রহমান সাহেবকে বলল, 'কিন্তু খালেক, স্যার, কংগ্রেস করে।' রহমান সাহেব উত্তর দিলেন, 'কংগ্রেস করত। তবে এখন আমাদের পার্টিতে আসতে চাইছে। আচ্ছা এ ব্যাপারে আমরা আলাদাভাবে কথা বলব।' রহমান সাহেব ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাইলেন না। আয়ান এসে কথাটা নাসিরকেও বলল। নাসিরেরও মত নেই। কিন্তু বলল, 'লোকাল কমিটি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন আর আপাতত কিছু করার নেই। আমি পরের মিটিঙে কথাটা তুলব।' নাসির লোকাল কমিটির সদস্য। কাজেই কোন ব্যাপার পার্টিকে জানাতে হলে নাসিরের মাধ্যমেই জানাতে হবে। নাসির জানাবে বলল। তবে আপাতত তারা মিছিলের জন্য উঠে-পড়ে লাগল। উঠে পড়ে লাগল খালেক বিশ্বাসও।

রবিবার তিনপাড়ার মানুষ মিছিলে জড়ো হল। আয়ানদের পাড়ায় প্রায় সবাই সি. পি. এম. করে। শুধু নাদের মণ্ডল আর খালেক বিশ্বাসরা দুয়েক ঘর কংগ্রেস করত। তার মধ্যে খালেক বিশ্বাস শুধু মিছিলেই আসেনি, আশেপাশের বাড়ির লোকদেরও নিয়ে এসেছে। এক আবিদ হোসেনের বাড়ির লোক ছাড়া মাঠপাড়া থেকেও প্রায় সবাই এসেছে। সেখপাড়া থেকেও নাসির প্রায় সকলকেই বের করে এনেছে। প্রায় সবাই হাতে একটা করে লাঠি, বল্লম যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। সবাই একত্র হলে নাসির মিছিলটাকে লম্বা করে সাজাল। সামনে থাকল সে, মাঝে আয়ান আর পেছনে খালেক। সে স্লোগান দিতে থাকল 'ইনকিলাব', সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোকগুলো বলে উঠল 'জিন্দাবাদ।' নাসির আয়ান আর খালেককেও স্লোগান দিতে বলল। স্লোগানগুলো আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আয়ান স্লোগান দিতে শুরু করল 'ইনকিলাব'। আশেপাশের লোকগুলি চিৎকার করে উঠল। 'জিন্দাবাদ'! স্লোগান চলতেই থাকল— ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ; দুনিয়ার মজদুর, এক হও; কৃষক শ্রমিক

ঐক্য, জিন্দাবাদ ; হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই লীগ সংঘ, নিপাত যাক। বাঁচতে গেলে লড়তে হয়, লড়াই করে বাঁচতে হয় ; লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই; ইনকিলাব, জিন্দাবাদ! গোটা মিছিলটা ঢেউয়ের মতো স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলল। রহিম কংগ্রেস করে। মিছিলটা ওর বাড়ির কাছে আসতেই স্লোগানটা আরও জোর হয়ে যায়। যেন তাকে না শুনিয়ে আর ছাড়াছাড়ি নেই। কিন্তু সে শুনছে কি না তা বোঝা যায় না। দুয়েকজন অতি উৎসাহী হয়ে গিয়ে তার টিনের চালটার উপর দমাদম কয়েকটা লাঠির বাড়ি বসিয়ে দেয়। নাসির ওদের নিরস্ত করে। কিন্তু ততক্ষণে রহিমের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছে। সে উত্তেজিতভাবে কি বলছে। কিন্তু মিছিলের লোকেরা ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না। আরও জোরে চিৎকার করে স্লোগান দিতে লাগল। কয়েকজন আবার রগড় করার জন্য হেসে হেসে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। রহিমের স্ত্রী মুখ ঝ্যামটা দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকে গেল। সামনের রাস্তা দিয়ে আসছিল মসলেম। সেও কংগ্রেস করে। তাকে দেখে মিছিলের লোকেরা হাসতে লাগল। আর আরও জোরে জোরে স্লোগান দিতে লাগল। মসলেম রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল।

মিছিলটা এগিয়ে চলল। ক্রমে বাঘডাঙ্গা ছাড়িয়ে এসে পড়ল ভুবনডাঙায়, এখন মিছিলটা কল্পনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কল্পনারা অনেকেই ছাদের উপর থেকে মিছিলটাকে দেখছে। কল্পনাও কি ওকে দেখেছে? আয়ান বুঝতে পারে না। ভালো করে দেখারও সুযোগ পায় না। কল্পনার বাবাও কংগ্রেস করে। তাই মিছিলের লোকেরা এই জায়গাটায়ও জোরে জোরে চিৎকার করছে। আয়ান স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে, মিছিলটা স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা এসে পড়ল থানার কাছে। তারপর থানা পেরিয়ে জলকল্যাণের মাঠে। মাঠে তখন অনেক লোক জমা হয়েছে। মাইকে গণ-সঙ্গীত বাজছে। যে লোকটা গাইছে তাকে আয়ান চেনে। লালগোলা স্কুলের মাস্টার, অলক রায়। সে গাইছে—

এসো কলের শ্রমিক, এসো মাঠের কিষাণ
হাতে নিয়ে বিজয়ের রক্ত নিশান।
সর্বহারা আর রয়ো না বেহুঁশ
মাথা তুলে বলো আজ আমিও মানুষ।।

গণ-সঙ্গীতের সুরের উন্মাদনায় আয়ানের হাতের মুঠি শক্ত হয়ে আসে। চিৎকার করে তারও বলতে ইচ্ছে করে— আমিও মানুষ।

একটার পর একটা মিছিল ঢেউয়ের মত এসে সভায় মিশছে। তাদের সাথে এত লোক! আয়ানের মনে হয় জয় তাদের হবেই। আবার আসছে! কিন্তু একি? এই মিছিলটার সামনে যে কমল হালদার। সেই সুদী মহাজন যার কাছ থেকে তার বাবা কাঁসার ডাবোর দুটো বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছিল। আর ছাড়াতে পারেনি। বছরে শতকরা বাহাত্তর টাকা সুদ। এক বছরের মধ্যে ছাড়াতে পারেনি বলে ডাবোর দুটো কমল হালদার বিক্রি করে দিয়েছিল। পরের বছর পাট বিক্রি করে তার বাবা টাকা নিয়ে ডাবোর দুটো ছাড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু কমল হালদার শুধু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'কবে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তোমার ডাবরের যা দাম এতদিন রেখে সুদে পোষাবে কেন?' সেই কমল হালদার মিছিল করে আসছে। তার মানে সেও সি.পি.এম হয়েছে বা হতে চাইছে। খালেক বিশ্বাস সি.পি.এম.. কমল হালদার সি.পি.এম., তাহলে তাদের

লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে! আয়ানের ভারী অস্বস্তি লাগে। সে নাসিরকে খোঁজ করে। ততক্ষণে কমল হালদার মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মঞ্চে ওঠে।

সেখানে রহমান মাস্টার এবং আরও কয়েকজন বসে আছেন। কমল হালদার গিয়ে একটা চেয়ারে বসে। রহমান সাহেব ঝুঁকে পড়ে কি যেন জিজ্ঞেস করেন। সেও কিছু একটা উত্তর দেয়। মাইকে গণ-সঙ্গীত বেজে চলে। কিন্তু আয়ানের হাতের মুঠো আর শক্ত হয় না। বরং একটা বুকভরা হতাশায় তার হাত-পা শিথিল হয়ে আসে। মনে পড়ে তাদের তালতলার জমিটা এখন কমল হালদারের কাছে বন্ধক আছে। বোনের বিয়ে দেওয়ার সময় বাবা আটশো টাকায় বন্ধক দিয়েছে। বন্ধক দিয়েছে, কিন্তু রেজিস্ট্রি করে দিতে হয়েছে বিক্রি কবলা। কারণ, বন্ধক বলে রেজিস্ট্রি করলে সরকারকে কর দিতে হবে। সরকারকে কর না দেওয়ার জন্য বিক্রয় কবলা রেজিস্ট্রি করেছে। কিন্তু রেজিস্ট্রির খরচ লিখে রেখেছে আয়ানের বাবার নামেই। অর্থাৎ জমি ফেরত নিতে হলে ধারের টাকা দিতে হবে, সুদ দিতে হবে, রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার সময় যে খরচ হয়েছে তাও দিতে হবে। জমিটা এখন আয়ানের বাবা ভাগে চাষ করে। ভাগের অংশ যা পায় বাড়িতে আসে। অন্য অংশ সুদের জন্য কমল হালদারকে দিতে হয়। হাতে টাকা নেই। তাই আয়ানের বাবা জমি ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু তার মা বলে যে, করেই হোক জমিটা ফেরত নিতেই হবে। তাই একটা হিসাব করে রাখা দরকার। মার কথামতই আয়ান একদিন গিয়েছিল কমল হালদারের বাড়ি জমির ব্যাপারে তাদের দেনার হিসেব করতে। হিসাব দেখে আয়ানের চক্ষু ছানাবড়া।

মোট দেনার পরিমাণ ষোল শো ছ'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। রেজিস্ট্রির খরচ লেখা আছে আড়াই শো টাকা। কবে তার বাবাকে খরচ দিয়ে কান্দী পাঠানো হয়েছিল একটা জমির খোঁজ করতে। সে জমি হয়নি। অতএব সে টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে। তার দুশো টাকা। কবে আটা কেনার জন্য নিয়েছিল দশ টাকা। তার বাবা বলে, সে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমল হালদার লাল খাতাটি বের করে বলে, ফেরত দিলে তো খাতাতে লেখা থাকবে। খাতাতে লেখা নেই। অথচ খাতাতে লেখা আছে কবে তার বাবা দুকেজি আম নিয়েছিল তাদের বাগান থেকে। আয়ানের বাবা বলে, ওটা তো ওদের জমিতে সার তুলে দেওয়ার জন্য খেতে দিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য লেখা আছে ছ'টাকা পঞ্চশ পয়সা। আয়ান বলেছিল, মাও তো আপনাকে একটা মোরগ দিয়েছিল। ওটা তো লেখা নেই। ওটার অন্ততঃ কুড়ি টাকা দাম হবে। কমল হালদার অমায়িক হেসে বলে, 'ওটা তো তোর মা খুশি হয়ে খেতে দিয়েছে। ওটা আর কি লিখব?' এই সেই কমল হালদার। কমল হালদার মঞ্চের ওপরে। আয়ানের ভারী খারাপ লাগতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, কমল হালদারের স্বার্থ আর তার স্বার্থ তো আলাদা। তাদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। তাহলে যে পার্টিতে কমল হালদার নেতা সে পার্টি তার স্বার্থ কি করে দেখবে? সে নাসিরের খোঁজ করতে লাগল। নাসির বলল, এখন তো ওসব আলোচনার সময় নয়। পরে আলোচনা করা যাবে। উত্তরটা আয়ানের পছন্দ হল না। সে আস্তে আস্তে মিটিঙ থেকে বেরিয়ে গেল।

আয়ান মিটিঙ থেকে বেরুল বটে, কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না। সর্বাগ্রে তার যাঁর কথা মনে পড়ল তিনি অমর মাস্টার। কিন্তু অমর মাস্টার তার এই বয়সে পার্টি করা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন পার্টি করার জন্যও কিছু বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয়।

অমর মাস্টার বলেন, লেনিনই বলেছেন যে, পার্টি করার জন্য একজন ব্যক্তিকে অন্তত স্নাতক হতে হবে। স্নাতক হতে হবে মানে যে স্নাতক পরীক্ষায় পাস করতে হবে তা নয়—একজন স্নাতকের যতটা পরিণত বুদ্ধি থাকে পার্টি করার জন্য ততটা বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার। আয়ান ভাবল সে বাড়িতেই ফিরে যাবে। কিন্তু তখনই মনে হল, সে গ্রাম থেকে মিছিল করে সকলকে নিয়ে এসেছে। সকলে এখনও মিটিঙে আছে। এখনই সে বাড়ি ফিরে গেলে সেটা ভালো দেখাবে না। তাছাড়া মা অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে। মাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। আয়ান সফিউলের বাড়ি যেতে পারত। কিন্তু তাহলে ওর মা আয়ানকে আর ফিরতে দেবে না। তাই ওখানেও যেতে ইচ্ছে হল না। কিছু ঠিক না করতে পেরে সে ভুবনডাঙ্গার দিকে হাঁটতে লাগল। মিটিঙের মাইকের শব্দ এখনও ভেসে আসছে। গান শেষ হয়েছে। এবার রহমান মাস্টার বক্তৃতা দিচ্ছেন। হয়ত এরপরে কমল হালদার বক্তৃতা দেবে। আয়ান হাঁটতে থাকল।

আয়ান ভাবল, বাড়ি যাওয়ার আগে সে কল্পনার সঙ্গে দেখা করে যাবে। কিছুক্ষণ আগেই সে এই রাস্তা দিয়ে মিছিল করে গিয়েছে। তখন পৃথিবীটা কত আনন্দময় মনে হচ্ছিল। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা দুঃখে ভরা। আয়ান এইসব ভাবতে ভাবতে কল্পনাদের পুকুর পাড়ে এসে পড়ল। পুকুরের পাড় ধরে বাড়ির দরজায় এল। কিন্তু বাইরের বৈঠকখানায় কেউ নেই। আয়ানের কিরকম লাগল, একবার ভাবল ফিরে যায়। কিন্তু আবার কি মনে করে দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। দরজা খুলল কল্পনার বাবা। দরজা খুলেই বলল, 'কে? তুমি? বল?' আয়ান কি বলবে? সে তো কল্পনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু সত্যিকার কোন দরকারই নেই। তাই কি বলবে ভাবছিল। হঠাৎ মনে হল কল্পনার কাছে তার একটা খাতা আছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'কল্পনার কাছে একটা খাতা আছে। খাতাটা আমার দরকার ছিল।' কল্পনার বাবা বলল, 'কল্পনা তো এখন বাড়িতে নেই। ওর কাকার বাড়ি গেছে। তুমি বস, না হয় পরে এস।' কল্পনা নেই। তাহলে বসে কি হবে? আয়ান বলল, 'তাহলে পরে আসব'। এই বলে সে চলতে শুরু করল। তার যেন কিরকম সন্দেহ হচ্ছিল যে, কল্পনা বাড়িতেই আছে। ওর বাবা মিথ্যা করে বলে দিল, ও বাড়ি নেই। আয়ান জানে লোকটা কংগ্রেস করে। তাহলে সে সি.পি.এম করছে বলেই কি এত রাগ? না, কল্পনাকে এমনিতেই আয়ানের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না? যাই হোক আয়ানের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এর থেকে সোজা বাড়ি গেলেই ভালো হত। অথচ বাড়ি যেতে তার ইচ্ছে করছে না।

খানিকটা গিয়েই তনুজাদের বাড়ি। তনুজা খুব ভাল গান করে। তনুজাও প্রাইমারী স্কুল থেকেই আয়ানদের সঙ্গে পড়ে। আয়ানের মনে হল তনুজার কাছে গেলে হয়। কিন্তু তনুজা কিছুতেই গান শোনাতে চায় না। প্রাইমারী স্কুলে তনুজাকে গান করার জন্য অনুরোধ করে আয়ান হয়রান হয়ে যেত। অনেকদিন অমর মাস্টারকেও বারবার অনুরোধ করতে হত। আয়ানের মনে হয়, গান যারা জানে তাদের খুব অহঙ্কার। এতটা ভালো নয়। তার মনে হয় সে গান শিখলে যে বলবে তাকেই গান শোনাবে। আর যদি তনুজার মতো এত ভালো গাইতে পারে তবে লোককে ডেকে ডেকে গান শোনাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে গাইতে পারে না। তবে বড় হলে সে গান শিখবেই।

আয়ান দেখল সে কখন নিজেরই অজান্তে তনুজাদের বাড়ির সামনে এসে গেছে। তনুজা

ছাদে বসে ছিল। তাকে দেখে এসে দরজা খুলল। তনুজার মুখে হাসি। দরজা খুলেই বলল, 'কি, কল্পনার কাছে এসেছিলি?' কথাটা সত্যি। আয়ান তো কল্পনার কাছেই এসেছিল। কিন্তু সত্যি কথাও সময় সময় অপ্রিয় মনে হয়। আয়ানেরও হল। কল্পনার কাছে এসেছিল সত্যি। কিন্তু এখন তো সে তনুজার কাছেই এসেছে। কিন্তু আবার ওরকম করে কথা বলা কেন? কিন্তু আয়ান মুখে সে কথা বলল না। সে কথাটাকে ঘুরিয়ে বলল, 'কেন, আমি কি তোর কাছে আসতে পারি না?' তনুজা অপ্রতিভ হল না। বলল, 'পারিস। কিন্তু আসিস না তো।' আয়ান এবার কথা পেল। সে স্বচ্ছন্দে বলল, 'আসলেও গান শোনাস না বলে আসি না।' এটা যেন কোন যুক্তিই হল না, এরকম ভাব করে তনুজা বলল, 'যখন তখন কি গান করা যায়? তুই কর দেখি!' আয়ান বলল, 'আমি জানলে বলতেও হত না। লোককে ডেকে ডেকে শোনাতাম।' তনুজা এবার হেসে ফেলল, 'আচ্ছা, গান শিখলে ডেকে ডেকে শোনাস।' এবার আবৃত্তি করে শোনা দেখি। তুই আবৃত্তি তো করতে পারিস।'

আয়ান পড়ল মুশকিলে। সে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু সত্যি, এখন আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আবৃত্তি না করলেই তার তর্কে হার হয়ে যাবে। সেটা সে মেনে নিতে পারে না, তাই মনটাকে প্রস্তুত করে আবৃত্তি করতে শুরু করে— আজ হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতাটা সে আবৃত্তি করে ফেলে। নজরুল আর সুকান্তের কবিতা তার ভালো লাগে। তবে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও জীবনা নন্দের কবিতা তার ভালো লাগছে। তাই ভালো লাগা এই কবিতাটা সে মুখস্থ করেছে। আর তনুজার সঙ্গে তর্ক করে এক্ষুনি সেটা আবৃত্তি করে শোনাল। এবার তনুজার ভালো না লাগার যুক্তি অচল। অতএব সেও হার্মোনিয়ামটা খুলে বসল। আয়ান বলল, 'রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা কর তো— ক্ষমিতে পারলাম না তব ক্ষমাহীনতার অপরাধ।' তনুজা বলল, 'ওটা আমার তোলা নেই।' তারপর হার্মোনিয়ামের রীডে হাত দিয়ে গাইতে লাগল একটা নজরুল গীতি— 'গুলবাগিচার বুলবুলি আমি। রঙিন প্রেমের গাই গজল হায়।'— শেয়র আর তাল ভাগ করে তনুজা চমৎকার গাইল। শেয়র থেকে তালে যাবার সময় গমকটা আয়ানের সব থেকে ভালো লাগল। গানের সুরটা যেন তাকে একটা অপার্থিব শান্তি দিচ্ছে। গানটা শেষ হলে আয়ান বলে উঠল, 'আরেকটা কর।' তনুজা আবার রীডে হাত দিল।

ষোল

নাসিরের বক্তব্যে আয়ান সন্তুষ্ট হতে পারেনি। নাসির তাকে একদিন পার্টি অফিসেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের কথাও আয়ানকে সন্তুষ্ট করেনি। তাদের বক্তব্য যে, তারা জানে এই কমল হালদাররা পার্টিতে থাকতে পারে না। তারা একদিন পার্টি থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই বেরিয়ে যাবে। তবে যতদিন আছে তাদেরকে পার্টির স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আয়ানের মনে হয়েছে যে, পার্টি তাদেরকে পার্টির স্বার্থে কাজে লাগাতে পারছে না। অপরপক্ষে তাদের হাতে পার্টির নেতৃত্ব থাকায় তারাই নিজেদের স্বার্থে পার্টিকে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে পার্টি আয়ানদের মতো একেবারে গরীব মানুষদের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে না। তার এ বক্তব্য পার্টির লোকেরা অস্বীকার করেনি। আবার মেনেও নেয়নি। আয়ানও তাদের

মনগড়া বক্তব্যে খুশি হতে পারেনি। তাই পার্টি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের না হয়ে গেলেও পার্টির কাজে আর তেমন উৎসাহ নেই। আয়ান ক্লাসের পড়ার পর সে বাড়ির কাজ করে। তারপরেও সময় থাকলে পড়াশোনা করে। সম্প্রতি সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিকেও ঝুঁকেছে। এবার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যে নাটক অভিনীত হবে তাতে আয়ান সাহিত্যিকের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাছাড়া সে একটা ছোট হাস্যকৌতুকও রচনা করেছে। ঐ একই দিনে অভিনীত হবে।

পুরস্কার বিতরণী সভা হয়ে গেলেও স্কুলে ক্লাস জমে উঠল না। কারণ সামনে সরস্বতী পুজো। এবার পুরস্কার বিতরণী সভায় অভিনয় করে আয়ান ভারী জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। তাই ক্লাসের ছেলেরা দাবি করল যে, আয়ানকে সরস্বতী পুজোয় থাকতে হবে। আয়ান পড়ল দোটানায়। সে যে ধর্ম পালন করে তাতে মূর্তিপুজো মহাপাপ। আবার সে যে পার্টির সঙ্গে যুক্ত তারা বিশ্বাস করে ধর্ম সমাজের পক্ষে আফিম স্বরূপ। তবে ধর্ম এবং পার্টি উভয়ের প্রতি আয়ানের আস্থা এখন অনেকটা শিথিল। ধর্মে আগের মত আস্থা থাকলে সে অভিনয় করতে পারত না। কারণ তার ধর্মে অভিনয়ও পাপ। আর পার্টির কাজে মন থাকলেও সে এসবের জন্য সময়ই পেত না। তাই সে রাজী হয়ে গেল। সে মনকে এই প্রবোধ দিল যে, সে তো নিজে পূজা করছে না। তা ব্যাপারটা কি, তা দেখার জন্য সে থাকতেই পারে। সে থেকে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে বাঁশের খুঁটি পুঁতে স্টেজ বাঁধল, দেবদারু পাতা কেটে এনে সাজাল। সকালবেলায় মেয়েরা এল। তারা একখানা দুখানা করে শাড়ি দিয়ে গেল। শাড়িগুলোকে স্টেজে লাগানো হল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় লুচি আর আলুরদম খেয়ে 'দম দম মস্ত কলন্দর।' যার যখন যে গান মনে পড়ে সে তখন সেই গান তার যেরকম খুশি সেই রকম করে গাইতে থাকে। আয়ানের মনে হয় এই যাচ্ছেতাইয়ের মধ্যেও যেন একটা স্বতস্ফূর্ত সৌন্দর্য আছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য আর বেশিক্ষণ থাকল না।

সঙ্গীতচর্চা বন্ধ হল। এখন একজন আরেকজনের পেছনে কাঠি দিতে লাগল। এ ব্যাপারে বর্তমান হেডমাস্টারের ছেলে নয়ন এক্সপার্ট। দুয়েকটা কথা হতেই সে বলল, 'কিরে চপ্লা? তোরা কি কাকা-ভাইপো দুজনেই ঐ সীমা ছুঁড়িটার জন্যে পাল্লা দিচ্ছিস?' চপল আজ সীমাদের বাড়ি গিয়েছিল। নয়ন যে সেটা লক্ষ্য করেছে সেটা সে আগেই বলেছে। আর চপলের এক কাকার সঙ্গে যে সীমার বিশেষ সম্পর্ক আছ সেটা সকলেরই জানা। নয়নের আক্রমণের মাল-মশলা এগুলিই। কিন্তু এ আক্রমণে চপল রেগে গেল, 'শালা। তোর কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? আমি কাকীমা বলি।' নয়ন ছাড়ার ছেলে নয়। সে বলল, 'কাকীমা বলিস তো কি হয়েছে? কাকীমা বলতে বলতে যদি দুয়েকবার দিদিমা বলেই দিস..?' কি জানি এর মধ্যে কিছু সত্যতা ছিল কি না। কি জানি চপলের মনে সেরকম সামান্যতমও কোন কামনা ছিল কি না। তবে চপল একটু বেশিই রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল, 'তোর মতো? তুই যেমন কল্পনার পেছনে দিনরাত ঘুরিস।' কল্পনার কথা এসে যাওয়ায় আয়ানের অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি এমন ভাব করার চেষ্টা করল। কিন্তু নয়ন কপট লজ্জার ভান করে জিভ কামড়াল, 'না ভাই, ওকথা বলিস না, আয়ান আছে। ওটা আয়ানের রিজার্ভ মাল।' এমনিতেই আয়ানের খারাপ লাগছিল। তারপর এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আয়ানের ভীষণ খারাপ লাগল। সে বলল, 'এরকম আলোচনা হলে কিন্তু আমি নেই।' নয়নটা আরও মজা পেল। সে গাম্ভীর্যের

ভান করে বলতে লাগল, 'না ভাই। আর যাই কর। কল্পনাকে নিয়ে কোন কথা বলো না।' আয়ানের প্রাণে ব্যথা লাগে। আয়ান বুঝল এবার সবাই মিলে তার পেছনে লাগবে। সে সুদীপের হাত ধরে বলল, 'চল আমরা স্টেজটা দেখে আসি।' সে ওখান থেকে চলে গেল।

এইভাবে গানে-গল্পে-ঘুমে রাতটা কেটে গেল। পরের দিন শ্রীপঞ্চমী। আজই পুজো হবে, অঞ্জলি হবে। সবাই লেগে গেল যোগাড় যন্ত্র করতে। ময়দা-মিষ্টি-ঘি, ফুল, ফলমূল সব বাজার থেকে আনা হল। তারপর কেউ লাগল ফুলের মালা গাঁথতে, কেউ লাগল ফলমূল কাটতে। আবার কেউ লাগল আটা মাখতে। আয়ান ফুলের মালা গাঁথবে বলেছিল। কিন্তু সমীরবাবু বললেন, 'ফুলগুলো মেয়েদের দিয়ে দে। মালাটালা ওরা গাঁথুক।' আয়ান ফুলগুলো মেয়েদের দিয়ে দিল। দেখল সীমা, কল্পনা দুজনেই এসেছে। রাতের আলোচনা মনে পড়ায় আয়ানের কেমন যেন সংকোচ লাগল। সে ওখান থেকে উঠে গিয়ে লুচি ভাজতে লাগল। এমন সময় হরিদেব টিকিওয়ালা একজন পুরোহিত নিয়ে হাজির হল। পুরোহিতমশাই পুজোর তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। কারণ তার নাকি আরও পাঁচজায়গায় পুজো করতে হবে। সমীরবাবু পুজোর জন্য বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আয়ান তেলের কড়াইটা সুদীপের তত্ত্বাবধানে দিয়ে মূর্তিটার কাছে এল। পুজোর সময় পুরোহিত কি করে, সেটা দেখার তার খুব ইচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল যে আর বেশি লুচি ব্যালা নাই। এক্ষনি বেলতে না লাগলে কড়াই খালি পড়ে থাকবে। সে উনুনের দিকটায় যাচ্ছিল। দেওয়ালটার কাছে এসেছে, তখন তার হঠাৎ মনে হল, কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাকছে। সে পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু না। পেছনে কেউ নেই। কিন্তু এবার সে শুনতে পেল। কণ্ঠস্বরটা খুব চাপা— আসছে পেছন থেকে নয়, দেওয়ালটার আড়াল থেকে। সুপ্রিয় সমীরবাবুকে খুব আস্তে আস্তে বলছে, 'ওগুলো পুজোয় দেওয়া যাবে না স্যার।' সমীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' সুপ্রিয় বলল, 'ওগুলো আয়ান ছুঁয়েছে স্যার।' আয়ান আর যেন কিছু শুনতে পেল না। সমীরবাবু কী উত্তর দিলেন, সুপ্রীয় তারপর কি বলল আয়ান তার কিছুই শুনতে পেল না। এই অনুষ্ঠানে হঠাৎ তার নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হল। সে একটা জিনিস ছুঁয়েছে বলে পুজোতে দেওয়া যাবে না। তাহলে সে এই পুজোতে আছে কেন? তার এও মনে হল যে, বোধহয় সেই কারণেই সমীরবাবু তাকে কৌশলে মালা গাঁথা থেকে নিরস্ত করেছে। সে ওখান থেকে মণ্ডপটার দিকে এগিয়ে এল। দেখল, কল্পনা অন্যান্য মেয়েদের সাথে বসে তখনও মালা গাঁথছে। তার খুব কষ্ট হল। তাই কাউকে কিছু না বলে সে চুপ করে ওখান থেকে বেরিয়ে এল। গেটের কাছে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। আয়ানকে দেখে সে বলল, 'কিরে, কোথায় চললি?' আয়ান নির্দিষ্ট করে কোন উত্তর দিল না। বলল, 'এই একটু কাজ আছে, যাচ্ছি।' সে গেট দিয়ে বের হয়ে গেল।

আয়ান স্কুল থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাটাকে মন থেকে কিছুতেই বের করে দিতে পারল না। তার শুধুই মনে হতে লাগল যে তার একমাত্র অপরাধ এই যে, তার বাবা-মার ধর্ম হিন্দু নয়। তাই সে যতই ভালো ছেলে হোক তার ছোঁয়া কোন জিনিস পুজোয় দেওয়া যাবে না। তাহলে কি দরকার এরকম পুজো করার? কিন্তু তবুও সে এর জন্য হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ হতে পারল না। কারণ সে জানে যে, এই কুশ্রীতা শুধু হিন্দুধর্মের নয়, সব ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি ধর্মেরই বিধান এমনভাবে প্রবর্তিত হয়েছে যেন বিশ্বের সব লোক সেই ধর্মই মেনে চলবে। একাধিক ধর্মের লোক কিভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে তার বিধান কোন ধর্মেই

নেই। তাহলে কি করতে হবে? আয়ান ঠিক করতে পারে না। তাই বাড়ি ফিরেও সে শান্তি পায় না। ভাবে নাদের মণ্ডলের অনেক বুদ্ধি। দেখা যাক সে কি বলে। কিন্তু নাদের মণ্ডল যা বলে তা আয়ানের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। নাদের মণ্ডল বলে, 'ধর্ম! তো একটাই আছে, মুসলমান ধর্ম। এই ধর্ম যারা পালন করবে তারা বেহেস্তে যাবে। নবীর মুরিদ না হলে যে যাই করুক সব দুজুকে যাবে।' নাদের মণ্ডলের এই বক্তব্য মেনে নিলে যা দাঁড়ায় তা হল এই যে, আয়ান জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্ম পেয়েছে, সে এই ধর্মটা পালন করলেই স্বর্গে যাবে। কিন্তু অমর মাস্টার জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্ম পাননি। তাই তিনি যত ভালো কাজই করুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে নরকে যাবেন। এটা হতেই পারে না। আয়ান এটা মানতে পারে না। আবার অনেক ধার্মিক লোক বলে যে, সব ধর্মের মূল কথা একই, তাও আয়ান মানতে পারে না। এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের ফারাক অনেক বেশি। অনেক সময় দুটি ধর্মের বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন ইসলাম ধর্ম অনুসারে মূর্তিপুজো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু হিন্দুধর্মে মূর্তিপুজো ঈশ্বরপ্রাপ্তির একটা উপায়। কিন্তু এ তো কোনমতেই হতে পারে না যে, কেউ হিন্দু ঘরে জন্মেছে বলে মূর্তিপুজো করে স্বর্গে যাবে, আর কেউ মুসলমান ঘরে জন্মেছে বলে মূর্তিপুজোর অপরাধে নরকে যাবে। এই ভাবনাগুলো আয়ানের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। সে কিছুতেই শান্তি পায় না। না পেরে, শেষ পর্যন্ত অমর মাস্টারের বাড়ির দিকে যাত্রা করে, তিনি যদি কোন সমাধান দিতে পারেন।

অনেকদিন পর আয়ানকে দেখে অমরবাবু খুবই খুশি হলেন। কিন্তু আয়ানের মুখে ঘটনার কথা শুনে তিনিও দুঃখ পেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ঘটনাটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। তবুও আমি বলব, তুমি দুঃখ করো না।' আয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'স্যার, আমি তো ওরকম দুঃখ করিনি। তবে আমার মনে প্রচণ্ড অশান্তি হচ্ছে। তাই আপনার কাছে এসেছি।' অমরবাবু এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন। তারপর আয়ানের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখ, যারা এরকম করে, তারা জানে না, আর জানার চেষ্টাও করে না। তুমি জানার চেষ্টা করো।' আয়ান অমরবাবুর মুখের দিকে তাকল। অমরবাবু বলতে থাকলেন, 'বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিল একটি নদী। ঐ যে এলাহাবাদের কাছে ত্রিবেণী সঙ্গম আছে। ত্রিবেণী সঙ্গম বলতে তিনটি নদীর মিলনস্থল। তিনটি নদী হল গঙ্গা, যমুনা আর এই সরস্বতী। এখন আর সরস্বতী নেই। কিন্তু আগে ছিল। বৈদিক যুগের লোকেরা সাফল্যের জন্য সরস্বতীর তীরে গিয়ে যাগযজ্ঞ করত। ক্রমে এমন হল যে, সরস্বতীর জন্যই যাগযজ্ঞ করতে লাগল। তখনও মূর্তি তৈরি হয়নি। কিন্তু তারও পরে সরস্বতীর মূর্তি তৈরি হল। এবং তারও অনেক পরে সরস্বতী বিদ্যার দেবী হল। বর্তমানে তো শ্বেতবসনা সরস্বতী দেখ। তবে সরস্বতী একসময় কালো ছিল। কোথাও কোথাও সরস্বতীর কালো মূর্তি দেখা যায়। তাহলে একটা নদীকে লোকে অনেক যুগের অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শ্বেতবসনা বিদ্যার দেবী করেছে। এতসব ব্যাপার জানলে আমার ধারণা ওরা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না।' আয়ানের কাছে যেন ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার মনে হল। তার মনে হল স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে মানুষ যুগে যুগে কিছু নিয়ম করেছে, আর সেই নিয়মগুলোকে ঈশ্বরের বিধান বলে চালিয়ে দিয়েছে। ধর্ম এই ঈশ্বরের নামে মানুষের তৈরি বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। আয়ানের মনে একটা প্রশান্তি নামে, ঘটনাটাকে এখন তার অনেক তুচ্ছ বলে মনে হল।

সতের

হঠাৎ করে একদিন কারা যেন এক লরী সিমেন্টের বস্তা এনে আয়ানদের গোয়ালঘরে নামিয়ে দিয়ে গেল। যারা সিমেন্ট নামাচ্ছিল আয়ান তাদের জিজ্ঞেস করাতে বলল— বি. ডি. ও. অফিস থেকে বলেছে। আয়ান ব্যাপারটা কি জানার জন্য বি. ডি. ও. অফিস যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের পালের ভুঁইয়ের কাছে আসতেই দেখল যে, চার-পাঁচটা লরী থেকে সিমেন্টের মোটা মোটা পাইপ নামানো হচ্ছে। তারাই বলল, যে, মাঠে ডীপ টিউবওয়েল বসবে। পাতাল থেকে জল তুলে আবাদ হবে। সেকথা শুনে বাঘডাঙ্গার লোকেরা শঙ্কিত হয়ে পড়ল, 'যাও বা দুয়েক বিঘে জমি ছিলো তাও এবের গরমেন্ট লিয়্যা লিবে।' কেউ তাদের কাছে ঘেঁষল না। অনেক বড় বড় গাড়ি এল। একটা ইয়া বড় ক্রেন এল। ক্রেনের মাথায় একটা আলো জ্বলে। ক্রেনটা রাতদিন মোটা মোটা পাইপগুলোকে টেনে তুলে জোড়া দেয় আর ঘোরাতে ঘোরাতে পাতালে পাঠিয়ে দেয়। পাইপের মধ্যে দিয়ে জল কাদা আর বালি উপরে উঠে আসে। তার সঙ্গে উঠে আসে নানান রঙের ছোট ছোট নুড়ি। তা কুড়োবার জন্য গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি মারামারি লাগিয়ে দেয়। ক্রেনের সঙ্গে যারা এসেছে তারা কাপড়ের ত্রিপল দিয়ে তাঁবু খাটিয়েছে। সেখানেই তারা দিন-রাত থাকে। ডোমকল বাজার থেকে রোজ মাছ-মাংস তরি-তরকারি নিয়ে আসে। তারা রোজ মাছ-মাংস খায়। গ্রামের কারো বাড়িতে বড় মোরগ দেখলেই যতই দাম লাগুক কিনে নিয়ে চলে আসে। আয়ানের মা বলে, 'নীলকুঠির সাহেবরাও ওরকম করতোক। তবে এরা দাম দেয়, ওরা দাম দিতোক না।' আয়ান বাজিতপুরে ভাগারু বাড়ি যাওয়ার পথে দেখেছে বড় বিলের ওপারে ডোমকল থেকে বহরমপুর যে রাস্তাটা গেছে তার আগেই একটা নীলরঙের কাঁচ দেওয়া প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। বাড়িটার আশেপাশে অনেকগুলো পুকুর, ফুলের বাগান, ফলের গাছ আর দক্ষিণ দিকে কতগুলো কবর। আয়ান প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে, কবর এরকম হয়। পাকা বাড়ির মতো বাঁধানো। তার উপরে সুন্দর হরফে ইংরেজিতে লেখা— ডেভিড টমসনের স্মরণে, জন্ম ১৯৩৩, মৃত্যু ১৯৪৬। পরে তাদের গ্রামের সরিফন যখন মারা গেল তখন বুঝতে পারল। সরিফনের অনেক জমি ছিল। যাবার আগে জমিগুলো সে সামেদকে দিয়ে গিয়েছিল। তাই সামেদ তার কবর ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে ওপরে নাম লিখে দিয়েছিল। সরিফন বেওয়া, মৃত্যু ১৯৬৭। সরিফনের জন্ম-তারিখ রাখা ছিল না। বাঘডাঙ্গা গ্রামের কারও রাখা থাকে না। আয়ানেরও নেই। তবুও ঐ লেখাটা দেখেই আয়ান বুঝতে পেরেছিল যে, নীলকুঠির দক্ষিণের বাঁধানো ওগুলো কবর। বুঝতে পেরেছিল নীল নীল কাঁচ আছে বলেই কুঠিটাকে নীলকুঠি বলে।

অনেকদিন পরে ক্লাস নাইনে উঠে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়ে পড়তে গিয়েই মাত্র তার ভুল ভেঙেছে। বুঝতে পেরেছে নীলকাঁচের কুঠি বলে নয়—ঐখানে নীলকর সাহেবরা থাকত বলে কুঠির নাম নীলকুঠি হয়েছে। মা বলে ঐ কুঠির লোকেরা মুরগি ছাগল নিয়ে যেত। কিন্তু দাম দিত না। কিন্তু এরা দেয়। দাম দেয়, তবে আয়ান বুঝতে পারে না তারা রোজ রোজ মাছ-মাংস খায় কেন? মাছ-মাংস তো অনেক দিন বাদে বাদে খেতে হয়। কিন্তু তারা রোজ রোজ খায়। তারপর একদিন সব বন্ধ করে ক্রেনটা নিয়ে চলে যায়।

এবার মাঠের মধ্যে নর্দমা কেটে পাইপ বসাতে হবে। আর কিছুদূর অন্তর অন্তর মেন পাইপ থেকে জল উঠে আসার জন্য স্পাউট। ওই কাজের ঠিকে নিয়ে এল নিমতলার ইরফান। কিন্তু মাটি কাটাতে, স্পাউট গাঁথতে লোকজনের দরকার। আশেপাশের গ্রাম থেকে যোগাড় করতে পারলে খরচ কম পড়বে। তাই লোকজন যোগাড় করার জন্য ইরফান সহযোগী নিল সামেদকে। সামেদের সাগরেদ ছিল কামাল ডাকাত। তাদের দুজনের খুব ভাব। একসঙ্গে খানাপিনা করে। মাঝে মাঝে চলাফেরাও। নতুন কাজ পেয়ে সামেদ আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন যোগাড় করে নিয়ে এল। মাঠে মাঠে পাইপ লাগিয়ে স্পাউট গাঁথা হয়ে গেল। তারপর যেখানে ডীপ টিউবওয়েল বসেছিল ওখানে দুখানা ঘর হল। টিউবওয়েলটার ওপরেও একটা ছোট ঘর হল। মেশিন এল। দুটো খুঁটির ওপর ট্রান্সফরমার বসল। ডোমকল থেকে ইলেক্‌ট্রিকের লাইন এল। আর যারাই কাজ করল তারাই সামেদের মাধ্যমে লোকজন যোগাড় করল। লোকজন কাজ শেষ হলে পয়সা চাইল। সামেদ বলল, 'সরকারের কাজ তো। এখুনো পয়সা স্যাংশান হয়নি। স্যাংশান হলেই দিয়্যা দিব।' পয়সা স্যাংশান হল না। কিন্তু ডীপ টিউবওয়েলের ঘরে দুজন লোক এসে গেল।

এদের মধ্যে একজনের নাম নির্মল চক্রবর্তী। হুগলী জেলার লোক। তার সারা গায়ে শ্বেতী। বয়স ত্রিশ-পয়ঁত্রিশ। কিন্তু অবিবাহিত। সে নাকি অপারেটর। ডীপ টিউবওয়েল সেই চালাবে। আরেকজন যে ছিল তার নাম হারাধন দাস। বাড়ি বহরমপুরের কাদাই তাঁতীপাড়া। বয়স বাইশ-তেইশ। বিবাহিত। সঙ্গে তার স্ত্রীও এল। সে ওয়াটার অ্যাসিস্ট্যানট্, ডব্লিউ. টি.। আয়ান গিয়ে একদিন আলাপ করল। আলাপ করল অন্যান্য লোকেরাও। গ্রামের লোকেরা হারাধনের নামকরণ করল হারু। এ নামটা তাদের অনেকটা পরিচিত। কিন্তু নির্মল চক্রবর্তীর ওরকম সহজ নাম তারা পেল না।

চক্রবর্তী নাম তারা উচ্চারণ করতে পারে না বলেই হোক, আর তার সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকার জন্যই হোক গ্রামের লোকেরা তার অসাক্ষাতে তাকে উল্লেখ করতে লাগল 'চখরা মখরা' বলে। অবশ্য তার সামনে বলে অপারেটর বাবু। একদিন অপারেটর বাবু মেশিন চালু করল। সঙ্গে সঙ্গে স্পাউট দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল উঠতে লাগল। অপারেটর বাবু বলল, যার যত খুশি জল নিয়ে আবাদ করুন, প্রথম বছর কোন পয়সা লাগবে না। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তার ফাঁদে পা দিল না। তারা জানে, 'লোভ দেখিয়ে দু-একবার আবাদ করতে দেবে। তারপর যেই আবাদ শুরু করবে, অমনি সব জমি গরমেন্ট লিয়া লিবে।' কাজেই কেউ জল নিয়ে আবাদ করতে এল না। আয়ান তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, সরকার যদি জমি নিতেই চায় তবে তো এমনই নিতে পারে। কেউ জল না নিলেও নিতে পারে। ডীপ টিউবওয়েলের জল নিলেই নিয়ে নেবে, এরকম ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু সে বোঝাতে পারেনি। খরায় জমির ফসল শুকিয়ে গেছে, তবুও ইব্রাহিম ডীপ টিউবওয়েল থেকে জল নেয়নি। এক সামেদ ছাড়া গ্রামের কোন লোকই নেয়নি।

সামেদ ডীপ টিউবওয়েল বসানোর সময় কাজ করেছিল। ফলে অপারেটর এবং ডব্লিউ. টি. উভয়ের সঙ্গেই তার ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে কারও কথা শোনেনি। সে প্রথম বছরেই সেচ নিয়ে আবাদ করল। অন্যান্যদের থেকে ফসল অনেক ভালো হল। তার পরেরবার

খালেক বিশ্বাসও জল নিল। লোকে দেখল দুবছর হয়ে গেলেও সামেদ বা খালেকের জমি কেউ নিল না। তখন গ্রামের লোক একে একে সকলেই জল নিতে লাগল। শেষে এখন এমন হয়েছে যে, কে কার আগে জল নেবে তাই নিয়ে মারামারি। ডীপ টিউবওয়েল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা হওয়াতে বাঘডাঙ্গা গ্রামের মাঠে ভালো ফসল হতে শুরু করল। এতদিন পর্যন্ত ওপরের মাঠে শুধুমাত্র দুটো ফসল হত। খরিফ মরশুমে আউস ধান বা পাট এবং রবি মরশুমে মুসুরি, খেসারি, ছোলা ইত্যাদি। কিন্তু সেচের ব্যবস্থা হওয়ায় এখন বোরো চাষ শুরু হল। গমের আবাদ বাড়ল। তাছাড়া পাট বা ধানের ফলনও বাড়ল। সরকার একর-পিছু একশ টাকা করে সেচ কর বসাল। কিন্তু তারপরেও ডীপ টিউবওয়েলের জল দিয়ে সেচের খরচ শ্যালো মেশিন দিয়ে সেচের খরচের থেকে কম হল। কম খরচে সেচের ব্যবস্থা হওয়ায় গ্রামের লোক অনেকটা লাভবান হল, যাদের জমি আছে তাদের তো সুবিধা হলই। যারা জমি ভাগে করে তাদেরও আয় বাড়ল। যাদের জমি নেই বা যারা জমি ভাগেও করে না তাদের কোন প্রত্যক্ষ লাভ হল না বটে, তবে পরোক্ষভাবে তাদেরও সুবিধা হল। সেচের ফলে বছরের প্রায় সব সময়ই মাঠের কাজ চলতে থাকল। ফলে তারা কাজ পেল।

লাভবান সকলেই হল, তবে সব থেকে বেশি লাভ হল সামেদের। সে প্রথম বছর থেকেই সেচ নিতে শুরু করেছিল, ফলে দু-তিনটে আবাদ সে বিনা পয়সায় করে নিল। আর পরের আবাদেও তাতে সুবিধা হল। তার হাতে কিছু পয়সা জমল। মাঠে পাইপ বসান এবং স্পাউট গাঁথার জন্য ইরফনের হয়ে সে লোক যোগাড় করেছিল। বাঘডাঙ্গার ডীপ টিউবওয়েলের জন্যে করেছিল, আশেপাশে মাঠের ডীপ টিউবওয়েলের জন্যও করেছিল। কথা ছিল স্যাংশান হলেই পয়সা দিয়ে দেবে। ইরফানের কাছে সে পয়সা নিয়ে নিল। কিন্তু স্যাংশান আর হল না। লোকে একদিন পয়সা চাইতে এল, দুদিন চাইতে এল, চারদিন এল। পাঁচদিনের দিন আয়ানদের চারা আমগাছটার নিচে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। তারপর দুহাত তুলে অভিশাপ দিল, 'এই গরীবদের এত কষ্ট করা পয়সা যে দিল না, আল্লা যেনো তার ভালো করো না।' অভিশাপ দিয়ে তারা চলে গেল। কয়েকজন হাঙ্গামা করার চেষ্টা করল। কিন্তু এ ব্যাপারে সামেদের সহায় কামাল। কথায় বলে কল্লাকে দেখে আল্লা ডরায়। আল্লা ডরাক আর না ডরাক, মানুষ ডরায়। কামালের ভয়ে লোকেরা সামেদের কিছু করতে পারল না। ডাকাত মানুষ, বলা যায় না, কবে দলবল নিয়ে গিয়ে মেরে ধরে খুনই করে ফেলবে। অতএব তারা শুধু অভিশাপ দিয়েই ক্ষান্ত হল— আল্লা উয়ার ভালো করবে না। যে টাকা লোককে দিতে হত তার থেকে কামালকে কিছু দিতে হল বটে, কিন্তু তার পরেও তার হাতে অনেকটা টাকা থেকে গেল।

এমন সময় মাঠপাড়ার ফৈমুদ্দিন মারা গেল। তার কুড়ি-বাইশ বিঘে জমি ছিল। তার শেষপক্ষের স্ত্রীর প্রথম ছেলের বয়স তখন সাত বছর। কিন্তু তার প্রথম পক্ষের বড় ছেলে ফড়িঙের বয়স ষাট। ফড়িঙের বড় ছেলের বয়সই আঠার। ফরিঙ তার জমিগুলো গিয়ে দখল করল। শেষপক্ষের স্ত্রী তখন তার নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে সুবিচারের জন্য মোড়লদের কাছে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে ফৈমুদ্দিনের বৌ সামেদের কাছেও এল। সামেদ এখন যথেষ্ট চালাক লোক। সে বলল, 'আমি তো চাই তুমার ন্যায্য ভাগ তুমি পাও। কিন্তু পাড়ার সব লোক তো ফড়িঙের

দিকে।' ফৈমুদ্দিনের শেষপক্ষ ভাবল সামেদ তার দিকে আছে। সে আর একটু সরে এসে বলল, 'ইডা তো ঠিকই যে, সব লোক এখন উয়ার দিকে। কিন্তু একটা বুদ্ধি তো দ্যাও।' সামেদ খানিকক্ষণ বসে থাকল। এমন ভাব করল যে, ফৈমুদ্দিনের শেষপক্ষের জন্যে সে ভেবে ভেবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর একসময় বলল, 'তুমি একটা কাজ কোরতে পারো। তুমি জমিগ্যালা বিক্রি করে দ্যাও।' কথাটা শেষপক্ষের মনঃপুত হল না, 'জমি বেচে দিলে, আমি খাবো কি?' আমার নাবালকেরা খাবে কি?' সামেদ বলল, 'জমি বিক্রি কোর‍্যা তুমি তো টাকা পাবা, তাই খাবে?' কিন্তু শেষপক্ষ তাতেও সন্তুষ্ট হল না। সে বলল, 'টাকা তো তিনদিনেই ফুরিয়ে যাবে, তারপর কি হবে?' সামেদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে আবার ভাবতে লাগল, একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে এক কাজ করো।' 'কি কাজ?' 'তুমি জমিগ্যালা এখুন আমার নামে লেখ্যা দাও। আমি দখল করি । তারপর দখল হয়ে গেলে আবার তুমাকে লেখ্যা দিবো।' এই প্রস্তাবটা শেষপক্ষের মনে ধরল। সে ভাবল এতে ফড়িঙও জব্দ হবে। আবার তার জমিও থাকবে। সে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সামেদ জমিগুলি শুধুমাত্র তার নামে রেজিস্ট্রি করল না। সে জানত যে, ফড়িঙ জমিগুলি এমনি ছাড়বে না। কারণ ফড়িঙ তার বাবার শেষপক্ষকে স্বীকারই করতে চাইছে না। সে বলছে, তার বাবার জমি এখন তার। তাই জমি দখল করতে হলে লোকজনের দরকার। পাড়ার নাদের মণ্ডলের গোষ্ঠী বড়। তাই সে নাদের মণ্ডলের সঙ্গে গোপনে কথা বলল এবং জমি তাদের দুজনের নামে রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। তারা জমি দখল করে নিল। একসঙ্গে সামেদ আর নাদের মণ্ডলের লোকদের জমিতে উপস্থিত দেখে ফড়িঙ হাঙ্গামা করতে সাহস করল না। সে গিয়ে একটি উকিল ধরে কোর্টে মামলা করে দিল।

মামলা চলতে লাগল। সামেদ আর নাদের জমিগুলি আবাদ করছিল। ফৈমুদ্দিনের শেষপক্ষকে খাবার জন্য কিছু দিচ্ছিল আর মামলার খরচ চালাচ্ছিল। কিন্তু ফড়িঙকে মামলার খরচ চালাতে হচ্ছিল নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে। আর তার সব জমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় তার পয়সা রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিন পড়লেই মামলা হোক আর না হোক উকিলের পয়সা চাই। একটা দরখাস্ত লিখতে গেলে মুহুরিবাবু পয়সা চায়। মামলার দিন কবে পড়েছে জানতে হলে কেরানিবাবুরা পয়সা চায়। সাক্ষীদের নিয়ে যেতে হলে তাদের বাসের ভাড়া, হোটেলের খরচের জন্য পয়সা চাই। কোর্টের ভাঙা ভাঙা ইটগুলো এবং কোর্টের কাছের গাছগুলোও যেন পয়সা চায়। মামলা করতে গেলেই পয়সা চায়। কিন্তু অতো পয়সা ফড়িঙের নেই। আর পয়সা না থাকলে মামলায় হার হবেই। ফড়িঙ মামলা চালাতে পারল না। সে হেরে গিয়ে ধুঁকতে লাগল। জমি সামেদ আর নাদের মণ্ডলের দখলে এল। ফৈমুদ্দিনের শেষপক্ষ এবার সামেদের কাছে গিয়ে বলল, 'এবের জমি আমাকে লেখ্যা দ্যাও।' শেষপক্ষ জানত না যে, সামেদ জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নেয়নি। সে বলল, 'জমি তো শুধু আমার নামে নাই যে, আমি রেজিস্ট্র কোরলেই হবে। তুমি নাদের মুনডোলের কাছে যাও। আমাকে যখুন বুলবা তখুনই রেডি।' শেষপক্ষ নাদের মণ্ডলের কাছে গেল। নাদের মণ্ডল বলল, 'আমার সাথে তো তুমার কুনু কথা হয়নি। সামেদের সাথে কথা বোলো।' শেষপক্ষ ফিরে সামেদের কাছে এল। কিন্তু সামেদ তখন বাড়ি নেই। এইভাবে চলতে লাগল।

এমন সময় একদিন ভোররাতে পুলিশ এসে কামাল ডাকাতকে ধরে নিয়ে গেল। আগের

রাতে বিলাসপুরে ডাকাতি হয়েছিল। ডাকাতের গুলিতে একজন লোক ঘায়েল হয়েছিল। লোকটি হাসপাতালে মারা গেছে। তবে মরার আগের জবানবন্দীতে নাকি সে কামালকে চিনতে পারার কথা বলেছে। পরের দিন গ্রামে আবার পুলিশ এল। তারা কামালকেও সঙ্গে নিয়ে এল। এসে কামালের শোবার ঘরের মেঝে খুঁড়ে একটা বন্দুক ও কয়েক ভরি সোনা বের করে নিয়ে আবার চলে গেল। কিন্তু দুদিন পরে আবার গ্রামে পুলিশের গাড়ি ঢুকল। এবার সামেদের বাড়ি। তা দেখে লোক জড়ো হয়ে গেল। এওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, 'মারের নাম বাবাজী। মারের চোটে ভূত পালায়, আর কামাল তো ছ্যা। মারের কোবে বুল্যা দিয়্যাছে।' তারপর গলাটা একটু খাটো করে বলে, 'জান না, সামেদ যে থানিন্দার?' পাশের লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকায়। কিন্তু সামেদ বাড়িতে নেই। পুলিশগুলো ফিরে গাড়িতে চাপে। গাড়ি গিয়ে ওঠে খালেক বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। গ্রামের লোকেরা এবার ধান্দায় পড়ে। খালেক বিশ্বাসও কি ডাকাত? কি জানি বাবা, কার মধ্যে কি আছে! থানিন্দারই হবে বোধ হয়। কিন্তু না, খালেক বিশ্বাসও বাড়িতে নেই। বাড়িতে এলে থানায় যেতে বলে পুলিশগুলো গাড়িতে উঠল। জীপ গাড়িটা শব্দ করতে করতে চলে গেল। গ্রামের লোকেরা ভাবতে লাগল, খালেক বিশ্বাসের বাড়ি পুলিশ এল কেন? আয়ান ভাবতে লাগল। খালেক বিশ্বাসের বাড়ি পুলিশ আসা অবশ্য আজ নতুন নয়। মাঝে মাঝেই কয়েকজন পুলিশ তার বাড়িতে আসে। বৈঠকখানায় বসে। চা মিষ্টি খায়। কখনও মুরগিও কাটা হয়। ভুরি ভোজন হয়। গল্পগুজব করে। তারপর একসময় চলে যায়। কিন্তু পুলিশ দেখে পালায় না। আয়ান জানতে পেরেছে যে, পুলিশ আসার সময় খালেক বাড়িতে ছিল, সামেদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনে সে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। আয়ান এই পালানোর কারণ বুঝতে পারে না।

আয়ান কারণটা জানতে পারে স্কুলে গিয়ে। ভগীরথপুরের এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন বহরমপুরে। নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখানোর জন্য। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও তাদের কোন সন্তানলাভ না হওয়ার জন্যই এই ডাক্তার দেখানোর দরকার পড়েছে। ডাক্তার দেখানোর পর ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বাসে তুলে দিয়েছিলেন। পরের দিন ভদ্রলোকের বহরমপুরে কাজ ছিল বলে নিজে থেকে গেছেন। বাসটি ভগীরথপুর যায়। কাজেই ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু ডোমকল থেকে ছাড়ার পরই বাসটি খারাপ হয়ে যায়। তখন ভদ্রমহিলা পড়েন বিপাকে। ভগীরথপুরের দিকে যাওয়ার জন্য আর কোন বাস নেই। সবাই যে-যার দিকে চলে যায়। ড্রাইভার কণ্ডাক্টর তাকে বাসে থেকে যেতে বলে। কিন্তু একা বাসে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করেন না। যেখানে বাস খারাপ হয়েছিল তার একটু দূরেই জোহুর কারিকরের বাড়ি। তিনি আর কিছু ঠিক করতে না পেরে ওঠেন জোহুর কারিকরের বাড়ি। জোহুর কারিকর ধর্মভীরু দয়ালু প্রকৃতির লোক। মহিলার অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে রাতের মতো তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়িতে তার স্ত্রী ছিল না। তাই মেয়েকে ডেকে রাতের খাবার ব্যবস্থা করতে বলে। খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রমহিলা শুয়ে পড়েন। দরজাটা লাগিয়ে জোহুর শুয়ে পড়ে। চোখটা সবে এঁটে এসেছে। হঠাৎ দরজায় টোকা শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলেই দেখে সামনে একজন পুলিশ। জোহুর হাত দিয়ে চোখ মোছে। সে ঠিক দেখছে তো। স্বপ্ন দেখছে না তো? না স্বপ্ন নয়, পুলিশ কথা বলে। বলে 'তুমি মেয়ে চুরি কোরে

এনে ঘরে রেখেছো, তাড়াতাড়ি বের কোরে দাও। বড়বাবু বোললেন নিয়ে যেতে।' জোহুর ঘাবড়ে যায়। সে কি বলবে ঠিক করতে পারে না। থানা-পুলিশকে তার ভয়ানক ভয়। ওরা পরহেজগার লোক বলে খাতির করে না। যা-তা বলে দেয়। সে হাত জোড় করে বলে, 'হুজুর!' পুলিশ ধমকে ওঠে, 'ওসব হুজুর টুজুর ছাড়। যা বোলছি তাই কর।' জোহুর ভয় পেয়ে তার মেয়েকে ডাকে। মেয়ে গিয়ে মহিলাকে ডেকে তোলে, মহিলা এসে বলতে থাকেন, 'উনি চুরি করে আনবেন কেন? আমি নিজে এসেছি।' পুলিশ বলে, 'সেকথা তুমি বোললে তো হবে না। তুমার স্বামী বোলছে তোমাকে চুরি কোরে এনেছে। তুমার স্বামীর নাম মঞ্জুর তো?' মহিলা বলে, 'হ্যাঁ।' জোহুর দেখে, পুলিশের খবর ঠিক আছে। তার মানে কেস গড়বড় মনে হচ্ছে। পুলিশ বলে, 'তুমার স্বামী বড়োবাবুর কাছে বোসে আছে, তাড়াতাড়ি চল।' মহিলা কোন কথা বলে না। জোহুর আরও ঘাবড়ে যায়। সেটা বুঝতে পেরে পুলিশ জোহুরের দিকে চেয়ে বলে, 'বড়বাবু তুমাকেও নিয়ে যেতে বোলেছে। তাড়াতাড়ি করো।' জোহুর ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভয়ে পকেটে হাত দেয়, তারপর পুলিশটার কাছে এসে তার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দেয়। তারপর দুহাতে তার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমার কুনু দোষ নাই, আমাকে ছাড়্যা দ্যান, ও আপদ আপনি লিয়া যান, তবে আমাকে ছাড়্যা দ্যান।' পুলিশ বলে, 'তাহলে তাড়াতাড়ি বের কোরে দাও।' জোহুর ভদ্রমহিলাকে বের করে দেয়। পুলিশ তাকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা যায় মেয়েটি অজ্ঞান অবস্থায় বড় বিলের ধরে পড়ে আছে। তার স্বামী সব শুনে পাগলের মত হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তারের মতে তাকে বেশ কয়েকজন মিলে বলাৎকার করেছে। আয়ান ভাবতে পারে না, একসঙ্গে অনেকজন মিলে বলাৎকার! কালাম বলে 'তুই একটা বুদ্ধু আছিস, একসঙ্গে কেন? সবাই মিলে পাহারা দিয়েছে, আর একজন একজন করে পরপর গিয়েছে।' আয়ান বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু খালেক বিশ্বাস ছিল তা কি করে জানা গেল?' কালাম বলল, 'বাসে তুলে দেওয়ার সময় তাঁর স্বামী তাকে দেখেছিল, তাই পুলিশ সন্দেহ করেছে।' 'কিন্তু সামেদ?' কালাম বলে, 'জোহুর দেখেছে পুলিশবেশী লোকটি যখন মহিলাকে নিয়ে যায় তখন সামেদ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাই তাকেও সন্দেহ করছে।' আয়ানের মনে হল পুলিশের সন্দেহ হয়ত যথার্থই সত্য, নাহলে খালেক এবং সামেদ দুজনেই পুলিশ দেখে লুকাল কেন? আয়ান শুনেছে যখন পুলিশ আসে তখন সামেদ বাড়িতেই ছিল। পুলিশের কথা শুনে সে ধানের আউড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আর বাড়ির মেয়েরা বলেছিল— 'বাড়িতে নাই।'

আয়ানের মনে হল এরকম কাজ যারা করে তাদের খুব কড়া সাজা হওয়ার দরকার। ভদ্রমহিলার জন্য আয়ানের কষ্ট হয়। খারাপ লাগে এই ভেবে যে, তাদের গ্রামেরই কয়েকজন লোক ঘটনাটির জন্য দায়ী। এর আগে তাদের গ্রামের কোন লোক এরকম জঘন্য কাজ করেছে বলে তার মনে পড়ে না। অবশ্য খালেক বিশ্বাসকে নিয়ে একটা গোলমাল হয়েছিল। তখনও তার বিয়ে হয়নি। তাদের বাড়ির কাছেই মফেজের বাড়ি। মফেজ তার সমবয়সী। মফেজের বউ দেখতে বেশ সুন্দরী। মফেজ কাজে গেলেই খালেক গিয়ে তাদের বাড়ি হাজির হত। মফেজের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প-গুজব করত। কখনও একটা হিমানী, কখনও একটা স্নো এনে দিতো।

মফেজের বউ সেগুলো পেয়ে খুব খুশি হত। কিন্তু মফেজ খুব রেগে যেতো। তারপর একদিন কি একটা গণ্ডগোল হয়। মালেক বিশ্বাস ছেলেকে ধরে কয়েক থাপ্পড় কষায়। আয়ানের মনে হয়, সেটাও বোধ হয় এই রকমই কিছু একটা ছিল। অবশ্য তার পরেই মালেক বিশ্বাস ছেলের বিয়ে দিয়ে দেয় এবং আর কোন ঝামেলা হয়নি। তার মনে হয়, তাদের ঠিকমত শাস্তি হওয়া দরকার। ক্লাসে বসেও সে যেন স্বস্তি পায় না।

ক্লাস শেষ হলেই বেরিয়ে পড়ে। আজ তার কিছু ভালো লাগছে না। সে আজ ভুবনডাঙ্গা দিয়ে না গিয়ে জোহুর কারিকরের বড়ির দিকে গেল। দেখল সেখানে বাড়ির সামনে অনেকগুলো লোক বসে আছে। তারা কি যেন আলোচনা করছে। আয়ান বুঝতে পারল না ওরা কি বলাবলি করছে। তবে মনে হল রাতের ঘটনার কথাই হবে। সে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ডীপ টিউবওয়েলটার কাছে চলে এলে হঠাৎ দেখল, একজন লোক ডীপ টিউবওয়েলের ওপর থেকে বেরিয়ে পড়িমড়ি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। লোকটি একবার পড়ে গেল। কিন্তু উঠে আবার দৌড়চ্ছে। আয়ান চিনতে পারল, লোকটি খালেক বিশ্বাস। আবুল ডীপ টিউবওয়েল থেকে ফিরছিল। সে গতবছর পড়া ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে এখন পুরোপুরি সংসারী। সে হাসতে হাসতে বলল, 'দূর থেকে তোকে দেখে পুলিশ মনে করে পালাচ্ছে।' আয়ান বলল, 'তাই!' কিন্তু আবুলের হাসিতে যোগ দিল না, সে ডীপ টিউবওয়েলের দিকে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। দেখল খালেক তখন আরও জোরে জোরে দৌড়চ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে আবার পড়ে গেল। আয়ানের মনে হল, সে পুলিশ হলে দৌড়ে গিয়ে খালেককে এক্ষুণি ধরত। কিন্তু সে তো পুলিশ নয়, তাই ডীপ টিউবওয়েলে গিয়ে খোঁজ করল তাদের বাড়ির কেউ আছে কিনা। কেউ নেই।

আঠারো

আয়ান এবারও জেলা আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কুলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। বহরমপুরের ইউনিয়ন ক্রিশ্চিয়ান ট্রেনিং কলেজ প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আয়ান গত দু বছর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ক্লাস নাইন থেকে গিয়ে সে কিছুই হতে পারেনি। সেবার প্রথম হয়েছিল লালবাগ নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের একটি ছেলে। গতবার গিয়ে সে অনেক ভালো করেছিল, তবুও সে তৃতীয় হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল বহরমপুরের কাশীশ্বরী স্কুলের একটি মেয়ে। আয়ানের খুব ইচ্ছে যে, সে একবার প্রথম হয়, কিন্তু পেরে উঠছে না। এবার তার ইলেভেন। এবার না পারলে আর স্কুল থেকে হওয়া হল না। এবারের বিষয়টি আয়ানের মনের মতো। সভার মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একমাত্র ছাত্ররাই দায়ী। আয়ান বিপক্ষে নাম দিয়েছে। বিপক্ষে নাম দেওয়ার একটা সুবিধা, অন্ততঃ একজনের পরে বলতে পাওয়া যায়। কিন্তু পক্ষে হলে একদম প্রথমেও বলতে হতে পারে। প্রথমবার তার তাই হয়েছিল। লটারীতে তার নাম এক নম্বরে উঠল। সে পক্ষের বক্তা ছিল। কাজেই তাকে প্রথমেই বলতে হল। কিন্তু বিতর্কে প্রথমে বলার অনেক কিছু সুবিধা থাকলেও একটি বড় অসুবিধা এই যে, কারো যুক্তি খণ্ডন করার সুযোগ থাকে না,

সব শেষে তাকে সামান্য সময় দেওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে বিচারকরা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েই থাকেন। কাজেই কোন লাভ হয় না। তাই এবার আয়ান বিপক্ষে নাম দিয়েছে। অবশ্য সে ব্যক্তিগতভাবে মনেও করে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একমাত্র ছাত্ররাই দায়ী নয়। ফলে তার বলতে সুবিধা হবে।

আয়ান বইপত্র ঘেঁটে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভালো ভালো পয়েন্ট আর ধারাল ধারাল যুক্তি তৈরি করতে লাগল। কিন্তু আয়ানের একটা অসুবিধা হল, আয়ানের ভালো জামা-কাপড় নেই। ওখানে সবাই খুব সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরে আসে। আর আয়ানের সম্বল শুধু একটা খারে-কাচা পাজামা আর হাফ শার্ট। গতবারও সে ঐ পরেই গিয়েছিল। কিন্তু সবাই এমনভাবে তাকায় যে, যেন বলতে চাইছে 'কোথা থেকে উঠে এসেছ বাবা?' সকলেই যখন ঐভাবে তাকায় তখন আয়ানের অস্বস্তি লাগে। তাই আয়ান ঠিক করেছে একটু ভালো জামা-কাপড় পরে যাবে। সেখপাড়ার সাদেক তাদের সঙ্গেই পড়ত। কিন্তু ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার সময় ফেল করে গঙ্গাদাস পাড়া স্কুলে এইটে ভর্তি হয়। ঐ স্কুলটা স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত। সাদেক তাই আয়ানের এক বছর আগে গতবারই ফাইনাল দিয়েছিল, পাসও করেছে, তবে রেজাল্ট ভালো হয়নি বলে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। বাড়িতেই বসে আছে। সাদেকদের অবস্থা আয়ানদের তুলনায় ভালো। তার ভালো ভালো জামা-কাপড়ও আছে। আর তার জামা-কাপড় ধোপা বাড়িতে ধোয়া হয়। আয়ান এক জোড়া জামা-পাজামার জন্য সাদেককে বলল। কিন্তু সাদেক বলল, 'পাজামা কেন, আপনি প্যান্ট নিয়ে যান।' গ্রাম সম্পর্কে আয়ান সাদেককে 'চাচা' বলে। তাই একসঙ্গে পড়লেও ঠাট্টা করে তারা একে অপরকে লেন-দেন করে। আয়ানও করে, সাদেকও করে। আয়ান প্যান্ট পড়ে দেখল। সত্যই, পাজামা থেকে প্যান্টে তাকে ভালো লাগছে। তার মনে পড়ল, হ্যাঁ, ওখানে ছেলেরা সবাই প্যান্ট পরেই আসে। তাই সাদেকের প্রস্তাব আয়ানের ভালো লাগল। ঠিক, সে প্যান্ট পরেই যাবে।

কিন্তু তাতে আরও ঝামেলা বাড়ল। আয়ানের কোন জুতো নেই, সাদেকের প্যান্ট মাপে হলেও জুতো পায়ে হল না। কাজেই প্যান্ট পরে যেতে হলে জুতো যোগাড় করতে হবে। আয়ান নাসিরের কাছে গেল। কিন্তু তার জুতোও তার পায়ে হল না। আয়ান একটু মুশকিলে পড়ল। সে বাড়ির অবস্থা বোঝে। তাই আগের মত মা বাবার কাছ থেকে আর কিছু চাইতে পারে না।' খাতা-কলমের দরকার হলেও ছুটির দিনে কারো কাজে চলে যায়, যা খরচ পায় তা দিয়েই খাতা-কলম কিনে নেয়। আয়ান ঠিক করল সে জুতোটাও এভাবে যোগাড় করবে।

পরের দিন ছিল রবিবার। ছুটি। আবার সোমবারও বৌদ্ধ পূর্ণিমা না কি একটা পরবের ছুটি। বিলে ঠিকেতে পাট বিনানো হচ্ছিল। তিনটাকা কুড়ি। সামেদের পাট বিনাতে মুনিষ দরকার। আয়ানের প্রথমে সংকোচ হচ্ছিল। সামেদের কাজ সে করতে চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সে তো কাজ করে টাকা নিচ্ছে এমনি এমনি নিচ্ছে না। তাহলে আপত্তিটা কি?

আয়ান পাট বিনাতে চলে গেল। ডাঙ্গার কোলে দুটো খুঁটি পুঁতে পাটকাঠি দিয়ে বসার জায়গা করে নিল। জায়গাটা হয়ে গেলে সে পাট বিনাতে লেগে গেল। সামেদের পাটগুলি মোটামোটা, তাই হাবলে পাটের সংখ্যা তুলনায় কম। ফলে বিনানো তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু তাহলে কি হবে! আট হাবলে এক আঁটি। আর কুড়ি আঁটিতে তিন টাকা। আয়ান বিকেল পর্যন্ত

বিনিয়েও মাত্র পঁচিশ আঁটি বিনাতে পারল, তার বেশি কিছুতেই হল না। কারণ একটানা বসে থেকে থেকে কোমর ব্যথা করতে লাগল। আয়ান ধোয়া পাটের বস্তাগুলো গাড়িতে তুলে দিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। পাট ধোয়া বা বিনানোর একটাই ঝামেলা যে, সমস্ত হাত-পা পাট পচা জলে ভিজে গন্ধ হয়ে যায়। তাই পুকুরে ভাল করে স্নান না করে উপায় নেই। আয়ান স্নান করে বাড়িতে গেল। পরের দিনও সে পঁচিশ আঁটি পাট বিনাল। পঞ্চাশ আঁটি পাটের খরচ সাড়ে সাত টাকা হয়। সে হাবল ভাঙেনি বলে সামেদ আট টাকাই দিল।

আয়ান আট টাকা নিয়ে মঙ্গলবারের হাটে এল। সে সমস্ত হাটটা ঘুরে ঘুরে দেখল। বাজারে দুটো জুতোর দোকান আছে। একটা শওকত সু স্টোর, আরেকটা সাদেক সু স্টোর। শওকত সু স্টোরটা তুলনায় অনেক বড়। সে ঢুকতে সাহস পেল না। তাই আবার ঘুরতে ঘুরতে সাদেক সু স্টোরে এল। সে সংকোচের সঙ্গে উঠে দরজার পাশে দাঁড়াল।

একজন ভদ্রলোক একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছে। সাদেক পাঁচ-সাত জোড়া জুতো বের করে দিয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের কোনটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তখন সাদেক দোকানের কর্মচারীকে ডেকে বলছে, 'নান্টু, দেখ তো, লাল লেসওয়ালাটা, না না আরেকটু উপরে, হ্যাঁ, ওটাই, পাড়।' আয়ান যে দাঁড়িয়ে আছে তা কেউ যেন দেখছেই না। আয়ানও কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে হঠাৎ দেখল তাদের স্কুলের মাস্টার স্বদেশবাবু এসে হাজির। মাস্টার মশাই তাকে এখনও দেখেননি। আয়ান দেখল, মাস্টারমশাই আসতেই সাদেক ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'এই যে মাস্টারমশাই আসেন আসেন। অনেক দিন পর আপনাকে দেখতে পেলাম।' কর্মচারীটি একটা টুল এগিয়ে দিল, স্বদেশবাবু টুলের ওপর বসলেন। আয়ান চোরের মতো টুপ করে সরে পড়ল। পাশে মসলেম ডাক্তারের শেফা লেখা হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের একপাশে রাখা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। স্বদেশবাবু বেরিয়ে গেলে সে আবার গিয়ে সাদেক সু স্টোরে উঠল। এবার দোকানে কোন খরিদ্দার ছিল না। তাই দোকানের কর্মচারীটি আয়ানের দিকে তাকাল। আয়ান বলল, 'আমাকে এক জোড়া জুতো দেখান।' কর্মচারীটি জানতে চাইল, 'কত নম্বর?' আয়ান জানে না জুতোর নম্বর কিরকম করে বলতে হয়। সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কর্মচারীটি হয়ত বুঝতে পারল, তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পায়ের?' আয়ান মাথা নাড়ল— হ্যাঁ। কর্মচারীটি এবার জিজ্ঞেস করল, 'লাল, না কালো?' আয়ান উত্তর দিল, 'কালো।' কর্মচারীটি একজোড়া কালো চামড়ার জুতো বের করল। পায়ে দিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু সে আয়ানের পায়ের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'পা দুটো পাপোষে একটু মুছে নিন।' আয়ান খালিপায়ে এসেছিল, কাজেই পায়ে একগাদা ধুলো ছিল। আয়ানের এতক্ষণ সেকথা খেয়ালই ছিল না। কর্মচারীটি বলাতে তার খেয়াল হল। সে পাপোষে ঘষে ঘষে যতটা সম্ভব পা দুটো পরিষ্কার করল। তারপর পা পুরে দেখল যে, জুতো জোড়া ঠিকই হচ্ছে। সে তখন দাম জানতে চাইল, 'এ জুতো জোড়ার দাম কত?' কর্মচারীটি বলল, 'কুড়ি টাকা।' দাম শুনে আয়ানের গা দিয়ে ঘাম ছুটল। সে যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। তার মনে হচ্ছে যে, সে জুতোতে পা ঢুকিয়েছে অথচ তার কাছে দাম নেই। ওরা যদি বকে! সেকথা ভেবে আয়ান বলল, 'এর থেকে কম দামের জুতো নেই?' কর্মচারীটি বলল, 'আপনাব কাছে কত টাকা আছে?' আয়ান বলল, 'আট টাকা।' আয়ানের কথা

শুনে সাদেক বিরক্ত হল। কর্মচারীটি তাড়াতাড়ি করে জুতোটা তুলে দিয়ে বলল, 'আট টাকায় কোন জুতো হবে না।' আয়ান কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে নিঃশব্দে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

সাদেক সু স্টোর থেকে বেরিয়ে সে আস্তে আস্তে শওকত সু স্টোরে এল। এখানে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসেছিল। দোকানে আর কেউ ছিল না। আয়ান এসে দাঁড়াতেই সে লোকটি বলল, 'কিছু বলছেন?' আয়ান ঠিক করেছিল, সে দাম জেনে তবে জুতো দেখবে। সে বলল, 'আমার পায়ের কালো রঙের জুতোর দাম কত হবে।' লোকটি একটু ভ্রূ কোঁচকালো, তারপর বলল, 'জুতো না দেখলে দাম কি করে বলব— যে রকম জুতো সেরকম দাম, কম দামেরও আছে, বেশি দামেরও আছে।' আয়ান বলল, 'সবচেয়ে কম দামেরগুলো কত করে জোড়া?' লোকটি উত্তর দিল, 'বাইশ টাকা।' আয়ান দেখল এ লোকটি আবার আরও বেশি বলছে। কাজেই তার জুতো কেনা হবে না। সে আস্তে করে বলল, 'তাহলে হবে না।' কথাটা সে লোকটিকে বলল, না নিজেকে বলল কিছু বোঝা গেল না। লোকটি কিছু বলল না। আয়ানও চুপি চুপি দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

হাটে প্রচণ্ড ভিড়। কাছাকাছি এলাকায় হাট নেই। তাই দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এই হাটে আসে। কেউ আসে কিনতে, আবার কেউ আসে বেচতে। কেউ শাক-সব্জি এনেছে, কেউ এনেছে ধান-চাল, সবই বিক্রি হচ্ছে। আয়ান সে সবের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে পথ করে অগ্রসর হচ্ছিল। যজ্ঞেশ্বর ফার্মেসীর সামনে আসতেই সে দেখল যে, একটা জায়গায় খুব ভিড়। ভিড় দেখলে সবাই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। আয়ানও হল। সে এগিয়ে দেখার চেষ্টা করল ভিড়টা কিসের। কিন্তু দেখেই তার চোখ আটকে গেল। একটা বড় বড় মোচওয়ালা লোক পুরোনো জুতো বিক্রি করছে। সে ওখানেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল একটা লোক একজোড়া জুতো নিয়ে দরাদরি করছে। মোচওয়ালা লোকটা বলছে দশ টাকা। আর খরিদ্দার লোকটি বলছে সাত টাকা। শেষ পর্যন্ত ন টাকায় ঠিক হল।

আয়ানের আশা হল যে, সেও তাহলে একজোড়া কিনতে পারে। প্রথমে তার মনে হচ্ছিল যে পুরোনো জুতো পরে গেলে ওরা কি ভাববে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের মধ্যে সে সমর্থন পেল। ওরা জানবে কি করে যে, সে জুতোটা পুরোনো কিনেছে। নতুন জুতো কিনলেও এরকম পুরোনো হতে পারত। অর্থাৎ পরে যাওয়া যেতে পারে। সে ভালো করে দেখতে লাগল তার পায়ে হবার মতো কোন জুতো আছে কিনা। পেছনে তাকাতেই দেখল তার সহপাঠী হরিদেব বাজার করতে এসে কপির দাম জিজ্ঞেস করছে। আয়ানের অস্বস্তি হল। হরিদেব যদি তাকে পুরোনো জুতো কিনতে দেখে ফেলে! সে পাশের দিকে সরে গিয়ে ফার্মেসীর সামনে দাঁড়াল। হরিদেব তাকে দেখতে পেল না। হরিদেব চলে গেলে আয়ান আবার ভিড়ের মধ্যে এল। সে এবার একজোড়া জুতোতে পা পুরে দেখল ঠিকই আছে। ডানপায়ের জুতোটায় একটা সেলাই আছে বটে। তবে দেখতে ভালোই লাগছে। সে জুতো জোড়ার দাম জিজ্ঞেস করল। মোচওয়ালা হাঁকল, 'দশ টাকা।' আয়ান বলল, 'সাত টাকা হবে?' মোচওয়ালা বলল, 'উঁহু, অত কম দামে হবে না।' আয়ান জানতে চাইল, 'ঠিক কততে হব?' মোচওয়ালা বলল, 'একদম কম ন টাকা। তার থেকে এক পয়সা কম বললেও হবে না।' আয়ান বলল, 'আট টাকায় হয়ত দেন।'

কিন্তু না, মোচওয়ালা রাজী হল না, 'আট টাকায় হবে না।' আয়ানের কাছে আট টাকার বেশি নেই, কাজেই সে দু-তিনবার বলল, 'আট টাকায় দিয়ে দেন।' কিন্তু লোকটি রাজি হল না। এবার আয়ান আশা ছেড়ে দিল। সে চলে যাচ্ছিল। তখন লোকটি তাকে ডাকল, 'শুনুন শুনুন , ও বাবু, আচ্ছা ঠিক আছে, আর আট গণ্ডা পয়সা দিন। সাড়ে আট টাকায় নিয়ে যান।' আয়ান ফিরে দাঁড়াল, জুতো কেনা তার দরকার। কিন্তু আট টাকার বেশি যে তার কাছে নেই। সে খুলেই বলল, 'দেখুন, আমার কাছে আট টাকার বেশি নেই।' লোকটি বলল, 'তার উপরে তো আর কোন কথাই নাই, আচ্ছা নিয়ে যান। আমার একদম কোন লাভ থাকল না।' আয়ান টাকা আটটা দিয়ে জুতো জোড়া ব্যাগে ভরল।

শুক্রবার দিন বেলা এগারোটায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা। কথা হয়েছে তারা আটটা দশের বাসটায় যাবে। সকালবেলায় উঠেই আয়ান স্নান-খাওয়া করে কাপড় পরতে লাগল। জামা-প্যান্ট পরে জুতো পরার পর তার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হল সবাই যেন তাকে দেখছে। হাঁটতে গিয়ে আরেক বিপদ। জুতোর মধ্যে পায়ে জ্বালা করতে লাগল। সে আর জোরে জোরে হাঁটতেই পারছে না। আস্তে আস্তে এসে সে যখন বি. ডি. ও. অফিসের মোড়ে পৌঁছল তখন পৌনে আটটা হয়ে গেছে। আয়ান গিয়ে একটা চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। পা দুটোতে তখনও জ্বালা করছে। তার ইচ্ছে করছিল, জুতো থেকে পা বের করে দেখে। কিন্তু সবাই যেন আজ তাকে তাকিয়ে দেখছে। কাজেই সে পা বের করল না। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাস আসতেই দেখল সনাতনবাবু হাতের ইশারা করে আয়ানকে ডাকছেন। তাহলে সনাতনবাবু ঠিকই এসেছেন। আয়ান বাসে উঠে পড়ল। কিন্তু বসার জায়গা নেই। রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কুঠি থেকে অনন্তর ওঠার কথা। ও আয়ানদের স্কুল থেকে পক্ষে বলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ওদের দুজনকে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাবার ভার নিয়েছেন সনাতনবাবু। সনাতনবাবুই ঠিক করেছেন যে, তাঁরা এই বাসটায় যাবেন। সনাতনবাবু আয়ানকে বলল, 'দেখ তো, অনন্ত এসেছে কিনা?' অনন্তর কুঠির মোড় থেকে ওঠার কথা। আয়ান দরজার কাছে এসে দেখল অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে। সে হাত ইশারা করতেই অনন্তও উঠে এল। সনাতনবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

দশটা দশের সময় বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছল। সনাতনবাবু বললেন, 'বি টি কলেজ বেশি দূর নয়, চল হেঁটেই চলে যাব। আয়ান খুশিই হল। হাঁটতে গিয়ে দেখে পায়ে আবার লাগছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়লে সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করবেন, তাই ব্যথা অগ্রাহ্য করেই সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। তারা গিয়ে যখন কলেজের হলঘরটায় পৌঁছল তখন প্রায় সকলেই চলে এসেছে। আয়ান তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, পরিচিত মুখ কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। তারা গিয়ে একপাশে বসল। আয়ান মনে করে দেখল তার যুক্তিগুলো ঠিক ঠিক মনে আছে কি না। আর ঠিক সময়ের মধ্যে মোটামুটি বলা হয়ে যাচ্ছে কি ন। সময় ঠিক রাখার জন্য সে সফিউলের ঘড়িটা নিয়েছে। এক মিনিট সময় সে যুক্তি খণ্ডনের জন্য রেখেছে। পক্ষের বক্তা যে যুক্তি দেখাবে আয়ান তা বলার প্রথম দিকেই খণ্ডন করবে। আয়ান দেখেছে এরকম করলে বক্তব্য আকর্ষণীয় হয়। আয়ান তার বক্তব্য আকর্ষণীয় করবেই, সে আবার যুক্তিগুলোকে মনে মনে

আউড়ে নিতে লাগল। এমন সময় জনা চারেক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। লম্বা করে ধুতিপরা ভদ্রলোককে আয়ান চিনতে পারল।

রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। উনিই সভাপতি হয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। আর বিতর্কের সারা সময়টা বসে কে কি যুক্তি দেখাচ্ছে তার নোট রাখেন। আর প্রতিযোগিতা শেষ হলে তার সারাংশটা বলে দেন। সঙ্গের লোক তিনটি নিশ্চয় বিচারক। হ্যাঁ, বিচারকই হবেন। কারণ ওনারা দর্শকদের সামনের আসনের ডায়াসের দিকে মুখ করে বসলেন। রবীনবাবু নাম ডেকে কারা কারা এসেছে দেখে নিতে লাগলেন। দেখা গেল বহরমপুরের চারটে স্কুল সমেত মোট পনেরটা স্কুলের তিরিশ জন প্রতিযোগী এসেছে। প্রত্যেককে পাঁচ মিনিট করে বলতে দেওয়া হবে। তার মানে আড়াই ঘন্টা ধরে প্রতিযোগিতা চলবে। রবীনবাবু এবার কতগুলো কাগজের টুকরোতে এক, দুই, তিন করে পনের পর্যন্ত লিখলেন। লেখার পর প্রথম পক্ষের ছেলেদের ডাকলেন। প্রত্যেককে মোড়ান কাগজের গুটিগুলো থেকে একটি করে তুলতে বললেন। যার যত নম্বর উঠল সে তত নম্বরে বলবে। আয়ানদের স্কুলের অনন্তর নম্বর হল আট। এবার বিপক্ষের ছেলেদের পালা। আয়ান একটা টুকরো তুলে ভাঁজ খুলতেই দেখল তিন। তার মন খুশিতে ভরে উঠল। তার নম্বর তিন। অর্থাৎ পক্ষের তিনজন বিপক্ষের দুজন মোট পাঁচ জনের পর সে বলতে উঠবে। এই সময়টা খুব ভাল। কারণ বিতর্কটা তখন সবে জমে ওঠে অথচ শুনে শুনে বিচারকরা ক্লান্ত হয়ে যান না।

লটারী হয়ে গেলে সভাপতি উঠে সভার মত ঘোষণা করলেন এবং পক্ষের প্রথম বক্তাকে সভার মতের সমর্থনে তার বক্তব্য রাখতে ডাকলেন। বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আয়ান কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল কে কি বক্তব্য রাখছে তা নোট করে রাখতে। সে ঠিক করেছে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে তার একদম আগে যে বক্তব্য রাখবে তার মতই খণ্ডন করবে। কিন্তু তার বক্তব্য যে কোন কারণে যদি খণ্ডন করার মতো কোন যুক্তিই না থাকে তাহলে তার আগের পক্ষের বক্তাদের মতই তাকে খণ্ডন করতে হবে। তাই সে পয়েন্টগুলো নোট করতে লাগল। চারজনের বলা হয়ে গেল। এবার পক্ষের হয়ে বলতে উঠছে বহরমপুর কাশীশ্বরী স্কুলের মৌমিতা ব্যানার্জি। এরপরেই আয়ানের নাম। তাই সে খুব সতর্কতার সঙ্গে মৌমিতার বক্তব্য শুনতে লাগল। মেয়েটি কিন্তু খুব সুন্দর বলে। তার বক্তব্যের সারমর্ম, সমাজের অন্যত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য অনেকেই দায়ী হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে। একথা কেউই বলবে না যে, শিক্ষকরা গণ্ডগোল করছে। তাহলে গণ্ডগোল করার জন্য কারা থাকছে? ছাত্ররা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একমাত্র ছাত্ররাই দায়ী। মেয়েটি বলল, 'বিরোধী পক্ষের বক্তারা বলছেন যে, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দেশের সামাজিক অবস্থা দায়ী, অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী, রাজনৈতিক অবস্থা দায়ী।'

মৌমিতা তার বক্তব্য শেষ করে বসলে রবীনবাবু আয়ানের নাম ডাকলেন। আয়ান গিয়ে মাইকের স্পীকারটায় একটা মৃদু টোকা দিয়ে দেখল, ঠিক আছে। ঐ যে নেতাজীর জন্ম-জয়ন্তীতে প্রথমে মাইকে কথা বলার দিন সে টোকা দিয়ে দেখেছিল ওটা প্রায় ওর স্বভাব হয়ে গেছে। টোকা দিয়ে দেখে নিয়ে আয়ান তার বক্তব্য শুরু করল, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়! সভার মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একমাত্র ছাত্ররাই দায়ী। সরকারী পক্ষের

বক্তা এতক্ষণ তারস্বরে এই মতকে সমর্থন করে গেলেন। কিন্তু একটু মনযোগ সহকারে তার যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সভার মতের বিরোধিতাই করে গেলেন। আসুন তার শেষ যুক্তিটাই একটু বাজিয়ে দেখি। তিনি বললেন যে, 'একহাতে তালি বাজে না। কিন্তু আমি বলছি বাজে।' সকলে মিলে আয়ানের দিকে তাকাতে লাগল। 'একহাতে তালি বাজে।' আয়ান বলল, 'এই দেখুন আমার বাঁ হাতটা কিছু না করে চুপ করে বসে আছে। ডান হাতটা এসে ওটার উপর পড়ল। বলুন এতে বাঁ হাতটার কি দোষ আছে! অথচ তালি বাজল তো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করতে এসেছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের আঘাত করছে, সামাজিক অবস্থা তাদের আঘাত করছে, রাজনৈতিক অবস্থা তাদের আঘাত করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থা তাদের আঘাত করছে, শিক্ষকদের অশিক্ষকসুলভ মনোভাব তাদের আঘাত করছে, মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায় উত্তেজনাকর অবস্থা তাদের বাবা-মাদের মধ্যে দিয়ে এসে তাদের আঘাত করছে, বিধানসভা লোকসভা রাজ্যসভার ভবনে সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তাদের আঘাত করছে. তালি তো বাজবেই। ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল তো হবেই। বলুন, এরপরও কি বলবেন যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একমাত্র ছাত্ররাই দায়ী? কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয়।' এরপর আয়ান এক এক করে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন, কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবকবৃন্দ দেশের আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী তা ব্যাখ্যা করল। ব্যাখ্যা করতে করতেই ওয়ারনিং পড়ে গেল। অর্থাৎ আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় বাকী আছে। আয়ান তখন তার বক্তব্যের উপসংহারে এল, 'আমি আশা করব সরকারী পক্ষের বক্তারা এতক্ষণে তাদের বক্তব্যের অসাড়তা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাত্ররাও দায়ী হলেও একমাত্র দায়ী নয়।'

আয়ানের বক্তব্য শেষ হলে সে এসে বসল। বিতর্ক চলতে লাগল। এতক্ষণ একটা উদ্বেগ ছিল। তার বলা শেষ হলে সেই উদ্বেগটা আর থাকল না। সেও বিতর্ক উপভোগ করতে লাগল। অবশেষে বিতর্ক শেষ হল। বিচারকেরা তাঁদের নম্বরের কাগজ নিয়ে সভাপতির কাছে গেলেন। হিসেব চলতে লাগল। তার পর ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা গেল আয়ান প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইন্‌সটিটিউশনের একটি ছেলে আর তৃতীয় হয়েছে মৌমিতা, যে আয়ানের ঠিক আগে বলেছিল। সনাতনবাবু এত খুশি হলেন যে, আয়ানকে সকলের সামনেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রবীনবাবু পুরো বিতর্কের আলোচিত ব্যাপারগুলো আলোচনা করলেন। তারপর পুরস্কার দেওয়া হল। আয়ান প্রথম পুরস্কার পেল উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী। পুরস্কারটা নিয়ে এসে সে সনাতনবাবুর হাতে দিল। সনাতনবাবু তাদের নিয়ে চলে আসছিলেন। কিন্তু রবীনবাবু ধরে মিষ্টিমুখ করালেন। আয়ানেরা বেরিয়ে এল। এখন আর আয়ান তার পায়ের ব্যথা বুঝতে পারছে না। কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না তাও দেখছে না। তার এখন বেশ ভালো লাগছে। আর মনে হচ্ছে সেও পারে, অনেক কিছু করতে পারে। মনে হচ্ছে, সে অনেক কিছু করবে। ঠিক কি করবে তা সে ভেবে উঠতে পারছে না, তবে করবে কিছু একটা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলেন—সনাতনবাবু একজন

ভদ্রলোককে ডাকলেন, তিনি সনাতনবাবুকে কুশল জিজ্ঞাসা করতেই সনাতনবাবু বললেন, 'ভালই আছি, ডিবেটিং কমপিটিশন ছিল। আমাদের স্কুল ফার্স্ট হল।' যেন সনাতনবাবু সবাইকে জানাতে চান, আয়ানের মনে হয় সনাতনবাবুও খুবই খুশি হয়েছেন। খুশি মনে তাঁরা এসে বাসে উঠলেন। অনন্ত কুঠিতে নেমে গেল। সে কিছু হতে পারেনি, তাই তার মনটা খারাপ। আয়ান সনাতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বি. ডি. ও. অফিস মোড়ে নামল। সনাতনবাবু বাসেই থাকলেন। তাঁকে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামতে হবে।

আয়ানের আজ মনটা ভালো ছিল। সে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জেলায় প্রথম হয়েছে। তারপর তার পরনে আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-প্যান্ট, পায়ে জুতো। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল। বিকেলের সোনা রোদ এসে রাস্তার ওপরে পড়ছিল, তার চোখে-মুখেও। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে বিকেলের এই রোদ কেমন একটা স্বপ্নময় মায়াবী জগতের সৃষ্টি করেছে। তাতে সব কিছু সুন্দর মনে হচ্ছে। আয়ানের কাছে আজ পৃথিবীটা বড় সুন্দর মনে হচ্ছে। সে যা দেখছে তাই ভাল লাগছে। ভালো লাগছে দু-পাশের মাঠ, ভাল লাগছে পায়ে-চলা এই পথ। দূরে কল্পনার দাদা প্রশান্তর নতুন বাড়িটাও ভালো লাগছে। বিকেলের রোদ এসে বাড়িটার ওপর পড়ে বাড়িটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিছুদিন হল কল্পনার দাদা বাড়ি থেকে পৃথক হয়ে এখানে আলাদা বাড়ি করেছে। লোকে বলে ও বাবার অমতে বিয়ে করেছে বলে ওর বাবা বনমালী ডাক্তার বউকে বাড়িতে উঠতে দেয়নি। কেউ কেউ বলে শুধু বাবার অমতে নয়, আসলে প্রশান্ত একটা বেশ্যা মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেইজন্যই বনমালী ডাক্তার তাকে বাড়িতে উঠতে দেয়নি! আবার দুয়েকজন একথাও বলে যে, আসলে ওসব লোককে দেখানোর জন্য, ছেলেকে আলাদা না করে দিলে অনেক জমি সিলিঙের বাইরে চলে যাবে বলে ইচ্ছে করেই আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু লোকে যাতে সে প্ল্যানটা না ধরতে পারে সেজন্যই নিজে থেকে নানারকম গল্প ছড়িয়েছে। আয়ানেরও মনে হয়, সেটাই ঠিক হবে। কারণ প্রশান্তর বউকে তো সে কল্পনার সঙ্গে ওদের বাড়িতে দেখেছে। হ্যাঁ, ঐ তো বউটা প্রশান্তর পাশেই বসে আছে। আয়ান হাঁটতে লাগল। ওদের পৃথক হয়ে যাওয়ার আসল কারণ ঠিক করতে পেরে তার খুশি লাগছে।

কিন্তু জুতো পায়ে জামা-প্যান্ট পরা আয়ানকে দেখে প্রশান্ত খুশি হতে পারল না। সে জানে আয়ান বাঘডাঙ্গার এক চাষার ছেলে। চাষার ছেলের পক্ষে এরকম ধোপ দুরস্ত জামা-কাপড় পরে তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া তার অসহ্য মনে হল। জামা-প্যান্ট পরবে তাদের মতো লোকেরা, যাদের অনেক জমি আছে, গ্রামে পাকা বাড়ি আছে, আর ঘরে অনেক টাকা আছে। 'চাষাভুষার' ছেলেও যদি জুতো পায়ে দেয়, জামা-প্যান্ট পরে, তাহলে তাদের সঙ্গে পার্থক্য থাকল কোথায়? প্রশান্ত বোধহয় তার স্ত্রীকে এই কথাগুলিই বলল, তারপর আয়ানের পা ফেলার সঙ্গে তাল রেখে সে বলতে শুরু করল— 'লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।' আয়ান প্রথমে বুঝতে পারেনি, তাই শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই দেখল প্রশান্তর বউ দাঁত বের করে হাসছে আর প্রশান্ত তার পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে যাচ্ছে— 'লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।' আয়ান বুঝতে পারল প্রশান্ত তাকে উপহাস করার জন্যই এরকম করছে। তার খুব রাগ হল। তার মনে হল, তার প্রতিবাদ করা উচিত। সে থেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তও লেফ্‌ট রাইট বলা বন্ধ করে দিল। কিন্তু আয়ান কিছুতেই ঠিক করতে পারল না, কি বলে প্রতিবাদ করা যায়। যদিও একথা সর্বাংশে সত্য যে, প্রশান্ত তাকে অপমান করার জন্যই এরকম করেছে, তবুও কিছুতেই তা প্রমাণ করা যাবে না। কাজেই আয়ান কিছু না বলেই আবার হাঁটতে শুরু করল। প্রশান্ত আবার তার পা ফেলার তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলতে লাগল— 'লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।' আয়ান উপহাস হজম করে হাঁটতে লাগল। সে এই বলে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল যে, রাস্তায় চললে ওরকম দুয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করবেই, কিন্তু তাই বলে তো আর কুকুরের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করা যায় না। এই মনে করে সে সান্ত্বনা পেতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা পেল না। আয়ানের শুধুই মনে হতে লাগল যে, আয়ান তো প্রশান্তর কোন ক্ষতি করেনি। বরং কল্পনার দাদা বলে তাকে সে সম্মানের চোখেই দেখে। তাহলে প্রশান্ত কেন তাকে এমন করে অপমান করল! প্রশান্তদের পরিবারের সম্পর্কে আয়ান অনেক কথা শুনেছে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সেসব সত্যি, না মিথ্যে। আজ যেন মনে হল সে সবই সত্যি।

প্রশান্তর বাবা বনমালীর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ডোমকলের সরকারী ডাক্তার-খানায় সে ছিল কম্পাউন্ডার। ডাক্তারখানায় সরকার যে ওষুধ সাপ্লাই দিত লোকে তা ডাক্তারখানা থেকে পেত না। কিন্তু টাকা দিলে বনমালীর বাড়ি থেকে পাওয়া যেত। শুধু ওষুধ বিক্রি নয়— সে রোগী দেখে ফিও নিত। কথায় বলে 'আদাড় বুনে শিয়াল বাঘ।' তা এই ভুবনডাঙ্গা-বাঘডাঙ্গা-জয়রামপুর অঞ্চলে বনমালী কম্পাউন্ডার ডাক্তার। লোকে বলে বনমালী ডাক্তার। বনমালী ডাক্তারখানার ওষুধ বিক্রি করে আর রোগীর কাছ থেকে ফি নিয়ে দু-তিন বিঘে জমি কিনল। জমি থেকে যা ফসল ওঠে তাতে খাবার চলে যায়, তখন সে কম্পাউন্ডারির মাইনে জমিয়ে সুদে খাটাতে লাগল। তার বাড়ির পাশেই ছয়েদ ঢুলির বাড়ি। তার মা অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য বনমালী ডাক্তারকে ডাকে। বনমালী ডাক্তারের ফি আর ওষুধের দাম শোধ করার জন্য তাকে এক বিঘে জমি ডাক্তারকেই লিখে দিতে হয়। কথা হয়, টাকা শোধ করলে বনমালী ডাক্তার জমিটা ফেরত দেবে। কিন্তু পরের বছর বনমালী ডাক্তার ছয়েদ ঢুলির সমস্ত জমি দখল করে নেয়। সব লোককেই সে দলিল বের করে দেখায়, ছয়েদ তার সব জমি বনমালী ডাক্তারকে বিক্রি করে দিয়েছে। ছয়েদ সকলকেই বলল, 'আমি সুদু ভিটার জমিখ্যান বোন্ধক দিয়্যাছি।' কিন্তু দলিলে সেরকম লেখা নেই, দলিলে লেখা আছে ছয়েদ তার সব জমিই বনমালী ডাক্তারকে বিক্রি করে দিয়েছে। ছয়েদ সব মোড়লদের কাছে গিয়েছিল। তারা কিছু করেনি। সে থানায়ও গিয়েছিল। কিন্তু থানার লোকেরা বনমালী ডাক্তারকে একবারও জিজ্ঞেস করেনি এতটা জমি কেনার জন্য সে টাকা কোথায় পেয়েছে। বরং ছয়েদকে বলেছে—তোমার হাতের টিপসই আছে দলিলে। আমাদের কিছু করার নেই। ছয়েদের আর কিছু করার ছিল না। সে থানায় যাওয়ার অপরাধে নিজের ভিটে থেকে উচ্ছেদ হতে চলেছিল। কিন্তু বনমালী ডাক্তারের দয়ার শরীর। তাই ভিটেটা তার নাম থাকলেও ছয়েদকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেনি। এখন ছয়েদ লোকের জমিতে মুনিষ খেটে খায়। মাঠপাড়ার ফজর আলির বাবা সেরাজ হালখানা ছিল মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক। তারও পনের ষোল-বিঘে জমি ছিল। তার মৃত্যুর পর ফজর আলি বোনদের ফঁকি দেওয়ার জন্য পুরো জমিটা লিখে দিয়েছিল বনমালী

ডাক্তারকে। বনমালী ডাক্তার তাকে সেরকমই বুদ্ধি দিয়েছিল। কিন্তু বনমালী ডাক্তার কথামতো সে জমি আর ফিরিয়ে দেয়নি। একই কায়দা করে বনমালী ডাক্তার সাদেকের পিসী ফুদোনের জমিগুলোও নেওয়ার ফন্দি করেছিল। কিন্তু ফুদোন বনমালীর ফন্দি বুঝে ফেলেছিল। আর বুঝে ফেলার ফলে বনমালী যেই তাকে বুদ্ধি দিতে এসেছিল, অমনি একটা হেঁসো নিয়ে তাড়া। তাড়া খেয়ে বনমালী নাকি পড়ি কি মরি করে বাঘডাঙ্গা থেকে পালিয়েছিল। আর কোনদিন এদিকে আসেনি। ফুদোনের প্রতি আয়ানের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। সেও যদি বনমালীর ঐ বাঁদর ছেলেটাকে হেঁসো নিয়ে ওরকম তাড়া করতে পারত! কিন্তু আয়ান কিছুই করতে পারেনি। শুধু নিজেই তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে।

উনিশ

উচ্চ-মাধমিক পরীক্ষায় আয়ানের সিট পড়ল বহরমপুরের কলেজিয়েট স্কুলে। এতদূর থেকে গিয়ে দুবেলা পরীক্ষা দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। কাজেই বহরমপুরে আট-দশ দিন থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। আয়ানের বহরমপুরে কেউ জানাশোনা নেই। তাই তার পক্ষে থাকার জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু মুশকিলের আশান করলো তার এক সহপাঠী। তার এক দাদা গোরাবাজারে মেসে থেকে কলেজে পড়াশোনা করে। ঠিক হল আয়ান ওখানে থেকেই পরীক্ষা দেবে। সেইমতো পরীক্ষার দুদিন আগে তার বইপত্তর একটা পুরনো টিনের বাক্সে পুরে নিয়ে বাসে উঠল। সহপাঠী আগে থেকেই মেসের ঠিকানা দিয়েছিল। কিভাবে যেতে হবে তাও বলে দিয়েছিল, কাজেই খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। সেদিনই সে সেই সহপাঠীর সঙ্গে এসে পরীক্ষা কেন্দ্রও দেখে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা দিতে এল।

কিন্তু পরীক্ষার অবস্থা দেখে তার দমকে দমকে কান্না আসতে লাগল। সবাই শুধু যে বই-খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসল তাই নয়—বাইরে থেকে লোক এসে কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত লিখতে হবে তাও দেখিয়ে দিতে লাগল। যাঁরা পরীক্ষায় গার্ড দেওয়ার জন্য ছিলেন তাঁরা খাতাগুলো সই করে দেওয়ার পর নিজেরাও বই-খাতা নিয়ে ছাত্রদের কপি করতে সাহায্য করতে লাগলো। চারিদিকে হৈচৈ চেঁচামেচি। আয়ান একটুও মনস্থির করতে পারছে না। লিখতে লিখতে বারবার ছন্দ কেটে যাচ্ছে। সবাই বই দেখে লিখছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে। এর মধ্যে নিজে থেকে কোন উত্তর লেখা তার অসম্ভব মনে হল। সে যে বই দেখে লিখবে তারও উপায় নেই। কারণ সে পরীক্ষার হলে বই নিয়ে আসেনি। সে একবার গার্ড ভদ্রেলোককে ডেকে অভিযোগ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটা ছেলে তার মাথায় চাটি মেরে বসিয়ে দিল। অসহায়ের মতো আয়ান তার যা মনে আসে তাই লিখতে লাগল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তার খাতাটা ভর্তি হল। সে লুজ সীট নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ডানপাশের বেঞ্চি থেকে একটা ছেলে এসে তার খাতাটা নিয়ে নিল। আয়ান ছুটে গিয়ে তার খাতাটা নিতে গেল। কিন্তু ছেলেটা ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ করে বসে যা। লেখা হলে দিয়ে দিব। আর এখন ঝামেলা করলে দোয়াত উবুড় করে কালি ঢেলে দিব।' আয়ান ভয় পেয়ে গেল, এমনি ফল কি হবে, তার ঠিক নেই। তারপরে কালি ঢেলে দিলে তো একদমই ফেল।

গার্ড ভদ্রলোকটিকে সে খোঁজ করে পেল না। তখন নিজের বেঞ্চে এসে লুজ সীটে বাকি উত্তরগুলো লিখতে লাগল। পাঁচ মিনিট আগের ঘণ্টা পড়তে ছেলেটা এসে আয়ানের খাতাটি ফেরত দিয়ে গেল। একজন লোক এসে তা সেলাই করে দিয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। আয়ান গিয়ে টেবিলের ওপর খাতাটা জমা দিল। তখনও অনেকে বই দেখে লিখে যাচ্ছে। আর সেই গার্ড সাহেব বলছেন, 'আর বেশি দেরী কোরো না, এবার দিয়ে দাও।' আয়ান বেরিয়ে গেল।

বাইরে আসতেই স্বদেশবাবুর সঙ্গে দেখা। স্বদেশবাবুকে দেখেই আয়ান কেঁদে ফেলল। বলল, 'এভাবে পরীক্ষা দিলে আমি ফেল করে যাব। অন্তত আমার জন্য আলাদা ঘরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমি অফিসে বসেও পরীক্ষা দিতে রাজি আছি।' স্বদেশবাবু আয়ানকে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ঘরে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আয়ানকে আলাদা ঘরে বসে পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'ও রিস্ক আমি নিতে পার্‌বো না। আলাদাভাবে পরীক্ষা নিতে গেলেই একটা হাঙ্গামা হতে পারে। এখানে পরীক্ষা দিতে হলে ওর মধ্যেই পরীক্ষা দিতে হবে।'

অগত্যা আয়ানকে বাংলা দ্বিতীয়পত্রের জন্যও গিয়ে ঐ সিটেই বসতে হল। একইরকম-ভাবে পরীক্ষা দিয়ে মেসে ফিরে সে আর কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারল না। তার অনেক আশা ছিল উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করবে। কিন্তু সে আশা আর পূরণ হবার নয়। আয়ানের মনে হয়েছে বহরমপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্‌টিটুশানের যেসব ছাত্রের সিট তাদের সঙ্গে পড়েছে, পরীক্ষা হলে তাদেরকে দেখলেই বোঝা যায় তারা এরকমভাবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত ছিল। কাজেই তারা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালোভাবে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু আয়ানরা তো এরকম পরীক্ষার কথা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তারা মফঃস্বলের ছেলে। যেটুকু পেরেছে পড়াশোনা করেছে। সৎভাবে পরীক্ষা দেবে বলেই তৈরি হয়েছে। কাজেই এ ডামাডোলের মধ্যে পড়ে তাদের পরীক্ষা কিছুতেই ভালো হবে না। আয়ান খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। সারাটা সন্ধ্যা ধরে সে কাঁদল। তারপর রাত হয়ে গেলে তার সহপাঠীর দাদা তাকে ভাত খাওয়াল। সে কাঁদতে কাঁদতেই শুয়ে পড়ল।

পরের দিন আয়ান পরীক্ষা হলে বই নিয়েই গেল। সেদিন আর কেউ তার খাতা নিতে এল না। সে বই দেখেই লিখল। শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষা একইভাবে হল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ান মেসে ফিরে বইপত্তর নিয়ে বাসে উঠল। বহরমপুরে তার এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল না। বহরমপুরে পরীক্ষা দিতে এসে তার ভালো রেজাণ্ট করার স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাকে আবার বহরমপুর আসতে হল। সফিউল এসে বলল তাদের গ্রামের ফরহাদ পাগল হয়ে গেছে। পাগল হওয়ার কারণটা বড় দুঃখের। ফরহাদ তাদের দু-ক্লাস নীচে পড়ত। একই ক্লাসে পড়ত ডোমকলের একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম মাধবী। মাধবী ডোমকলের আহসান মাস্টারের মেয়ে। মাধবীকে ফরহাদের খুব ভালো লেগে যায়। ফরহাদ সাহস করে সেকথা মাধবীকে বলেও ফেলে। কিন্তু মাধবীর ফরহাদকে পছন্দ নয়। সে ফরহাদকে মুখের উপর কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু ফরহাদের ভালো লাগার তাতে কোন

তারতম্য হয় না। সে সুযোগ পেলেই মাধবীকে সেকথা বলতেও কসুর করে না। মাধবী সেকথা তার বাবাকে বলে। বাবা বলেন স্কুলের হেডমাস্টারকে। আর হেডমাস্টার ডেকে পাঠান ফরহাদের বাবাকে। বাবা হেডমাস্টারের কথায় অপমানিত বোধ করেন। ফলে বাড়ি গিয়ে ছেলেকে উত্তম-মধ্যম দেন। কিন্তু তাতেও তার কোন পরিবর্তন হয় না। বাধ্য হয়ে মাধবী স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। তখন ফরহাদ মাধবী মাধবী করতে করতে আহসান মাস্টারের বাড়িতে হাজির হয়। বাধ্য হয়ে আহসান মাস্টার মেয়েকে বাইরে কোন আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাধবীকে না দেখতে পেয়ে ফরহাদ প্রথমে মাধবী মাধবী করে ছুটে বেড়িয়েছে। তারপর জামা-কাপড় ছিঁড়েছে। থালা-বাসন ভেঙেছে এবং অবশেষে লোকজনকে মারধোর করতে শুরু করেছে। শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেও তাকে বাড়িতে রাখা যায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত তার চিকিৎসার জন্য জেলে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিনসাতেক হল সে বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছে। এদিকে তার মা ছেলের শোকে পাগল হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তার মা সফিউলকে তার খবর এনে দেওয়ার জন্য ধরেছে। সফিউল এসে বলল, 'চল ঘুরে আসি।' আয়ান 'না' বলতে পারল না। কাজেই জামা-পাজামা পরে রওনা হল।

সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে তারা দেখা করার জন্য দরখাস্ত করল। দরখাস্ত মঞ্জুর হলে তারা দেখা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। ফরহাদকে একজন খাকী কাপড়পরা লোক ধরে নিয়ে এসে দাঁড়াল। সফিউল কথা বলল। আয়ানও দুয়েকটা কথা বলল। ফরহাদ এখনও একদম সুস্থ হয়ে ওঠেনি। তবে আগের তুলনায় অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। সে সফিউলকে বলল, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলেন।' সফিউল বলল, 'দুয়েকদিন অপেক্ষা কর, আমি কথা বলে নিয়ে যাব।' খাকী কাপড়পরা লোকটা এবার ফরহাদকে নিয়ে চলে গেল।

আয়ানরা চলে আসছিল। হঠাৎ কে পেছন থেকে তার নাম ধরে তাকে ডাকল। আয়ান ঘুরে তাকিয়ে দেখল, তাদের গ্রামের মাঠপাড়ার কামাল ডাকাত। সে বলছে, 'এখ্যানে আস্যাও চাচা আমার সঙ্গে দ্যাখা না কোর‍্যা চল্যা যাচ্ছো?' আয়ান হতবাক। সেই বিলাসপুরের ডাকাতি কেসে কামালকে পুলিশ ধরে এনেছিল তা আয়ান জানে। একথাও জানে যে, বিচারে তার জেল হয়ে গেছে। কিন্তু সে যে এই জেলেই আছে তা তো আয়ান জানত না। তাই সে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। দেখে, কামাল ডাকাত কেমন করুণ করুণ চোখ করে খুব কাছে এসে তাকে দেখছে। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমার চাচী ভালো আছে?' আয়ান ঠিক জানে না সে সত্যি ভালো আছে কি না। তবুও বলল, 'হ্যাঁ, ভালো আছে।' সে বলল, 'তুমার চাচীকে যায়্যা বুলো যে আমি ভালো আছি। আর চিঠি দিতে বুলো।' কামাল ডাকাতের চোখ মুখ যেন আরও করুণ হয়ে আসে। আয়ানের মনে হয় এ কামালকে সে এর আগে কখনও দেখেনি।

তার মনে পড়ে একদিনের কথা। যেদিন সামেদের গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দুজনে খাচ্ছিল। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। কামাল ওর বুকে ডান হাত দিয়ে কিল মেরে সামেদকে বলছিল, 'এ তলাটে তোঁ কেউ নাই যে এই কামালের মুকাবিল্যা করে!' বলে সে নিজে নিজেই সন্তোষের হাসি হেসেছিল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছিল। আর আজ সেই দুটো চোখই কেমন করুণ করুণ। কেমন বেদনায় যেন ছলছল করছে। অবস্থা মানুষকে কত পরিবর্তিত করে দেয়। আয়ান একদৃষ্টে কামালের দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন খাকী কাপড়পরা লোক এসে

কামালকে ভেতরে যেতে বলল। কামাল যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'তুমার চাচীকে কিন্তু বুলো। বুলো আমি ভালো আছি। আর চিঠি দিতে বুলো।' তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। যেতে গিয়েও ফিরে ফিরে তাকায়। যতক্ষণ দেখা যায় আয়ান দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সফিউলের সঙ্গে এসে বাসে ওঠে। বাস থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার আগে কামালের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কামালের স্ত্রীকে জেলখানায় কামালের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কামাল ভালো আছে জানায়। আরও জানায় যে তার স্বামী চিঠি দিতে বলেছে। কামালের বউ সেকথা শুনে কোন কথা বলে না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখে পলক পড়ে না।

কুড়ি

ক্রমে খবরটা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। জেল থেকে কামাল সামেদকে চিঠি লিখেছে। লিখেছে, 'তুই আমার বোন্ধু মানুষ। আমি যখুন জেলে আছি, তোর উচিত আমার বাল-বাচ্চা, মা-বোকে দেখাশুনা করা। তা না কোর‍্যা তুই গেলছিস আমার বোর ইজ্জত লুটতে। আসল বোন্ধুর কাজ কর‍্যাছিস। তোর আমি অনেক উপকার কর‍্যাছি। তার পতিদান তুই ভালোভাবেই দিয়াছিস। আমার জেল থাক্যা ছাড়া পাত্যা আর ছমাস বাকী আছে। ইয়ার মধ্যে তোর ভালো মুন্দো যা খাত্যা ইচ্ছা করে খায়্যালে। কারুণ আমি জেল থাক্যা বার হলে তোখে আর কেহু বাঁচাতে পারবে না। 'কেউ কেউ বলল, 'চিঠি একখানা লেখ্যাছে বটে।' কেউ বলল, 'একখান নারে, চিঠি লেখ্যাছে দু-তিনখ্যান।' কেউ বলল, 'না সামেদকে চিঠি লেখ্যানি। লেখ্যাছে উয়ার বোকেই।' আবার কেউ স্বীকার করল, 'হ্যাঁ কথাডা সত্যি বটে।'

কথাটা এই, কামাল জেলে গেলে সামেদ বন্ধুর মতোই কামালের বউ এবং ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করত। শুধু যে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করত, তাই নয়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খোঁজ-খবরও করত। আগে থেকেই সামেদের সঙ্গে কামালের বউয়ের আলাপ ছিল। স্বামীর অবর্তমানে সেই আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হল। সামেদের ওপর সে অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাই তার যা দরকার হত সামেদকে বলতে সংকোচে করত না। আর পরের বউয়ের ফাই-ফরমাশ শুনতে ভালোই লাগে। সামেদও সে যা বলত তাই শুনত। কিন্তু যখন শুনত, তখন একটা অন্যরকম ইচ্ছা লোভী সাপের মতো তার শিরায় শিরায় এঁকেবেঁকে বেড়াত। তাই কামলের বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে অনেক সুখঘন মুহূর্তের কথা কল্পনা করে হঠাৎ হঠাৎ আনমনা হয়ে যেত। কামালের বউ তাকে নিয়ে কিছু ভাবত কি না তা সামেদ বুঝতে পারত না। কিন্তু কামালের বউয়ের ভাবনা সে ভুলতে পারত না। ওদিকে জোহুর কারিকরের বাড়ি থেকে মেয়ে বার করে বলাৎকার করার ব্যাপারে তার বা খালেক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা হয়নি। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নাকি কোনরকম প্রমাণ পায়নি। কেসটা মিটে গেছে। তার দুশ্চিন্তার কোন বিষয় ছিল না। তাই কামালের পূর্ণ-যুবতী বউটা সব সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। বিশেষ করে দু-এক গ্লাস সুধা পান করলে তো কামালের বউকে জান্নাতের হুরী মনে হত। সেদিন গ্লাসটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। ডোমকলে দোকানটা খোলার পর

থেকে সে মাঝে মাঝেই খায়, কিন্তু এক-দু গ্লাসের বেশি খায় না। যখন কামাল ছিল, অর্থাৎ জেলে যায়নি তখন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তারা লুকিয়ে লুকিয়েও খেয়েছে। কিন্তু কামাল জেলে যাওয়ার পর থেকে সে একা হয়ে পড়েছে। একা একা সুধা পান করতে তার ভাল লাগে না, অথচ গ্রামের আর কেউ খায় না। কাজেই সে মামার দোকানে এসেই খায়, দু-একজন সঙ্গী-সাথীও জুটে যায়। একটু হৈ-হল্লা হয়। তবে সে দু-এক গ্লাসের বেশি খায় না।

কিন্তু সেদিন কি মনে হল দু গ্লাস খেতেই কামালের বউটার কথা মনে পড়ল। তার কথা ভাবতে ভাবতে সামেদ অনেকটা পান করে ফেলেছে। তারপরেই তার মনে হল কামালের বউ নিশ্চয় এতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে হুড়মুড় করে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল। মামা সাইকেলটা এগিয়ে দিল। সামেদ রাস্তায় দু-একবার আছাড় খেয়েও কামালের বাড়িতে এসে হাজির হল। রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই কামালের বউ খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল। সামেদ সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল। কামালের বউ সামেদ এসেছে টের পেয়ে উঠে বসতেই সামেদ তাকে জড়িয়ে ধরল। কামালের বউ অনেক চেষ্টা করল সামেদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে। কিন্তু যখন কিছুতেই সফল হল না তখন চিৎকার করে উঠল। কামালের বাড়ির পাশেই আবিদ হোসেন মোল্লার বাড়ি। সে তখন রাতের নামাজ পড়ছিল। ঘোর চিৎকারে তার নমাজের ব্যাঘাত ঘটল। সে উঠে শব্দ অনুসরণ করে দৌড়তে লাগল। কিন্তু এসে সামেদের দুই হাতের মধ্যে কামালের বউকে দেখেই সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে মুখ ফিরিয়ে উচ্চারণ করল, 'আস্তগ ফেরুল্লা, তৌবা তৌবা।' এদিকে সামেদ মাতাল হলেও তালে ঠিক ছিল। আবিদ হোসেনকে আসতে দেখেই টের পেয়েছিল যে, সে বিপদে পড়ে গেছে। আর যেখানে বিপদ সেখান থেকে যে পালায় সেই বাঁচে। সামেদও পালাল। আবিদ হোসেন মাথার টুপিটা ঘুরিয়ে পরে ঘুরে তাকিয়ে দেখল একা কামালের বউ আলুথালু হয়ে বসে আছে। সে বাড়ি ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে তুলল। রাত্রিবেলায় সারা পাড়ায় রব হয়ে গেল, 'সামেদ কামালের বোর কাছে আস্যাছোলো।'

পরের দিন সকালে কামালের বউকে সঙ্গে করে আবিদ হোসেন এসে উঠল খালেক বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। তার দাবি অন্যায়ের বিচার করতে হবে। খালেক বিশ্বাস দেখল, ব্যাপার খারাপ। কিন্তু জোহুরের বাড়ি থেকে মেয়ে বার করে বলাৎকারে সে ছিল সামেদের সঙ্গী। কাজেই সে কিছু করে সামেদের অপ্রিয় হতে চাইল না। সে বলল, 'সামেদ তো নাদের মণ্ডলের দশের লোক। আপনারা নাদের মণ্ডলের কাছে যান।' আবিদ হোসেন নাদের মণ্ডলের কাছেই গেল। কিন্তু এই কিছুদিন হল সামেদের প্রচেষ্টাতেই নাদের মণ্ডল ফৈমুদ্দিনের জমির একটা বড় অংশ লাভ করেছে। কাজেই সামেদের কাছে সে অনেক পরিমাণে ঋণী। সুতরাং সেও সামেদের বিচার করল না। তখন বাধ্য হয়ে কোন উপায় না থাকায় কামালের বউ বিচারের জন্য চিঠি লিখল জেলে স্বামীর কাছে। চিঠি পেয়ে কামাল রাগে অন্ধ হয়ে গেল। রাগের চোটে নিজেই নিজের শরীর কামড়াতে লাগল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল, 'এই সামদকে আমি খুন করবই।' কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেই সে, শান্তি পেল না। সে সামেদকে চিঠি লিখল। চিঠি লিখল তার বউয়ের কাছেও, 'তুমি আর কডা দিন সোবুর কোর্যা থাকো। আমি জেল থাক্যা ছাড়া পাল্যাই ইয়ার বিচ্যার কেরবো।'

চিঠি পেয়ে কামালের বউ সবুর করে আছে। কিন্তু সামেদের আর সবুর সইছে না। সে কামালকে ভালোভাবে চেনে। তাই তার চিঠির মানেও সে বুঝেছে। মানে বুঝেছে, তবুও বারবার চিঠিটাকে পড়েছে। যত পড়েছে তত তার মৃত্যুকে খুব কাছে মনে হয়েছে। সে বাঁচার জন্য ছুটে গেছে নাদের মণ্ডলের কাছে। নাদের মণ্ডল তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর বলেছে, আবিদ হোসেনরা সামেদের বিরোধিতা করছে। কাজেই নিরাপদ হতে হলে আবিদ হোসেনদের পক্ষে আনতে হবে। সামেদ চেষ্টা কম করেনি। ব্যর্থও হয়নি। লোক লাগিয়ে নিজে থেকে আগ্রহ দেখিয়ে আবিদ হোসেনের ভাইঝির সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছে। এখন আবিদ হোসেনের গোষ্ঠী সামেদের আত্মীয়। তবুও সামেদ আশ্বস্ত হতে পারেনি। সে হান্নান পীরের শিষ্য হয়েছে। পীর সাহেবের হাতে হাত দিয়ে তৌবা করেছে, সে আর কোনদিন মদ খাবে না, পরের মেয়েছেলের দিকে লোভ করবে না, আর ধর্ম করবে। সে দাড়ি রেখেছে। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ছে। আর গরীব দুঃখীদের দান-ধিয়ানও করছে। আর এ হেন একজন শাঁসাল শিষ্য পেয়ে হান্নান পীর তো সামেদের বাড়িকে এ অঞ্চলে তার হেডকোয়ার্টার করেছে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে যখন-তখন আসছে। মিঠাই-মণ্ডা যা পারছে চেপে খাচ্ছে। আবার যাবার সময় বেঁধেও নিয়ে যাচ্ছে। লোকে বলছে, 'দ্যাখো, হান্নান পীর সামেদের মতো লোককেও সংশোধন ক্যের‍্যা ফেল্যাছে।' একজন পাশে থেকে টিপ্পনী কেটে বলছে, 'সংশোধন করেনি পীরে—কোর‍্যাছে কামাল ডাকাতের ডরে।' পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠছে, 'তা যা বোলেছো ভাই। দারোগা পুলিশ যা পারল না, তাই কোর‍্যা দিলো কামাল ডাকাত এক চিঠিতে। তাজ্জোব ব্যাপার!' আরেকজন বলল, 'তাজ্জোবের তো এখুনো কিছু হয়ইনি। দাঁড়াও, কামাল ডাকাত আগে জেল থাক্যা আসুক। তারপর দেখবা মজাডা ক্যাম্নু লাগে।'

কামাল ডাকাত জেল থেকে এল, আর মজাটাও লাগল। কিন্তু তা এত ঘোরাল হয়ে লাগল যে, মজা আর মজা রইল না। কামাল জেল থেকে এসে ঘোষণা করল যে, সে সামেদকে যেখানে পাবে সেখানেই খুন করবে। তবুও সামেদ নাদের মণ্ডলের পরামর্শমতো কামলের বাড়িতে গেল। দুপুরবেলায় কামাল তখন ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। সামেদকে দেখে কামালের বউ খুব ভয় পেয়ে গেল। ভাবী খুন-খারাবির আতঙ্কে সে শিউরে উঠল। আতঙ্কিত হয়ে সে স্বামীর কাছে চলে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল কামাল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সামেদ। দুজনেই দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। কামালই প্রথমে কথা বলল, 'তুই এখ্যানে ক্যানে আস্যাছিস?' সামেদ বলল, 'তুই তো বলছিস, আমাকে খুন কোরবি, তাই আমিই আনু, খুন করিস তো কর। অন্যায় তো একটা হয়েই গেল্‌ছে। তার লাগ্যা আমি তোবা টোবা কর‍্যা পীরের মুরিদ হয়্যাছি।'

পীরের কথা শুনে কামাল চটে গেল। 'তোর ভেক দেখ্যা হান্নান ডাকাত ভুলতে পারে, কিন্তু এই কামাল ডাকাত ভুলবে না।' হান্নানকে কামাল ডাকাতই বলে। সে নাকি হাটপাড়ার কাছে রাস্তার ওপর ডাকাতি করত। বাগড়ী অঞ্চল থেকে অনেকেই গাড়ি নিয়ে রাঢ়ে কিছুটা সস্তায় ধান কিনে আনতে যায়। হান্নান করত কি রাস্তার মাঝে এইসব গাড়োয়ানদের মারধোর করে টাকা-পয়সা বা ধান কেড়ে নিত। কিন্তু একবার বর্তনবাজের পনের-ষোলখানা গাড়ি একসঙ্গে যাচ্ছিল। তারা হাটপাড়ার হঠকারিতার কথা জানত। তাই সঙ্গে লাটি-সোটা নিয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু হান্নান ডাকাত এতসব জানত না। সে পাঁচ-সাতজন লোক নিয়ে এসে গাড়ি আটকাল। যে গাড়োয়ানটার গাড়ি ধরেছিল, সে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় করল। কিন্তু সব টাকা না দিয়ে দিলে হান্নান ডাকাত ছাড়বে না। ততক্ষণে অন্যান্য গাড়োয়ানরা লাঠিহাতে, সিপারা হাতে তাদের ঘিরে ধরেছে। তারা হান্নান ডাকাত ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের এমন ধোলাই দিল যে, সব রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। হান্নান অনেক দিন থেকেই একাজ করছিল। কিন্তু এরকমটা কোনদিন হয়নি। তাই গাড়োয়ানদের এরকম ব্যবহার সে আশা করেনি। সে প্রস্তুত ছিল না। তাই বেঘোরে মার খেল এবং মার খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে রইল। কিন্তু তাতেই শেষ হল না। থানার বড়বাবু রাতে ঐ রাস্তা হয়েই ফিরছিলেন বহরমপুর থেকে। তিনি হান্নানদের তুলে নিয়ে গেলেন থানায়। কয়েকটা ডাকাতি কেসে হান্নানকে খোঁজা হচ্ছিল। কাজেই তার কয়েক বছরের মেয়াদ হয়ে গেল।

কিন্তু জেল থেকে ফিরে হান্নান আর ডাকাতি করল না। কয়েকদিনের জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে এসে গ্রামের লোকদের বলল যে, সে দেওবন্দের পীরের মুরিদ হয়েছে। তার কিছু শিষ্য যোগাড় হয়ে গেল। সেই থেকে হান্নান পীর। সে এখন লোককে ধর্মের উপদেশ দিয়ে খেয়ে বেড়ায়। তবে গরীব-গুরবোকে নয়। সে শাঁসাল শাঁসাল পার্টি ধরে মুরিদ করে আর ধর্মের উপদেশের নামে তাদের ট্যাক ফাঁকা করে নেয়। এতে ধরা পড়ার ভয় নেই, মারও খেতে হয় না, লোকেও ভালো বলে। আবার ইনকামও ভালো হয়। হান্নানকে এখন সবাই বলে পীরসাহেব। কিন্তু কামাল বলে ডাকাত। বলে, 'শালা মারের ভয়ে পীর সাজ্যাছে।' তাই পীরের কথায় চটে গেল। সে বলল, 'মরার ভয়ে মুরিদ হয়্যাছিস। আর পীরও পায়্যাছিস ভালো। কিন্তু তোকে আমি বাঁচতে দিব না। যেখ্যানে পাব সেখ্যানে খুন কোরবো। আজ আমার বাড়িতে আস্যাছিস বলে তোর গায়ে হাত দিব না। তুই আমার বাড়ি থাক্যা চল্যা যা। সামেদ যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তা কেউ শোনেনি। সবাই দেখল সামেদ কামালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবল কামালের সঙ্গে সামেদের বিবাদ মিটে গেছে। শুধু সামেদ জানল যে, বিবাদ মিটল না। সে গিয়ে নাদের মণ্ডলকে বলল, নাদের মণ্ডলও জানাল তার প্লান সফল হল না।

সামেদ একা একা বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিল। কোথাও যাওয়ার বিশেষ দরকার হলে অন্তত চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে করে যেতে লাগল। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিয়ে রাতে জেগে থাকতে লাগল। তাছাড়া রাতে কয়েকজন পাহারাও রাখল। সামেদকে খুন করতে না পেরে কামাল ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে গেল। সে দিন-রাত একটা বড় হেঁশে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সামেদকে কিছুতেই বাগে পায় না। এদিকে জেলে থাকার সময় তার ডাকাতের দল ভেঙে গেছে। কে যে কোথায় আছে সে সব সে এখনও ঠাহর করে উঠতে পারেনি। অবশ্য তার সময়ও হয়নি। ফড়িঙ মামলায় হেরে যাওয়ার পর খালেক বিশ্বাসকে ধরে পড়েছিল, কিছু একটা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য। সামেদ বা নাদের মণ্ডলের বেশি জমি হয়ে যাক সেটা খালেক নিজেও চায়নি। তাই মীমাংসার অজুহাতে কিছু জমি যদি ফেরত দেওয়ানো যায় তার জন্য খালেক সামেদের সঙ্গে কথাও বলেছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সামেদ বলেছিল সে তার সমস্ত জমি ফৈমুদ্দিনের শেষপক্ষকে ফেরত দেবে। তারপর তারা যা

বোঝে করবে। এরপর খালেক আর কিছু পারেনি। তাই ফড়িঙ কামাল আসার দিন গুনছিল। সে আসতেই কামালকে গিয়ে ধরল। কামালও দেখল এই সুযোগ। সে ফড়িঙের ছেলেগুলো এবং পাড়ার আরও কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে একটা দল করল। এই দল নিয়ে মাঝে মাঝে দূর দূর গ্রামে ডাকাতি করতে লাগল। আর প্রায়ই সামেদ বা নাদের মণ্ডল বা পাড়ার অন্য কারও কিছু চুরি করতে লাগল। গাছের আম-কাঠাল, বাঁশঝাড়ের বাঁশ, যা পারল রাতের আঁধারে চুরি করে বেচে দিতে লাগল। সামেদ আর নাদের মণ্ডল উদ্যোগী হয়ে একটা ভলান্টিয়ার পার্টি তৈরি করল। তাদের দলে তেইশটা বাড়ি আছে। ঠিক হল সামেদ আর নাদের মণ্ডল মিলে প্রতিদিনই একটা করে লোক দিতে হবে। ফলে প্রতিদিন তিনটি বাড়ি থেকে তিনজন এবং সামেদ ও নাদের মণ্ডলের বাড়ি থেকে একজন করে পাড়া পাহারা দিত। এর ফলে কামালের পক্ষে চুরি করাও অসুবিধা হয়ে গেল। সে ডাকতি করার কথাও ভাবতে পারল না। কারণ লোকজন জেগে থাকলে ডাকাতি করা যায় না। আর গ্রামে ডাকাতি করলে সবাই চিনে ফেলবে। আবার তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। সামেদকে আর খুন করা হবে না। তখন সে ফাঁক-ফোঁকর খুঁজতে লাগল।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। আয়ানের খুড়তুতো বোনটা বাঁশঝাড়ের পাশে তাদের যে খেজুর গাছ আছে তা থেকে খেজুরের পাতা কেটে বিশ্বাসদের গুলগুলিতলার কাছ দিয়ে আসছিল। কিন্তু খালেক বিশ্বাস তা দেখে মনে করল সে পাতা তার কলম বাগান থেকে কেটেছে। তাই কিছু জিজ্ঞেস না করেই দু-থাপ্পড় দিয়ে পাতাগুলো সে কেড়ে নিল। মেয়েটি মার খেয়ে পাতা হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। আয়ানের কাকীমার গালিগালাজ শুনে আয়ান ওদিকে গেল। সব শুনে আয়ানের খুব খারাপ লাগল। সে তার বোনটাকে নিয়ে খালেক বিশ্বাসের কাছে রওনা দিল। পেছনে পেছনে খালেক বিশ্বাসকে গাল দিতে রওনা হল তার কাকীমা।

কিন্তু খালেক বিশ্বাসের বাড়ি যেতে হল না। সে মাঠে বেরিয়েছিল। আয়ান তাকে তালতলার ভুঁইয়ের কাছেই পেয়ে গেল। খালেককে সামনে পয়ে আয়ান জানতে চাইল, 'ছুড়িকে মেরেছেন কেন?' খালেক বিশ্বাস উত্তর দিল, 'আমার গাছের পাতা কাট্যাছিলো, তাই মেরেছি।' কিন্তু ও'তো বলছে পাতা আমাদের গাছে কেটেছে।' 'বললে তো হবে না। পাতা আমার গাছে কাট্যাছে।' 'আপনি বললেও তো হবে না। চলুন আপ্নার কোন্ গাছে পাতা কেটেছে, দেখান।' খালেক এবার আয়ানের আস্পর্ধা দেখে ভয়ানক চটে গেল। সে বলল, 'তুমার দরকার থাকে দ্যাখো গা, আমার দরকার নাই, আমি আমার মাটিতে পায়্যাছি, পাতা ধরেছি।' আয়ান বলল, 'আপনাকেও এখন আমার মাটিতে পেয়েছি, তাহলে আপনার ছাতাটা কেড়ে নিই!' একথা শুনে খালেক চিৎকার করতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে এল আবুলের দাদা আকুল। এসেই সে কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই, 'তুরা কি ভাব্যাছিস রে' বলে আয়ানকে ঘাড় ধরে এক ধাক্কায় অনেকখানি সরিয়ে দিল। নাদের মণ্ডল দৌড়ে আসছিল। আকুল তাকেও এক ধাক্কা দিয়ে বাড়ির দিকে সোজা দৌড়াতে লাগল। আর নাদের মণ্ডলকে ধাক্কা দিতে দেখে লোকে ভাবল মারামারি লেগে গেছে। তাই দুই পক্ষেরই লোক লাঠি-সোটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আকুল ততক্ষণে ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। নাদের মণ্ডলের বাড়ির

সকলে চলে এল। আয়ানের বাবা-কাকারা সব বেরিয়ে এল। যেন একটা মহাকাণ্ড হয়ে গেছে। আয়ান অবাক হয়ে গেছে যে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে সে কি কাণ্ড করে তুলেছে। সে তো শুধু খালেককে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে, তার কাকাত বোনকে মারা তার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আকুল এসে যেতেই পাড়ায়-পাড়ায় কাজিয়া করে তুলল। আয়ান আর নাদের মিলে তাদের পাড়ার লোকদের শান্ত করল। বিশ্বাসপাড়া থেকেও আকুল না এলেও অন্যান্যরা বেরিয়ে এসেছিল, সাম-মহম্মদ আর আসগর বিশ্বাস মিলে তাদেরকেও শান্ত করল। সবাই শান্ত হলে আয়ান বলল যে, কার গাছের পাতা কাটা হয়েছে দেখা হোক। খালেক বিশ্বাসের গাছের পাতা কাটা হলে সে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু পাতা তাদের গাছের হলে খালেক বিশ্বাসকে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু খালেক বিশ্বাস যেতে রাজি হল না। সবাই বুঝল ব্যাপারটা। কিন্তু কেউ খালেক বিশ্বাসকে বোঝাতে পারল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল। সাম-মহম্মদ দেখল হাওয়া তাদের বিপক্ষে। কাজেই সে খালেককে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ি নিয়ে গেল।

দুপুর বেলাতেই খালেক বিশ্বাসের বৈঠকখানায় একটা মিটিঙ বসল। ছোটলোকদের খুব বাড় বেড়েছে। কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। সাম-মহম্মদ সুযোগের জন্যই বসেছিল। কথা উঠতেই সে তার চাপ দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এই ইব্রাহিমের ব্যাটাডা, দু কিলাস পড়হ্যা, একেবারে ছোটো বড়ো মানে না। আমি মালেক ভাইকে তখুনি বুল্যাছিনু কাঁটার মুক ছুঁচল্যা কোরো না। তা, আমার কথা তো কেহু শুনবে না।' খালেক বলল, 'যা হয়্যা গেলছে তা হয়েই গেলছে। এখুন আর তা ভাব্যা লাব নাই। এখুন কি করা যায় তাই ভাবতে হবে।'

সবাই ভাবতে লাগল কি করা যায়। সাম-মহম্মদ বলল, 'ইয়াতে ভাবার কিছু নাই। উয়াধের লাঠির জোর আছে। দাপটের সঙ্গে থাকতে হলে আমাধেরও লাঠির জোর করতে হবে। ইপাড়ায় আমাধের লোক বেশি নাই। অন্য পাড়ার লোক হাতে করতে হবে।' সবাই স্বীকার করল কথাটা একদম ঠিক। সাম-মহম্মদ উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল, 'এখুন কামাল আর ফড়িঙ উয়াধের উপর চটা। উরা আমাধের দিকে আসতে পারে।' খালেকের কথাটা মনে ধরল। একসময় কামালের সঙ্গে তার ভালই সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কামাল কোন কারণে সামেদের দিকে চলে যায়। এখন তো সামেদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। কাজেই এখন সে তার দিকে আসতেই পারে। আর ফড়িঙকে তো ডাকলেই আসবে। খালেক দুজনের সঙ্গেই কথা বলল। তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হল। ফড়িঙ আর কামাল ঘন ঘন খালেক বিশ্বাসের বাড়ি আসতে লাগল। রাত নেই দিন নেই যখন-তখন খালেক বিশ্বাসকে কামাল আর ফড়িঙের সাথে শলা-পরামর্শ করতে দেখা যেতে লাগল। দেখা যেতে লাগল একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও।

আশেপাশের গ্রামগুলোতে চুরি-ডাকাতি খুব বেড়ে গেল। সপ্তাহে অন্তত দুটো-তিনটে ডাকাতি হয়ই। পুলিশ কামালের বাড়িতে আসে। কামাল তাঁর ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখায়। 'দেখুন, আমি আর ডাকাতি করি ন্যা। আমি যেদিন ঐ সামদ্যাডাকে খুন কোরবো সেদিন আপনারা আমাকে ধর‍্যা লিয়ে যায়েন।' পুলিশের লোকেরা তার বাড়িতে কিছু পায় না। কেউ তাকে দেখেছে তাও বলতে পারে না। সবাই বলে, মুখে কাপুড় বাঁধা ছিলো। চিনতে পারিনি। তাই পুলিশও কামালকে ধরতে পারে না। সবাই বলে, 'সত্যি, কামাল সামেদকে মারব্যার লগ্যা

ডাকাতিও ছাড়্যা দিয়্যাছে।' কিন্তু ওরই মধ্যে দু-একজন তা মানতে রাজী হয় না। তারা বলে, 'ডাকাতি ছ্যাড়া দিয়্যাছে তো চল্যা কি কোর‍্যা, কাজ তো কিছু করে না। তাহলে রোজ রোজ মাচ গোচ্ আসে কি কর‍্যা? আসলে মাল তো এখুন বাড়িতে রাখে না। রাখে খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে।' পুলিশের কাছেও হয়তো সেইরকমই খবর ছিল। তাই মাঝে মাঝেই পুলিশের গাড়ি খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে আসত। তবে খালেক বিশ্বাসকে ধরতে নয়। তার বাড়ি তল্লাশি করতেও নয়। তাদের কাজ থাকত। তাই আসত। আগেও আসত। এখনও আসে। আজও এসেছিল।

বাঘডাঙ্গা গ্রামে আশেপাশের গ্রামের মতো ডাকাতি হয় না। কিন্তু মণ্ডলপাড়ার সকলেরই কিছু না কিছু চুরি হয়ে যাচ্ছে। গাছের কাঁঠাল গাছে থাকছে না। জমিতে ধান-পাট-গম রাতারাতি লোপাট হয়ে যাচ্ছে। অথচ পরের দিন ধরার কোন উপায় নেই। গম চুরি করলে রাতে রাতেই মাড়াই করে নিচ্ছে বা খালেক বিশ্বাসের খোলায় এনে রেখে দিচ্ছে। বিশ্বাসপাড়ার অন্যান্যদের গোলাও তারা ব্যবহার করছে। কোন কিছু লুকিয়ে রাখতে হলে তাদের বাড়ি রেখে যাচ্ছে। কিছু জিনিস বিক্রি করতে হলে খালেক বিশ্বাসই বিক্রি করে দিচ্ছে। সামেদের খোলস্যাকুড়ির ভুঁইয়ের গমগুলো কারা একদিন রাতে সব কেটে নিয়ে গেল। আয়ানদের গড়ানের ভুঁইয়ের গমও একরাতে চুরি হয়ে গেল। তারপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, নাদের মণ্ডলের কলম বাগানের সব ছোট ছোট গাছগুলোকে কারা রাতের বেলা কেটে ফেলে রেখে গেছে। গম চুরি তাও বোঝা যায়। তাদের লাভ আছে, কিন্তু গাছগুলি কাটলে তাদের কোনও রকম লাভ নেই। শুধু অন্যের ক্ষতি করার জন্যই করেছে। প্রতিটি ঘটনার খবরই থানায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু থানা থেকে একবার খোঁজ করতেও কেউ আসেনি। আসেনি বললে ভুল হবে। খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে এসেছে।

একদিন সকালবেলায় দেখা গেল আয়ানদের ঝাড়ের বাঁশগুলো কারা কেটে নিয়ে গেছে। আয়ানের বাবা খোঁজ নিয়ে দেখল বাঁশগুলো ফড়িঙের বাড়িতে আছে। তিন পাড়ার মানুষ ডাকা হল। কিন্তু বিচার হল না। খালেক বিশ্বাস এবং বিশ্বাসপাড়ার সবাই বলতে লাগল এ বাঁশ ইব্রাহিমের ঝাড়ের নয়। আয়ান বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে এই বাঁশ এরা কোথা থেকে এনেছে বলুক।' খালেক উত্তর দিল, 'তা বলতে যাবে কেন? তুমাধের বাঁশ নয় মিটে গেল। ওরা যেখ্যান থাক্যা খুশি বাঁশ আনুক তুমার দেখার দরকার নাই।' আশ্চর্য, এক নাদের ছাড়া আর কেউ কিছু বলল না। আয়ান আজ নিজে থানায় গেল। অফিসার ইন চার্জকে খোঁজ করল। কিন্তু পেল না। ডিউটি অফিসারকে ঘটনার কথা বলল। ডিউটি অফিসার একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লিখে দিন, এতে যা বললেন লিখে দিন। 'আয়ান লিখে দিয়ে জানতে চাইল, 'কখন আপনারা দেখতে যাবেন? খুব বেশি দেরি হলে তো বাঁশগুলো সরিয়ে ফেলতে পারে।' ডিউটি অফিসার বলল, 'আপনি যান। আমাদের সময় হলে ঠিকই যাব।' আয়ান চলে এল, কিন্তু তাদের আর সময় হল না। থানা থেকে কেউ এল না। দিন চারেক পরে আয়ান গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করল। সে বলল, 'কিন্তু পরশুদিন তো মেজবাবু বাঘডাঙ্গায় গিয়েছিলেন।' আয়ান বলল, 'গিয়েছিলেন। তবে কেস দেখতে নয়, খালেক বিশ্বাসের বাড়ি।' বড়বাবু বলল, 'সে কি? আচ্ছা

আপনি যান। আমি খোঁজ নিচ্ছি।' বড়বাবু খোঁজ নিয়েছিল কিনা আয়ান তা জানে না। তবে থানা থেকে কোনদিনই কেস দেখতে কেউ এল না। আয়ান বুঝতে পারল যে, থানা থেকে তারা কোনরকম সাহায্যই পাবে না। নাদের মণ্ডলও একই কথা বলল, 'খালেক বিস্‌স্যাস টাকা দিয়্যা থানা কিন্যা লিয়্যাছে।'

থানা থেকে যখন সাহায্য পাওয়া যাবে না তখন নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। এ পাড়ার লোকও ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। ভলাণ্টিয়ার পার্টির লোকজন বাড়াল। প্রতিরাতেই অন্তত পাঁচ-সাতজনের দল পাড়া গার্ড দিতে থাকল। আর শুধু লাঠি-সোটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল না। ফালা-বল্লম, টাঙ্গি, তীর-ধনুক তৈরি করতে লাগল। টর্চ কিনল। এপাড়ার খবর গিয়ে পৌঁছল বিশ্বাসপাড়াতে। তারাও যত পারে তীর-ধনুক, ফালা-বল্লম তৈরি করতে লাগল। এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হল যে, যে কোন মুহূর্তেই একটা বড় ধরনের মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। মণ্ডলপাড়ার লোকেরা এখন ফলের বাগান বা মাঠেও পাহারা দিচ্ছে। তারা ঠিক করেছে যে, চুরি বা ডাকাতি করতে দেখলে তারা ঠেকাবেই। মাঠের চুরি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে মুহূর্তে মুহূর্তে গুজব ছড়াচ্ছে। মণ্ডলপাড়ায় এই শোনা গেল, ওরা বিশ্বাসের পুকুরের পাড়ে জমায়েত হচ্ছে। এখনি হয়তো কোথাও চুরি করতে যাবে। বিশ্বাসপাড়ায় পরের মুহূর্তে শোনা গেল—নাদের মণ্ডলের বাড়িতে একটা মিটিঙ হচ্ছে। আজ রাতেই বোধ হয় ওরা আক্রমণ করবে। এইরকম প্রতি মুহূর্তের গুজবে আর পাল্টা-গুজবে গ্রামটা আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। গোটা পরিবেশটা একটা বোমার মত হয়ে রইল, একটু নড়াচড়া হলেই বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় খবর এল যে, কামাল ডাকাতরা নাদের মণ্ডলের বাগানে গাছ কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে এ পাড়ার সমস্ত লোক লাঠি, ফালা, বল্লম, টাঙ্গি আর তীর-ধনুক নিয়ে ফৈমুদ্দিনের মাঠ্যালের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদিকে বিশ্বাসপাড়ায় খবর এল যে, ওরা বেরিয়ে পড়েছে। বিশ্বাসপাড়ার সমস্ত লোক অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে গুলগুলিতলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন ছুটে গেল কামাল ডাকাতকে খবর দিতে। ওদিকে ওরা তড়পাচ্ছে— এগিয়ে আয়, এদিকে এরা তড়পাচ্ছে— এগিয়ে আয়।

নাদের মণ্ডল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সে, দেখল আজ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। সে এরকমটা চায়নি। সে চেয়েছিল যাতে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়। সে তাড়াতাড়ি এসে মণ্ডলপাড়ার লোকদের বলল, 'তুরা কেহু আগাবি ন্যা। আয়ান, তুমি দেখো যাতে কেহু না আগায়।' এই বলে সে খালিহাতে গুলগুলিতলায় দিকে এগুতে লাগল। 'খালেক, তুমরা চিল্লাচ্ছ ক্যানে? তুমাধের কি হয়্যাছে?' নাদের কাছে আসতেই কামালের লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। নাদের আবার বলল, 'খালেক, তুমাধের কি হয়্যাছে? চিল্লাছ ক্যানে?' খালেক বলল, 'আপনারা তো আমোধের মারতে আসছেন।' নাদের বলল, 'মারতে আস্যা কি কেহু খালিহাতে আসে?' এতক্ষণে সকলের খেয়াল হল যে, নাদেরের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। সবাই তার কাছাকাছি এগিয়ে এল। নাদের বলল, 'এ যে দেখছি সবার হাতেই অস্ত্র, ওদিকেও সবার হাতেই অস্ত্র। একবার লাগলে কেহু বাঁচবে? দ্যাশ ধ্বংশ হয়ে যাবে। তুমি মানা কর।' বলেই নাদের এদিকে চলে এল। তখনও সবাই তড়পাচ্ছে। নাদের সকলকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে আনল।

পরের দিন বহরমপুর থেকে ডি. এস. পি. সাহেব এসে কামালকে ধরে নিয়ে গেল। কুমোরপুরে সম্প্রতি একটি ডাকাতিতে একটি ছেলে মারা গিয়েছে। ঐ ডাকাতি কেসেই কামালকে ধরা হয়েছে। খালেক সঙ্গে সঙ্গে থানায় ছুটল, কামালের জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বড়বাবু বলল যে, ঐ কেসে খালেকেরও নাম আছে। কাজেই খালেক জামিনের জন্য আর বহরমপুরে যেতে পারল না। সে বাড়িতেও থাকল না, নস্করপুরে তার আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেল। ফিরে এল দিন পনেরো পরে, আসগর বিশ্বাসের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে। ইতিমধ্যে কুমোরপুরের ডাকাতি কেসে কামালের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই কামাল কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়েছে। আসগর বিশ্বাসের ছেলের বিয়েতে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু কামাল বা তার দলের কেউ এই বিয়েতে এল না। খালেক বিশ্বাস তার জামিনের জন্য না যাওয়ায় কামাল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই সে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও এল না। বিয়ের দিন চারেক পর খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল। তাদের কাঁসার থালা-বাসন, সোনার গহনা-পত্র, নগদ টাকা-পয়সা ডাকাতরা সব নিয়ে তো গেলই, উপরন্তু খালেক বিশ্বাসকে মেরে আধমরা করে রেখে গেল। সবাই বলল, ঐ কামালের দলই করেছে। খালেকের কাছে ডাকাতির সোনাদানা ছিল। খালেক সেগুলো মেরে দিচ্ছিল। কামালের ধারণা, তাদের খুব অল্প টাকাই দেওয়া হচ্ছিল। আর খালেক পুলিশকে দিতে হচ্ছে বলে পুলিশকে যা দিচ্ছিল তার থেকে নিজে বেশি খেয়ে নিচ্ছিল। তাছাড়া তারা যেসব গম অন্যের জমি থেকে কেটে এনে খালেকের গোলায় রেখেছিল, খালেক তারও দাম দেয়নি। এইসব নিয়ে অনেক দিন ধরেই মন-কষাকষি চলছিল। কিন্তু প্রকাশ হয়নি। কিন্তু কামালের জামিনের জন্য খালেক না যাওয়াতেই সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কামালের ধারণা খালেক তাকে জেলে পাঠিয়ে দলের সব টাকা মেরে দিতে চায়। কামালের আরও ধারণা যে, খালেকই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাই সে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করেছে খালেককে শিক্ষা দেবে। যেই কথা সেই কাজ। রাতের বেলা দলবল নিয়ে চলে এসেছে। তারপর বাড়িতে যা ছিল সবই নিয়ে গিয়েছে। এরা নাক-মুখ ঢেকেও আসেনি। খালেক সকলকেই চিনতে পেরেছে, কিন্তু পুলিশকে খালেক সে কথা বলল না। খালেক বলল যে, সে কাউকে চিনতে পারেনি। তবুও গ্রামে রাতের বেলা পুলিশের গাড়ি এল। কামাল বাড়িতে ছিল না। তবে তার দলের দুজন ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু কামাল পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

দুদিন পরের ঘটনা। সামেদের নতুন বেহাই আলি হোলেন মোল্লা বাজারে সাইকেলে করে গম ভাঙাতে যাচ্ছিল। কামাল তার একজন সঙ্গী সমেত পাটের ভুঁই থেকে বেরিয়ে গলাটা কেটে ফেলল। তারপর রক্তমাখা হেঁসোটা নিয়েই আবার পাটের ভুঁইয়ে ঢুকে গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ছুটে গেল। পুলিশ এল। কিন্তু কামালের আর খোঁজ পাওয়া গেল না। কেউ বলল, 'সে ওপারে পালিয়ে গেছে।' কেউ বলল, 'অন্যদলের লোকেরা পথে মেরে ফেলেছে।' আবার কেউ বলল, 'না, বেঁচেই আছে। তবে ওপারে গিয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খাটছে।'

একুশ

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল চলে এল। কালো মেঘ সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি হল। এত বৃষ্টি শুরু হল যে, ছাগলখালি বিলের সব ধান ডুবে গেল। বিল ভর্তি হয়ে জল এবার ডাঙায় উঠতে শুরু করল। এর মধ্যে বড়বিলে ডাড়া দিয়ে ভৈরব নদীর জল এসে ঢুকল। বানের জল বড়বিল ছাপিয়ে হাঁসকলমের মাঠ ডুবিয়ে দিয়ে বাঘডাঙার দিকে এগুতে লাগল। বৃষ্টিও বন্ধ হল না। ক্রমে বৃষ্টির জল আর বন্যার জল একাকার হয়ে মাঠকে মাঠ সাদা করে দিল। রাস্তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যেতে লাগল। পাটের ক্ষেতে এক কোমর জল। বিলে তো নামার উপায় নেই। নদীর মত ঢেউ খেলছে। রাস্তাতেই একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেল। লোকের বাড়িতে জলের ঢেউ ঢুকে পড়ছে। যাদের নিচু জায়গায় ঘর ছিল তাদের ঘরগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আয়ানদের আঙিনায়ও জল উঠে পড়েছে। তাদের বড় ঘরের ভিতটা উঁচু করা ছিল, তাই এখনও জল ওঠেনি। তবে রান্নাঘরে, গোয়ালঘরে জল উঠে গেছে। গরুগুলোকে কোথাও বাঁধার উপায় নেই। রাতদিন জলে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের পায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে। আবার মাঠ-ঘাট সব ডুবে আছে, কোথাও একটু ঘাসের দেখা নেই। শুকনো খড় যা ছিল তাও পচে নষ্ট হয়ে গেছে। গরুর খাবারও নেই। প্রায় না খেয়ে এবং কখনও সামান্য কিছু খেয়ে গরুগুলো ক'দিন বাঁচল। তারপর পায়খানা হয়ে মারা গেল। কিন্তু ওগুলোকে ফেলারও জায়গা নেই, জলেই ভাসিয়ে দিতে হল। লোকে কলার গাছ কেটে মাচা তৈরি করল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ এখন কলার মাচায় করে।

আয়ানের মনে হয় এরকম চলতে থাকলে তাদের গ্রামের সব লোক মরে যাবে। কেউ বাঁচবে না। কেই বা বাঁচাতে আসবে! কিন্তু বাঁচাতে এল। নৌকায় বি. ডি. ও. অফিস থেকে লোকেরা রিলিফ নিয়ে এল। কাউকে একটা প্লাস্টিকের ত্রিপল দিল। কাউকে একসের চিড়ে আর কাউকে খানিকটা গুড়। তরপর তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। জলবন্দী লোকেরা যেমন ছিল তেমনি থাকল। ভাগ্যক্রমে ভৈরব নদীর জল কমে গেল। বড় বিলের জল ডাড়া দিয়ে নেমে নদীতে পড়তে লাগল। বৃষ্টিও থেমে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে রাস্তাঘাট থেকে জল নেমে গেল। তবে তখনও মাঠে জল দাঁড়িয়ে থাকল। বিলে জলের ঢেউ খেলতে লাগল। সব ধান হেজেমজে মরে গেছে। অর্থাৎ এ বছরে বাঘডাঙার লোক বিলের জমি থেকে আর এক ছটাকও ধান পাবে না। ওপর মাঠেরও অনেক ধান নষ্ট হয়ে গেছে। পাটের গোড়ায় জল জমে থাকায় শিকড় বেরিয়ে গেছে। এখনই কাটতে হবে। না হলে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। মাঠে পলি পড়েছে। অর্থাৎ পরের ফসল খুব ভাল হবে।

আয়ানদের বিলে কোন নিজের জমি নেই। তবে তার বাবা পাঁচ-ছয় বিঘে বিলের জমি ভাগে চাষ করে। তাতে যে ধান পায় তাতে তাদের সারা বছরের খাবার চলে। কিন্তু এবার তারা একটা ধানও পারে না। শুধু এখন ওপর মাঠের পাটকটা আর দুবিঘে ধান সম্বল। এদিকে হালের বলদ মারা গেছে। বলদও কিনতে হবে। না হলে চাষবাস বন্ধ হয়ে যাবে। ইব্রাহিম সব পাটগুলো কেটে ফেলল। বলদ নেই। ছেলেদের সাথে নিয়ে মাথায় করেই বিলে নিয়ে এল। তারপর পাট ধুয়ে ডোমকলে নিয়ে গেল বিক্রি করতে। ডোমকলে বেশ কয়েকটা আড়ত খুলেছে। ইব্রাহিম এ আড়ত ও আড়ত ঘুরে দেখল ঠাকুরের আড়তেই দর সব থেকে বেশি

দিতে চাইছে। তবে টাকা দিন চারেক পরে নিতে হবে। সে ঠাকুরের আড়তেই পাটগুলো দিয়ে দিল। পনের শো টাকার পাট হল। তাহলে এক জোড়া বলদ হয়ে যাবে। ইব্রাহিম ঠিক করল টাকা পেলেই চোখ-মুখ বন্ধ করে বলদ জোড়া কিনে ফেলবে।

কিন্তু চারদিন পরে টাকা নিতে এসে ইব্রাহিম দেখল যে, আড়তদার আড়ত উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। গোরাবাজারে ঠাকুরের বাড়িতে গেল ইব্রাহিম। কিন্তু সে শুধুই আশা দিয়ে ঘোরাল, টাকা দিল না। এমন বছরে পাটের সমস্ত টাকাটা মার যাওয়ায় ইব্রাহিম যেন মূক হয়ে গেল। সে চুপচাপ বসে থাকে। খেতে দিলে দুটো খায়। না দিলে বসেই থাকে। রাতে শুয়ে শুধু বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর নিজের বুদ্ধি আর অদৃষ্টকে দোষ দেয়। সালমাই বাড়ি সামলায়। ঘরে যা আছে তা থেকে হিসেব করে খরচ করে। ছাগল, মুরগিগুলো দেখে। আবার স্বামীকেও সান্ত্বনা দেয়। বলে, 'যা গেল্‌ছে যাক। তুমি ওরকম মুনুস্তাপি হয়ে থাকো না। আবার সব হবে।' কিন্তু ইব্রাহিম বিশ্বাস করতে পারে না। ঘরে ধান নেই, বিলে ধান নেই, হালে বলদ নেই, হাতে টাকা নেই। হবে কি করে! তালতলার জমিটা বন্ধক আছে। তাও বোধহয় ছাড়াতে পারবে না। আর বাকি যেটুকু আছে সেটুকুও থাকবে না। কারণ বলদ তো তাকে কিনতেই হবে। বলদ না কিনলে আবাদ হবে না। আবাদ না হলে নিজেরা তো খেতে পাবেই না, ভাগের জমিগুলোও চলে যাবে। অতএব বলদ তাকে কিনতেই হবে।

এর মধ্যে আয়ানের উচ্চ-মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হল। তার রেজাল্ট খুব ভালো হয়নি। তবে সে প্রথম বিভাগে ভালো নম্বর পেয়ে পাস করেছে। যা নম্বর পেয়েছে তাতে সে ইচ্ছে করলে ডাক্তারিতে ভর্তি হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এও ভর্তি হতে পারে। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে। কিন্তু সে যা নম্বর পেয়েছে তাতে ডাক্তারিতে সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। কিন্তু আয়ান এখন সেসব কিছুই ভাবতে পারছে না। পরিস্থিতি তাকে কিছুতেই ভাবতে দিচ্ছে না। তার ভালো রেজাল্টে তার মাস্টারমশাইরা খুশি হয়েছেন। অমরবাবু খুশি হয়েছেন। তবে তিনি আরেকটু ভালো ফল আশা করেছিলেন। কিন্তু কি পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে তা তিনি জানেন। কাজেই যা হয়েছে তিনি তাতেই খুশি হয়েছেন। কিন্তু তার বাবা ইব্রাহিমের খবর শুনে খুশি-অখুশি কিছুই হয়নি। মা খানিকটা খুশি হয়েছে। সে ছেলেকে ডেকে বলেছে, 'ম্যালা পড়হা হয়্যাছে। এবার একটা চাকরি দ্যাখ। না হোলে তোর ব্যাটা আর একলাই পারছে না।' তার বাবা যে আর পারছে না একথা ঠিক। কিন্তু, তা বলে সে চাকরি করতে রাজি হতে পারছে না। তার খুব ইচ্ছে এখনও পড়ে। সে মাকে সেকথা জানিয়েছিল। কিন্তু মা তা অনুমোদন করেনি। মার মতে আয়ানের আর পড়া সম্ভব নয়। বাড়িতে ওই অবস্থা। টাকা-পয়সার টানাটানি। তাছাড়া অন্যান্য ছেলেমেয়েদের প্রতিও তো তাকে তাকাতে হবে। অন্যান্য ভাইবোনদের কথা ভাবলে আয়ানও আর পড়ার কথা ভাবতে পারে না। আয়ানকে মাঠের কাজে না পেয়ে ইব্রাহিম তার পরের দুই ছেলেকে আর কিছুতেই স্কুলে পাঠায়নি। তার পরেরটা কিছুদিন গিয়েছিল। এবার তার ফোরে পড়ার কথা। কিন্তু তাকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে এক বাড়িতে রাখালের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ঐ ভাইটা পড়াশোনায় ভালো ছিল। কিন্তু পড়াশোনার বদলে সে এখন পরের বাড়ি রাখালি করে পেটের ভাত যোগাড় করছে। আর বাড়িতেও মাসে তিনটাকা করে দিচ্ছে। আয়ানের

ভাবতে খারাপ লাগে যে ঐ তিন টাকা থেকে তার পেছনেও খরচ হচ্ছে। সবই আয়ান বুঝতে পারে, তবুও তার পড়া ছাড়তে ইচ্ছে করে না। পড়া ছেড়ে দিলে সে তো আর বড় হতে পারবে না। অথচ সে যে অনেক বড় হতে চায়। তাই তার পড়তে ইচ্ছে করে। তাই এরকম অবস্থার মধ্যেও সে পড়ার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারে না।

নিজে কিছু ঠিক না করতে পেরে আয়ান অমরবাবুর কাছে গেল। কিন্তু অমরবাবুও কোন পথ দেখাতে পারলেন না। আসলে কেউ যখন নিজে কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন অন্য কেউই তাকে পথ দেখাতে পারে না। অমরবাবু বললেন, যাতায়াত করে কলেজে পড়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আর কিছু টিউশনি যোগাড় করে বহরমপুরে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এমন সময় একদিন মুন্নাভাই ডেকে পাঠালেন। মুন্নাভাই আয়ানদের পাশের গ্রাম জয়রামপুরের লোক। তিনি ভগীরথপুর হাই স্কুলের হেডমাস্টার। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা যে, তিনি একজন কংগ্রেসের নেতা। মুন্নাভাইয়ের একটা বন্দুক আছে। আয়ান যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ত তখন মুন্নাভাই তাদের ছাগলখালির বিলে পাখি মারতে আসতেন। তখন থেকেই আয়ানের মুন্নাভাইয়ের সঙ্গে আলাপ। তারপর আয়ান যখন স্কুলে খুব ভালো রেজাল্ট করছিল তখন আলাপটা ভালভাবে হয়। মুন্নাভাইয়ের ইচ্ছে ছিল আয়ানকে কংগ্রেসের মধ্যে নিয়ে আসেন। তাই আয়ানের রহমান সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। তবুও আয়ান রহমান সাহেবের সঙ্গেই মিশতে লাগল। আয়ান সি. পি. এম.-এর দিকে ঝোঁকায় মুন্নাভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হল। এখন আর তেমন যোগাযোগ নেই। অনেকদিন পরে মুন্নাভাই আবার ডেকে পাঠালেন। আয়ান পরের দিন সকালেই মুন্নাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মুন্নাভাই আয়ানকে বসতে বলে ঘরের দিকে মুখ বাড়াল, 'অনেকদিন পরে আয়ান এসেছে। শুনেছ তো কেমন ভালো রেজাল্ট করেছে। একটু মিষ্টিটিষ্টি খাওয়াও।' মুন্নাভাইয়ের স্ত্রী দুটো প্লেটে করে মিষ্টি দিয়ে গেলেন। বাড়ির কাজের মেয়েটা জল নিয়ে এল। মুন্নাভাই মিষ্টি মুখে দিতে দিতে বললেন, 'এরপর কি পড়বি ঠিক করেছিস।' আয়ান জানাল, 'কিছুই ঠিক করিনি, ভাবছি।' মুন্নাভাই বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই, তুই ডাক্তারিতে ভর্তি হো।' 'কিন্তু আমাদের অবস্থা তো জানেন। কলকাতায় থাকার খরচ কোথায় পাব?' 'সেসব আমার উপর ছেড়ে দে। তুই ভর্তি হয়ে যা। আমাদের অঞ্চলের ছেলেরা ভালো রেজাল্টও করে না। ডাক্তারিতে চান্সও পায় না। তুই যখন পাচ্ছিস তখন নষ্ট করিস না।' সে কি করে ডাক্তারিতে ভর্তি হবে? মুন্নাভাই তো তাদের বাড়ির অবস্থা জানেন। তবুও তিনি কি করে তাকে ডাক্তারিতে ভর্তি হতে বলছেন? সে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কি করে?' মুন্নাভাই বললেন, 'তুই তো জানিস কলকাতায় আমার এক মামাশ্বশুর থাকেন। বিরাট বড়লোক— মোটর পার্টসের ব্যবসা আছে। তার একটা মেয়ে আছে। তোর ভাবীর থেকেও সুন্দর। তুই যদি বলিস তো একদিন এনে দেখিয়ে দেবো।' আয়ান জানতে চাইল, 'কেন?' মুন্নাভাই বললেন, 'ভাই তো বলিসই, ভাইরা হয়ে যা। ওখানেই থেকে ডাক্তারি পড়বি।' আয়ান এবার বুঝতে পারল যে, মুন্নাভাই তার মামাতো শালীকে বিয়ে করে তাদের খরচায় ডাক্তারি পড়ার কথা বলছে। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল প্রস্তাবটা মন্দ

নয়। মুন্নাভাই তো বললেন, মেয়েটি মুন্নাভাইয়ের স্ত্রীর থেকেও সুন্দরী। আয়ান মুখটা কল্পনা করার চেষ্টা করল। সে কলকাতায় থেকে ডাক্তারি পড়ছে। সারাদিন পড়শোনা নিয়ে ব্যস্ত আছে। তারপর সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছে তখন একটি লাজুক মুখে দুটো আগ্রহী চোখ তার পথের দিকে চেয়ে আছে। তারপর কয়েক বছর পরই সে ডাক্তার। তখন সে ইচ্ছেমত গবেষণা করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সন্দেহ জাগল, তারা গবেষণা করতে দেবে তো! তারা যদি বলে চাকরি কর! ওরা যদি বলে পয়সা রোজগার কর! তারা যদি পয়সা নিয়ে পড়ার জন্য তাকে ঘৃণা করে! না, আয়ান তা সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে সে নিজে নিজে যা পারে তাই করবে।'

মুন্নাভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছিস?' আয়ান বলল, 'আমার তো ডাক্তারি পড়তে ভালো লাগে না, তাই ভাবছি কৃষ্ণনাথ কলেজেই ভর্তি হব।' মুন্নাভাই বললেন, 'তুই যদি তাই ভালো বুঝিস হো। তবে আমার কথাটা একটু ভেবে দেখিস।' আয়ান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে এল। সে ভেবে দেখবে। ভেবে দেখে সে ঠিক করল যে, সে কৃষ্ণনাথ কলেজেই ভর্তি হবে।

আয়ান একদিন ভর্তির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণনাথ কলেজে গেল। অনার্স নিয়ে পড়তে হলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে। আয়ান অনার্স নিয়েই পড়বে। কারণ অনার্স না থাকলে এম. এস. সি. পড়তে দেবে না। তাই আয়ান অ্যাডিমিশন টেস্টে বসল। সে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স তিনটি বিষয়েই অনার্স নিয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করল। ঠিক করল যে, কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হবে। কিন্তু ভর্তি হওয়ার জন্য শ দেড়েক টাকার দরকার। আয়ান বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে কথা বলল। বাবা জানতে চাইল, 'মুন্নাসাহেব তোকে কিছু বোল্যাছোলো?' আয়ান বলল, 'হ্যাঁ, উনার এক মামাত শালীকে বিয়ে করলে ডাক্তারি পড়াবে বলেছিল।' ইব্রাহিম বলল, 'ডাক্তোরি পড়হা তো ভালো।' আয়ান বলল, 'আপনি তো বলছি না যে ডাক্তারি পড়া খারাপ।' কিন্তু ওদের খেয়ে-পরে ওদের পয়সায় পড়লে আমি আর এ বাড়ির ছেলে থাকব না, ওদের বাড়ির লোক হয়ে যাব।' ইব্রাহিম আর কিছু বলেনি।

বলেছিল নাদের বক্স মণ্ডল। বলেছিল, 'লোকে আমাদেরকে বোলে চাযা। আমরা চাষা বটেই তো। সেই আমাদের ঘরে যখন মুন্না সাহেবের মতো লোক বিয়ের কথা বলছেন, তখন না করা কি ঠিক হবে?' আয়ান বলল, 'মুন্নাসাহেব আপনাদের ঘরে বিয়ের কথা বলছেন না, আমাকে কিনে নিয়ে ওনাদের মতো করে গড়ে নেওয়ার কথা বলছেন। আমি যদি আপনাদের ঘরের ছেলে থাকি তাহলে উনি কিছুতেই বিয়ের কথা বলবেন না।' নাদের বক্স হয়ত যুক্তিটা বুঝতে পেরেছিল। তাই আর কথা বাড়ায়নি।

এদিকে মাঠে জল শুকিয়ে জমিতে জো হয়ে উঠছিল। কাজেই ইব্রাহিম আর বলদ না কিনে থাকতে পারল না। গড়ানের দশকাঠা জমি তাকে বিক্রি করতে হল। অভাবে পড়ে কিছু বিক্রি করতে গেলে, কখনই ভালো দাম পাওয়া যায় না। ইব্রাহিমও পেল না, যা পেল তাতে দুটো বলদ হয়ে কিছু টাকা থাকল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইব্রাহিম তা থেকে আয়ানকে ভর্তি হওয়ার টাকা দিল। আয়ান গিয়ে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হয়ে এল। কলেজে ততদিনে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আয়ান পরের দিন থেকেই ক্লাসে যেতে লাগল।

কলেজের একটা বইও কেনা হয়নি। হওয়ার সম্ভবনাও নেই। কলেজ যাওয়ার মতো ভালো জামা-কাপড়ও নেই। এমন কি কলেজের ক্লাসে ব্যবহারের জন্য একটা ভালো খাতাও সে কিনতে পারেনি। তবুও সে কলেজে গেল। সাতটার সময় স্নান করে খেয়ে পুরোনো জামা-পাজামাটা পরে খালি পায়ে। সে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। পোনে আটটা নাগাদ বি. ডি. ও. অফিসের মোড়ে এসে পৌঁছল। আটটার সময় যে বাসটা এল তাতে উঠে পড়ল। কিন্তু বসার জায়গা তো দূরের কথা, দাঁড়াবার জায়গা করা মুশকিল হয়ে পড়ল। সে রড ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকল। অপ্রশস্ত রাস্তা। পাশে নয়নাজুলিতে পাট ধুয়ে দুপাশে পাটকাটি পালা দেওয়া। মাঝে মাঝে রাস্তার খানিকটা বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা দখল করে আছে। তারপরেও কোথাও গরুর গাড়ি, কোথাও রিক্সা সামনে পড়ছে। বাস অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলছে। আর যেখানে-সেখানে থেমে পড়ছে। আয়ান দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অবশেষে সাড়ে দশটার সময় বাস এসে স্ট্যাণ্ডে পৌঁছল। আয়ান তাড়াতাড়ি করে ছুটতে লাগল। সমবায়িকার পাশ দিয়ে টেক্সটাইল কলেজ অতিক্রম করে, স্কয়ার ফিল্ডের মাঝ দিয়ে, সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়ে আয়ান যখন কলেজে পৌঁছল তখন এগারটা পাঁচ বেজে গেছে। সাড়ে দশটা থেকে অনার্সের ক্লাস হওয়ার কথা। চৌদ্দ নম্বর ঘরে। আয়ান যেতেই দেখল ক্লাস শেষ করে কল্যানবাবু বেরিয়ে আসছেন। পরের ক্লাস ফিজিক্সের। আয়ান অন্যদের সঙ্গে তখন ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টের দিকে যেতে লাগল।

ফিজিক্স ক্লাসে লাইট পড়ানো হল। আয়ান বেশ বুঝতে পারল, সে স্কুলেই এসব পড়েছে। এখানে একটু বিস্তারিতভাবে পড়ান হল এই যা। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আয়ান আবার এল চৌদ্দ নম্বর ঘরে। এবার আবার অনার্সের নরেনবাবুর ক্লাস। আয়ান গিয়ে সামনের বেঞ্চটায় বসল। আয়ান ইতিমধ্যে তাদের অনার্সের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করার সময় ছেলেরা তার চোখ-মুখের থেকে তার জামা-পাজামার দিকেই বেশি তাকায়। বোধ হয় তার জামা-কাপড় কলেজ ছাত্রের পক্ষে মানানসই নয় বলেই। কেমিস্ট্রি অনার্সে দুটি মেয়েও ভর্তি হয়েছে। আয়ানের এখনও ওদের সঙ্গে আলাপ হয়নি। তবে আয়ান ওদের দেখেছে। ওরা কৌতূহলী হয়ে আয়ানের দিকে চেয়ে দেখছে। ডোমকল স্কুলের নাজিমও কেমিস্ট্রি অর্নাস নিয়ে ভর্তি হয়েছে। সুদীপ ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। সুদীপ মেন হোস্টেলে থাকছে। আর নাজিম থাকছে একটা মেসে। আয়ানের তো অবস্থা খারাপ, তার বাবার টাকা নেই। তাই সে বহরমপুরে থাকতে পারে না। সে সকালে উঠে বাসে করে এসেছে। সেই সাতটার সময় বেরিয়েছে। তাই তার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। এজন্যই ক্লাসে বসে তার ভাল লাগছিল না।

অনার্সের ক্লাসটা শেষ হল। এবার ম্যাথামেটিক্সের ক্লাস হবে তেইশ নম্বর ঘরে। আয়ান গেল। ক্লাসের পর সে চলে আসছিল, একটি মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল, 'তোমার নাম আয়ান না!' আয়ান বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি...'। আয়ান ইতস্তত করছিল। মেয়েটি বলল, 'আপনি নয়, তুমি বল। আমি সুগতা। তুমি হায়ার সেকেন্ডারিতে ম্যাথমেটিক্সে লেটার পেয়েছ না?' আয়ান বলল, 'হ্যাঁ।' সুগতা তাদের অনার্সের মেয়েদের ডাকল, 'এই বাসন্তী, এই রীনা! তোদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?' ওরা এগিয়ে এসে 'না' সংকেতে ঘাড় নাড়ল। সুগতা আয়ানকে

দেখিয়ে বলল, 'আমার মেসোমশায়ের স্কুল থেকে পাশ করেছে, খুব ভাল ছাত্র।' আয়ান, দুহাত তুলে ওদের নমস্কার করতে যাচ্ছিল। সুগতা হেসে উঠল, 'একসঙ্গে পড়ে আর হাত তুলে নমস্কার করছে। আচ্ছা ছেলে বটে!' আয়ান কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ সুগতা চঞ্চল হয়ে উঠল, 'আমার আবার এক্ষুনি মনোজবাবুর ইকনমিক্স ক্লাস আছে।' সে পা চালিয়ে চলে গেল। আয়ানদের এবার অনার্সের প্র্যাকটিক্যাল। সবাই টিফিন বের করে খেতে লাগল। আয়ানের খিদের বোধটা আরও একটু বেড়ে গেল। সে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল। টাই টেস্ট শেখান হচ্ছে। স্কুলে সে কিছু কিছু শিখেছিল। কাজেই খুব অসুবিধা হল না। সাড়ে পাঁচটায় সময় ক্লাস শেষ হল।

আয়ান ক্লাস থেকে বেরিয়েই সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়ে স্কয়ার ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ছুটল। ছটা বেজে গেছে। ছটা কুড়িতে একটা বাস আছে। আয়ান উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে ছটা বেজে গেল। তারপর সেই ঢক ঢক করে চলা। যেখানে-সেখানে থামা। শেষ পর্যন্ত আয়ান যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আর একটানা চার পিরিয়ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করে এসে আবার দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। বাস সেই গরুর গাড়ির মত চলছে, ভেতরে সব লোক না ধরার জন্য ছাদের ওপরেও অনেক লোক উঠেছে। জোরে চালালে তারা চীৎকার করে উঠছে। ভেতরে ঠাসাঠাসির মধ্যে আয়ান রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে বি. ডি. ও. অফিস মোড় এল। আয়ান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে বাস থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগল। সেই সকাল সাতটায় দু'মুঠো আলুসেদ্ধ-ভাত খেয়েছে। আর এখন রাত সাড়ে আটটা। শরীরটা এলিয়ে পড়তে চায়। খিদের বোধটা এখন আর নেই। তবে পেটটা অসম্ভব রকমের ফাঁকা মনে হয়। মাথার মধ্যে টনচন করে। বাড়িতে একমুঠো ভাত জুটবে সেই আশায় আয়ান হাঁটতে থাকে। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দেখে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য তার জন্যে ভাত ঢাকা আছে। হ্যারিকেনটা মিটমিট করে জ্বলছে। আয়ান হ্যারিকেনটার দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে। কিন্তু বিকেলবেলার রান্না ভাত একদম ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। গলা দিয়ে নামতে চায় না। খিদের চোটে তাড়াতাড়িতে খেতে গিয়ে বিষম খায়। আর বার বার জল খেতে হয়। ভাত খেয়ে বৈঠকখানায় এসে দুটো বেঞ্চিকে পাশাপাশি করে শুয়ে পড়ে।

সকালবেলায় উঠেই আবার কলেজ যাওয়ার জন্য স্নান করতে চলে যায়। তারপর সেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে বি. ডি. ও. অফিসের মোড়ে বাস ধরা, দু ঘণ্টা-আড়াইঘণ্টা বাসে দাঁড়িয়ে থাকা। বাস থেকে নেমে দৌড়তে দৌড়তে কলেজ যাওয়া। তারপর ক্লাস। আয়ান ক্লাসে যখন গিয়ে পৌঁছয় তখন তার কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। শুধু পুতুলের মতো ক্লাসে বসে থাকা হয়। কোন পড়া বোঝার ক্ষমতা থাকে না। তারপর ক্লাস শেষ হলে বাড়ির জন্য রওনা দেয়। ছুটতে ছুটতে এসে বাসে ওঠে। দুঘণ্টা বাসে দাঁড়িয়ে থেকে বি. ডি. ও অফিসের মোড়ে নামে। তারপর আবার তিন মাইল হেঁটে বাড়ি যেতে হয়। সে মেসিনের মতো পরিশ্রম করে যায়। কিন্তু যে পরিমাণ উৎসাহ নিয়ে সে এগুলো করে তার তুলনায় কিছুই পড়াশোনা হয়নি। যেটুকু হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। ভর্তি হওয়ার পর যে ক'টা টাকা অবশিষ্ট ছিল তা শেষ হয়ে গেছে।

বাসের ভাড়ার অভাবে আয়ানের কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকদিন তার কলেজ যাওয়া বন্ধ থাকে। ক'দিন সে অন্যের জমিতে মুনিষ খাটতে যায়। তখন পাটকাটা হচ্ছিল। সে দুদিন ঠিকেতে পাট কাটে। তারপর সেই পয়সা নিয়ে আবার দুদিন কলেজে যায়। কলেজে কিন্তু কল্যানবাবু ক্লাসের শেষে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আয়ানের বলতে খুব খারাপ লাগে। তবুও বলতে হয় তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কল্যানবাবু বুঝতে পারেন না, ক্লাসে আসার সঙ্গে অবস্থার কি সম্পর্ক। আয়ান বলে, 'স্যার বাসের ভাড়া দিয়ে আসতে হয় তো। ভাড়া না থাকলে কি করে আসব?' কল্যানবাবু বুঝতে পেরে বিব্রত বোধ করেন। আয়ান ক্লাসে চলে যায়। ক্লাস শেষ করে এভাবেই বাড়ি আসে।

হঠাৎ একদিন মুন্নাভাই তাদের গ্রামের মহিমের হাত দিয়ে একটা পাশ পাঠিয়ে দেয়। তিনমাসের জন্য অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের ফ্রি পাস। তিনমাস আয়ানের নিয়মিত কলেজে যাওয়া হয়। মুন্নাভাই বলেন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলে পাসটা রিনিউ করে দেবে। আয়ান দেখা করে। সেক্রেটারী বলে রিনিউ করার জন্যে কলেজের ছাত্র পরিষদ-এর সেক্রেটারীর সুপারিশ লাগবে। আয়ান বুঝতে পারে মুন্নাভাই পাসের পরিবর্তে তাকে আবার কংগ্রেস করতে বলছে। সে পাশের আশা ছেড়ে দেয়। তার পরিবর্তে ডোমকলে একটা টিউশনি যোগাড় করে নেয়। ক্লাস নাইনের একটি ছেলেকে পনের টাকা মাইনেতে পড়ানোর কথা ঠিক হয়। কলেজ থেকে ফেরার পথে সে পড়িয়ে ফিরবে। শুধু নটার সময় বাড়ি ফেরার জায়গায় রাত এগারটায় বাড়ি ফিরতে হবে। তাতে মাসে তার পনেরদিন কলেজ যাওয়া হয়ে যাবে। মাসে চার-পাঁচটা রবিবার। তারপর আছে আরও নানারকমের ছুটি। মাসে পনের-কুড়ি দিনের বেশি কলেজে ক্লাস হয় না। কাজেই মাসে পনের টাকায় আয়ানের চলে যেতে লাগল।

বাইশ

আয়ান পড়াশোনার জন্য কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু তার কলেজে আসা-যাওয়াটা হল—পড়াশোনা হল না। কারণ খুব সকালে উঠে তাকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়। তারপর তিন-চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে, পঁচিশ মাইল পথ বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বাস থেকে নেমে আবার এক মাইল পথ হেঁটে কলেজে পৌঁছতেই তার সব শক্তি শেষ হয়ে যায়। ততক্ষণে দু-একটা ক্লাসও হয়ে যায়। যে দু-একটা ক্লাস বাকী থাকে আয়ান তাতে কোনরকমে চোখ দুটো অনেক চেষ্টা করে খুলে রাখে। কিন্তু ক্লান্তিতে তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। চোখ দুটো বুজে আসে। সে অতি কষ্টে জেগে থাকে। কিন্তু মাথায় কিছু ঢোকে না। তারপর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। আয়ানের বন্ধুরা টিফিন করে প্র্যাকটিক্যাল করতে ঢোকে। কি করবে তারা জানে। আয়ানও জানে কি করবে, তবে কি করে করতে হবে তা জানে না। ক্লাসে হয়ত কখনও বলা হয়েছে, কিন্তু তার মনে নেই। তার বই নেই যে, দেখে নেবে। তাই সবাই যখন কাজ করে আয়ান কারও কাছ থেকে একটা বই যোগাড় করে দেখতে থাকে! তাকে কি করতে হবে। পাঁচটা বেজে যায়। কাজ ফেলে তখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে ছুটতে হয়। আবার এক মাইল

পথ পেরিয়ে বাসে পঁচিশ মাইল পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে নামতে হয়। শরীরে তখন ইচ্ছা তো দূরের কথা, কোন বস্তু থাকে না। তবুও তাকে পড়াতে বসতে হয়। পড়ানোর পর যখন সে রাস্তায় পা বাড়ায় তখন সে সোজা চলতে চায় না— অলক্ষ্যে জড়িয়ে এদিক-ওদিক চলে যেতে চায়। বাড়িটা অনেক দূর মনে হয়। তিন-চার মাইল পথ তিন-চারশ মাইল বলে বোধ হয়। সেই তিন-চারশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর আর কিছুই ভালো লাগে না। যা থাকে মুখে দিয়ে শরীরটাকে বিছানার ওপর ফেলে দেয়, তাছাড়া আর কিছু করার নেই। সে একটি বইও কিনতে পারেনি। আর রাতও প্রায় বারটা হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে আবার ছুটতে হবে। আয়ানের সেই ছোটাছুটিই সার হচ্ছে — পড়াশোনা হচ্ছে না। বহরমপুরে না থাকতে পারলে তার পড়াশোনা হবে না। আয়ান চেষ্টা করতে লাগল কি করে বহরমপুরে থাকা যায়।

অনেক খোঁজখবর করে দুটো টিউশনি জুটল। একজায়গায় ক্লাস নাইনের দুটো ছেলেকে পড়াতে হবে। মাসে ষাট টাকা করে দেবে, অন্য জায়গায় ক্লাস টেনের একটি মেয়েকে পড়াতে হবে, মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে। দু জায়গাতেই সপ্তাহে ছদিন করে পড়াতে হবে। আয়ানের দরকার আছে। কাজেই সবাই কম পয়সা দিয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়ে নিতে চাইছে। আয়ানের অবস্থা খারাপ। কাজেই আয়ানকে তাতেই রাজি হতে হল। আয়ান বাড়ি থেকে একটি পরিষ্কার মতো কাঁথা আর একটি বালিশ নিয়ে এসে উঠল নাজিমদের মেসে। সে মেসে তাদের সঙ্গে অনার্সে রানীনগরের দিককার হামিদ বলে যে ছেলেটি পড়ে সেও থাকে। আসলে নাজিম আর হামিদ মিলেই আয়ানকে মেসে নিয়ে এল। ঠিক হল আয়ান সকালবেলায় মেয়েটিকে পড়িয়ে এসে স্নান-খাওয়া করে কলেজ যাবে। আর কলেজ থেকে ফিরে রাতের বেলা ছেলেদুটোকে পড়াবে।

সকালবেলায় উঠে আয়ান পড়াতে গেল। মেয়েটির বাবা মাস্টার। তিনি ততক্ষণে পাঁচ-সাতজন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে গেছেন। আয়ান যেতেই, তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে বসিয়ে দিলেন। আয়ানকে বসিয়ে দিয়ে তিনি আবার চলে এলেন। আয়ান টেবিলের পাশে রাখা একটি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে বইখাতা নিয়ে মেয়েটি এল। আয়ানের দিকে চেয়ে মেয়েটি যেন খুশি হল না। আয়ান নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকাল। না, ময়লা নয়, তবে খুবই সাধারণ মানের। আয়ান ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করল, ছাত্রীর নাম ছায়া। কাশীশ্বরী স্কুলে পড়ে। আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তোমাদের স্কুলের মৌমিতাকে চেনো?' ছাত্রী আয়ানের মুখের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, মৌমিতাদি তো গতবার স্কুল থেকে পাস করে গার্লস কলেজে পড়ছে। কিন্তু আপনি চিনলেন কি করে?' আয়ান বলল, 'বি. টি. কলেজে ইন্টার-স্কুল ডিবেটে আলাপ হয়েছিল।' ছাত্রী বলল, 'হ্যাঁ, সেবার তো, মৌমিতাদি প্রাইজ পেয়েছিল। আমি তখন এইটে উঠেছি সবে। আমিও গিয়েছিলাম। গাঁয়ের দিককার একটা ছেলে প্রথম হয়েছিল।' আয়ান বলল, 'দেখা হলে চিনতে পারবে ছেলেটাকে?' ছাত্রী ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, সে ছেলেটা তো সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরেছিল। 'আয়ান ভাবল, সুন্দর শার্ট-প্যান্টের কি জয়জয়কার! আর সেই জন্যই তার ছাত্রী তার মলিন বেশ দেখে অসন্তুষ্ট। সে একবার ভাবল যে সে বলে সেদিনের সেই সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরা ছেলেটা সেই। কিন্তু আবার কি মনে

হতে কিছু বলল না। বলল, ‘বল, কি পড়বে?’ ছাত্রী বলল, ‘লগের কয়েকটা অঙ্ক হচ্ছে না, করে দিন।’ আয়ান অঙ্ক করতে লাগল। অঙ্ক হয়ে গেলে ইংরেজি। জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে একটা এসে লিখতে হবে। আয়ান জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?’ ছাত্রী বলল, ‘ডাক্তার হওয়া।’ আয়ান অনেক ভালো ভালো গালভরা শব্দ দিয়ে একটা এসে লিখে দিল। ততক্ষণে নটা হয়ে গেছে। দশটার মধ্যে কলেজ বেরুতে হবে।

সে মেসে ফিরল। স্নান-খাওয়া করে কলেজ চলে গেল। কলেজ থেকে ফিরে সে ছেলেদুটোকে পড়াতে চলে গেল। দুটো ছেলেই উকিলের। দুজনেই ঈশ্বরচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে পড়ে। আয়ান ওদের সঙ্গে আলাপ করল। একজনের নাম রাজেন, অন্যজনের নাম রামেশীষ। রাজেন বলল, ‘আমাদের সূচীছিদ্র ক্যামেরাটা বুঝিয়ে দিন।’ আয়ান তখনই বুঝল যে, দুটো ছাত্রই মহা ফাঁকিবাজ। তারা কিছুই পড়েনি। তাই কি করিয়ে নিতে হবে তাও জানে না। ক্লাসে হয় তো কোনদিন সূচীছিদ্র ক্যামেরা পড়ান হয়েছে। নামটা মনে ছিল, তাই বলছে, ‘আমাদের সূচীছিদ্র ক্যামেরাটা বুঝিয়ে দিন।’ আয়ান বলল, ‘কোন্ জায়গাটা বুঝতে পারছ না, বল তো।’ তখন রামেশীষ বলল, ‘আপনি একবার বুঝিয়ে দিন, তারপর বলব।’ আয়ান ওদের সূচীছিদ্র ক্যামেরা পড়াতে লাগল। সূচীছিদ্র ক্যামেরা হয়ে গেলে ছাত্ররা যোজ্যতা আর সমীকরণ বুঝতে চাইল। বোঝাতে বোঝাতে ন'টা বেজে গেল। আয়ান আবার মেসে ফিরল। খাওয়া-দাওয়ার পর মেসে নাজিম এবং হামিদের বই থাকলেও আর পড়তে ইচ্ছে করল ন। সে শুয়ে পড়ল। মেসে এসে তার লাভ হল যে, কলেজে ঠিক সময় যেতে পারল আর রবিবার বা অন্য ছুটির দিনগুলোতে একটু বই দেখতে পারল। কিন্তু অন্যান্য দিন তার পড়াশোনার মোটেই সময় হল না।

এই করতে করতে কলেজে তদের বার্ষিক পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় আয়ানের স্থান হল চতুর্থ। অথচ যে সব ছাত্রছাত্রী কৃষ্ণনাথ কলেজে তার সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে হায়ার সেকেন্ডারীতে তার নম্বর ছিল সবচাইতে বেশি। কিন্তু কলেজে সে কিছুই শিখতে পারেনি। কলেজে তার প্রথম বছর এমন অনেক বিষয় পড়ান হয়েছে যা আয়ান স্কুলেই পড়েছিল। সেই পড়ার জোরেই সে চতুর্থ হয়েছে। কিন্তু স্কুলে শেখা বিষয়গুলো বাদ দিলে সে ফেল করবে। আয়ানের প্রচণ্ড মন খারাপ করে। সকালে উঠে যখন নিজের পড়া বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পড়াতে যেতে হয় তখন তার মনের ভেতরটা আনচান করে। কলেজ থেকে ফিরে যখন তার আজ কি কি পড়ান হয়েছে দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে কাল যেগুলো পড়ান হবে সেগুলো দেখতে, তখন তাকে পড়াতে যেতে হয় সেই দুটো ছেলেকে, যারা মোটেই পড়তে চায় না। অথচ তাদের বাবারা টাকা দিয়ে আয়ানের সেই সোনার সময়টা কিনে নিয়েছে। তাই আয়ানকে যেতে হয়। তার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জেনেও যেতে হয়। নিজের পড়া হচ্ছে না জেনেও অন্যদের পড়াতে হয়, পড়াতে হয় কয়েকটা টাকার বিনিময়ে। কারণ এই কটা টাকা না হলে তার মেসে থাকা হয় না। মেসে না থাকা হলে বাড়ি যেতে-আসতে হয়। আর বাড়ি থেকে আসতে হলে পড়ার সময় তো দূরের কথা, ক্লাসেও ঠিকমত আসতে পারে না। তাই আয়ানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়াতে হয়। আয়ান ভাবে, সে লোন স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করেছে, স্কলারশিপটা পেলে পড়ান ছেড়ে দেবে। কিন্তু তার

থেকে যাদের খারাপ নম্বর হয়েছে তাদের স্কলারশিপ এসেছে। কিন্তু তার আসেনি। আয়ান দেখল লিস্টে তার নাম নেই। আয়ান অফিসে জিজ্ঞেস করল, এটা কি রকম করে হল? অফিসে বসেছিলেন দুলালবাবু, তিনি বোটানীর প্রফেসর। কিন্তু আয়ানের সঙ্গে আলাপ আছে। দুলালবাবু বললেন, 'তুমি সাত্তার সাহেবের কাছে যাও। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কলেজ থেকে লেখালেখি করে এর কোন উত্তরই পাওয়া যাবে না। তুমি সাত্তার সাহেবের কাছে যাও।' আয়ান বুঝল দুলালবাবু সাত্তার সাহেবের কথা বলছেন। সাত্তার সাহেব কংগ্রেসের নেতা। এখন মন্ত্রী। আয়ান রোজই মেস থেকে ওঁনার বাড়ির কাছ দিয়ে আসে। তবে উনি খুব কম আসেন। এলেই খুব ভিড় হয়। তখন সামনের শুকরানা হোটেলে বিক্রি বেড়ে যায়। আয়ান কদিন থেকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সেই ভিড়টা দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরছে। আয়ান দেখল, বাড়ির সামনে অনেক ভিড়। আয়ান ঠিক করল কাল সকালেই সে দেখা করবে। আজই আসতে পারত। কিন্তু তাকে এখন পড়াতে যেতে হবে।

সকালবেলায় উঠে আয়ান হাত-মুখ ধুয়ে সাত্তার সাহেবের বারান্দায় এল। কিন্তু তার আগেই অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। একজন লোক তাদের একে একে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। আয়ান তাকে বলায় লোকটি নীরব মুখে বলল, বসতে হবে। আয়ান বসে থাকল। ব্যাগ হাতে করে কয়েকজন লোক এল। তারা কাউকে কিছু না বলে সোজা ঢুকে পড়ল। আয়ান কয়েকবার ঢুকে পড়বে ভাবল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংকোচ হল। উনি যদি অসন্তুষ্ট হন! একটার পর একটা লোক ঢুকছে। কথাবার্তা হচ্ছে, আয়ান শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু নিজে ঢুকতে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। সকাল থেকে আয়ানের কিছু খাওয়া হয়নি। ঐ তো আরেকজন কে ঢুকে গেল। সে একটা কয়লার পারমিটের জন্য দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু এখনও পায়নি। সাত্তার সাহেব বললেন, 'ব্যক্তিগত ব্যাপার তো আমি দেখব না। সামগ্রিক কোন ব্যাপার থাকলে বলুন।' আয়ানের মনে হল তারও তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাহলে তাকেও সাত্তার সাহেব একই কথা বলবেন। অর্থাৎ বসে থেকে লাভ নেই। সে বেরিয়ে মেসে চলে গেল। মেসে গিয়ে দেখল সফিউল এসে বসে আছে। সফিউল হায়ার সেকেন্ডারী পাস করে কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছে। ওদের পয়সা আছে। তবুও ও বহরমপুরে থাকতে পারে না। কারণ তাহলে বাড়িতে ওর মাকে একা থাকতে হয়, সেজন্য সে বাড়ি থেকে যাতায়াত করে। সফিউলের কাছ থেকে আয়ান জানতে পারল যে, তাদের ইন্দিরের ভুঁইয়ের ভাগারু তার বাবার নামে মামলা করেছে। গত কয়েক বছর ধরেই সে জমিটা ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল। কিন্তু তার বাবা ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। তার বাবার নামে বর্গা রেকর্ড আছে তাই জোর করে কেড়ে নিতে পারেনি। শেষে মামলা করেছে। পাঁচ বছরের ফসলের ভাগ দেয়নি বলে মামলা করেছে। ভাগচাষ অফিসারের আদালতে মামলা করেছে। জে.এল.আর.ও-রাই এখন ভাগচাষ অফিসার। ডোমকলের ভাগচাষ অফিস থেকে তার বাবার নামে নোটিশ গেছে। সফিউল বলল, 'চাচা তাকে বাড়ি যেতে বলেছে।'

পরের সপ্তাহে আয়ান বাড়ি গেল। গিয়ে জানল যে, সোমবার মামলার দিন আছে। আয়ান রহমান মাস্টারের কাছে গেল। তিনি বললেন, 'এখন তো কংগ্রেসের রাজত্ব, আমাদের কথা কেউ শুনবেই না।' আয়ান বলল, 'কিন্তু সুধীর উকিল তো সি. পি. এম করে, শুনলাম উনি

নাকি জমির মালিকের উকিল হয়েছেন।' রহমান সাহেব বললেন, 'আমি বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, 'ওকালতি তো আমার ব্যবসা, আর আমি না নিলেও মামলা অন্য লোক করবে।' যুক্তিটা আয়ানের পছন্দ হল না। কিন্তু সে আর কিছু বললও না। সে বাবাকে যা বলার বলে বহরমপুর চলে গেল।

বহরমপুরে ফিরেই আয়ান বিপ্লবের কাছে গেল। বিপ্লব তাদের কলেজেরই অর্থনীতির ভালো ছাত্র ছিল। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাস ছিল। আর ভালো ডিবেট করত। কিন্তু পার্ট টু পরীক্ষা দেয়নি। পড়া ছেড়ে দিয়ে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরবঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তারপর দু বছর হাজতে আটক থেকে কিছুদিন হল ছাড়া পেয়েছে। ঐ সময়ই আটক হয়েছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক শুভঙ্করবাবু। তিনি এখনও জেলেই আছেন। বিপ্লবের সঙ্গে মেলামেশায় ঝুঁকি আছে। তবুও তার সঙ্গে মিশতে আয়ানের খুব ভাল লাগে। তার সঙ্গে মেলামেশার ফলে সে যেন নকশালদেরই সমর্থক হয়ে যাচ্ছে। নকশালদের অনেকগুলো কাজ আয়ানের ভালো লাগে। নকশালরা নিয়ম করে দিয়েছে যে, কোন ডাক্তার রোগী দেখার জন্য পাঁচ টাকার বেশি ফি নিতে পারবে না। ডাক্তারি পড়তে গেলে পয়সা খরচ হয় এবং ডাক্তারদের বেঁচে থাকার জন্যও কিছু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা এত বেশি ফি নেবে যে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আসতেই পারবে না। অথচ ঘটনা তাই। অধিকাংশ ডাক্তারই ডাক্তারি পড়ে এই কারণে যে, তা করে অনেক বেশি পয়সা রোজগার করা যায়। অথচ তারা এই বলে সকলের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে যে, চিকিৎসা মহান পেশা। কিন্তু পেশাকে ভালবেসে বা মানুষের সেবার জন্য ডাক্তার শতকরা কজন আছে? হয়ত একজনও না। তাহলে ডাক্তাররা সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের মতো ঘৃণ্য নয় কেন, যারা খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে মুনাফা করতে চায়? উভয়ের উদ্দেশ্য তো একই— যেন তেন প্রকারেণ বেশি পয়সা রোজগার করা। এই বেশি পয়সা রোজগারের জন্য এক-একজন ডাক্তার পঞ্চাশ-ষাট এমনকি একশো, দেড় শো টাকা করে ফি নেয়। ফলে গরীব মানুষ তাদের ধারে-কাছেও আসতে পারে না, অথচ এক-একজন ডাক্তার তৈরি করতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, যা আসে ঐ সাধারণ মানুষের দেওয়া কর থেকে। সরকারি হাসপাতালগুলি হয়েছে সাধারণ মানুষের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার জন্য। অথচ সেখানে যান, সিট নেই, কিন্তু ডাক্তারবাবুর চেম্বারে টাকা খরচ করে দেখান, একটা চিরকুট লিখে দিলেই সিট খালি আছে। এই কারবার যারা করে তাদের নকশালরা শায়েস্তা করেছে।

আয়ানের মনে পড়ে, তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ে। তাদের গ্রামের পরেশ কঠিন অসুখে পড়ল। ডোমকলে তখন একমাত্র পাশকরা ডাক্তার মেহফুজ। পরেশের বাবা ছুটতে ছুটতে তার কাছে হাজির হল। কিন্তু মেহফুজ অসুখের ব্যাপারে কোনরকম আগ্রহ না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা আছে তো? আমি ভিজিটে গেলে তিরিশ টাকা ফি লাগবে।' পরেশের বাবার কাছে অত টাকা ছিল না। কাজেই ডাক্তার গেল না। পরেশ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। আয়ানের মনে হল এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নকশালরা সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

নকশালরা গ্রামের দিকে ভূমিহীন দিনমজুরদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তারা আমূল ভূমি-সংস্কারের পক্ষপাতী, যারা জমি চাষ করে নকশালরা তাদের জমির মালিকানা দেওয়ার

পক্ষপাতী। গ্রামাঞ্চলে তারা বড় বড় জোতদারদের জমি জোর করে দখল করে, যাদের জমি নেই, তাদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে। আয়ান জানে তাদের গ্রামের অধিকাংশ জমি ডোমকলের ব্যবসায়ী বা ভগীরথপুর বা বাজিতপুরের তথাকথিত বাবুদের। তাদের অন্যান্য কাজ আছে। বহরমপুর, কলকাতায় বাড়ি আছে। অফিস, আদালত, স্কুল বা কোন কোম্পানীতে কাজ করে। নিজেদের জমি মাঠের কোথায় আছে তা তারা জানেও না। কিন্তু জমির কাগজে তাদের নাম আছে। আর সেই কাগজের জোরে জমি তাদের। গ্রামের দরিদ্র মানুষ সারা বছর পরিশ্রম করে ফসল ফলাবে, আর বাবুরা কলকাতায়, বহরমপুরে বসে থেকে সেই ফসল ভোগ করবে। চাকরির বেতনও খাবে, ব্যবসার লাভও খাবে, আবার গরীব মানুষের বহু পরিশ্রমের ফসলও আত্মসাৎ করবে। আয়ানের বাবা ইব্রাহিমও এরকম কয়েক বিঘে জমি ভাগ চাষ করে। জমির মালিকদের একজন কলকাতায় চাকরি করে, একজন বাজিতপুরে স্কুলের মাস্টার, আরেকজন ডোমকলে ব্যবসা করে। তাদের এই জমিগুলি না থাকলেও বেশ চলে। অথচ আয়ানের বাবাকে সারা বছর পরিশ্রম করে অর্ধেক ফসল তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। বাকী যা থাকে তাতে এমনিতেই তার দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। তাতেও তারা খুশি নয়। জমিটা কেড়ে নেওয়ার জন্য সেই ব্যবসায়ী তার বাবার নামে মিথ্যা মামলা করেছে। আয়ানের মনে হয় এ অন্যায়। যাদের রোজগারের অন্য উপায় আছে তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে যাদের কিছু নেই তাদের দেওয়া উচিত। নকশালরা তাই করার চেষ্টা করছে।

দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে। তার মধ্যে কংগ্রেস এবং সি. পি. এম. এ অঞ্চলে এই দুটি দলই প্রধান। কংগ্রেসের কথা আয়ান ভাবতেই পারে না। কারণ কংগ্রেসের জন্মই হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করার জন্য। বড়লোকরাই এ পার্টির হর্তা-কর্তা। কাজেই বড়লোকের স্বার্থই সে পার্টি দেখবে। কংগ্রেসের মধ্যে কিছু ভালো লোক সব সময়ই আছে। কিন্তু তারা কংগ্রেসের স্বভাব পাল্টাতে পারেনি। সি. পি. আই., সি. পি. এম., ভাগ হওয়ার পর সি. পি. এম.-এরই দলভারী। তারাও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু সি. পি. এম.-এর নেতৃত্ব এখন কমল হালদার, খালেক বিশ্বাসের মতো লোকের হাতে। তাই সি. পি. এম.-কে আয়ানের তাদের মতো দরিদ্র মানুষের পার্টি বলে মনে হয় না। আয়ানের মনে হয় সি. পি. এম. মধ্যবিত্ত মানুষের পার্টি হতে পারে, কিন্তু একেবারে দরিদ্র মানুষের পার্টি হতে পারেনি। তারা সর্বহারা মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেয়, কিন্তু স্বার্থরক্ষা কিছুটা করলে করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, সর্বহারা শ্রেণীর নয়। সি. পি. এম. নেতারা সাম্যের দাবীতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে গেলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা প্রকট হয়ে পড়ে। সেই তুলনায় নকশালরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেক একাত্ম হয়ে মিশে যায়। তারা পার্টির কাজে গ্রামে গেলে গরীব মানুষের বাড়িতেই ওঠে, তারা যা খায় তাই খায়। তাদের বোঝার মতো করে কথা বলে। সেজন্য গরীবের ছেলে আয়ান তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে।

কিন্তু নকশালদের গলাকাটার নীতি আয়ান একদম মেনে নিতে পারে না। গ্রামের দিকে এই ব্যাপারটা দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রথমদিকে যেসব জঘন্য চরিত্রের জোতদাররা সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত এবং মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করত, তাদের খুন করা হয়েছিল। তাতে সাধারণ মানুষ খুশিই হয়েছিল। নকশালদের তারা আপন

ভেবেছিল। কিন্তু সম্প্রতি গলাকাটার যেন কোন বাছ-বিচার নেই। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষী, রাজনৈতিক কর্মী, এমনকি সৎ সরকারী কর্মচারীকেও হত্যা করা হচ্ছে। এতে নকশালরা সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকার প্রতীক হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের এখন যত না ভালবাসছে, তার থেকে বেশি ভয় করছে। সতীনাথবাবুর সঙ্গে আয়ান কথা বলেছিল। তিনি যা বললেন সেটা আরও ভয়ঙ্কর। তিনি বললেন, যে যে রাজনৈতিক দলগুলি নকশালদের জনপ্রিয়তায় ভীত তারা ভাড়াকরা গুণ্ডা নিয়ে খুন করে নকশালদের নামে চালাচ্ছে। যাতে জনসাধারণ নকশালদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা ব্যাপার আয়ানের ভালো লাগে না। নকশালরা বলে যে, এ বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ তৈরি হয় না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অনুগত কতগুলি দাস তৈরি হয়। কথাটা হয়ত কিছুটা পরিমাণে সত্য। দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় এ শিক্ষাব্যবস্থায় এমনভাবে পড়ান হয় তাতে সত্যকার জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো তো যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় একই রকম হবে। সতীনাথবাবু বলেছিলেন, 'কথাটি কিছু পরিমাণে ঠিক। কিন্তু তুমি তো রসায়ন পড়। রেয়ন উৎপাদন শিখেছ। কিন্তু রেয়নের কারখানায় একজন তথাকথিত অশিক্ষিত লোক যতটুকু কাজ করতে পারবে, তুমি তাও করতে পারবে না। প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় রেয়ন উৎপাদন শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, ক্লাসরুমে নয়, রেয়নের কারখানায়।'

আয়ানের কথাটা ভালো লেগেছিল। তবুও নকশালদের স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া, জোর করে তা বন্ধ করে দেওয়া আয়ানের ভালো লাগে না। কারণ দেশের স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে বড়লোকের ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে দু-একটা ছেলেমেয়ে গ্রামের স্কুলে পড়ে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। বিপ্লব বলল যে, বর্তমান স্কুলগুলিতে গরীব মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে না। বরং এতে গরীব মানুষদের তুলনায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। সরকার মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করেছে। কিন্তু তাতেও কি গরীব মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারছে? পারছে না। যার বাড়িতে একমুঠো ভাত জোটে না সে স্কুলে পড়তে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যের বাড়িতে গরু চরাতে বা থালা-বাসন মাজতে যায়। ভালো ছাত্রছাত্রীদের সরকার থেকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তা পাচ্ছে কারা? যারা খেতেই পায় না তারা কি করে ভাল রেজাল্ট করবে? পারে না। ফলে বৃত্তি পায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা। কাজেই যেখানে আমিই পড়তে পারব না, সেখানে স্কুল থাক আর নাই থাক, দুই আমার কাছে সমান।

তবুও স্কুল-কলেজ পোড়ানোর ব্যাপারটা আয়ান মেনে নিতে পারল না। বিপ্লব বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে, আয়ান তার কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। তাই বলল, 'তুমি আরেক-জনের সঙ্গে কথা বল। কিভাবে দেখা হবে আমি পরে বলে দেব।' আয়ান রাজি হয়েছিল। আয়ানের ইচ্ছে ছিল তার বাবার ওপরে ভাগারুর মামলা করার কথাটা বিপ্লবের সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু কথাটা আয়ান কিছুতেই তুলতে পারল না। তার মনে হল ব্যাপারটা একেবারেই ব্যক্তিগত। তাই শেষ পর্যন্ত সে কথাটা আলোচনা না করেই ফিরে এল।

ফিরে এল, কিন্তু আরেকজন লোকের সঙ্গে আলোচনার কথাটা ভুলল না। বিপ্লব বলল,

'রোববার সকাল দশটার সময় জজকোর্টের মাঠে দেখা হবে।' আয়ান 'নীলকণ্ঠ' বলে তার পরিচয় দেবে। আর যার সঙ্গে আলোচনা হবে তার নাম অনির্বাণ। আয়ান জানে সরকার নকশালদের কাজকর্ম ভালো চোখে দেখছে না। তাই যারা নকশালপন্থী তাদের ওপর পুলিশ নজর রাখছে। আর কিছু প্রমাণ পেলেই গ্রেপ্তার করছে। গ্রেপ্তারের পর চলছে অকথ্য অত্যাচার। অনেকেই এই অত্যাচারের মুখে ভেঙে পড়ে সঙ্গী-সাথীদের নাম বলে দিচ্ছে। তখন পুলিশ তাদের পেছনেও লাগছে। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নকশালপন্থীরা একে অপরকে ছদ্মনামে ডাকছে। সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

রবিবার সাড়ে ন'টার মধ্যে আয়ান গিয়ে জজকোর্টের মাঠে হাজির হল। বসে থেকে থেকে দশটা বেজে গেল। কিন্তু বিপ্লবের দেওয়া বর্ণনার কোন লোক এল না। আয়ান বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু না, কেউ এল না। অনেকক্ষণ পর আয়ান উকিলপাড়ার দিকে অনুরূপ বর্ণনার একটি লোককে আসতে দেখল। বিপ্লব বলেছে যে, লোকটিকে দেখলে আয়ান ডানহাত দিয়ে মাথা চুলকাবে। এই সংকেত পাওয়ার পর যদি লোকটি বাম হাত দিয়ে তার ডান কানে হাত দেয় তবে তার কাছে গিয়ে জানাতে হবে যে সে নীলকণ্ঠ। লোকটিকে দেখা মাত্র আয়ান তার ডান হাত মাথার ওপর তুলে দিল। লোকটি তার দিকে তাকাল, কিন্তু পূর্ব বর্ণনা মতো তার বাঁ হাত ডান কানে দিল না। কাজেই আয়ানও কাছে যেতে পারল না। লোকটি খানিকক্ষণ পায়চারি করল, তারপর আবার যে পথে এসেছিল সেইপথে চলে গেল। আয়ান হতাশভাবে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে মেসে ফিরে এল। বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না। পরের দিন খবরের কাগজে দেখল যে, বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনের কামরা থেকে এক কট্টর নকশালপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে বহরমপুরের একটি কলেজের অধ্যাপক ছিল এবং পুলিশ তার ওপর নজর রাখছে বুঝতে পেরে পালাচ্ছিল। আয়ানের সন্দেহ হল, তাহলে এই লোকটির সঙ্গেই কি কাল তার দেখা হওয়ার কথা ছিল? দুদিন পরে বিপ্লবের সঙ্গে দেখা হলে সে বুঝতে পারল যে, তার ধারণাই ঠিক। সে মেসে ফিরে আবার পড়াশোনা করতে লাগল। কিন্তু জজকোর্টের মাঠে লোকটির পায়চারি করার দৃশ্য চোখে ভেসে উঠতে লাগল। এমনও হতে পারত যে, লোকটি যখন তার সঙ্গে কথা বলছে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হল। তাহলে তো তাকেও গ্রেপ্তার হতে হত। আয়ানের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল। আসলে সে বুঝতে পেরেছিল যে, পুলিশ তাকে ফলো করছে। তাই সে আয়ানের সঙ্গে কথা বলেনি। তাই সে বহরমপুর ছেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাও ধরা পড়ে গেল। তার সঙ্গে আলোচনা আপাতত আর হল না। আয়ান জানে না, আর কোনদিন সে সুযোগ তার হবে কি না।

তেইশ

কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষায় আয়ান ভালো ফল করতে পারেনি। তবে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিতর্কে প্রথম হয়েছিল। মরুভূমির বুকে মরূদ্যানের মতো তাই একটুখানি সুখ তার বুকে এখনও জেগে আছে। জেলা আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সে কলেজের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দলে নির্বাচিত হয়েছে। বিতর্কের আয়োজন করেছে জেলা স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা। জেলাশাসক নিজে সভাপতিত্ব করবেন। নির্দিষ্ট দিনে তাদের কলেজের সাংস্কৃতিক

সম্পাদক রনদা আয়ানদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কমার্স কলেজ, টেক্সটাইল কলেজ, জিয়াগঞ্জ কলেজ, কান্দী কলেজ এবং বেলডাঙ্গা কলেজ থেকেও প্রতিযোগীরা এসে পৌছল। তবে জাঁক-জমকের সঙ্গে এল গার্লস কলেজ। প্রিন্সিপাল নিজে এলেন প্রতিযোগীদের নিয়ে। সঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটজন ছাত্রীর একট দল। বিমল সিংহ হলের অর্ধেকটা তারাই দখল করে নিল। সভাপতি এলে লটারী করে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। সভার মতে স্বল্প সঞ্চয় খাতে অধিকতর বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। ছ'টা কলেজের মাত্র বারজন প্রতিযোগী। প্রত্যেককে সাত মিনিট করে বলতে সময় দেওয়া হচ্ছে। আয়ানের পয়েন্টগুলো ঠিক করাই ছিল। তার পালা আসতেই আয়ান সভাপতিকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল। 'সরকারী পক্ষের বক্তারা যখন বলছেন যে, স্বল্প সঞ্চয় খাতে অধিকতর বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব তখন তারা এই মৌলিক সূত্রটার ওপর নির্ভর করছেন যে, যোগান অপরিবর্তিত থাকলে চাহিদা কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য হ্রাস পায়। এ সূত্রটার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা যদি প্রয়োজনভিত্তিক হত তাহলে হয়ত যোগান অপরিবর্তিত থাকত। কিন্তু আজ এখানে দাঁড়িয়ে সরকারী পক্ষের বক্তাদের একটি প্রশ্ন করতে চাই— আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা কি প্রয়োজনভিত্তিক? যদি সরকারী পক্ষের বক্তারা বলেন যে, আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রয়োজনভিত্তিক, তাহলে আমি তাদের কথা মেনে নেব। মেনে নেব স্বল্প সঞ্চয় খাতে অধিকতর বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু সে কথা সরকারী পক্ষের কোন বক্তাই বলতে পারবেন না। কারণ আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা মুনাফাভিত্তিক। আমাদের দেশের উৎপাদকরা আপনার-আমার কি প্রয়োজন তার দিকে চেয়ে উৎপন্ন করে না, উৎপন্ন করে তার লাভের দিকে চেয়ে। যা উৎপন্ন করলে, যতটা উৎপন্ন করলে অধিক লাভ হবে সে তা ততটাই উৎপন্ন করবে। স্বল্প সঞ্চয় খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আজ যেখানে দশটা মোটরগাড়ির চাহিদা আছে কাল যদি সেখানে আটটা মোটরগাড়ির চাহিদা হয়, মোটরগাড়ির উৎপাদকরা কাল দশটা নয়, আটটা গাড়িই উৎপাদন করবে। কাজেই দ্রব্যমূল্য রোধ করা সম্ভব হবে না।

আমার সরকারী পক্ষের বক্তারা যখন বলছেন যে, স্বল্প সঞ্চয়খাতে অধিকতর বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব, তখন তারা আরও একটি শর্ত সত্য বলে ধরে নিচ্ছেন যে, বাজারে অর্থের যোগানের ওপর সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনি তো জানেন বাজারে টাকার ওপর সরকারের কতটুকু নিয়ন্ত্রণ আছে? অসাধু ব্যবসায়ীরা যে কোটি কোটি কালো টাকার কারবার করে, চোরাকারবারী আর চোরা-চালানকারীরা যে কোটি কোটি কালো টাকার কারবার করে, বড় বড় ডাক্তাররা যে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে, বড় বড় উকিলরা লাখ লাখ টাকা উপায় করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে লাখ লাখ টাকার পারিশ্রমিক নেয় তার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে? আমি একটা খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। ভোটের সময় রাজনৈতিক পার্টিগুলি যে বিশাল পরিমাণ টাকা খরচ করে তার কোন হিসাব আছে? টাকাগুলো কোথা থেকে আসে? তার ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ আছে? উত্তর একটি— নেই। সরকারী পক্ষের বক্তারা মনে করতে পারেন যে, স্বল্প সঞ্চয় বাজারের একশ টাকার মধ্যে দু টাকা জমা করলেই দ্রব্যমূল্য দু টাকা কমে যাবে। কিন্তু হিসেবটা অত সহজ নয়। কারণ বাজারে কোটি কোটি কালো টাকা আছে। আর বাজারে কালো

আর সাদা টাকার দাম একই। তাই সামান্য কয়েক কোটি টাকা স্বল্প সঞ্চয় খাতে জমা করলেই বাজারে টাকার যোগান কমে যাবে না। বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কম হবে না। কাজেই স্বল্প সঞ্চয় খাতে অধিকতর কেন, অধিকতম বিনিয়োগের মাধ্যমেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না।' যেন এটা একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা নয়। যেন তার নিজের মতটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আয়ান চেষ্টা করছে। তাই আয়ানের বলার ভঙ্গী আজ খুবই সহজ, খুবই সাবলীল।

বলা শেষ হলে সে এসে বসল। বিতর্ক চলতে লাগল। এবারে বলতে উঠল গার্লস কলেজের ললিতা চৌধুরী। মেয়েটিকে আয়ানের খুব ভালো লাগে। সপ্রতিভ। আর মুখখানা যেন স্বচ্ছ। খুব পরিষ্কারভাবে কথাবার্তা বলে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। তাদের কলেজের সুরেনদের দুই বন্ধুকে কি জব্দটাই না করেছিল! ললিতা কোন কাজে আয়ানদের কলেজে গিয়ে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে কাউকে খুঁজছিল। হঠাৎ তাদের ডিপার্টমেন্টে বাইরের মেয়ে দেখে ফচকে সুরেনের একটু টিটকিরি মারার ইচ্ছে জেগেছিল। সে বলল, 'কাকে খোঁজ করছেন, ও দিদি?' ললিতা কোন উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ফচকে সুরেন তাতে আরও যেন মজা পেল। বলল, 'ও দিদি, চলে যাচ্ছেন কেন? আমাদের কি পছন্দ হচ্ছে না?' ললিতা এবার ঘুরে দাঁড়াল, 'আমি কে. এন. কলেজে ছেলে পছন্দ করতে আসিনি। আর যদি আসিই তবে একটা সেরা ছেলেই পছন্দ করব। কোন রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে নয়।' বলেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সুরেনের হতভম্বের ভাবটা কাটলে ওর বন্ধু বলল, 'হল তো, এবার পিছনে লাগার শিক্ষা হয়েছে?' সুরেন দেখল মেয়েটা চলে গেছে। তাকে যা-তা বলেও গেছে। বন্ধুর সামনে প্রেস্টিজ পাঞ্চার হয়ে যায়। সে এমন একটা ভাব করল যে, ইচ্ছে করলেই মেয়েটাকে উচিত জবাব দিতে পারে। কিন্তু ওসব কথার জবাব দেওয়া সে প্রয়োজনই মনে করে না। সব কথার উত্তর দিতে হবে এমন কি কথা আছে?

ললিতা বলেছিল একটি সেরা ছেলেই পছন্দ করবে। তাহলে সে কি সেই সেরা ছেলে? আয়ানের মনে হয় ললিতা তাকে পছন্দ করে। কলেজে এসে গ্র্যান্ট হলের প্রথম ডিবেটটাতেই ললিতার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তারপর আরও অনেকবার কথা হয়েছে। দেখা হলেই কথা হয়। কারণ কথা না বলে ললিতা কিছুতেই ছাড়ে না। মোহন সিনেমার মোড়ে সেদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল। ললিতার চুলের খোঁপায় বেলি ফুল গোঁজা ছিল। আয়ানের খুব লোভ হয়েছিল। আর তাই কথা বলতে বলতেই রাস্তার মাঝেই খোপা থেকে একটি ফুল সরিয়ে নিয়েছিল। ললিতা রাগ করে বলেছিল— বাঁদর। কিন্তু আয়ানের মনে হয়েছিল রাগটা ললিতার অভিনয়। আসলে কিছু বলতে হয়, তাই বলেছিল। না বললে প্রশ্রয় আছে সেটা প্রকাশ হয়ে যায়। তাই বলেছিল। আয়ান শুধু একটু হেসেছিল। আর সে হাসি দেখে ললিতা রাগ করে তার খোঁপা থেকে সবক'টা ফুল খসিয়ে বলেছিল, 'ধর।' আয়ান ললিতার খোঁপার সবক'টা ফুল হাতে নিয়ে কলেজের দিকে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু গেটের কাছে আসতেই ইন্দ্র আফসোসের বাহানা করে বলেছিল, 'ফুল নিয়ে এসেছিস। কিন্তু কলেজ আজ নিরামিষ।' কোন কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই যাদের জন্য ফুল আনা তারা কেউ নেই ইন্দ্র সেটাই বোঝাতে চেয়েছিল। আয়ানের ইন্দ্রের ওপর মায়া হচ্ছিল। কারণ তার হতভাগা বন্ধুটি জানে না যে, ফুলগুলি আর কারও জন্য নয়। ফুলগুলি যার জন্যে আনা হয়েছিল, ওগুলি এখন তার কাছেই আছে।

আরও একদিন কলেজ যাবার পথে ললিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ঐ লালদীঘির পাশে অসমাপ্ত রবীন্দ্র ভবনের কাছে। ললিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয়ানের সঙ্গে কথা বলছিল। রাস্তায় রোদ ছিল বলে ওরা অসমাপ্ত দেওয়ালটার ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। তা দেখে সাইকেল আরোহীরা কিছু টুকরো মন্তব্য করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে মন্তব্য শুনে ললিতার সহপাঠিনী যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তারা বলল, 'কি রে, তোদের ব্যাপার দেখে যে রাজ্যের লোকের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।' শুনে ললিতা কিন্তু একটুও অপ্রতিভ হয়নি। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তা যাদের লজ্জা অনেক বেশি তাদের একটু একটু লজ্জা করা ভাল। তোদের করছে না তো?' তারপর আয়ানের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোরও লজ্জা করছে নাকি, লজ্জা করে তো চলে যা।' আয়ানের সত্যি লজ্জা করছিল।' বিশেষ করে ওর বান্ধবীদের গায়ে পড়া ভাবটা ওর একদম ভালো লাগছিল না। ওরা ললিতার কথার উত্তরে বলেছিল, 'না ভাই, লজ্জা করছে না, তবে ওরকমভাবে গল্প করতে ইচ্ছে করছে।' তবুও আয়ান চলে আসতে পারেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিল। তাতে এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথম ক্লাসটা পুরো কামাই হয়ে গেল। কিন্তু সতীনাথবাবু হয়ত তাদের গল্প করতে দেখে থাকবেন। তিনি আয়ানকে ডেকে বললেন, 'ঐ ললিতা মেয়েটার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কোরো না। আমাদের কাছে খবর, মেয়েটা সি. আই. এ.-র চর।' আয়ান ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস হতে চায়নি যে, ললিতা চর। এত সুন্দর একটা মেয়ে। সে কি চর হতে পারে? আয়ান ডায়াসের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঐ তো মেয়েটি সুন্দর করে গুছিয়ে বক্তব্য রাখছে। ঐ মেয়েটা চর হতে পারে? আয়ান বিশ্বাস করতে পারেনি। আবার একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারেনি। তাই ললিতার সাথে মেলামেশা ছেড়েও দিতে পারেনি। আবার সবকিছু সমর্পণ করে দিতেও পারেনি। ললিতা তার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়ল। বিতর্ক চলতে লাগল। আরও দুজন প্রতিযোগি বক্তব্য রাখল। বিতর্ক শেষ হয়ে গেল।

বিচারকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে পুরস্কার-প্রাপকদের নাম ঘোষণা করলেন। আয়ান প্রথম হয়েছে, দ্বিতীয় ললিতা, তৃতীয় হয়েছে গার্লস কলেজেরই একটি মেয়ে— স্বপ্না ঘোষ। রনদা আয়ানকে জড়িয়ে ধরল। এই সামান্য একটু সময়ই এখনও আয়ানের জীবনে বেঁচে আছে। রনদা ছেড়ে দিতেই ললিতা তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশন।' আয়ানও হাত বাড়িয়ে দিল। এক হল লোকের সামনে তারা হ্যাণ্ডশেক করল, তারপর পাশাপাশি গিয়ে বসল। জেলা স্বল্প সঞ্চয় আধিকারিক বক্তব্য রাখলেন। তারপর সভাপতির ভাষণও হয়ে গেল। এবারে পুরস্কার বিতরণী। আয়ান একটি কাচের কেসের মধ্যে সুন্দর সোলার কাজকরা বজরা পেল। আয়ান সেটা রনদার হাতে দিল। সভা শেষ হয়ে গেল।

ললিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আয়ানরা বেরিয়ে এল। রনদা বলল, 'এবার তোকে কলকাতায় পাঠাব।' আয়ান খুশি হল। কিন্তু তার আগেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা এসে গেল। আয়ানও অন্যান্যদের সঙ্গে পরীক্ষা দিল। ফল বের হলে দেখা গেল সে কোনরকমে অনার্সটা টিকিয়ে রেখেছে। ফল খুবই খারাপ। আয়ানের মন খারাপ হয়ে গেল। ওদিকে বাড়ি থেকে খবর এল ইন্দিরের ভুঁইয়ের মামলায় তার বাবা হেরে গেছে। ভাগের ফসলের রসিদ দেখাতে পারেনি। তাই ভাগচাষ অফিসার জমি ছেড়ে দেওয়ার রায় দিয়ে দিয়েছেন। রসিদ তার বাবা কি করে দেখাবে? সে অঞ্চলে আজ পর্যন্ত কোন বর্গাদারকে ফসলের ভাগের জন্য কেউ রসিদ

দেয় না। পুরুষানুক্রমে তারা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে আসছে। ফসল উঠলে জমির মালিককে অর্ধেক দিয়ে আসতে হয়। ব্যস্। ভাগ দিয়ে যে রসিদ নিতে হয় এরকম ধারণাই তাদের নেই। তার বাবা ভাগচাষ অফিসারকে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হননি। কবে কোন্ বিচারক গরীব মানুষের কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন? হননি। কারণ তারা টাকা দিয়ে ভালো উকিল দিতে পারে না। আবার নিজের কথা নিজেও গুছিয়ে বলতে পারে না। ফলে বিচারক তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বিচারের রায় তার বিপক্ষে যায়। সে দোষী হোক আর নির্দোষ হোক, দণ্ড পায়। আয়ানের বাবাও পেল।

বিপ্লবের যুক্তিগুলো আয়ানের হঠাৎ খুব ঠিক মনে হল। আয়ানের মনে হল, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ তৈরি হয় না। আয়ানের মনে হল এদেশে সে যখন পড়তে পারছে না, তখন বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য স্কুল-কলেজ খুলে রাখার কোন মানেই হয় না। সব পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। বন্ধ করে দেওয়া দরকার। আয়ানের মনে হল, যারা তার বাবার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মিথ্যা মামলা করে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, যারা তার অসহায় ভাইবোনদের মুখের গ্রাসটুকু কেড়ে নিচ্ছে তাদের গলাকাটাই দরকার। আয়ান এতদিন ধরে নকশালদের অনেক নীতি সমর্থন করে এসেছে। কিন্তু স্কুল-কলেজ পোড়ান এবং গলাকাটার নীতি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি। সে অনেক কষ্ট করে স্কুলে পড়াশোনা করেছে। ভাল ফল করেছে। স্কুলে একটা সুবিধা ছিল সে স্কুল বাড়ির কাছে ছিল। ফলে বাড়ির কিছু কাজ-কর্ম করেও পড়ার সময় পাওয়া যেত। তার ফল ভালো হত। সে মনে করেছিল, চেষ্টা করলে সব সম্ভব। অসম্ভব বলে কিছু নেই। কিন্তু কলেজে এসে সে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছে না। বাড়ি থেকে কলেজে এসে তারপর বাড়ি ফিরে আর পড়া হচ্ছে না। আবার, সে যদি বা মেসে এল সেখানেও দুবেলা প্রাইভেট টিউশ্যানীতে সময় চলে যাচ্ছে, পড়া হচ্ছে না। সে কিছুতেই পড়তে পারল না। পরীক্ষায় ফল খারাপ হয়ে গেল। আয়ানের মনে হচ্ছে, এভাবে ভালো ফল করা অসম্ভব। এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তার ভাল ফল করা সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবের যুক্তিগুলো আয়ানের খুব ঠিক মনে হল। সে বলল, 'বিপ্লবদা, আমি কিছু কাজ করতে চাই!' আয়ানের বাবার জন্য খুব মায়া হয়। লোকটা সারাদিন মাঠে কাজ করে। তারপরও দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না। সারা বছর ফসল ফলায়। অথচ অর্ধেক ফসল জমির মালিকদের দিয়ে দিতে হয়। তারপরও জমির মালিকেরা মিথ্যা মামলা করে তাকে চাষের জমি থেকে তাড়িয়ে দেয়। জোতদাররা ওরকমই করে। আয়ান ওসব বন্ধ করবে। তাই সে বিপ্লবকে বলল, 'বিপ্লবদা, আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করেতে চাই।' বিপ্লব খুশি হল। আয়ানকে তাদের অ্যাকশন স্কোয়াডে নিয়ে নিল। তার সেই আগের নামটা বহাল হল, আয়ান এখন নীলকণ্ঠ।

চব্বিশ

গ্রামটির নাম পলাশপুর। গ্রাম বলতে এখানে কয়েকখানা কুঁড়ে ঘর আছে। সাঁওতালদের কুঁড়ে। এরাই এখানকার আদি বাসিন্দা। এখানকার বন এদেরই ছিল। তারা বনের ফলমূল সংগ্রহ করত। বনে পশু শিকার করত। বন থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করত। এদের কোন অভাব ছিল না। শাল-পিয়াল আর অশোক-পলাশের মতো এই সাঁওতালরাও ছিল বনের একটা অংশ।

বন তাদের, না তারা বনের এ নিয়ে তারা কখনও মাথা ঘামায়নি। সারা দিনমানে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করেছে। আর রাতে শাল বনের মাথার ওপরে চাঁদ উঠলে তারা মহুয়ার মদ খেয়ে মাদলে তাল দিয়েছে। আকাশের তলে সেই মাদলের তালে মেয়েরা এসে গলা মিলিয়েছে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তারা মাদলের তালে তালে ঝুমুঝুমু করে ঝুমুর নেচেছে। উদাসী চাঁদের আলোর সাথে গলার সুর কখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মেয়েরা কোমরে হাত দিয়ে গেয়ে উঠেছে– সারা রাত সারা দিন বাজাসইল রে কালা/এখন বলে যাবো যাবো....।

এখনও বাড়িতে বাড়িতে পলাশ গাছ আছে। পিয়ালের সেই বন আছে। কিন্তু সেই সুখ তাদের আর নেই। হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক কন্ট্রাক্টর। গভর্ণমেন্ট সব জমি নাকি তাকে লিখে দিয়েছে। সে কাগজের পর কাগজ বের করে তাদের দেখিয়েছে। বুধু মাঝি হাঁ করে খানিক তাকিয়ে থেকেছে। তারপর সনাতন মাঝির কাছে গেছে। সনাতন তাদের মোড়ল। এবার সনাতনের একটা কিছু করা দরকার। চিরকাল ধরে এইটেই হয়ে আসছে। কিছু হলেই মোড়ল ঠিক করে কি করতে হবে। কিন্তু সনাতন এবার কিছু করতে পারেনি। লোকটির বন্দুক আছে। তাদের তীর-ধনুকের থেকে অনেক বেশি দূর থেকে তাতে জন্তু-জানোয়ার মারা যায়। লোকটা এক গুলিতে একটা হরিয়াল মেরে তাদের দেখিয়েছিল। আর বলেছিল, কেউ গণ্ডগোল করলে তারও ঐ দশা হবে। থানার দারোগাবাবুও এসেও তাই বলেছিল। বলেছিল 'বন এখন বাবুর, তোরা নষ্ট করলে থানায় ধরে নিয়ে যাবো।' তাই সাঁওতালরা এখন বনে থেকেও বনের কেউ নয়। তারা বনের গাছপালা কাটতে পারে না। বিনা অনুমতিতে শিকারও করতে পারে না। আর ওদিকে কনন্ট্রাক্টরবাবু একটা কাঠ চেরাইয়ের মেশিন বসিয়েছে। এতবড় বন থেকে গাছ কেটে সে প্রথমে চেরাই করে। তারপর লরীতে করে কলকাতা বোম্বাই দিল্লী বিভিন্ন জায়গায় চালান দেয়। বুধু-কান্ত-সনাতনরা এখন তার মুনিষ খাটে। গাছ কাটে, মেশিনে কাঠ চেরাই করে অথবা লরীতে কাঠ বোঝাই করে দেয়। যা খরচ পায় তা দিয়ে সালতোড়ার বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে নিয়ে আনে। মেয়েরা কাঠ-খড়-পাতা কুড়িয়ে উনুন জ্বালে। দুমুঠো ভাত খায়। মহুয়ার মদ একটু খায়। কিন্তু মাদলের তাল যেন ঠিকমত পড়ে না। সমস্ত গ্রামটা যেন কেমন বেতাল হয়ে গেছে। সনাতন মোড়লের মনে সুখ নেই। সে মোড়ল আছে বটে, কিন্তু মোড়লী তার নেই। কন্ট্রাক্টরবাবুর কাছ থেকে সে ক'টা টাকা ধার নিয়েছিল। তার সুদের দায়ে তার বাড়ির ভিটেটাও বিক্রি হয়ে গেছে। ও গ্রামের সকলের অবস্থাই প্রায় ওরকম। তবে বুধু মাঝির অবস্থা আরও খারাপ। তার মাঝ্যানটাকেও ঐ কন্ট্রাক্টরটা এঁঠো করে দিয়েছে। তাই গ্রামের সবাই ঐ কন্ট্রাক্টরটার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। কিন্তু পেরে উঠছে না। আয়ানের ওপর ভার পড়েছে তাদের সংগঠিত করার। আয়ান এসে আজ এক সপ্তাহ এদের সঙ্গে আছে। সনাতন মাঝি মোড়ল বলে, বাইরের লোক তার বাড়িতেই ওঠে। তাই আয়ান আছে কান্ত মাঝির বাড়ি। আয়ান কয়েকবারই ওদের নিয়ে মিটিঙ করছে। ঠিক করেছে এই দানব কন্ট্রাক্টরটাকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কি করে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি।

আয়ান সমস্ত এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে। দেখেছে কন্ট্রাক্টরের বাড়িটাও। বাড়িটা দোতলা। নিচের তলায় চাকর-বাকররা থাকে। ওপরের তলায় থাকে সে। তার একটা দু-নলা

বন্দুক আছে। রাতের বেলা বন্দুকটা তার কাছেই থাকে। অথচ আয়ানের কাছে কোন অস্ত্র নেই। আয়ান বিপ্লবকে বলেছিল। কিন্তু বিপ্লব বলেছে, সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে আছে। তাঁরা শ্রেণী-শত্রুর ওপর অসন্তুষ্ট। এইটাই আমাদের বড় অস্ত্র। এর বাইরে কোন অস্ত্রের দরকার হলে তা যোগাড় করে নিতে হবে। আয়ান সেই কথাই ভাবছিল। কি করে এই লোকগুলির অসন্তোষকে সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে, কি করে সে দরকারী অস্ত্র সংগ্রহ করবে, সেই চিন্তাই করছিল। চিন্তা করতে করতে সে বনের দিকে অগ্রসর হল। বনের পাশে একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে দু'একটা বাড়ি। হ্যাঁ এই সাঁওতালদেরই। একটা জিনিস আয়ান লক্ষ্য করেছে যে, সাঁওতালরা গরীব হলেও বাড়ি-ঘরগুলো খুব পরিষ্কার রাখে— একদম ঝকঝকে তকতকে। লেপে পুছে গুছিয়ে রাখে। আয়ানের খুব ভাল লাগে। পুকুর পারের ঐ বাড়িটায় বসে একটা মেয়ে কি করছিল। একজন সাঁওতাল এসে ওকে সাপটে ধরল। মেয়েটা আপত্তি করছে। কিন্তু ছেলেটি শুনল না। ওকে পাজাকোলা করে তুলে নিল। মেয়েটা আপত্তি করছে। কিন্তু না, অত আপত্তি করছে না। মেয়েটা খলখল করে হাসছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে। ছেলেটা ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল। ঝাঁপটা বন্ধ করে এখন ওরা কি করছে? ভাবতে গিয়ে আয়ানের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন সে একটা শিহরণ অনুভব করছে। মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠছে। আয়ানের জানতে ইচ্ছে করছে ঝাঁপটা বন্ধ করে ঘরের ভেতর ওরা কি করছে। ঐ তো মেয়েটি ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে এসে মুখটা ওদিকে করে হাসছে। ছেলেটি বেরিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যেন এখন খুব খুশি। কিন্তু আয়ানের ভেতরটা তোলপাড় করছে। হঠাৎ তার মনে হল সে দেশের কাজে নেমেছে। বড় কাজ করছে। তাকে অনেক শক্ত হতে হবে। সামান্য ওসব ব্যাপারে তার পক্ষে এমন এলিয়ে পড়া শোভা পায় না। কিন্তু সে কিছুতেই সেই দৃশ্যটার কথা ভুলতে পারছে না। মেয়েটা খলখল করে হাসছে। ছেলেটা পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঘরে ঢুকেই ঝাঁপটা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু তাকে ভুলতেই হবে। সে দৃশ্যটা ভোলার জন্য এক দুই তিন চার করে গুনতে লাগল। পুকুরের পাড় থেকে রাস্তার দিকে এল।

ভর দুপুরবেলা। উদাস বাতাস ঝরা পাতাগুলোকে নাড়া দিয়ে সড়সড় করে বয়ে যাচ্ছে। আয়ানের উদাস মনটা বারবার পিছলে পিছলে সেই কুঁড়েটার মধ্যে চলে যেতে চাইছে। আর আয়ান বারবার তাকে টেনে টেনে এই বনের ঝরা পাতার ওপর বসাতে চাইছে, মড়মড় করে বয়ে যাওয়া বাতাসের ওপর বসাতে চাইছে। দূর বনের মধ্যে পাপিয়ার পি-পিয়া ডাকের উপর বসাতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই বসাতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে আয়ান বড় বটগাছটার তলায় গিয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ তার চোখ দুটো দূরে রাস্তার উপর আটকে গেল। কন্ট্রাক্টরবাবু তার দু-নলা বন্দুকটা নিয়ে এদিকেই আসছে। আয়ানের মনটা পিছু পিছু গিয়ে বন্দুকটার ওপর আটকে গেল। অনেক কথা, অনেক পরিকল্পনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু সে চুপ করে বসে থাকল। সে চোখ দুটোকে ছোট করে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিল। কন্ট্রাক্টার-বাবু আস্তে আস্তে বটগাছটার নিচেই চলে এল। বন্দুকটা হাতে করে সে গাছের ডালে ডালে চোখ ফেলতে লাগল। আয়ানের চোখ দুটো বন্দুকটার ওপরে লেগে থাকল। এখানে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না! কিন্তু সঙ্গে কেষ্টা মাঝি আছে। তাতে কি হয়েছে? কেষ্টা মাঝি তো তাদেরই লোক। কিন্তু লোকটা যদি বন্দুকটা কেড়ে নেওয়ার আগেই তাকে গুলি করে দেয়!

তা কেন হবে? লোকটা তো আনমনে আছে। এক টান দিলেই বন্দুক আয়ানের হাতে চলে আসবে। তারপর ধারে-কাছে একটাও লোক নেই, একটা গুলি চালিয়ে দিলেই হল। কিন্তু আয়ান কি গুলি চালাতে পারে? সেই কবে ছোট বেলায় মুন্নাভাইয়ের বন্দুক দেখেছে। তাও কোনদিন চালায়নি। তবে মুন্নাভাইয়ের কাছে একদিন কি করে চালাতে হয় তা দেখেছিল। ঐ যে ওপরে একটা সুইচের মতো, ওটা ক্যাচ। ওটা ঘুরিয়ে খুলে নিয়ে তবে গুলি ভরতে হয়। আর নিচে ঘোড়ার মধ্যে টিগার। টিগার তো একটা থাকে! কিন্তু এটাতে দুটো যে। ও দু-নলা বলে বোধ হয় দুটো। ঐ টিগারে চাপ দিলেই তো গুলি বের হয়। আয়ানের মন বলে সে পারবে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে যদি তখন গুলি বের না হয়! তাহলে সে তো ধরা পড়ে যাবে। সেটা ঠিক হবে না।

আয়ান মন ঠিক করতে পারল না। আর ঠিক করতে না পেরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়েই রইল। আর চোখ ছোট করে দেখতে লাগল। লোকটা এবার বন্দুকটা ঘাড়ের ওপর তুলল। তারপর দম করে একটা শব্দ হল। একটা নলের ভেতর দিয়ে একটু ধুঁয়ো বেরুল। আর একটা পোড়া পোড়া গন্ধে জায়গাটা ভরে গেল। দুটো হরিয়াল ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। কেষ্টা মাঝি দুটোকেই কুড়িয়ে আনল। কন্ট্রাক্টরবাবু দেখল, একটা লোক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েছিল। গুলি ছোঁড়ার শব্দ হতেই লোকটা চমকে উঠে জুল জুল করে তাকাচ্ছে। সে বুঝতে পারে হঠাৎ গুলির শব্দে খুব ভয় পেয়ে গেছে। আচমকা দুম্ শব্দে কার না চমক লাগে। গাছের গুঁড়িতে হেলান দেওয়া লোকটারও লেগেছে। লোকটার হাবাগোবা মুখে আতঙ্ক দেখে কন্ট্রাক্টরবাবু হেসে ফেলল। কেষ্টাও তার হাসিতে একটুখানি হাসি যোগ করে হরিয়াল দুটি তার সামনে তুলে ধরল। নিজের সাক্ষাৎ সফলতাকে সামনে দেখে সে খুবই খুশি হল। কেষ্টাকে বলল, 'আজ দু-দুটো হরিয়াল পড়েছে। যা, বুধার বউটারে ডেকে নিয়ে আয়। আজ এখানেই পিকনিক হবে।' কেষ্টা বলতে যাচ্ছিল, 'কিন্তু আজ্ঞে....' কন্ট্রাক্টর বাধা দিয়ে বলল, 'কোন কিন্তু নয়, তুই যা।' কেষ্টা যাবার আগেই আয়ান উঠে কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে চলতে লাগল। কন্ট্রাক্টর মনে করল লোকটা ভয় পেয়ে গেছে। তাই ঠাট্টা করে জানতে চাইল, 'কি হে, খুব ভয় পাইছ নাকি?' আয়ান আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ, সে ভয় পেয়েছে। কন্ট্রাক্টর হেসে ওঠে, 'কোথায় যাবা?' 'জী শালতোড়া আজ্ঞে ' আয়ান উত্তর দেয়। কন্ট্রাক্টর ভাবে লোকটা যথার্থই ভয় পেয়েছে। তাই আরেকটু রসিকতা করে নিতে চায়, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' আয়ান বলে, 'অশোকনগর বটে আজ্ঞে।' কন্ট্রাক্টর ভাবে হবেও বোধ হয়।

শাল-পিয়াল, অশোক-পলাশ-সেগুন আর শিরীষের গাছ এখানে মাইলের পর মাইল। তাই গ্রামগুলিরও নাম শালতোড়া, পলাশপুর, অশোকনগর, পিয়াশাল ইত্যাদি। সেই অশোকনগরের ছেলেটা এই পলাশপুরের বটতলায় বসেছিল। সে এখন শালতোড়ায় যাবে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। আয়ানের মাথায় ছাঁটা ছোট ছোট চুল, খালি গা, খালি পা, থানের ধুতি সবই এই পলাশপুরের সাঁওতালপাড়ার পরিবেশে খুবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক তার বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে যাবার ঘটনাও। তাই আয়ানকে দেখে কন্ট্রাক্টরবাবুর কোন সন্দেহই হল না। আয়ান হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বনের আড়ালে হারিয়ে গেল। বনের আড়াল হতেই সে পা চালিয়ে চলে এল কান্তর বাড়িতে। কান্ত তখন সবে কাজ

থেকে ফিরেছে। সে গিয়ে সনাতনকে ডেকে আনল। কান্তু আর সনাতনকে নিয়ে আয়ান বুধুর বাড়িতে এল। বুধুর বাড়িতে ততক্ষণ কেষ্টা মাঝি এসে গেছে। তারা সকলে মিলে যুক্তি করতে বসে গেল। তারপর বুধুর মধ্যান বান্নুকে নিয়ে কেষ্টা বটগাছের দিকে চলে গেল।

বান্নুকে দেখে কন্ট্রাক্টরবাবু খুব খুশি হল। সম্প্রতি বান্নু আর তার বাড়ি যায় না। বুধু মাঝি যেতে দেয় না। আজও সে আশা করতে পারেনি যে, বুধু মাঝি বান্নুকে আসতে দেবে। তাই বান্নুকে এত তাড়াতাড়ি আসতে দেখে সে খুব খুশি হয়। বলে, 'দেখ্ তোর জন্যে দুটো বড় হরিয়াল মেরেছি।' কিন্তু বান্নু আর এগোয় না। সে দূরে দাঁড়িয়ে বলে, 'মু ডর লাগে বটে রে বাবু! তুর হাতে বোন্দুক দেখলে ডর লাগে বটে।' কন্ট্রাক্টরের আরও ভালো লাগে, তার হাতে বন্দুক দেখে আজ সবাই ভয় পাচ্ছে। সেই ছেলেটা তো গুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। আবার বান্নুকে বান্নু, যে বান্নু দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না, সেও ভয় পাচ্ছে। সে আরও খুশি হয়ে বলে, 'নে, আমি বন্দুক রেখে দিলাম। সে বন্দুকটাকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে বান্নুর দিকে এগুতে লাগাল। কেষ্টা চট করে একটা কাপড় দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুধু, সনাতন আর কান্তু ছুটে এসে কন্ট্রাক্টরের মুখে কাপড় পুরে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। কেষ্টা হরিয়াল আর বন্দুকটা নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আয়ান ভাবতে লাগল বন্দুকটা কি করা যায়? আজ হোক, কাল হোক পুলিশ আসবেই, আর পুলিশ এলে সবার আগে যেটা খোঁজ করবে তা হল এই বন্দুকটা। আর যার কাছে পাবে তাকে তো জামাই আদর করবে। কিন্তু এটা ফেলেও দেওয়া যায় না। কারণ এটা তাদের কাজে লাগবে। তাদের অস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। আয়ান ভাবতে লাগল এটা কোথায় লুকান যায়। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য তখন পলাশপুর গ্রামের শাল-পিয়াল আর অশোক-পলাশের বনে অজস্র সোনা ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম দিক-চক্রবালের কোলে ঢলে পড়ছে। আস্তে আস্তে আঁধার এসে গ্রামের কুঁড়েগুলোকে ঢেকে ফেলছে। ওরই একটা কুঁড়ের মধ্যে বসে আয়ান বন্দুকটা লুকোনোর কথা ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মনে হল, এই মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়লে তারা হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে। আয়ান কেষ্টাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কেষ্টার হাতেই বন্দুকটা। কেউ দেখলেও কিছু ভাববে না। কারণ কেষ্ট বাবুর বাড়িতে কাজ করে। তারা বনের মধ্যে ঢুকে গেল। বনের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি। কোন কালে নাকি কোন ডাকাতদলের কালীমন্দির ছিল। আয়ান সেই পোড়ো বাড়িটাতে উঠে গেল। এক দেওয়ালের ধার থেকে কয়েকটা ইট খুলে ফেলল। তারপর জায়গাটা বাক্সের মতো করে তাতে বন্দুকটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর সুন্দর করে ইটগুলো সাজিয়ে দিয়ে তার ওপরে শুকনো লতা-পাতা যেমন ছিল তেমনি করে সাজিয়ে দিল। বন্দুকটা লুকিয়ে রেখে আয়ান সনাতনের বাড়ি ফিরে এল। সনাতনরা ততক্ষণে কাজ সেরে ফিরে এসেছে। বুধুও ওকে এক হেঁসের কোপে শেষ করে দিয়েছে। সনাতন কি ভাবল। তারপর বলল, 'পুলিশ আসবেক বটে। তু এখন যা বটে।' আয়ানও একথাটা ভাবছিল। সে ঠিক করল, রাতে রাতেই সে মেজিয়া হয়ে বড়জোড়া চলে যাবে। রাত এগারটার সময় শালতোড়া থানায় গিয়ে কেষ্টা মাঝি খবর দিল যে বাবু যে সেই বন্দুক নিয়ে বনে ঢুকেছে এখনও ফেরেনি।

পঁচিশ

আয়ান প্রথমে ভেবেছিল সে বনে বনে যাবে। কিন্তু রাত্রিবেলায় বনে কারও সঙ্গে দেখা হলে কোন কৈফিয়ৎ থাকবে না। তার থেকে রাস্তা দিয়ে যাওয়াই ভালো। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলে বলবে যে শালতোড়ায় কাজ করতে এসেছিল। কিন্তু কাজ করার কোন যন্ত্রপাতি তার কাছে নেই। তাহলে কি বলা যায়? সে বলবে অশোকনগরে তার দিদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে ভারি কাজ। তাই সকালের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। তার বাড়ি রাজকুসুমে। কিন্তু লোকটার বাড়ি যদি রাজকুসুম বা আশোকনগর হয়? আয়ান ঠিক করল কারো সাথে দেখা হলেই প্রথমে তার বাড়ি কোথায় তা জেনে নেবে। তারপর অবস্থা বুঝে সে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে বলবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে পথ হাঁটছিল। মেজিয়া সে কখন পেরিয়ে এসেছে। সামনে বড়জোড়া। বনে বনে পাখিরা ডেকে উঠছে। একটু দূরেই একপাল শিয়াল ডেকে উঠল। আয়ানের ভয় করতে লাগল। আয়ান অবশ্য জানে শিয়ালে মানুষ ধরে না। কিন্তু যেখানে এতগুলো শিয়াল আছে সেখানে দু-একটা বাঘ, অন্ততঃ বাঘডাশা থাকা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। সে আরও জোরে হাঁটতে লাগল। হ্যাঁ, ঐ তো সামনে বড়জোড়া। কিন্তু একটা আলো ডানদিক থেকে ছুটে সামনে আসছে। আয়ানের ভয় হল, পুলিশের গাড়ি নয় তো? হতেও পারে। এতক্ষণে হয়ত শালতোড়ায় পুলিশ এসে বুধুর কাছ থেকে সব জেনে গেছে। তারপর তাকে ধরবার জন্য এখন ছুটে আসছে।

আয়ান পাশের জঙ্গলে নেমে গেল। আলোটা সামনে এসে থামল। আয়ান দেখল একটা বাস বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের দিকে গেল। আয়ান আবার রাস্তায় এসে হাঁটতে লাগল। এখন লোকালয়ে একজন দু'জন করে লোক উঠতে শুরু করেছে। পাখিগুলো কিচির-মিচির করছে। দু-একটা পাখি ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর এসে বসেছে। পুব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে থেকে রক্তবর্ণ সূর্যটা যেন দামোদরের ঐ পারে উঠছে। সামনে দুর্গাপুর ব্যারেজ। একজন পুলিশ রাইফেল ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে আর একজন পুলিশ। আয়ানের মনে হল পুলিশ দুটো যেন এদিকে তাকিয়ে তাকেই দেখছে। কাছে গেলেই ধরবে। হতে পারে শালতোড়ার পুলিশ কেষ্টর কাছ থেকে তার বর্ণনা জেনে গেছে। তারপর এখানকার পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। আয়ান গেলেই ওরা ধরবে। সে আর পা বাড়াতে পারল না। ডানদিকের পার্কটায় নেমে গেল।

পার্ক থেকে সে দামোদরের বালুচরে নেমে গেল। তার পরনে সাঁওতালের মত কাপড়। তার মাথার চুল তাদের মতোই কাটা। কেউ তার নেমে যাওয়া দেখে সন্দেহ করল না। সে দামোদরের বালির চর ধরে হাঁটতে থাকল। শুকনো নদী হেঁটেই পার হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে দুপুরবেলায় রাজকুসুমে এক কমরেডের বাড়ি গিয়ে উঠল। এখানেই তার জামা-পাজামা ছিল। আয়ান স্নান করে জামা-পাজামা পরল। তারপর বাসে করে বহরমপুর চলে এল। বহরমপুর এসে উঠল তার সেই পুরনো মেসে। নাজিম এবং হামিদ তার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। আয়ানও কিছু না বলে বিপ্লবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিপ্লব পলাশপুরের খবর কাগজেই দেখেছিল, সে খুব খুশি হয়েছে আয়ানের কাজে। আয়ানকে দেখেই তার পিঠ চাপড়ে সে আনন্দ প্রকাশ করল। সেখানে আরো দুটো ছেলে বসে

ছিল। কিন্তু আয়ানের যেন মনে হল ছেলে দুটির একটি ছেলেকে সে কোথায় দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না, কোথায় দেখেছে। অবশেষে অনেক কষ্টে তার মনে পড়ল। আড়তের মালিক তার বাবার টাকা মেরে দিলে সে সফিউলকে সঙ্গে করে কয়েকবার গোরাবাজারে তার বাড়িতে এসেছিল। প্রথম প্রথম সে আজ দেব, কাল দেব করে কয়েকবার ঘুরিয়েছিল। কিন্তু তারপর একদিন কাকে দিয়ে খবর দিয়ে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিল। ঐ ছেলেটি এসে তাদের প্রাণের হুমকি দিয়ে শাসিয়েছিল। বলেছিল, 'গোরাবাজার নিমতলা বড় খারাপ জায়গা দাদা। এখানে এসে ঘোরাঘুরি করলে লাশ পড়ে যাবে। প্রাণের মায়া থাকলে জলদি কেটে পড়ুন। আর আসবেন না কোনদিন।'

আয়ান তখন আজকের আয়ান ছিল না। সে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর তাদের সেই ভয় পাওয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আড়তদার বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিল। অপমানিত আয়ান বন্ধুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কারণ ঐ ছেলেটি যা পরিচয় দিয়েছিল তাতে ও পারে না এরকম অপরাধই নেই। তাই আয়ান আড়তদারের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। আর কোনদিন যায়নি। আর আজ ঐ ছেলেটা বসে বিপ্লবের সঙ্গে বিপ্লবের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছে। আয়ানের সব হিসেব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তার খুব অস্বস্তি লাগছে। কারণ যে ছেলে বড়লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা হয়ে কাজ করতে পারে তার হাতে যদি কোন পার্টির নেতৃত্ব পড়ে তাহলে সে পার্টির কি হতে পারে আয়ান ভাবতে পারল না। আয়ান উঠতে যাচ্ছিল। বিপ্লব তাকে বসতে বলল। তার সঙ্গে নাকি কথা আছে।

আয়ান চুপ করে বসে থাকল। ছেলেদুটির যা আলোচনা ছিল তা সেরে নিয়ে উঠে গেল। আয়ান তখন পুরো ব্যাপারটা বিপ্লবকে না বলে পারল না। বিপ্লব বলল, 'জানি, বাপীর ইতিহাস আমি জানি। কিন্তু শুধুমাত্র নীতি আর তত্ত্ব দিয়ে তো পার্টি চলে না। ওরা আমাদের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের তো তার মোকাবিলা করতে হবে। তা আমার তো তোর মতো লোককে দিয়ে হবে না। তার জন্যই ওদের দলে নেওয়া, দলের স্বার্থে ওদের ব্যবহার করতে হবে।' সেই একই যুক্তি, যে যুক্তি রহমান সাহেব দিয়েছিল, সেই যুক্তি। আয়ানের একদম পছন্দ হল না। সে বলল, 'তাহলে অন্য পার্টির সঙ্গে আমাদের ফারাক কি? আমাদের তো লোকে গুণ্ডা পাটি বলবে।' বিপ্লব কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আয়ান চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল, 'দেখুন, আমি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এ দলে আসিনি। আমার বাবার ন্যায্য টাকা এরা মেরে দিয়েছে। সে টাকা আদায়ের জন্য আমি পার্টির সাহায্য চাইনি। জোতদার মিথ্যা মামলা করে আমার বাবাকে জমি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তবুও তার প্রতিকারের জন্য পার্টির সাহায্য চাইনি। আমি চেয়েছি যাতে আর কাউকে এরকম অবিচারের মুখোমুখি হতে না হয়। কিন্তু যারা এই অন্যায় করছে, আমরা যদি তাদেরকে নিয়েই পার্টি করি তাহলে তো এ অন্যায় আরও বাড়বে।' বিপ্লব এতেও বেশি কথা বলল না। শুধু জানাল যে, যা করা হচ্ছে সবই লোকাল কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে করা হচ্ছে। আয়ান লোকাল কমিটির সব সদস্যকে চেনেও না। সে বিপ্লবের হাত ধরেই পার্টিতে ঢুকেছিল। সে-ই রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে পলাশপুরে পাঠিয়েছিল। আজ তার মুখে এই কথা শুনে তার মোহভঙ্গ হয়ে গেল। সে বলল, 'তাহলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। গুণ্ডা বদমাশ যেখানে নেতা, আমি সেখানে

নেই।' বিপ্লব এতেও কোন কথা বলেনি। আয়ানও আর কোন কথা না বলেই বেরিয়ে এসেছিল।

বেরিয়ে এসে আয়ান উঠল মেসে। হামিদের কাছ থেকে আয়ান জানল যে, পার্ট টুয়ের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ চলছে। হামিদের ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়ে গেছে। নাজিম আগামীকাল করবে। তার এক ছাত্র একদিন তার খোঁজ করতে এসেছিল। কোন খবর না পেয়ে চলে গেছে। আর আসেনি। আয়ানের মনে হল আর এসেও কাজ নেই। সে রাতের বাসেই বাড়ি চলে গেল। কারণ টিউশনি নেই। মেসের খরচ সে চালাবে কোথা থেকে? তাছাড়া তাকে ফরম পূরণ করতে হবে। হামিদের কাছে জেনেছে যে, সে ফ্রিশিপ পেয়েছে কাজেই টাকা অল্পই লাগবে। ঠিক কত লাগবে আয়ান জানতে পারেনি। না জেনেই সে বাড়ির বাসে চেপে পড়েছে। অনেকদিন পরে বাড়ি তাকে খুব টানছে। তার বাবা ইব্রাহিমের করুণ মুখ মনে পড়ছে। তার মার কথা মনে পড়ছে। তার ভাইবোনের কথা মনে পড়ছে। ছাগলখালি বিলের কথা মনে পড়ছে। তার বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

আয়ান যখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছল তখন খানিকটা রাত হয়ে গেছে। সকলেই শুয়ে পড়েছে। আয়ান মা মা বলে ডাকতেই সালমা ধড়ফড় করে উঠে দেখল আয়ান উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। সালমা জিজ্ঞেস করল, 'কখুন আলি? শরীল ভালো আছে? তুই নাকি পড়হা ছাড়্যা দিয়েছিস?' অনেক যেন তার জিজ্ঞাসা, তাই আয়ান একই সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হল। আয়ান বলল, 'পড়া ছাড়িনি। পরীক্ষা দেব।' তাদের কথা শুনে ইব্রাহিমও উঠে পড়ল। কিন্তু কিছু বলল না। সালমা ভাত চড়িয়ে দিল। খাওয়া হলে আয়ান বৈঠকখানার বেঞ্চি দুখানার ওপর শুয়ে পড়ল।

খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙে গেল। তখন ছাগলখালি বিলের ওপরে পুব আকাশে সূর্য উঠেছে। তার সোনালী রশ্মিগুচ্ছ তাদের চারা আমগাছটার পাতার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পাশের বাঁশঝাড়ে পাখিরা ডাকাডাকি করছে। তার মেজ ভাইটা উঠে গরুর নান্দে শানি দিচ্ছে। পরের দুটো ভাই হাত-মুখ ধুয়ে যে-যার বাড়িতে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে নিজের বাড়িটাই তার কাছে কেমন নতুন লাগছে। এটা যেন তার বাড়িই নয়। এখানে তার জন্য কোন কাজ নির্দিষ্ট নেই, এখানে কোন কাজ তার জন্য থেমে থাকে না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ির পাশের ঝোপ থেকে একটা পিঠুলির দাঁতন ভাঙল। তারপর সেটা মুখে দিয়ে বিলের ধারে এল। বিলে এখনও অনেক জল আছে। আর জলের ওপরে ধানের গাছ। তার মনে হল এবার বিলের ধানের ফলন খুব ভালো হবে। সে বাড়িতে এসে একটা বদনার গলায় দড়ি বেঁধে এক বদনা জল তুলল। সেই জল দিয়ে হাত-মুখ ধুল। তারপর মাকে গিয়ে বলল, 'আমি আজ কলেজ যাব।' মা রান্না চড়িয়ে দিল। আয়ান স্নান করে নিল। খাওয়া-দাওয়া করে সে কলেজ রওনা হল।

কলেজে তাকে দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হল। আরও আশ্চর্য হল সে পরীক্ষা দেবে শুনে। কিন্তু আয়ান পরীক্ষা দিল। লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেলে ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কয়েকদিন কলেজ ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু তবুও পরীক্ষা ভালো হল না। মাস পাঁচেক পরে পরীক্ষার ফল বেরুল। দেখা গেল আয়ান কোনরকমে পাস করেছে। তবে অনার্স পায়নি। এক

সময় তার খুব ইচ্ছা ছিল এম. এস. সি. পড়বে। তারপর গবেষণা করবে। কিন্তু সে অনার্সই পেল না। আয়ানের পড়াশোনার পরিকল্পনা, গবেষণা করার পরিকল্পনা বি. এস. সি.-র রেজাল্ট একেবারে তছনছ করে দিল। আয়ান ভেবেই পেল না সে এখন কি করবে। কিন্তু সে পড়বে বলে ঠিক ছিল, তাই তখনও এম. এস. সি পড়ার চেষ্টা করল। তার রেজাল্ট দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফর্মই দিল না। সে শুনল যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স না থাকলেও অনেক সময় নেয়। সে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ফরম আনল। পূরণ করে জমাও দিল। কিন্তু সেখানেও তার এম. এস.-সি. পড়ার সুযোগ মিলল না। আর আয়ানের যে খুব পড়ার ইচ্ছে ছিল তাও হয়ত ঠিক নয়, কারণ কোনরকমে এম. এস.-সি. পড়লেও আর কোন লাভ নেই। তার বি. এস.-সি.-র রেজাল্ট এত খারাপ হয়েছে যে, এম. এস.-সি.-র রেজাল্ট যতই ভালো হোক না কেন, কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাওয়া যাবে না। আর সে বি. এস.-সি.-তে এত কম শিখেছে যে, এম. এস.-সি. পারবে না। সময় পেলে হয়ত পড়ে নেওয়া যেত। কিন্তু এম. এস.-সি. পড়তেও তো পয়সার দরকার হয়। আর সে পয়সা না থাকলে পড়তে যাওয়া দারুণ কষ্টের। দারুণ যন্ত্রণার। বি. এস.-সি. পড়তে গিয়ে সে সেটা বুঝতে পেরেছে। তাই পড়ার তার যে আর খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। তবে আগে থেকে যেহেতু পড়ার পরিকল্পনা ছিল তাই পড়ার জন্য এম. এস.-সি.-তে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে সে তেমন কষ্ট পায়নি। কারণ ব্যর্থ হবে সেটা যেন সে জানত। কিন্তু মুশকিল হল, এরপরে সে কি করবে তা সে জানত না। কারণ সে ব্যাপারে সে কোনদিন চিন্তা করেনি। সে জানত সে পড়াশোনা করবে। কলেজের পড়া শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। তারপর গবেষণা করবে। বড় বৈজ্ঞানিক হবে। সেই নিউটন বা ডাল্টন যেমন বৈজ্ঞানিক ছিল সেরকম। কিন্তু তা না হতে পারলে সে কি করবে তা সে ভাবেনি। সে জানত বি.এস.সি.-তে সে ভালো রেজাল্ট করবে। কারণ সে ভালো ছেলে। কিন্তু বি. এস.-সি.-তে ভালো রেজাল্ট না হলে কি করবে সে কোনদিন ভাবেনি। এমন কি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় তার যখন খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছিল তখনই তার বোঝা উচিত ছিল যে বি. এস.-সি.-র রেজাল্ট তার আর ভালো হবে না। কিন্তু মানুষের একটাই দোষ যে, খারাপ দিকটা কোনদিনই ভাবতে চায় না। সে তার সুবিধামতো যুক্তি দিয়ে যেটা ভাবতে ভালো লাগে সেটাই ভাবে। ভেবে ভেবে শূন্যের উপর কাল্পনিক স্বর্গ তৈরি করে। কোনরকমে সে স্বর্গে যদি সে পৌঁছে যেতে পারে তবে সে খুশি হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূঢ় বাস্তবের আঘাতে সে স্বর্গ খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায়। তখন সে তার সেই কল্পিত স্বর্গের ধ্বংসস্তূপের উপর বিলাপ করে কালাতিপাত করে। আয়ানেরও হল তাই।

আয়ানের বাবার অবস্থা কোনদিনই ভালো ছিল না। তাদের কখনও খাবার জুটত, কখনও জুটত না। ভালো জামা-কাপড় কোনও দিনই জুটত না। তবুও স্কুলে বরাবর আয়ান ভালো ছাত্র ছিল। কারণ আয়ান পড়াশোনা করত। স্কুল কাছে ছিল বলে বাড়ির ছোটখাট কাজের পরও পড়ার সময় থাকত। আর বইখাতার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা তার বাবা-মা পূরণ করতে পারত। অসুবিধা হলেও পূরণ করত। আয়ানের আরও একটা সুবিধা ছিল, সে সংসারের অভাবের কথা বুঝত না, তাই বিনা সংকোচে সে চাইতে পারত। তাই বাড়িতে খাবার

না জুটলেও তার খাতা-কলম কেনা হত। সে ভালো রেজাল্ট করত। তাই আয়ান ভেবেছিল সে কলেজেও ভালো রেজাল্ট করবে। সে বিশ্ববিদ্যালয়েও ভালো রেজাল্ট করবে। সে গবেষণাতেও ভালো রেজাল্ট করবে। সে বড় বৈজ্ঞানিক হবে। ডাল্টন বা নিউটনের মতো বড় বৈজ্ঞানিক হবে। কিন্তু সে কলেজে ভর্তি হয়ে দেখল বাসের ভাড়ার অভাবে সে কলেজ পৌঁছতে পারছে না। বাসের ভাড়া যোগাড় করতে গেলে তার পড়া তো দূরের কথা ঘুমোবারও সময় থাকছে না। না ঘুমিয়ে পরের দিন ক্লাসে গেলে পড়া বোঝা তো দূরের কথা, জেগে থাকাই মুশকিল হচ্ছে। তার বই তো দূরের কথা নোট লেখার জন্য খাতাও কেনা হচ্ছে না। সে এখন বড় হয়েছে। বাড়ির হাঁড়ির হালের খবর তার অজানা নয়। সে এখন জানে যে, মুরগির ডিম বিক্রি করে যে একটা টাকা পাওয়া গেছে তা তার খাতা কেনার জন্য চাইলে বাড়িতে তার ভাইবোনেদের ভাগ্যে ভাতও জুটবে না। অথচ নিজে মুনিষ খাটতেও পারছে না। ক্লাস কামাই হয়ে যাচ্ছে। একদিন ক্লাস কামাই হলে পরের দিন ক্লাসে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যদিও বাড়িতে এক-আধদিন ছুটির দিনে সময় পাওয়া যাচ্ছে, তার কাছে একটিও বই নেই। ছটফট করে সময়টা কেটে যাচ্ছে।পরের দিন ক্লাসে গিয়ে পড়া বুঝতে পারছে না, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কি করতে হবে ঠিক করতে পারছে না। পড়াশোনা অসহ্য কষ্টদায়ক হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে একটুখানি মুক্তি পাবার জন্য চলে যাচ্ছে বিতর্ক, এক্স টেম্পোর বক্তৃতা বা প্রতিযোগিতায়। তা সে ক্লাস কামাই করে হলেও। তাও কয়েকটা ঘন্টা শান্তি। কয়েক মুহূর্তের জন্য 'আমি যে কিছু পারি' তার অনুভূতি। কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও সাফল্যের সুখ। কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও লোকের সপ্রসংশ স্বীকৃতি।

কিন্তু তাতে তার পড়াশোনার আরও বেশি ক্ষতি হতে লাগল। তখন সে মনে করল তাকে বহরমপুরে একটা থাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। সে করলও। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? দুবেলা টিউশনির মূল্যে। সকালবেলায় উঠে তাকে পড়াতে যেতে হয়। ফিরে এসে কলেজ। কলেজ থেকে ফিরে আবার পড়াতে যাওয়া। মানুষের শক্তির একটা সীমা থাকে। তা সে যত শক্তিশালী আর যত বেশি মনের জোরওয়ালা মানুষই হোক। তাই একটা সীমার বাইরে সে কিছুই করতে পারে না। দুবেলা পড়িয়ে পড়িয়ে সারাদিন কলেজে ক্লাস করে আয়ান আর পড়াশোনার সময় পেল না। আর ইতিমধ্যে যা পড়ানো হয়েছিল, তা সে কিছুই পড়তে পারেনি। তাই দু-একদিন পড়ার সুযোগ পেলেও, হাতের কাছে দু-একটা বই পেলেও আয়ানের তখন পড়তে ভালো লাগত না। তাই একসময় তার মনে হয়েছিল এরকম পড়াশোনা করে সে মানুষ হতে পারবে না। পরীক্ষায় খারাপ ফল আর বাড়ির খারাপ খবর তাকে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। সে মনে করেছিল যে, দেশের কাজ করবে। কিন্তু সেখানেও যাদের সঙ্গে তার দেখা হল তাদেরকে সে মেনে নিতে পারল না। আবার কলেজে ফিরে এল, পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার ফল এভাবে ভালো হতে পারে না, তা সে ততদিনে জেনে গেছে। তবুও পরীক্ষার ফল খারাপ হলে কি করবে তা সে একদম ভাবেনি। তাই এই মুহূর্তে আয়ানের সামনে শুধু ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ। সে এখন কি করতে চায় নিজেও জানে না।

যখন কারো কোন লক্ষ্য থাকে না তখন স্রোত তাকে যেখানে নিয়ে যায় সে সেখানেই যায়। তাদের ছাগলখালি বিলের ঢেউ খুব সংকীর্ণ। সাত সাগর আর তের নদীর পার তা যেতে

পারে না। তাতে যা খড়-কুটো পড়ে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বাঘডাঙ্গায় তুলে দেয়। তারপর তা রোদে শুকিয়ে যায়, বৃষ্টিতে ভেজে। বাঘডাঙার সাথে মিশে যায়। আয়ানও স্রোতের ধাক্কায় বাঘডাঙায় এসে পড়ল। কিন্তু সে বাঘডাঙার সাথে মিশে যেতে পারল না। সে কোন রকমে শুধু থাকল। স্কুলে আয়ান বরাবর ভালো ফল করত। তাই সবাই জানত সে ভালো ছাত্র। তার ওপর সে বিতর্কে জেলায় প্রথম হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকলন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জেলায় প্রথম হয়েছিল, একবার স্কুলের পত্রিকার ছাত্র সম্পাদক হয়েছিল। ফলে তার পরিচিতি ছিল। সবাই তাকে ভালো ছাত্র বলে জানত। তাই যখন সে বি. এস.-সি.-তে খারাপ রেজাল্ট করল তখন অনেকেই জানল। কিন্তু কেন খারাপ রেজাল্ট হল তা তারা জানত না। তাই যে যেরকম বুঝেছিল সে সেরকম ধরে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। কেউ বলত, 'কলেজে শহরের মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল, কি করে পড়াশোনা হবে?' কেউ বলত, 'ওসব কিছু না, খুব অহঙ্কার হয়েছিল, এত অহঙ্কার যে, আল্লাকে ধর্মও মানত না, আল্লা শিক্ষা দিয়েছে।' কেউ বলত, 'নেতা হয়েছিল যে। নেতাগিরি করলে পড়াশোনা হবে কেন?' আবার কেউ বলত, 'চাষার ছেলের আবার পড়াশোনা হয়? ঐ অনেক হয়েছে।' শুধু বলেই তারা সন্তুষ্ট থাকত না। আয়ানের সঙ্গে দেখা হলেই তার রেজাল্ট খারাপের কারণ জানতে চাইত। একে রেজাল্ট খারাপ করে সে মরমে মরেছিল, তারপরে লোকে কৈফিয়ৎ চাইলে খুবই খারাপ লাগত। তাই সে সচরাচর বাড়ি থেকে বের হত না। ইব্রাহিমের ঘরে সে জন্মেছিল। তাই তার ভাতে তার জন্মগত অধিকার। সে ভাত যখন জুটত খেত, না জুটলে খেত না, তবু বাড়িতেই বসে থাকত।

ছাব্বিশ

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আয়ান বাড়ি থেকে বের হয়নি। তবে বাড়িতে বসেও সে অনেক খবর পেত। তাছাড়া একেবারে যে সে বের হয়নি তা নয়। সে একদিন রহমান সাহেবের কাছে গিয়েছিল। আয়ানের রেজাল্ট খারাপের জন্য রহমান সাহেব খুব দুঃখ করলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন। রহমান সাহেব এখনও এম. এল. এ.। গত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। এখন কংগ্রেসের রাজত্ব চলছে। সমস্ত ক্ষমতা কংগ্রেসীদের হাতে। তাই এখন ডোমকলের নেতা মুন্না আর বীন্না। লোকজন এখন তাদের কাছেই যায়। ফলে রহমান সাহেবের কাছে আগের মতো সেই ভিড় নেই। সেজন্যই তিনি আয়ানের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন। তিনি আয়ানকে অনেক খবরও দিলেন। আয়ানদের গ্রামের খালেক পার্টি ছেড়ে দিয়ে এখন কংগ্রেস করছে। আয়ান বলল, খালেক আগেও কংগ্রেস করত, আবার করছে। মাঝে সি. পি. এম. যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সি. পি. এম. করেছিল। আবার যদি সি. পি. এম. ক্ষমতায় আসে তাহলে আবার সি. পি. এম. করবে। আয়ান জানল পার্টি ছেড়েছে আরও অনেক লোক। সেটাই স্বাভাবিক। নিজের সুবিধার জন্য যারা পার্টি করে দুর্দিনে তাদের পার্টিতে থাকার কথা নয়। তারা এখন কংগ্রেস করবে। তাতে অনেক সুবিধা, লাইসেন্স, পারমিট, এমন কি চাকরি-বাকরিও। সি. পি. এম. কি এখন এসব দিতে পারবে? পারবে না।

তাই তারা সি. পি. এম. করে না। তবে কমল হালদার এখনও সি. পি. এম. ছাড়েনি। হয়ত তার জনপ্রিয়তা এত বেশি যে, কংগ্রেসেও সে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্প্রতি নাকি তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা তাকে মেরে ধরে তার সোনা-দানা, টাকা-পয়সা সব নিয়ে গিয়েছে। আয়ান বুঝতে পারে না, কারা ডাকাতি করেছে। কিন্তু খবরটা তার খারাপ লাগে না। গরীব মানুষের সর্বস্ব যারা সুদের দায়ে বিক্রি করে নেয় তাদের বাড়ি ডাকাতি হওয়াই উচিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ডোমকলে আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সি. পি. এম. যখন ক্ষমতায় ছিল তখন অনেক লোক কংগ্রেস থেকে সি. পি. এম.-এ চলে এসেছিল। যারা সি. পি. এম.-এ গ্রহণযোগ্য ছিল না, তারা অন্যান্য শরিক দলে ঢুকে পড়েছিল। যারা অন্যান্য শরিক দলেও গ্রহণযোগ্য ছিল না তারা এস. ইউ. সি. করতে শুরু করেছিল। কল্পনার দাদা প্রশান্ত, গয়েসপুরের মণ্ডলেরা তখন সব এস. ইউ. সি. করত। এস. ইউ. সি.-র মিটিঙে তখন কি ভিড়! তা দেখে তাদের স্কুলের শরীফ মাস্টার তো এস. ইউ. সি.-র হয়ে বিধানসভার ভোটেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু যেই কংগ্রেস জিতেছে তারা আবার সব কংগ্রেস করতে শুরু করেছে।

আয়ান একদিন জবামামীর বাড়ি গিয়েছিল। জবামামীর মনের অবস্থা ভালো নয়। হেনার বিয়ে হয়েছিল, একান্নবর্তী পরিবার। তাই শাশুড়ী-ননদ অনেক ছিল। বেশি পণ না দিতে পারায় তারা হেনাকে সব সময় গঞ্জনা দিত। বিয়ের সময় তারা অত দাবী করেনি, তবে পরে জামাই মোটর সাইকেল চাইল। জবামামীরা দিতে পারেনি। তাই হেনাকে প্রায়ই মারধোর করত। খবর পেয়ে তারা গিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে আর নিতে আসেনি, প্রায় দু-বছর হয়ে গেল কোন খোঁজ-খবরও নেয়নি। হেনা এখন বাড়িতেই আছে। কিন্তু আয়ানের সামনে আসে না। তাকে আসতে দেখে সেই যে ঘোমটা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে আর বের হয়নি। মামী একবার ডেকেছিল। কিন্তু হেনা আসেনি।

আয়ান তার বোনের বাড়িতেও একদিন গিয়েছিল। বোনটির এখন দুই মেয়ে এক ছেলে। ভগ্নিপতি বাবার থেকে আলাদা হয়েছে। কাজেই জমিজমা কিছু নেই। তাই যখন মাঠে কাজ থাকে মুনিষ খাটে। আর যখন কাজ থাকে না তখন হাটে হাটে পাটালি গুড়, না হয় সঞ্জীবনী সালসা বিক্রি করে বেড়ায়। তার দাবি তাকে একটা সাইকেল কিনে দিতে হবে। আয়ান দেখল তার বোনের শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আয়ানের ছোট কাকা ইসমাইলের শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। তার এখন পাঁচটা ছেলেমেয়ে। একা মুনিষ খেটে আর চলে না। কিন্তু জমিজমা কিছু নেই, চলুক আর নাই চলুক একমাত্র মুনিষ খাটার ওপরেই নির্ভর। ফলে প্রায়ই অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটে। হয়ত কোনদিন কিছু না খেয়েই মুনিষ খাটতে যেতে হয়। ফলে তার শরীর ভেঙে গেছে। শরীর ভেঙে গেছে তার মেজকাকা ইস্রাফিলেরও। সে একেবারে পাগল হয়ে গেছে। এখন সব সময় ভুল বকে। আর যেখানে-সেখানে ঘোরে। কেউ ধরে কোন কাজে লাগিয়ে দিলে কাজ করে। তারপর অন্য কোথাও চলে যায়। আয়ানের খারাপ লাগে যে, লোকটি পাগল হয়ে গেছে, অন্যরা তার সুযোগ নেয়। যে যা পারে কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু মজুরী দেয় না। খুব খিদে পেলে আয়ানদের বৈঠকখানায় এসে বসে থাকে। কিন্তু খাবার চায় না। বাড়িতে কারো নজর পড়লে দয়া করে কিছু এনে দিলে খায়। না হলে চুপ করে বসে থাকে। আয়ানের তৃতীয় ভাইটা এলে হাত ইশারা করে ডাকে। এই ভাইটাকে

মেজকাকা বরাবরই খুব ভালবাসত। তাই এই ভাইটাই যেন তার একমাত্র আপন। সে এসে বলে, 'কি বোলছো?' মেজকাকা ডান হাতটা নাড়িয়ে মুখের কাছে নিয়ে আসে, বোকার মত মুখের দিকে তাকায়। তবুও খাবার চায় না। বলে, 'তুরা খায়্যাছিস?' ভাইটা বলে 'খ্যায়াছি।' তারপর বাড়ির ভেতর গিয়ে দু চামচ ভাত বা দুটো রুটি এনে দেয়। সে মুখে দিয়ে বধ্‌নাটা নিয়ে কুয়োর পাড়ে যায়। এক বধ্‌না জল তুলে ঢক্ ঢক্ করে খায়। তারপর 'ঝাল্যা' আমগাছটার তলায় বসে মাটিতে দাগ কাটে। হয়ত ডাড়া কাটার প্ল্যান! হয়তবা পরেশ স্যাকের বিটিকে বিহ্যা করার প্ল্যান। অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবে। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে বকে। রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে বিড়ি চায়। কেউ দিলে খায়। না দিলে খাওয়া বিড়ি খুঁজে বেড়ায়। খানিক পরে উঠে কারও গাছতলায় বা বৈঠকখানায় বসে। তবে তার জমিজমাগুলো এখনও আছে। সে এখন তাদের বাড়ি খায় বলে জমিজমাও তাদের কাছেই আছে।

এই জমি দেখতে আয়ান কয়েকদিন মাঠে গিয়েছিল। আয়ানরা এখন ন' ভাইবোন। তার মধ্যে তার পরের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে. বাড়িতে আছে তারা আট ভাইবোন। তার মধ্যে তার পরের তিন ভাই কাজের উপযুক্ত হয়েছে। তারা সকলেই এখন মাঠে কাজ করে। ফলে তাদের জমির কাজে আর বাইরের লোককে মুনিষ নিতে হয় না। নিজেরাই নিড়ান, কাটাই, মাড়াই করে। পাট কাটা, পাট ধোয়াও তারাই করতে পারে। আয়ানদের নিজেদের এখনও দু-এক বিঘে জমি আছে। ইন্দিরের জমিটা বেরিয়ে গেলেও কয়েক বিঘে ভাগের জমিও আছে। তাতে যা আবাদ হয় তাতে তাদের মোটামুটি চলে যায়। এবার পাট ভালো হয়েছে। তবে তার মা সালমা তা বেচতে দেয়নি। সে বলেছে, এবার তালতলার জমিটা ছাড়াতে হবে। বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পর কমল হালদার নাকি খুব ভালো হয়ে গেছে। সে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। আয়ানদের পাট বিক্রি হয়েছে। এবার একটা দিন ঠিক করে রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে।

আয়ান ভাবছিল আজই সে ভগীরথপুরে কমল হালদারের কাছে যাবে। এমন সময় কল্পনার ছোটভাই শঙ্কর সাইকেল থেকে নামল। আয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ছোড়দি পাঠাল?' ছোড়দি মানে কল্পনা। কিন্তু আয়ান ভেবে পায় না কল্পনা কি করতে তাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শঙ্কর নিজে থেকেই বলল। বলল যে, তার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা সামনে। তাই আয়ানের কাছে অঙ্কটা ক'দিন দেখিয়ে নিতে চায়। কিন্তু তার জন্য কল্পনা কেন? তাছাড়া কল্পনা তো এখন কলকাতায় থাকে। সে এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছে। তাহলে কি বাড়ি এসেছে? আয়ান শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল, 'কল্পনা কলকাতায় থাকে না?' 'হ্যাঁ, কলকাতায় থাকে। ক'দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে।' শঙ্কর জানাল। কল্পনা বাড়িতে এসেছে। আয়ানের কল্পনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে। তার এম. এ. পড়ার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। সে যখন পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিল আয়ান একদিন বিজয়া দশমীর পর গিয়েওছিল। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। কল্পনার বাবাই বসিয়ে কথা বলেছিল। কল্পনা একফাঁকে এসে শুধু প্লেটে করে মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করেনি। আয়ানের মনে হয়েছিল, কল্পনা এম. এ. পড়ছে। আর আয়ান বেকার হয়ে বাড়িতে বসে আছে। তাই বোধ হয় কল্পনা তার সঙ্গে কথাই বলল না। অথচ তারা শিশুশ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে। আয়ানের খুব খারাপ লেগেছিল। সে দুঃখ

পেয়ে চলে এসেছিল। সেই কল্পনা তার ভাইকে পড়তে পাঠিয়েছে। তবুও আয়ান না করতে পারল না। বলল, 'আসিস, তবে সকালে আসিস।' শঙ্কর চলে গেল। আয়ানও ভগীরথপুর রওনা হল।

কমল হালদার পরের সোমবার দিন দিল। তবে রেজিস্ট্রি ডোমকলে হবে না— গোয়াসে করতে হবে। একই অফিসে বার বার জমি নেওয়া-দেওয়ার রেজিস্ট্রি করলে নাকি সরকারের নজর পড়ে। বন্দকী বা সুদী কারবারের কথাও জানাজানি হয়ে যায়। কমল হালদার সেটা চায় না। তাই সে গোয়াসে রেজিস্ট্রি করতে চায়। জমিটা নেওয়ার সময় ডোমকলে রেজিস্ট্রি হয়েছে। এবার গোয়াসে হলে চট করে সরকারের নজর পড়বে না। আবার গোয়াসে তার পরিচিত পার্টির লোকজনও বেশি নেই। কাজেই পার্টির কাছেও ধরা পড়ার ভয় নেই। সেই জন্যই কমল হালদার গোয়াসে রেজিস্ট্রি করতে চায়। আয়ান সেটা বুঝতে পারে। তাকে অনেকটা পথ বেশি যেতে হবে। তাছাড়া তাদের দিক থেকে অন্য কোন অসুবিধা নেই। তাই সে রাজি হয়ে যায়।

সোমবারে জমিটা রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। সালমা খুব খুশি হয়। খুশি ইব্রাহিমও। সে কোদাল নিয়ে জমিটা সমতল করতে লেগে যায়। আয়ানও বাড়িতে থেকে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সেও যায়। আলগুলো বেঁধে দেয়। উঁচু জায়গা থেকে মাটি তুলে ডালিতে পুরে ভাইদের মাথায় তুলে দেয়। ভাইয়েরা সে মাটি নিয়ে গিয়ে নিচু জায়গায় দেয়। জমি সমতল হলে সেচের জল নেওয়ার সুবিধা হয়। আর সারও উঁচু জায়গা থেকে জলের সঙ্গে নিচু জায়গায় চলে যায় না। ফলে সমস্ত জমিতেই ফসল ভালো হয়। তালতলার জমিটা সমান হয়ে গেলে আয়ানের নজর পড়ে শিশুবাগানের জমিটায়। শিশুবাগানের জমিটা ডীপ টিউবওয়েলের সেচের আওতার বাইরে। তাই ওখানে আগের মতো সেই একটা-দুটো আবাদ হয়। তাও ভালো হয় না। অথচ রাস্তার নিচেই বিলে জল থাকে। টিনে করে জল সেচে অনায়াসে ভালো আবাদ করা যায়। আয়ান ভাইদের নিয়ে নালা কাটতে লেগে যায়। তা দেখে মাঠপাড়ার মকবুল মোল্লা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঠাট্টা করে, 'কলেজে পড়হেও দেখছি চাষের কাজে খুব মুন?' আয়ান কোন উত্তর দেয় না, শুধু মুখের ওপর একটু হাসি আনে। তারপর ভাইদের সাথে টিনে দড়ি বেঁধে জল সেচে জমি ভেজাতে থাকে। সেচ পেয়ে গমের গাছগুলো সবুজ হয়ে ওঠে। খুব ভালো বাড়তে থাকে। আয়ানের মনের মধ্যেও অনেক দিন পরে একটা খুশি ছড়িয়ে পড়ে।

আয়ান খুশিমনেই বৈঠকখানায় বসেছিল। শঙ্কর পড়তে এল। পড়া শেষ হলে সে প্যান্টের পকেট থেকে দুটো কুড়ি টাকার নোট বের করে আয়ানের হাতে দিতে গেল, বাবা আপনাকে দিতে বলেছে।' আয়ান বুঝতে পারছে যে, শঙ্কর তাকে পড়ানোর বেতন দিতে চাইছে। তবুও জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' শঙ্কর উত্তর দিল, 'পড়ানোর জন্য।' কিন্তু আমি তো বলেছি যে আমি বেতন নিয়ে পড়াব না' আয়ান বলল। শঙ্কর মাস শেষ হতেই কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করেছিল, বলেছিল, 'বাবা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন আপনি কত নেবেন।' আয়ান বলেছিল, 'আমি এক পয়সাও নেব না।' আয়ানের কথা শুনে তার বাবা খুশি হয়নি। ইব্রাহিম তখন নান্দে শানি দিয়ে বলদ দুটোকে বেঁধে দিচ্ছিল। শঙ্কর চলে গেলে বলেছিল, বেতন দিবে তো লিবি ন্যা ক্যানে? তুই তো অমনি লিচ্ছিস ন্যা। খাটুনি কোর‍্যা লিছিস। পড়হ্যাছিস। দরমা লিবি। যদি দরমা না

লিবি তো পড়হিয়ে লাভ কি?' আয়ান কোন উত্তর দিতে পারেনি। ইব্রাহিম একটাও অন্যায্য কথা বলেনি। আয়ান কি করে উত্তর দেবে। আয়ান কি করে তার বাবাকে বোঝাবে যে, শঙ্কর কল্পনার ভাই, ওকে কল্পনা তার কাছে পাঠিয়েছে; সে শঙ্করের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারে না। আয়ান কিছুতেই বোঝাতে পারে না। তাই সে কিছু উত্তর দেয় না। চুপ করে সব শুনে যায়। শঙ্করও তারপরে ক'দিন আর কিছু বলেনি। চুপ করে এসেছে, আর পড়ে চলে গেছে. হয়ত বাড়িতে বাবার সাথে কোন কথা হয়েছে। আর তাই আজ আবার টাকা নিয়ে এসেছে। শঙ্কর বলল, 'বাবা বলেছেন, পড়ানোর দাম দেওয়া যায় না, কিন্তু কিছু না নিলে কি করে হয়?' আয়ান বলল, 'আমি কিছুই নেব না। তোর বাবাকে বলিস।' তবুও শঙ্কর আরও কয়েকবার টাকা দেওয়ার চেষ্টা করল। আয়ান কিছুতেই নিল না। অগত্যা শঙ্কর চলে গেল। আজও আয়ানের বাবা আঙিনায় গরুকে শানি দেওয়ার জন্য ডালি হাতে দাঁড়িয়েছিল। ছেলের খাম-খেয়ালিপনা দেখে তার অসহ্য মনে হয়েছে। সে বিরক্তিতে হাতের ডালিটা পাকশাটা দিয়ে ফেলে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আয়ানের ভারী অস্বস্তি হতে লাগল।

আয়ান বুঝতে পেরেছে বাবা তার ব্যবহারে অতন্ত বিরক্ত হয়েছে। বাবা-মা তাকে বড় করেছে, সে তাদের খেয়ে-পড়ে মানুষ হয়েছে। তাদের পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখেছে। তারা এখন আশা করতেই পারে যে, সে এখন কিছু উপার্জন করুক। তাদের এ চাওয়াতে কোনরকম অন্যায় নেই। অথচ সে এখনও কোনরকম উপার্জন তো করছেই না, উপরন্তু এখনও তাদেরই বসে বসে খাচ্ছে। আয়ানের মনে হল সে যদি আজ উপার্জন করত তাহলে হয়ত তার বাবা তার এই ব্যবহারে অতটা বিরক্ত হত না। কাজেই তাকে উপার্জন করতে হবে। আয়ান ভাবতে থাকে সে কি করবে। কিন্তু উপার্জনের মতো কিছু দেখতে পায় না। সতীনাথবাবুর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জীবনমুখী নয়— এ শিক্ষা আমাদের জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করে না—শুধু কেরানি তৈরি করে। কিন্তু কেরানিগিরি আর কজনের ভাঁগ্যে জুটবে? বেশিজনের ভাগ্যে জোটে না। আয়ানের ভাগ্যে জুটবে কি? জুটুক আর নাই জুটুক আয়ান চেষ্টা করবে। আর যতদিন তা না জোটে ততদিন অন্য উপায়ে কিছু রোজগার করতে হবে। আয়ান ভাবল কল্পনার ভাই বলে সে পয়সা নিতে পারছে না। কিন্তু অন্য কাউকে পড়ালে তো এই অসুবিধাটা থাকবে না। আয়ান ঠিক করল সে কয়েকটা টিউশনি যোগাড় করবে।

সাতাশ

আয়ান ঠিক করেছে যে, আপাতত সে কয়েকটা টিউশনি যোগাড় করবে। কিন্তু সেটা কি করে যোগাড় হবে সে বুঝতে পারছে না। ছেলেমেয়েদের জন্য যাঁরা প্রাইভেট টিউটর রাখেন তাঁরা চান তাদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাস করুক। সেক্ষেত্রে স্কুলের মাস্টারমশাই বা দিদিমণিদের কাছে পড়ান অনেক সুবিধাজনক। কারণ পাস-ফেলের ব্যাপারে তাদের হাত আছে। কিন্তু আয়ান কোন স্কুলে পড়ায় না। তাহলে তার কাছে কেউ পড়তে চাইবে কেন? কিন্তু শঙ্কর তো আসে। শঙ্কর আসে, কারণ শঙ্কর এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। সে পরীক্ষার

খাতা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা দেখেন না। তাহলে সে যারা ফাইনাল পরীক্ষা দেবে এরকম ছেলেমেয়ে পড়াবে। কিন্তু সেরকম ছেলেমেয়ে সে যোগাড় করবে কি করে? কাকে গিয়ে বলবে যে, সে পড়াতে চায়। আয়ান ঠিক করেছে যে, সে অন্তত ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়ে পড়াবে। কিন্তু তাদের পাড়ার কেউ ওপরের ক্লাসে পড়ে না। আর বাইরের কেউ এখানে পড়াতে আসবে সেটা আশা করা যায় না। কারণ এখন বর্ষাকাল। তাদের মাটির রাস্তায় একহাঁটু কাদা। কার দায় পড়েছে এই কাদা ভেঙে পড়তে আসতে। শঙ্কর আসত। সেও ক'দিন আসেনি। তবুও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। না হয় বাইরে গিয়ে পড়াবে। সেখপাড়ার ইমানের ভাইটা, কি যেন নাম? হ্যাঁ, আলিম। আলিম ক্লাস নাইনে পড়ে। আলিমকে বলে দেখলে হয় না? আয়ান ভাবল আলিমকে বলবে, 'আমি কয়েকটি ছেলেকে প্রাইভেট পড়াতে চাই? তোমার জানাশোনা কেউ থাকলে বলো।' একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে আয়ান ওদের বাড়ি গেল। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হতেই কেমন সংকোচ হতে লাগল। কিছুতেই বলতে পারল না। আলিম কোন্ ক্লাসে পড়ছে, ক্লাস টিচার কে, কে অঙ্ক করায়, কে কার কাছে পড়তে যায় এরকম অনেক কথাই আয়ান জিজ্ঞেস করল। আরও অনেক কথাও হল। কিন্তু সে যা বলার জন্য এসেছিল তা বলা হল না। না বলেই সে একসময় চলে এল।

আয়ান ভাবল সে একদিন স্কুলেই যাবে। গিয়ে হেডমাস্টারমশাইকে বলবে। কলেজে পড়ার সময় তো তিনি একটা টিউশনি যোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই আশায় ভর করে সে স্কুলে গিয়ে হাজির হল। বি. এস.-সি.-তে খারাপ রেজাল্ট করার পর এই তার প্রথম স্কুলে যাওয়া। মাস্টারমশাইরা একের পর এক তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কোন অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি? সে পরীক্ষা কি ভালভাবে দিয়েছিল? এখন সে কি করবে ঠিক করেছে? এরকম গুচ্ছের প্রশ্ন গোছা হয়ে এসে তার কানে আঘাত করতে লাগল। আয়ান সব প্রশ্নেরই উত্তরে একটু মৃদু হাসার চেষ্টা করল। অবশেষে ঘোষালবাবু বললেন, 'এবার তুই একটা কাজ যোগাড় করে ফেল।' কিঙ্করবাবু ওদিকের চেয়ারটায় বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'যোগাড় তো করবে। কিন্তু কাজটা কোথায়?' তখন সবাই মিলে স্বীকার করল যে, হ্যাঁ কাজ যোগাড় করা খুব শক্ত। বীরেনবাবু কোণার দিকটায় বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'এখানকার সমবায়িকায় কিন্তু ম্যানেজার নেবে, তোর তো মুন্নার সঙ্গে আলাপ আছে। বলে দেখতে পারিস।' আয়ানের কথাটা মনে ধরল। সে টিউশনির কথা ভুলে মুন্নাভাইয়ের বাড়িতে রওনা হল। কিন্তু বাড়িতে তাকে পাওয়া গেল না। ভাবী জানাল যে তিনি বহরমপুর গেছেন। আসতে রাত হবে। তবে ফিরে আসবেন।

আয়ান পরের দিন সকালে আবার মুন্নাভাইয়ের বাড়িতে হাজির হল। মুন্নাভাই তাকে দেখেই বলে উঠল, 'কিরে সি. পি. এম.! কিছু বলছিস?' আয়ান কিছু বলল না। সে কিনা দুদিন ধরে ঘুরে মরছে, আর শেষে যেরকম কথা তাতে আর কিছু বলে লাভ নেই। আয়ান বসে থাকল। মুন্নাভাই বলল, 'রাগ করলি নাকি? ঠাট্টা করলাম। আর তুই তো সি. পি. এম. করিস। তা বল কি ব্যাপার।' আয়ান এবার তার আসার কারণ খুলে বলল। মুন্নাভাই বলল, 'হতে বললাম ডাক্তার, তা শুনলি নে। কোপারটিভের ম্যানেজার হয়ে কি হবে?' আয়ান কোন উত্তর দিল না। মুন্নাভাই একটু বসে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, তুই বারীন মণ্ডলের সঙ্গে দেখা কর।

ওই তো এখন সেক্রেটারী। বলবি মুন্নাভাই পাঠিয়েছে। আমি বলে দেব।' আয়ান মুন্নাভাইয়ের পরামর্শ মতো বারীন মণ্ডলের কাছে রওনা হল।

বারীন মণ্ডলের বাড়ি গয়েসপুর। তার বাবা আয়ানদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বারীন মণ্ডলও এখন একটা স্কুলের শিক্ষক। তবে স্কুলটা এতদিন মঞ্জুর হয়নি। তারা বরাবরই কংগ্রেস করত। কিন্তু এর আগের ভোটে যখন ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল তখন এ. ইউ. সি. করতে শুরু করেছিল ঐ কল্পনার দাদারাও তখন এস. ইউ. সি. করত। এবারকার ভোটে কংগ্রেস জেতায় আবার তারা কংগ্রেস করছে। এখন সে থানা সমবায় সমিতির সেক্রেটারী। আয়ান সার কিনতে ওখানে কয়েকবার গিয়েছে। সমিতিটার পুরে নাম— ডোমকল থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড। আয়ান যদি ওখানকার ম্যানেজার হয় তাহলে সে সমিতিটার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সে গিয়ে পৌঁছল গয়েসপুর জুনিয়র হাইস্কুলে। বারীন মণ্ডল তখন অফিসে বসেছিলেন। আয়ান গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। তিনি আয়ানকে বসতে বললেন, 'মুন্না যখন পাঠিয়েছে তখন তো কোন কথাই নেই। তুমি একটা দরখাস্ত লিখে আমাকে দিয়ে দাও, না অত তাড়াতাড়ি নেই, কাল দিলেই হবে।' আয়ান আশ্বস্ত হল। মনে হচ্ছে ম্যানেজারের চাকরিটা তার হবে। অতএব দেরি করার কোন মানে হয় না।

সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দরখাস্ত লিখতে লাগল। মেজভাই এসে প্রশ্ন করল, 'বড়ভাই, পালের ভুঁইয়ের নয়ানজুলিডা কি চোরুশ কোরতে যাবো?' আয়ান একবার মুখ তুলে তাকাল। মনে পড়ল বিকেলে পালের জমির রাস্তার ধারের গর্তটা আজ সমান করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার তো দরখাস্ত লিখতে হবে। আয়ান বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। তোরা যাস তো যা, আমি একটু পরে যাব।' ছোট ভাইয়েরা চলে গেল। আয়ান লিখতে লাগল। তিন-চারবার লিখল। কিন্তু কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না। হয় একটা বানান ভুল হচ্ছে, না হয় লাইন বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। না হলে ভাষাটাই পছন্দ হচ্ছে না। আয়ান তখন সিদ্ধান্ত নিল সে মনে মনে আগে বয়ানটা ঠিক করবে। তারপর লিখবে। কলমটা বাঃ করে সে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে লিখতে লাগল। লিখতে লাগল—আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন ম্যানেজার নেওয়া হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে আমি নিজেকে একজন প্রার্থীরূপে উপস্থাপিত করছি। নির্বাচিত হলে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব।

বিশ্বস্ত সূত্রের কথাটা বারীনবাবুই বলে দিয়েছিলেন। তাই আয়ান সেরকমভাবেই লিখল। এরপর হায়ার সেকেন্ডারী থেকে আরম্ভ করে বি. এস.-সি., বিতর্ক, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, তাৎক্ষণিক ভাষণ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, জীবনে সে যাতে যত মার্কশীট আর সার্টিফিকেট পেয়েছে সব কপি করে জুড়ে দিল। এসব করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছোট ভাইয়েরা মাঠ থেকে ফিরে এল। আয়ান অস্থিরভাবে রাতটার শেষ হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ভোর হতে না হতেই আয়ান গয়েসপুরের দিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তায় সূর্য উঠল। যখন সে বারীন মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছল তখন সূর্যটা আকাশে অনেকটা ওপরে উঠেছে। আয়ান বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়াল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সে বৈঠকখানায় উঠে আস্তে আস্তে কড়া নাড়াল। কাজের মেয়েটি বেরিয়ে এসে বলল, 'জেঠু ওঠেনি, উঠতে দেরি হবে।'

বলেই সে আবার ভেতরে চলে গেল। বসতেও বলল না। বৈঠকখানায় চেয়ার পাতা ছিল। আয়ান একবার ভাবল, ওখানে বসে। কিন্তু আবার সংকোচ হতে লাগল। সেটা ঠিক হবে কি? যদি তাঁর স্ত্রীর বা অন্য কেউ কিছু মনে করে!' তাই সে ওখানে না বসে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গাতে। একপায়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আবার আয়ান দূরে কোথাও যেতেও পারে না। কারণ তাহলে উনি আবার কোথাও বেরিয়ে যেতে পারেন। তাই সে ওখানেই পায়চারি করতে লাগল। অনেকক্ষণ পায়চারি করেও কোন ফল হল না। তখন আবার চুপ করে বৈঠকখানায় উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ঘন্টাখানেক বসে থেকে থেকে সে প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। এমন সময় দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বারীন মণ্ডল। দেরি করে ওঠার কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতো করে বলতে থাকলেন, 'রোজই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। আজ শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করছিল। তাই দেরি হয়ে গেল।' আয়ান আর এর কি উত্তর দেবে। সে দরখাস্তটা এগিয়ে দিল। দরখাস্ত দেখে বারীন মণ্ডল খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তুমি দিন পাঁচেক পরে দেখা কোরো। এর মধ্যে হিসেব রাখার ব্যাপারগুলো একটু দেখে এসো।' আয়ান মনে করল, তাহলে কাজটা সে পাচ্ছে। সে বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে একটা বই যোগাড় করল। আর বাড়িতে ফিরেই হিসাবশাস্ত্রের প্রাথমিক ব্যাপারগুলো নিয়ে পড়ল। দিন কয়েকের মধ্যেই ডেবিট, ক্রেডিট, লেজার, জার্নাল আয়ত্ত করে ব্যালান্স শীট ক্যাশবুক পর্যন্ত সে শিখে ফেলল।

পাঁচ দিনের দিন আয়ান গয়েসপুর জুনিয়র হাইস্কুলে গিয়ে হাজির হল। বারীনবাবু তখন ক্লাসে ছিলেন। আয়ান টিচার্সরুমে অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি ফিরে এসে বললেন, 'গতকাল আমাদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুন্নার বহরমপুরে কাজ ছিল। তাই থাকতে পারল না। মিটিংও হয়নি। পরশুদিন হওয়ার কথা আছে। তুমি তার পরের দিন এসো।' আয়ান পরের দিন গেল, কিন্তু মিটিং সেদিনও হয়নি। 'শুক্রবারে হবে। তুমি শনিবারে এসো।' আয়ান শনিবার গেল, কিন্তু সেদিনও মিটিঙে কিছু ঠিক হয়নি। 'পরের সপ্তাহে এসো।' পরের সপ্তাহে কিছু ঠিক হল না। তখন বারীনবাবু বললেন, 'আসছে মঙ্গলবার দশটার সময় মিটিঙ আছে। যা হয় একটা হয়ে যাবে। তুমি বিকেলের দিকে এসো।' আয়ান বিকেলেই এল। কিন্তু বারীনবাবু বাড়িতে নেই। সে খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। তার যেন মনে হল এঁরা তাকে বোধ হয় শুধুই ঘোরাচ্ছেন, না হলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরি লাগে? তাহলে কি ঘোরাঘুরি করে কোন লাভ নেই? একবার মনে হল, কোন লাভ বরং ফিরেই যায়। মাঠে কাজ করলে তাও কিছু লাভ হবে। আবার মনে হল সে যখন এসেছে তখন অপেক্ষা করে দেখা করে যাওয়াই ভালো, হয় কি না হয় কিছু জানা যাবে। আয়ান দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে দেখল যে কাছে একটা লিচু গাছের নিচে মাচানে কয়েকজন লোক এসে বসল। তারা সবাই গল্প করছে। বারীনবাবু এখনও বাড়িতে ফেরেননি। আয়ান জানে না তাকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, হয়ত রাত পর্যন্ত থাকতে হবে। কিন্তু অতক্ষণ কি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? আয়ান লিচু গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। বরং সে ততক্ষণ লোকের গল্প শুনবে। মাচানের কাছেই একটা কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। আয়ান গিয়ে তার ওপর বসে পড়ল। কিন্তু এ কি গল্প সে শুনতে এল। মাচানের ধারের ফরসা মতো লোকটা বলছে, 'তার থেকে তোমার বুড়ো

বদলজোড়া বেচে দাও।' তা শুনে ধুতিপরা, তুলসীর মালা গলায় কালো মতো লোকটা বলল, 'কিন্তু এত বুড়ো গরু লিবে কে?' তার উত্তরে প্রথম লোকটা বলল, 'নেওয়ার লোকের কি অভাব? হাফশার্টগুলো কি করতে আছে?' তা শুনে দ্বিতীয় লোকটা অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল, 'ভাই সাহেবরা। হ্যাঁ, ভাই সাহেবরা লিবে?' আয়ানের খারাপ লাগতে লাগল, হয়ত তার উপস্থিতি ওরা ধরতে পারেনি, নয়ত এরা তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করছে না। একটা সম্প্রদায়ের লোকের সম্পর্কে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে কত অবজ্ঞার ধারণা! কি করে এদের মধ্যে সত্যকার বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠবে! আয়ান ওখান থেকে উঠে পড়ল। সে বরং পাকা রাস্তার ওপর বট গাছটার নিচেই অপেক্ষা করবে। বারীনবাবু ফিরলে তো ঐ রাস্তা হয়েই ফিরবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আয়ান বারীনবাবুকে ফিরতে দেখল না। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বাড়ি তো ফিরতেই হবে। কাজেই সে ফিরতে লাগল, বরং দরকার হলে কাল-পরশু একবার স্কুলে এসে দেখা করে যাবে।

আয়ান ফিরতে লাগল। পথে হঠাৎ মুন্নাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুন্নাভাই তাকে দেখে সাইকেল থেকে নামল। নেমে বলল, 'তোর ব্যাপারে আজ আলোচনা হয়েছে। তবে সবাই বারীনের কথা শুনছে না, তুই বরং বিন্না আর মলিন হালদারের সঙ্গে দেখা কর। ওরাও মেম্বার তো।' আয়ান কিছু বলল না। মুন্নাভাই আবার সাইকেল চেপে চলে গেল। আয়ান বুঝতে পারছে ম্যানেজারের চাকরি তার হবে না। মুন্নারা হয়ত তাকে একটু ঘোরাতে চাইছেন। মুন্না বা বারীন মণ্ডলের সঙ্গে আয়নের আলাপ ছিল। তাই তার তত খারাপ লাগেনি। কিন্তু বিন্না বা মলিনের সঙ্গে তার আগে থেকে আলাপ নেই, কাজেই তাদের সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে অত সহজ হবে না। সে হাঁটতে লাগল। কিন্তু বি. ডি. ও. অফিস মোড়ে এসে দেখল, বিন্না এবং মলিন দুজনেই পিয়ারের চায়ের দোকানে বসে আছেন। আয়ান কোন কিছু না ভেবেই গিয়ে দোকানে উঠে পড়ল। বিন্না বললেন, 'বস বস, তোর কথা মুন্না বলেছে।' পাশ থেকে মলিন বলে উঠলেন, 'ম্যানেজারের জন্যে তো?' বিন্না মাথা নাড়লেন— 'হ্যাঁ।' মলিন হালদার বললেন, 'কিন্তু তোমার তো হবে না। আমরা কমার্সের ছেলে নেব। তুমি ওকাজ পারবে না।' মলিন হালদার কথাগুলো আয়ানকে উদ্দেশ্য করেই বললেন। আয়ান আগে থেকেই বুঝতে পারছিল যে, তাকে নেওয়া হচ্ছে না। এখন মলিন হালদারের কথায় সেটা পরিষ্কার হল। নিজেকে তার অপমানিত বোধ হচ্ছিল। সে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিন্না বললেন, 'বস বস, মলিনদার কথা শুনে কিছু মনে করিস না। বারী যে! কোথা থেকে?' বারী মোটর সাইকেল থেকে নামল। সে তাদের গ্রামে আসগর বিশ্বাসের বাড়ি জায়গীর থেকে ডোমকল স্কুলে পড়ত। আয়ানের বছর দুয়েক আগে পাস করছে। এখন যুব কংগ্রেসের নেতা। থাকে গয়েসপুরের মণ্ডলপাড়াতেই। বারী মোটর সাইকেল থেকে নেমে বিন্নার কাছে এল। আয়ানকে দেখেই সে বলল, 'আয়ান, কেমন আছ? শুনলাম তুমি সোসাইটিতে ম্যানেজার হচ্ছ!' আয়ান কিছু বলার আগেই বিন্নার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগল, 'আপনারা কিন্তু ভালো ম্যানেজার পাচ্ছেন।' বিন্না তাকে বললেন, 'তুই আগে বস। তারপর কথা বল।' বারী বসে পড়ল। আয়ান এবার উঠে দাঁড়াল। বারী বলল, 'কোথায় যাবা? বসো বসো।' আয়ান বলল, 'বাজারে একটু কাজ আছে।' সে হাঁটতে লাগল।

বাজারে আসলে তার অন্য কোন কাজই নেই, তবে বৈদ্যনাথ ফার্মেসীতে খবরের কাগজ আসে, আয়ান সময় পেলেই এসে কাগজটা দেখে যায়। যদি চাকরির কোন বিজ্ঞাপন থাকে, দেখে দরখাস্ত করে। ক'দিন আগেই একটা চাকরির বিজ্ঞাপন ছিল, উত্তর প্রদেশের কানোরিয়া কেমিক্যাল বলে একটা কোম্পানী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ কর্মী চেয়েছে। আয়ানের তো হায়ার সেকেণ্ডারীতে ভালো রেজাল্ট আছে। তাই সে একটা দরখাস্ত করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন উত্তর আসেনি। আয়ানের ইচ্ছা আজও কাগজটা একবার দেখে যাবে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে বার বার মলিন হালদারের কথাটা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন যে, আয়ান ও কাজটা করতে পারবে না। পরিস্থিতি মানুষকে কত খারাপ অবস্থায় ফেলতে পারে! মলিন হালদারের মতো লোক যিনি না জানেন কাজটা কি রকম, না জানেন আয়ানের যোগ্যতা, তিনিও মন্তব্য করেন, তুমি ওকাজ করতে পারবে না। আয়ান ঠিক করল আর অযথা ওর পেছনে ঘোরাঘুরি করবে না। আয়ান হাঁটতে লাগল। বৈদ্যনাথ ফার্মেসীতে পৌঁছে দেখল কাগজ এসেছে। তবে শরীফ মাস্টার পড়ছেন। আয়ানের ওপর চোখ পড়তেই বললেন, 'দেখবে, নাও। হ্যাঁ, একটা চাকরির বিজ্ঞাপন আছে। তুমি দরখাস্ত করতে পার।' শরীফবাবু বিজ্ঞাপনটা আয়ানকে বের করে দিলো। আয়ান দেখল তাদের রেজিস্ট্রি অফিসেই একজন কেরানি নেওয়া হবে। যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস। আয়ান বিজ্ঞাপনটা ভালোভাবে দেখতে লাগল। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এখনও দুসপ্তাহ বাকি আছে। তবে দরখাস্তের সঙ্গে পনের টাকার পোস্টাল অর্ডার দিতে হবে। আয়ান একটা কাগজে পয়েন্টগুলো নোট করে নিয়ে বাড়ি এল। সে দরখাস্ত দেবে। কিন্তু পনের টাকার পোস্টাল অর্ডার কেনার টাকা তার কাছে নেই। বাবার কাছে সে লজ্জায় চাইতে পারল না। রাত্রে খাবার সময় মাকে বলল কথাটা, 'একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করতাম। কিন্তু পনের টাকার পোস্টাল অর্ডার কিনতে হবে।' সালমা ছেলের কথা শুনে খুশি হল। তাহলে এতদিনে ছেলের বুদ্ধি হয়েছে! সে তো সেই কবে থেকে চাকরির জন্য বলছে। কিন্তু ছেলে বলে, আরও পড়বে। তাই আয়ান যখন নিজে থেকে চাকরির কথা বলল তখন সালমা খুশি হল। সে বলল, 'চাকরি হবে তো?' আয়ান বলল, 'তা তো বলা যাবে না। তবে হতে পারে। দরখাস্ত না করলে তো হবার কোন আশা নেই, করলে তাও একটা আশা থাকবে।' মা ছেলের কথা বুঝল, কিন্তু তার কাছে টাকা ছিল না। সে ঝাঁকাওয়ালাকে ডেকে দুটো মুরগি বিক্রি করে ছেলেকে টাকা দিয়ে দিল। আয়ান ডোমকলে গিয়ে পোস্টাল অর্ডার কিনে দরখাস্ত জমা দিল।

কিন্তু রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানির চাকরিও আয়ানের হল না। চাকরিটা পেল কমল হালদারের ভাই রঞ্জন হালদার। রঞ্জন অঙ্কে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে ভগীরথপুর স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে। আর আয়ান অঙ্কে লেটার নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেছে। বি. এস.-সি.-ও পাস করেছে। তবুও চাকরিটা রঞ্জন হালদার পেল। তার একমাত্র কারণ সে সিডুল কাস্ট। আয়ানরা না খেতে পেয়ে রঞ্জন হালদারদের কাছে জমি বন্ধক দেয়। আর আয়ানকে বঞ্চিত করে রঞ্জনের জন্য সংরক্ষণ। আয়ানের খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু নাসির বলল, 'কমল হালদাররা তাও তো মধ্যবিত্ত। কিন্তু ভগীরথপুরের চৌধুরীরা! ওরা জমিদার ছিল। এখনও বিরাট বড়লোক। কিন্তু ওরাও সিডুল কাস্ট। ওদের বাড়ির এক ছেলে তো এই

সংরক্ষণের জন্যই গতবার বি. ডি. ও. হল।' আয়ান আর কিছু ভাবতে পারল না। সে বাড়ি গিয়ে ভাইদের সঙ্গে শিশুবাগানের ভুঁইয়ে গম কাটতে লাগল। কিন্তু গম কাটতে কাটতে তার মনে হল বারীন মণ্ডলের সঙ্গে একবার দেখা করলে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তো না বলেননি। যদি ম্যানেজারের কাজটা হয়েই যায়! পরের দিন সে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হল আবার সেই গয়েসপুর জুনিয়র হাই স্কুলে। আজ বারীন মণ্ডল টিচার্স রুমে বসেছিলেন। আয়ানকে দেখে বিনা ভূমিকায় বললেন, 'আগের ম্যানেজার, যাকে টাকা মারার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল সে হাইকোর্টে মামলা করেছে। কাজেই মামলা না মেটা পর্যন্ত কিছু হচ্ছে না।' আয়ান কিছু বলতে পারল না। তার মনে হল, না এলেই বোধ হয় ভালো হত। তবে এসে লাভ হল এই যে, সে জানতে পারল, ম্যানেজারের চাকরি তার হবে না। বিমর্ষ আয়ান খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাড়ির পথ ধরল।

আঠাশ

আয়ান টিচার্স রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বদেশবাবু এসে বললেন, 'আয়ান আছিস? যা তো ক্লাস সেভেনের একটা ক্লাস আছে। আমার আবার বাজারে একটু কাজ আছে। তাহলে একটু আগে বেরিয়ে যাই।' স্বদেশবাবু আয়ানের হাতে ডাস্টারটা ধরিয়ে দিলেন। আয়ান নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বদেশবাবু বললেন, 'ভাব-সম্প্রসারণের ক্লাস। তোর কাছে কিছু না।' তিনি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেলে চেপে বেরিয়ে গেলেন। আয়ান ক্লাস সেভেনের ক্লাস নেবার জন্য এগোতে লাগল। কিন্তু এইভাবে ক্লাস নিতে যেতে তার ভালো লাগছে না। তার মনে হচ্ছে এভাবে রাজী হয়ে সে ঠিক করেনি। মাস্টারমশাইরা তাকে শুধু শুধু খাটিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু কিছু করছেন না। যখন তার রেজিস্ট্রি অফিসের চাকরি হল না এবং যখন সে জানতে পারল যে, সোসাইটিতে ম্যানেজারের চাকরিও তার হবে না, তখন আয়ানের মনে হল আপাতত তার কোন চাকরি হবে না। কিছু রোজগারের জন্য তাকে টিউশনিই করতে হবে। তাই সে হেডমাস্টারকে এসে বলেছিল, 'স্যার, আমাকে কয়েকটা টিউশনি যোগাড় করে দিন।' হেডমাস্টারমশাই একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, 'তোকে এখানকার ছেলেরা চেনে না। হঠাৎ করে তোর কাছে পড়তে আগ্রহ দেখাবে না। তুই কয়েকদিন দু-একটা করে ক্লাস করা। তাহলে তোর টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারব।' আয়ানের টিউশনির খুব দরকার। তাই সে রাজি হয়ে গিয়েছিল। আয়ান এর আগেও ক্লাস নিয়েছে। যখন ইলেভেনে পড়ত, তখন মাস্টারমশাই কম থাকলে কোন কোন দিন হেডমাস্টারমশাই তাকে ক্লাসে পাঠিয়ে দিতেন। তখন ক্লাসে পড়াতে খুব ভালো লাগত। কিন্তু এখন লাগে না। এখন সব সময় মনের মধ্যে ঘোরে যে, সে টিউশনি পাবার জন্য এখন ক্লাস নিচ্ছে। শুধু তাই নয়--সে উপস্থিত থাকলে যিনিই হাতের কাছে পান তাকে ক্লাসে পাঠিয়ে দেন। সে একটা পিরিয়ড যে বিশ্রাম করে কারো সঙ্গে তার নিজের ব্যাপারে কথা বলবে তার সময় পর্যন্ত পায় না। তাই তার মনে হচ্ছিল সে রাজি হয়ে ঠিক করেনি। তবুও সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে দেখল স্বদেশবাবু বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। অন্যান্য মাস্টারমশাইরাও আছেন। মাসের প্রথম দিন, তাই বেতন হচ্ছে। আয়ান চেয়ে দেখল, সবাই সারা মাস কাজ করেছেন। এখন বেতন নিচ্ছেন। কাজ সেও করেছে। কিন্তু সে বেতন পাবে না। তার ভাবতে গিয়ে খারাপ লাগতে লাগল। তার তো এখানে ক্লাস করা কাজ নয় ; ঐ তো স্বদেশবাবু বাজার থেকে ফিরে এসে বেতন পাচ্ছেন, আর সে ক্লাস করে এসে হাওয়া খ'চ্ছে, তাহলে এমন ক্লাস সে কেন করবে? সে ঠিক করল সে আর আসবে না। সে স্কুল থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। সুভাষবাবু এসে বললেন, 'তুই আমাদের বাড়ি গিয়ে পড়াতে পারবি?' আয়ান ভাবতে লাগল। সুভাষবাবুর বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূর। তার পড়াতে যেতে অবশ্যই অসুবিধা হবে। তবুও আয়ান বলল না, যে সে পারবে না। তাকে পারতেই হবে। সে জানতে চাইল, 'স্যার, কে পড়বে?' সুভাষবাবু বলল, 'বোনটা গতবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়ে ফেল করেছে, ও পড়বে। আর একটা ভাই নাইনে আর ছোটটা সেভেনে পড়ে— মোট তিনজন পড়বে। তুই পারিস তো এ সপ্তাহ থেকেই শুরু করে দে। সকাল সাতটা থেকেই ভালো হবে।' আয়ান রাজি হয়ে গেল। পাঁচ মাইল পাস্তা। পায়ে হেঁটে অন্তত দেড় ঘণ্টা লাগবে।

আয়ান সূর্য উঠার আগেই হাঁটতে শুরু করল। সুভাষবাবু বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু আয়ান পড়াতে গিয়ে মুশকিলে পড়ল। ফেলকরা বোনটার মাথায় একদম কিছু নেই। আর চেষ্টাও নেই। তার বহরমপুরের সেই ছাত্রের মতো 'বুঝিয়ে দেন' পার্টি। আয়ান দু-একটা অঙ্ক বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বরাবর এত ফাঁকি দিয়েছে যে, মৌলিক ব্যাপারগুলোও জানে না। ফলে আয়ান অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বোঝাতে পারল না। তখন সে অঙ্কগুলো শুধু কষে দিল। যে ভাইটা নাইনে পড়ে সে ভাইটা বরং একটু ভালো। বোঝালে বুঝতে পারে। ছোটটারও বুদ্ধি আছে। কিন্তু খুব ফাঁকিবাজ। একটু খেয়াল না করলেই চুপ করে বসে থাকবে। আর কত তাড়াতাড়ি পড়াটা শেষ করবে, সব সময় সেই ধান্দা। তাই পড়ান আয়ানের খুব সহজ হল না। তবুও সে পড়াতে লাগল। তবে আসতে যেতে তার অনেক সময় লেগে যাচ্ছিল। সেকথা শুনে নাসির বলল, 'আমার সাইকেলটা তো বাড়িতে পড়েই থাকে, সকালে নিয়ে যাস। কোনদিন কাজ থাকলে আমি বলব।' সেদিন থেকে আয়ান নাসিরের সাইকেলটা নিয়ে যেতে লাগল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাসিরের বাড়ি আসে। ওখান থেকে সাইকেল নিয়ে পড়াতে যায়। পড়িয়ে ওদের বাড়ি সাইকেল রেখে সে বাড়ি চলে আসে। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে কাজ থাকলে মাঠে যায়। স্কুলে যাওয়া সে আজকাল বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু আজ সুভাষবাবু এমন একটা খবর দিলেন যে, তাকে আবার স্কুলে যেতে হল। সুভাষবাবু জানালেন যে, তাদের স্কুলের কেরানি রমেনবাবু শরীর খারাপ হয়ে যাবার জন্য স্বেচ্ছা অবসর নিচ্ছেন। আগামী কাল থেকেই তিনি অবসর নেবেন। কাজেই তাঁর জায়গায় একজন লোক নেওয়া হবে। আয়ানের বুকে একটু আশা এল। হেডমাস্টারমশাই তাকে ভালোবাসেন। সে স্কুলে তার প্রিয় ছাত্র ছিল। এখনও যোগাযোগ আছে। আর কেরানির জন্য তো মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী পাস দরকার। হায়ার সেকেণ্ডারীতে তার রেজাল্ট তো ভালোই

আছে। কাজেই তার এ চাকরিটা নিশ্চয় হয়ে যাবে। তাই সুভাষবাবুর বাড়ি থেকে পড়িয়ে বাড়ি না ফিরে সোজা স্কুলে চলে গেল।

তখনও স্কুল আরম্ভ হয়নি। আয়ান গিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। এগারটা বাজার কয়েক মিনিট আগে হেডমাস্টারমশাই এলেন। আয়ান ঢুকবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু তার আগেই প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই প্রেয়ারের জন্য লাইন করে দাঁড়াল। আয়ান অফিস ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল। প্রেয়ারে যোগ দিল না। সে যখন এই স্কুলে পড়ত তখনও রোজ এরকম প্রেয়ার হত। সে অন্যান্যদের সঙ্গে দাঁড়াত। শেষের দুবছর তো তাকে নিয়মিত সামনে দাঁড়াতে হত জয় হিন্দ্ বলার জন্য। তখন চোখে কত স্বপ্ন ছিল, তখন বুকে কত আশা ছিল, আর তাই মুখে কত ভাষা ছিল। আজ সেসব কথা মনে পড়লে আয়ানের খুব কষ্ট হয়। সেদিন আয়ান এই স্কুলের হেডমাস্টারের পদ নিতেও ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু আজ সেই স্কুলের কেরানির পদের জন্য এসে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেয়ার হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের ক্লাসে চলে গেল। মাস্টারমশাইরা টিচার্স রুমে ফিরে এলেন। হেডমাস্টারমশাই এসে ঢুকলেন তাঁর অফিসে। আয়ান ঢুকতেই তিনি বসতে বললেন। হাজিরা খাতা এল। কোন্ মাস্টারমশাই এসেছেন, কে আসেননি ; তাঁর জায়গায় কাকে দিতে হবে সেটা শেষ হলে আয়ান কথাটা তুলল। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই কোনরকম আগ্রহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'তুই কেরানির কাজ করে কি করবি? মাস্টারের পোস্ট খালি হলে কথা ছিল।' আয়ান বলল, 'স্যার, আপনি তো জানেন আমাদের আর্থিক অবস্থা। আর বেকার বাড়িতে বসে আছি। খুবই দরকার।' হেডমাস্টারমশাই এর উত্তরে কিছু বললেন না। শুধু বললেন, 'এই তো সুভাষবাবু সামনের বার বি. টি. পড়তে যাবেন, তখন দেখব চেষ্টা করে।' আয়ান বলল, 'স্যার, সে তো অনেক দেরি। এটা কি হবে না!' হেডমাস্টার চিন্তিত হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অন্য কথা আলোচনা করতে লাগলেন। যেমন, সোসাইটির কাজটা ভাল, স্কুলে মাস্টারমশাইরা ঠিকমত পড়ান না, কলকাতায় স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম ভালো চলছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। আয়ান বুঝতে পারল হেডমাস্টারমশাইয়ের নেওয়ার ইচ্ছা নেই। সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। টিচার্স রুমে রহমান সাহেবের খোঁজ করল। কিন্তু তিনি নাকি আজ স্কুলে আসেননি। আয়ান বাড়িতেই গেল। তাঁর স্ত্রী জানালেন যে, তিনি বহরমপুর গিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় ফিরবেন। আয়ান ফিরে এল। নাসিরের বাড়িতে সাইকেলটা দিয়ে এল।

আয়ান এসে খেতে বসেছিল। হঠাৎ তার মেজভাই এসে বলল, 'আপনি নাসিরের বায়েকে চড়হ্যা ব্যাড়ান?' হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আয়ানের মনটা বড় বিক্ষিপ্ত ছিল। সে মেজভাইয়ের কথা শুনতে পেল না। কিন্তু মেজভাই আবার বলল, 'আপনি নাসিরদের বাড়িতে পোড়্যা থাকেন?' আয়ানের এবার খেয়াল হল যে, তার মেজভাই তাকে কিছু বলছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছিস?' সে বলল, 'আপনার লাগ্যা আমাধেরকে কথা শুনতে হোলো। নাসিরের বাবা আমাধেরকে যা-তা বুললো।' আয়ান ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?' মেজভাই বলল, 'আপনি নাসিরধের বায়েক লেন ক্যানে?' 'কেন? তার কি হয়েছে?' 'তার লাগ্যা আমাধেরকে যা-তা বুললো।' এইভাবে কথা

চলতে লাগল। তা থেকে আয়ান জানতে পারল যে, আজ তাদের বিলের জমিতে ঢুকে একটা বাচ্চা ছেলে ধান ছিঁড়ছিল। তার মেজভাই সেটা দেখে ছেলেটাকে গিয়ে ধরে। সে ধান সমেত ছেলেটাকে ধরে নিয়ে আসছিল। ছেলেটা তখন কাঁদতে শুরু করে। ছেলেটাকে তার মেজভাই গোটা দু-এক থাপ্পড় দিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু সে কথা সে বলল না। সে বলল, ছেলেটা ছিল নাসিরের চাচাতো ভাই। তার কান্না শুনে নাসিরের বাবা ছুটে আসে। সে মেজভাইয়ের কাছ থেকে ছেলেটাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেয়। আর কিছু কথাও শুনায়। সে বলে, 'তোর বড়ো ভাই যে আমার বাড়ি যায়্যা পোড়্যা থাকে। আমার বায়েক লিয়্যা চড়হ্যা ব্যাড়ায় তা দেখতে পাস না?' আর দুট্যা ধান ছিঁড়েছে তা দেখতে পায়্যাছিস!' কথাগুলো মেজভাইয়ের খুব সম্মানে লেগেছে। সে বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলেছে। আর আয়ান ফিরতেই তার কাছেও এসে হাজির হয়েছে। তার মতে ওরা ধানও চুরি করল, আবার কথাও শোনাল। এটা শুধুমাত্র আয়ানের জন্য। আয়ান যদি ওদের সাইকেল না নিত, তাহলে তো ওদের কথা শুনতে হত না। যুক্তিটা আয়ান অস্বীকার করতে পারল না। নাসিরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। নাসির বলেছে, তাই সে সাইকেলটা নিয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য যে এরকম একটা বাজে ব্যাপার হবে আয়ান বুঝতে পারেনি। আয়ানের মনে পড়তে লাগল যে, সে পরের কথা শুনবে না বলে অপরের পয়সায় ডাক্তারি পড়তে চায়নি। আর আজ সাইকেল নিয়ে প্রাইভেট পড়াতে যাওয়ার জন্য কথা শুনছে। আয়ান আর ভাত খেতে পারল না। সে থালা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। মা মেজভাইকে বকতে লাগল, 'যেন এখুনি না বুললে আর চোলছ্যোলো না। যা, বাইরে যা'। মেজভাইকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে মা তাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আয়ান বলল, 'এমনিতেই আজ খেতে দেরি হয়ে গেছে। তাই এখন থাক। রাতে একসঙ্গে ভালো করে খাব।' মা আর কথা বাড়াল না। আয়ান আবার বেরিয়ে পড়ল। বিকেল হয়ে এসেছে। সন্ধ্যাবেলায় রহমান মাস্টার ফিরবেন। ওনার সঙ্গে আয়ান একবার কথা বলতে চায়। আয়ান মাকে বলল, 'আজ সফিউলদের বাড়ি যাব, রাত্রে নাও ফিরতে পারি।' মাকে বলে আয়ান বেরিয়ে পড়ল।

আয়ান যখন রহমান সাহেবের বাড়ির কাছে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রহমান সাহেব সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছিলেন, তাই খাওয়া-দাওয়া করে তিনি বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। আয়ানকে দেখে তিনি বসতে বললেন। তাদের গ্রামের খবর নিলেন। নাসিরের খবর নিলেন। তার বাবা ইব্রাহিমের খবর নিলেন। তারপর তার নিজের খবরে এল। আয়ান তখন রেজিস্ট্রি অফিস আর সোসাইটির চাকরি না হওয়ার কথা বলল। তারপর কথা প্রসঙ্গে স্কুলের রমেনবাবুর অবসরের ফলে যে কেরানির পোস্টটা খালি হচ্ছে সেটার কথা তুলল। আয়ান বলল, 'আপনি চেষ্টা করলে বোধ হয় আমার হয়ে যাবে।' রহমান সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না হে, আমি চেষ্টা করলেও হবে না। কালুবাবুর ছেলের সঙ্গে হেডমাস্টারের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে জান তো?' আয়ান এটা জানত। সে বলল, 'তাতে কি হয়েছে স্যার?' রহমান সাহেব বললেন, 'তাতেই সব হয়েছে। হেডমাস্টার চাচ্ছেন, কালুবাবুর ছোট ছেলেটাকে ওখানে নেওয়া হোক।' আয়ান এবার সকালে হেডমাস্টারমশাইয়ের কথাবার্তাগুলো যেন বুঝতে পারল। রহমান সাহেব বললেন, 'উনি তো পাকা লোক। সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে সব মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন। রমেনবাবু অবসর নিচ্ছেন, এটা আগে থেকেই তো

জানতেন। আমরা অনেক পরে জেনেছি। তাই আমি চেষ্টা করলেও এখন আর হবে না।' আয়ানও বুঝতে পারল যে, সত্যি আর হবে না। সেক্রেটারী কালুবাবুর বিশেষ পরিচিত। তার ওপর হেডমাস্টার চাচ্ছেন। কাজেই কালুবাবুর ছোট ছেলেরই হবে। আয়ানের আর ভালো লাগছিল না। সে রহমান সাহেবের সঙ্গে আর কয়েকটা কথা বলে উঠে পড়ল।

রাস্তায় এসে তার মনে হল যে, সফিউলের বাড়ি যেতে হবে। সে হাঁটতে লাগল। সম্প্রতি সফিউলের বিয়ে হয়েছে। হয়েছে মানে জোর করে দেওয়া হয়েছে। সফিউলের মা যখন মারা গিয়েছিল আয়ান পলাশপুরে ছিল তখনই। তাই শেষবারের মতো দেখতে পায়নি। তার মা মারা গেলে বাড়িতে সে একেবারে একা হয়ে পড়েছিল। গ্রামের প্রান্তে অতবড় বাড়িতে এক জনের পক্ষে থাকা খুবই কঠিন। তাই তার বড়দি এসে বললেন যে, বিয়ে দিয়ে তবে তিনি যাবেন। সফিউলের অত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দিদি তা শুনতে রাজি হলেন না। আর তার দিদির যুক্তিতে জোর ছিল। সে তা অস্বীকার করতে পারল না। ফলে মেয়ে দেখা চলতে লাগল। আয়ানেরও ডাক পড়েছিল। ডোমকল হাইস্কুলে বিনা পয়সায় মাস্টারি করার সময় সে একটি মেয়ে দেখেছিল। সে সেখানেই সম্বন্ধ কবল এবং শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটির সঙ্গেই সফিউলের বিয়ে হয়ে গেল। সফিউল এখনও আয়ানের মতোই বেকার। তবে তার কয়েক বিঘে জমি আছে। কোনরকমে চলে যায়। আয়ানের সঙ্গে সেদিন দেখা হতেই আয়ান দু-একটা টিউশনি যোগাড় করে দেওয়ার জন্য বলেছিল। আয়ান নিজের জন্য বলতে পারে না, সফিউল তার জন্য হয়তো বলতে পারবে। এই ভরসা নিয়েই আয়ান বলেছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। আয়ান ভাবল, তার আপাতত চাকরি তো হচ্ছে না। তাই টিউশনি যদি দু-চারটে যোগাড় হয়। সে হাঁটতে লাগল। কিন্তু গিয়ে দেখল সফিউল বাড়িতে নেই। বহরমপুর গিয়েছে। ওর স্ত্রী বলল, সে রাতে ফিরে আসবে। আয়ান অপেক্ষা করতে লাগল। সফিউলের স্ত্রী রান্না চড়িয়ে দিল। রান্না শেষ হবার আগেই সফিউল চলে এল। আয়ানকে দেখে সে খুব খুশি। সে বলল যে, সারাংপুরের হাই মাদ্রাসা থেকে এবার একজন শিক্ষক বি. টি. পড়তে যাচ্ছে। সে জায়গায় ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন মাস্টার নেবে। ওদের স্কুলের রহিম মাস্টারের সঙ্গে সফিউলের বাসে দেখা। সে বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। ওরা যুগান্তর কাগজে দেবে। আর যেহেতু বিজ্ঞানের মাস্টার ট্রেনিঙে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের মাস্টারই নেবে।

সফিউল বলল, 'তোর তো বি. এস.-সি. আছে। চেষ্টা করে দেখতে পারিস।' আয়ান এতে কোনরকম আশার আলো দেখতে পেল না। নিজের স্কুলে যেখানে কেরানির চাকরি হচ্ছে না, সেখানে বাইরের স্কুলে শিক্ষকের চাকরির কথা সে ভাবতেই পারল না। তার মনে হতে লাগল, হয় সেক্রেটারীর লোক আছে, নয় হেডমাস্টারের লোক আছে। অন্তত কোন মাস্টারের বা মেম্বারের লোক থাকবে না তা হতেই পারে না। তবুও একবার দেখতে হবে। বেকার ছেলেদের চাকরির খবর থাকলে খোঁজখবর করে দেখতেই হয়। চাকরি হোক আর না হোক চেষ্টা-চরিত্র করতেই হয়। আয়ানও করবে। আয়ান ঠিক করল সে প্রথমে হেডমাস্টারের সঙ্গেই কথা বলবে। তার কাছ থেকে কোনরকম আশা পেলে তবে সেক্রেটারী বা অন্য কারও সঙ্গে দেখা করবে। সফিউল বলল, 'ওখানকার হেডমাস্টার আর সেক্রেটারী দুজনেই কংগ্রেসী।

তুই মুন্নাকে ধর। মুন্না বললেই হয়ে যাবে।' আয়ান বলল, 'তাহলে আমার আর হবে না। মুন্না তো সোসাইটির জন্যেও বলেছিলেন। হয়েছে কি?' সফিউল এর উত্তর দিতে পারল না। সে তখন অন্য প্রসঙ্গে গেল, 'মনে হচ্ছে, আমিও কোন চাকরি পাব না। আর চাষবাষ করেও চলছে না। ভাবছি কয়েক বিঘে জমি বেচে ডোমকলে একটা বইয়ের দোকান করব।' আয়ান বলল, 'তাই কর, আমি না হয় তোর দোকানেই কাজ করতে লাগব।' 'চল না একসঙ্গে করি।' 'না ভাই ব্যবসায়িক বুদ্ধি আমার কোন দিনই ভালো না, আমি দোকান করলে, বই নয় আমার দোকানও বিক্রি হয়ে যাবে।' সফিউল বলল, 'আমারও কি ব্যবসায়িক বুদ্ধি আছে? কিন্তু চাকরি তো পাব না। কিছু একটা তো করতেই হবে।' আয়ান কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সফিউলের স্ত্রী এসে খেতে ডাকল। আয়ানরা খেয়ে দেয়ে আরও খানিকক্ষণ গল্প করল। তারপর শুয়ে পড়ল।

সকাল সকাল উঠে আয়ান সুভাষবাবুর বাড়িতে টিউশনি করতে গেল। এক মাস হয়ে গেছে, আর গতকাল সুভাষবাবু বেতনও পেয়েছেন। নিশ্চয় আজ তাকেও বেতন দেবেন। কত দিতে পারে? শঙ্কর তো একা পড়ার জন্য চল্লিশ টাকা করে দিতে গিয়েছিল। মফঃস্বলে অবশ্য চল্লিশ টাকা খুব বেশি। হয়ত পঁচিশ টাকা করে দেবে। তাহলে সে তিনজনকে পড়িয়ে পঁচাত্তর টাকা পাবে। যদি তাও না দেন, কুড়ি টাকা হিসেবে তো দেবেনই। তাহলে সে পাবে তিন কুড়ি, ষাট টাকা। পড়ান শেষ হতে আয়ান এইসব ভাবছিল। কিন্তু হায়! সুভাষবাবু চারটে দশ টাকার নোট এনে তার হাতে দিল। আয়ান একদমই ভাবতে পারেনি যে, এত কম পাবে। এতদূর থেকে বাড়িতে এসে পড়ায়, তিন জনকে পড়ায়। তার জন্য মাত্র চল্লিশ টাকা! তার দরকার আছে, সে নিজে থেকে পড়াতে চায় বলেছিল বলে এত কম? অথচ শঙ্করের কাছ থেকে সে কিছু নেবে না বলেছে। ওরা একজনের জন্য, তাও আয়ানের বাড়িতে গিয়ে পড়ত, চল্লিশ টাকা দিতে গিয়েছিল। সত্যিই যাদের টাকার খুবই প্রয়োজন দুনিয়া তাদেরকে দিয়েই কম টাকায় বেশি কাজ করিয়ে নেয়। আয়ান টাকা ক'টা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড হতবাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর সুভাষবাবুর বাড়ির বাইরে চলে এল।

সারাংপুর হাই মাদ্রাসার মাস্টারিটা তার হবে বলে আয়ানের আশা নেই। কিন্তু তবুও সে চেষ্টা না করে থাকতে পারছে না। বলা তো যায় না, যদি হয়ে যায়। একটা বছর তো নিশ্চিন্ত। তাছাড়া একবার অভিজ্ঞতা হলে পরের বার কোন স্কুলে চাকরি পেতে সুবিধা হবে। তাই আয়ান ভাবল বাড়ি যাওয়ার আগে সে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে যাবে। আয়ান জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু এত দৌড়াদৌড়ি করেও প্রায় শেষ রক্ষা হচ্ছিল না। আয়ান দেখল তিনি সাইকেল নিয়ে স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। আয়ানকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখে তিনি দাঁড়ালেন। রাস্তায় ওপরেই কথা হল। আয়ান তার পরিচয় দিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য বলল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'আমরা তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক চাচ্ছি। তবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কাউকে না পেলে প্লেন বি. এস.-সি.-ও নেওয়া হবে। কিন্তু আপনার তো বি. এস.-সি.-র রেজাল্টও ভালো নয়।' অর্থাৎ পথ দেখ। আয়ান তবুও বলল, 'বি. এস.-সি.-র রেজাল্ট আমার ভালো নেই বটে। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট খারাপ নয়। হেডমাস্টার একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু ও বছরের রেজাল্ট তো কেউ গ্রাহ্যই করে না। কারণ ওবছর সবাই টুকে পাশ করেছে।' আয়ানের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। হেডমাস্টার বোধ

হয় সেটা বুঝতে পেরেই বললেন, 'আপনি দরখাস্ত করুন। আমরা ঠিকভাবে বিচার করে নেব। আপনার থেকে ভালো ক্যাণ্ডিডেট না থাকলে আপনি পাবেন। কিন্তু কোন ভালো ক্যাণ্ডিডেট থাকলে বুঝতেই পারছেন।' আয়ান বুঝতে পারল। এরপরে আর কোন কথা বলা যায় না। সে হেডমাস্টারকে নমস্কার জানাল। হেডমাস্টারমশাই প্রতি-নমস্কার করে সাইকেলে উঠে পড়লেন। আয়ান হাঁটতে লাগল। হেডমাস্টারমশাইয়ের সব কথা তার ভালো লাগেনি। বিশেষ করে তার হায়ার সেকেণ্ডারী রেজাল্ট সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তা সত্যি হলেও তাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। অথবা সত্যি বলেই এতটা দুঃখ দিয়েছে। তবে এ জাতীয় লোকেদের সুবিধা এই যে, এরা হেডমাস্টারের মত মনে এক কথা মুখে আরেক কথা বলেন না। তাহলে কি তার থেকে ভালো রেজাল্ট কেউ দরখাস্ত না করলে তাকে সত্যিই নেওয়া হবে?

আয়ান ভাবতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল। না, ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকল। আয়ান ভাবতে থাকল মাস্টারিটা পেলে সে নিয়মমতো ঠিক সময়ে স্কুলে আসবে। প্রথম মাসের বেতন পেলে মার জন্য একটা শাড়ি আর বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবী কিনবে। আর যা টাকা থাকবে তা দিয়ে সে একটা সাইকেল কিনবে। না হলে, হাই মাদ্রাসাটা তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর। পায়ে হেঁটে বেশি দিন যাতায়াত করা যাবে না। পরের মাসে ভাইবোনদের জন্য জামা-প্যান্ট কিনে দেবে। সকলেই খুশি হবে। আয়ানও খুশি হয়ে স্কুলে যাবে। আয়ান যেন দেখতে পাচ্ছে সে ধোয়া জামা-কাপড় পরে সাইকেল চড়ে স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি বলছেন, কোথায় চললেন? আয়ান একটু হেসে বলল, এই স্কুলে যাচ্ছি। ভদ্রলোকটি শুনে ভাবছেন, উনি তাহলে মাস্টার। আয়ানের প্রতি তার সম্ভ্রম ফুটে উঠছে। আয়ান সাইকেল চড়ে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ খুব জোরে সাইকেলের বেল বেজে উঠল। আয়ান চমকে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখল কালাম। কালাম হাসছে। হাসতে হাসতে কালাম বলল, 'কি ভাবছিস?' কিন্তু আয়ান যা ভাবছিল তা কি করে বলবে! আয়ান বলে কিছু পরে, 'তোর খবর কি?' কালামের আবার খবর! সে তো সেই বি. এ. পাস করেছে। তারপর আয়ানের মতোই বেকার। কালাম বলল, 'আমার কোন খবর নেই। তবে তোর একটা খবর আছে। কাগজে দিয়েছে পোস্টঅফিসে ক্লার্ক নেবে। একদম নম্বরের উপর। তোর তো হায়ার সেকেণ্ডারীতে ভালো নম্বর আছে। তাই মনে করলাম, তোকে খবরটা দেওয়া দরকার। কালকের আনন্দবাজারেই দিয়েছে।' আয়ানের খেয়াল হল কালকের কাগজটা তার দেখা হয়নি। কালাম না দেখলে সে খবরটা জানতেই পারত না। তবে তার জন্য তার খারাপ লাগল না। বরং ভালোই লাগল, কালাম তাকে খবর দিতে এসেছে। আয়ানের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য খবর দিতে এসেছে। তার মানে কালাম তাকে কত ভালোবাসে। আয়ানের খুব ভালো লাগতে লাগল। পৃথিবীতে অন্তত সে একেবারে একা নয়। অন্তত সফিউল, কালামের মতো দু-একজন এখনও তার কথা চিন্তা করে। আয়ান গিয়ে কালামের সাইকেলে উঠল। সাইকেলে চড়ে তারা দুজনে বাড়ি এল।

অনেকদিন পরে কালামকে পেয়ে আয়ানের মা খুব খুশি হল। অনুযোগ করে বলল, 'আর আসো না ক্যানে গো? ব্যাটাও নাই, বিটিও নাই যে তাধের লাগ্যা আসতে পারো না।' কালাম শুধু হাসল। সত্যিই তো তার কোন কাজ নেই। তবুও সব সময় ব্যস্ত থাকে। কোথায় কি খালি

হচ্ছে? কার কাছে যেতে হবে? কার সঙ্গে দেখা করতে হবে? এইসব করতে করতেই সময় চলে যায়। তারপর বাড়িতে এসে অসহায় বাবার খাটুনির দুমুঠো ভাত বা দুটো রুটি মুখে পুরে শুয়ে পড়া। তাই না আসার কোন কারণ সে দেখাতে পারল না। শুধু হাসল। তারপর আয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। সালমা তাদের জন্য খাবার নিয়ে এল। কালাম বসল না। খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। আয়ান সারাংপুর হাই-মাদ্রাসার ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে বিবেচিত হওয়ার জন্য দরখাস্ত লিখতে লাগল। দরখাস্ত লেখা হলে সে এবার তার মার্কশীট এবং সার্টিফিকেটগুলোর কপি করতে লাগল। এখনও দু-একটা সার্টিফিকেট বাকি আছে। সেখপাড়ার আলিম এসে দাঁড়াল। আয়ান আলিমকে বসতে বলল। কপি করা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ?' আলিম বলল, 'হ্যাঁ, আপনি তো সুভাষবাবুর ভাইবোনদের পড়াতে যান। তো আমাদের পড়াবেন?' আমাদের বলতে কাকে কাকে বলতে চাইছে আয়ান বুঝতে পারল না। না হলে সে তো নিজে থেকেই পড়াতে চায়। তাই আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তোরা মানে কে কে বল্ তো?' আলিম বলল, 'আমি, মধুপুরের আক্কাসে, যুগিন্দ্যার খালক্যা আর ভুবনডাঙ্গার ভবেন ঠিক করেছি আপনার কাছে পড়ব।' আয়ান এরকমই একটা চাইছিল। কাজেই সে সহজেই রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল, সামনে সোমবার থেকেই আয়ান পড়া৩ শুরু করবে, ছেলেরা যে কোন জায়গাতে পড়তে রাজি। তারা আয়ানের বাড়িতে আসতেও রাজি আছে। কিন্তু আয়ান নিজে থেকেই বলল, গাবতলার টালি কারখানার ঘরটাতেই পড়াবে। কারণ বৃষ্টি হলে তাদের রাস্তায় প্রচণ্ড কাদা হয়। তখন কারো পক্ষে বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। টালি কারখানাটা পাকা রাস্তার ধারে হওয়ায় সেই অসুবিধা নেই, আর তা আয়ানের বাড়ি থেকেও খুব দূরে নয়। তাই টালি কারখানাতে পড়াই ঠিক হল। আলিম কথা শেষ করে চলে গেল। আয়ান ডোমকল রওনা হল। পোস্ট অফিসের বিজ্ঞাপনটা দেখতে হবে। আর ফেরার পথে সে টালি কারখানার মালিক শ্যামাপদর সঙ্গেও একবার কথা বলে রাখবে। অবশ্য শ্যামাপদ এখন তার বন্ধু হয়ে গেছে। কাজেই কোন অসুবিধা হবে না। তবুও একবার বলে রাখা ভাল।

উনত্রিশ

সারাংপুর হাই-মাদ্রাসার মাস্টারী আয়ান পায়নি। তারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পায়নি বটে, তবে আয়ানের থেকে ভালো ছাত্র পেয়েছে। ভালো ছাত্র মানে সে বি. এস.-সি. পরীক্ষায় আয়ানের থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। ডোমকল স্কুলের কেরানি পদে কালুবাবুর ছোট ছেলে ঢুকে পড়েছে। আর তার বড় ছেলের সঙ্গে হেডমাস্টারের মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। সোসাইটির মামলার রায় এখনও বের হয়নি। কবে বের হবে, তাও ঠিক নাই। পোস্ট অফিসে আয়ান দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু সেখানেও সেই বি. এস.-সি.। আর যারা দরখাস্ত করেছিল তারা কেউই আয়ানের থেকে হায়ার সেকেন্ডারীতে বেশি নম্বর পাইনি। কিন্তু বি. এ বা বি. এস.-সি.-তে তারা আয়ানের থেকে অনেক ভালো করেছে। ফলে সব নম্বর মিলিয়ে আয়ান পায়নি। সুভাষবাবুর বাড়ি পড়ানোও আয়ান ছেড়ে দিয়েছে। চল্লিশ টাকার জন্য পাঁচ মাইল

পথ যাওয়া-আসা করে তিনজনকে পড়ানোর কোন মানে হয় না। সে এখন শুধু আলিমদের চারজনকে পড়ায় আর বাড়ির কাজ করে। আলিমদের চারজনকে পড়িয়ে সে মাসে আশি টাকা করে পায়। আজ পড়ানোর পর আয়ান শ্যামাপদর সঙ্গে গল্প করছিল।

শ্যামাপদ তার প্রায় সমবয়সী, বছর খানেকের বড় হবে। তার জন্মস্থান নদীয়া জেলার ফুলিয়া কলোনী। দেশ-বিভাগের সময় তার বাবা পূর্ববাংলা থেকে এসে ওখানেই ঘর বেঁধেছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। শ্যামাপদ যখন বি. এস.-সি পড়ে তখন তার বাবা মারা যান। তাই আর পড়া হয়নি। আয়ানের মতোই সেও চাকরির জন্য অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। আর্মিতে লাইন দিয়েছিল, কিন্তু হয়নি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ঢুকেছিল তার মামার টালি কারখানায়। দু-তিন বছর সে এখানেই আছে। তার মামা অন্য কাজে এখন কারখানা ছেড়ে দিয়েছে। সে-ই এখন কারখানার মালিক। এখানে এসেও সে কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করেছিল। পায়নি। তবে আপাতত চাকরির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তার কারখানাতে সারা বছরে যা কাজ থাকে তাতে গড়ে মাসে দু-আড়াই হাজার টাকা রোজগার হয়। এইসব কথাই আয়ানরা আলোচনা করছিল। শ্যামাপদ বলেছিল যে, কোন কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে জমা দিলে সরকার শিক্ষিত বেকারদের পঁচিশ হাজার পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করছে। তাই শুনে আয়ান একদিন বহরমপুর গিয়েছিল শিল্প অধিকারিকের অফিসে। খোঁজ নিয়ে দেখল শুনতে যত সোজা, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এত বেশি ফ্যাকড়া যে, তার মতো সাধারণ ঘরের ছেলেদের পক্ষে সে সহযোগিতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। শ্যামাপদ কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আয়ানের বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল। এসেই ইব্রাহিম আয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলল যে, তাদের পাড়ার জামালকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। আয়ান ব্যাপারটা জানার জন্য বাবার সঙ্গে বাড়িতে এল।

জামালকে পুলিশে ধরার ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। কারণ সে খুবই নিরীহ ছেলে, মুনিষ খেটে খায়। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। কারও সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করে না। তাকে কেন যে হঠাৎ করে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল তা কেউ বুঝতে পারছে না। আয়ান পাড়ায় ফিরে দেখল জামালের মা কান্নাকাটি করছে। আর মাঝে মাঝে খালেক বিশ্বাসকে শাপ-শাপান্ত করছে, 'আল্লা ভালো কোরবে না। ঐ মুখে কুড়ি হবে, পুকা পোড়বে। বাপের মতো অধরাঙ্গ হবে। আমার ছেল্যাডাকে শুদু শুদু ধরিয়্যা দিলো। আল্লা ভালো কোরবে না।' জামাল এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে বাঁধা 'কিসম্যান' ছিল। দুবেলা খেত আর মাসে ষাট টাকা বেতন পেত। জামাল বেতন বাড়াতে বলেছিল। কিন্তু খালেক বিশ্বাস বাড়াতে চায়নি। তাই জামাল তার কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন মুনিষ খাটে। জামালের মার ধারণা খালেক বিশ্বাসই রাগে রাগে জামালকে ধরিয়ে দিয়েছে। গতকাল রাতে নাকি কে বা কারা তার পুকুরের ধরা মাছ চুরি করে নিয়েছে।

বর্ষাকালে ছাগলখালির বিল জলে ভর্তি থাকে। শরৎকালের দিকে জল কমতে থাকে। আর গরমকালে তা একবারে শুকিয়ে যায়। তখন একমাত্র পুকুরগুলোতে জল থাকে। সারা বিলের মাছ তখন এই পুকুরগুলোতে জড় হয়। যে পুকুর যত গভীর হয় সেখানে তত বেশি মাছ আশ্রয় নেয়। তাই গ্রীষ্মের সময়, যখন বিলে জল থাকে না তখন লোকেরা তাদের জমির

পুকুরগুলো গভীর করে রাখার চেষ্টা করে। বর্ষাকালে বিলের মাছ সেখানে আশ্রয় নেয়। তারপর জল শুকোতে শুকোতে পুকুরের পাড় জেগে গেলে, সেই পুকুরের জল থেকে সব মাছগুলোকে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দিকে সব থেকে কম জল সেচতে হয় বলে তখনই এই জাতীয় মাছ ধরা হয়। খালেক বিশ্বাসের পুকুরও এই বিলে আছে। তার জল থেকে মাছ ধরা হয়েছিল। তবে সে মাছ বিক্রি করবে বলে বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে পুকুর পাড়েই একটা গর্ত করে জল দিয়ে মাছগুলো রাখা হয়েছিল। পুকুরের পাড়ে ত্রিপল খাটিয়ে পাহারাও ছিল। তবু নাকি রাত্রিবেলায় কারা তার মাছ চুরি করে নিয়েছে। জামালের মার ধারণা খালেক থানায় গিয়ে তার ছেলের নামে ডায়েরী করেছে।

আয়ান থানায় গিয়ে দেখল যে, জামালের মার অনুমান ঠিক। জামালকে খালেক বিশ্বাসের মাছ চুরি সন্দেহেই ধরা হয়েছে। সে খালিগায়ে হাজতের মধ্যে চুপ করে বসে আছে। আয়ান অবশ্য প্রথমেই থানাতে আসেনি। সে প্রথমে রহমান মাস্টারের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু রহমান মাস্টার বললেন, 'আমরা তো এখন ক্ষমতায় নেই। কাজেই আমাদের কথা শুনবে না।' সেকথা শুনে আয়ান নিজেই এসেছিল, এসে থানায় উঠে দেখল কেউ নেই। শুধু হাজতে জামাল বসে আছে, আর ওদিকের একটা ঘরে একজন লোক একটা বাক্সের সুইচ টিপে টিপে বলছে, 'কনট্রোল ফ্রম ডোমকল, কনট্রোল ফ্রম ডোমকল, ক্যান ইউ রিড মি? ওভার।' ওয়্যারলেস অপারেটর হবে বোধ হয়। আর কাউকে না পেয়ে আয়ান তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও. সি. কোথায় আছে বলতে পারেন?' লোকটি আয়ানের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ওদিকে সেন্ট্রি আছে, জিজ্ঞেস করুন।' আয়ান তখন রেজিস্ট্রি অফিসের দিকটা থেকে পোস্ট অফিসের দিকে এল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। আয়ান বুঝল, থানায় কেউ নেই দেখে সেন্ট্রি নিশ্চয় কোথাও শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আয়ান আবার লোকটির কাছে এসে বলল, 'ওদিকে কেউ নেই।' লোকটি বিরক্ত হল। এবং সে বিরক্তি প্রকাশে কোনরকম দ্বিধা না করে বলল, 'ভিতরে বসুন, এক্ষুণি আসবে।' আয়ান এসে ভেতরে বসল।

বেলা তখন পড়ে এসেছে। একজন পোশাক পরা লোক উত্তরের ব্যারাক থেকে একটা রাইফেল নিয়ে এগিয়ে এল। দরজার কাছে এসে আয়ানকে দেখে বলল, 'আপনি কে? কাকে চান?' আয়ান বলল, 'আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' আয়ান একাই কথা বলছে। কারণ নাদের মণ্ডল বা জামালের বাবা যারা তার সঙ্গে এসেছে তারা কেউ কিছু বলছে না। আয়ানের কথা শুনে পোশাক পরা লোকটি বলল, 'কিন্তু বড়বাবু তো এখন বাসায়। সন্ধ্যার আগে আসবেন না।' আয়ান বলল, 'একটু খবর দেবেন দয়া করে?' লোকটি রাইফেলটা নিয়ে চলে গেল। আয়ানরা থানার মধ্য বসে থাকল। ঘন্টা খানেক বাদে বড়বাবু এলেন। বোধহয় অসময়ে ডাকের জন্যই মেজাজ পঞ্চমে।

থানায় ঢুকেই তিনি বললেন, 'তোমরা কেন এসেছ?' অপরিচিত লোকের কাছ থেকে এরকম সম্বোধন আয়ানের পছন্দ হল না, তবুও এই বলে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল যে, বড়বাবুর বয়স তার থেকে অনেক বেশি। বড়বাবু আবার বলল, 'তোমরা থানায় কেন এসেছো' আয়ান বলল, 'আমাদের গ্রামের একজন ছেলেকে ধরে এনেছেন।' বড়বাবু একটু উদাসীনভাবে বসে উঠলেন, 'ধরা তো পড়বেই, চুরি করলে ধরা পড়বে না?' আয়ান বলল, 'কিন্তু ও তো

কিছু চুরি করেনি।' বড়বাবু আসার আগেই আয়ান জামালের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। আয়ান জিজ্ঞেস করতেই জামাল কাঁদতে লেগেছিল, 'বিশ্বাস কোরুন ভাই, আমি কিছু কোরিনি। আল্লারই কিরে আমি মাছ চুরি কো রি নি।' জামালের সঙ্গে কথা বলে আয়ান নিশ্চিত ছিল যে, সে মাছ চুরি করেনি। খালেক বিশ্বাস সত্যিই শয়তানি করে ওর নাম দিয়ে দিয়েছে। মাছ চুরির ঘটনাটাও বানানো হতে পারে। তাই আয়ান বলল, 'আপনি খোঁজ-খবর করে দেখুন। ও মাছ চুরি করেনি।' বড়বাবু ওদিক দিয়েই গেলেন না। তিনি বললেন, 'কিন্তু খালেক বিশ্বাস ওর নামে ডায়েরী তো করেছে।' 'কিন্তু সে ডায়েরী সত্যি কিনা তা কি আপনি তদন্ত করে দেখেছেন? খালেক বিশ্বাস যদি কাল আমার নামে ডায়েরী দেয় তাহলে আপনি কি আমাকেও ধরে নিয়ে চলে আসতেন?' বড়বাবু রেগে গেলেন, তিনি টেবিলের ওপর থাবা দিয়ে বললেন, 'আমি কি করব না করব, সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে?' নাদের মণ্ডল আয়ানের হাত ধরে বলতে লাগল, 'আয়ান থামো।' কিন্তু আয়ান থামল না, সে বলল, 'আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিলে তো আমি যখন ডায়েরী করেছিলাম তখনই ধরতেন। চোরের কাছে তখন চুরির মাল পর্যন্ত ছিল, কিন্তু আপনারা ধরলেন না। ঐ খালেক বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে চলে এলেন। আর আজ খালেক বিশ্বাস মিথ্যা করে একটা ডায়েরী দিয়েছে আর আপনারা একটা নির্দোষ ছেলেকে ধরে এনেছেন।' বড়বাবু এবার চিৎকার করে উঠলেন, 'কে দোষী, কে নির্দোষ আমি তোমার কাছে শিখব?' আয়ান মনে মনে বলল, 'তুমি কি আর এভাবে শিখবে? তুমি শিখতে, যদি তোমাকে একটা বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা যেত'। তার মনে হল ব্যাপারটা এস. পি.-কে জানানো দরকার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তাতে কোন লাভ হবে না, শ্যামাপদর টালি কারখানার লাইসেন্সের জন্য তাকে আয়ান খোদ ডি. এম. এর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। জেলা-স্তরে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আসরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই সূত্রেই আয়ান তাঁর কাছে শ্যামাপদকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি পাঠিয়েছিলেন তাকে এ. ডি. এম-এর কাছে। আর এ. ডি. এম তার এক কেরানির কাছে। সে আয়ানদের একটা ফর্ম দিয়েছিল। শ্যামাপদ সে ফর্ম পূরণ করে, ফি-সমেত জমা দিয়েছিল। কিন্তু একমাস গেল, দুমাস গেল, বছর গেল, লাইসেন্স হল না। শেষে শ্যামাপদ সেই কেরানিবাবুর কথামতো তাঁর বাড়িতে গিয়ে পাঁচশ টাকা ঘুষ দিয়ে এল। এক সপ্তাহের মধ্যে লাইসেন্স হয়ে গেল। তাই এম. পি.-কে জানিয়েও লাভ হবে না। তাছাড়া এম. পি.-কে অফিসে পাওয়াও মুশকিল। কলেজে পড়ার সময়ই আয়ান দেখেছে যে, তিনি অফিসের চেয়ে বেশি সময় সাত্তার সাহেবের বারান্দায় থাকেন। সাত্তার সাহেব জেলা থেকে মন্ত্রী। অতএব তিনি ঠিক থাকলেই জেলা ঠিক আছে। অতএব যা করতে হবে এখনই করতে হবে। তাই আয়ানের মনে হল রাগরাগি করে লাভ হবে না, তাকে সংযত হয়েই কথা বলতে হবে। আয়ান এবার আস্তে বলল, 'আপনি দয়া করে রাগ করবেন না। আপনি....' তার কথা শেষ না হতেই ঘরে এসে ঢুকল ছোটবাবু। সে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, 'আয়ান, তুমি থানায়! কি ব্যাপার?' বড়বাবু বললেন, 'আপনি চেনেন ওকে?' ছোটবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সীমাদের সঙ্গে পড়ত। খুব ভালো ছেলে।' বড়বাবু রেগে গেলেন, 'ভালো ছেলে? কথাবার্তা মোটেই ভালো নয়।' সীমার বাবা এবার আয়ানের দিকে তাকিয়ে, প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?' আয়ান খুব সংযতভাবে বলল, 'আমাদের গ্রামের একটা ছেলেকে

ধরে নিয়ে এসেছেন। আপনারা খোঁজ-খবর নিন। যেভাবে খুশি, যার কাছ থেকে খুশি নিন, যদি দোষী হয় আমরা কিছু বলব না। কিন্তু যদি সে একদম নির্দোষ হয়, তাহলে ছেড়ে দিন।' সীমার বাবা বলল, 'তোমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও আমি ডাকছি।' আয়ানরা বাইরে গেল।

ঘরের মধ্যে দুই দারোগাবাবুতে কি কথা হল তা আয়ান জানে না। আধঘন্টা পরে বড়বাবু ডেকে বললেন, 'আচ্ছা আমরা জামালকে ছেড়ে দেব। তবে একজন জামিন লাগবে।'

আয়ান বলল, 'আমি জামিন থাকলে হবে?' বড়বাবু বলল, 'না একজন রেসপেক্টব্‌ল লোক লাগবে।' অর্থাৎ বড়বাবুর সংজ্ঞায় আয়ান ভদ্রলোক নয়, অন্তত শ্রদ্ধেয় লোক তো নয়ই। সে আর কথা বাড়াল না। থানা থেকে সোজা রহমান সাহেবের কাছে চলে গেল। রহমান সাহেব এসে জামিন হওয়ায় জামাল ছাড়া পেল। নাদের মণ্ডল ও অন্যান্যদের সঙ্গে সে বাড়ি চলে গেল। আয়ান এসে উঠল শ্যামাপদর টালির কারখানায়। আজকাল আয়ান এখানে প্রায়ই আসে। প্রতিদিন সকালবেলায় সে এখানে ছেলেদের প্রাইভেট পড়ায়। তখন তো আসেই। তাছাড়া অন্য সময়েও আসে। সকাল, দুপুর, বিকেল এমন কি রাত্রিবেলায়ও আসে। টালির কারখানাটা যেন তার মতো শিক্ষিত বেকার ছেলেদের মিটিঙ স্পেস হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলেই বাঘডাঙ্গা থেকে আয়ান আসে, নাসির আসে, সাদেক আসে, ভুবনডাঙা থেকে বাদল আসে, হাসান আসে, মদন আসে, একসঙ্গে বসে গান করে। কখনও তাস খেলতে বসে। ওয়ান হার্ডস থেকে ডাক উঠতে উঠতে থ্রি স্পেড, ফোর ডাইস থেকে ফোর নোট্রাম হয়ে যায়। একের পর এক বাজি খেলতে দুপুর রাত গড়িয়ে যায়। তখন যে, যার বাড়ি চলে যায়। আয়ানও যায়। তবে সে প্রতিদিন বাড়িতে যায় না। শ্যামাপদর সাথেই যা খাবার থাকে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে। তার বাড়িতে যেতে ভালো লাগে না। বাইরে ঘুরে বেড়াতেও ভালো লাগে না। বি. এস.-সি. রেজাল্ট খারাপ করার পর তার আর বাইরে যেতে ভালো লাগে না। অথচ বাড়িতে বসে থাকতে পারে না, তাই এখানে চলে আসে, আজও এল। ডোমকল থেকে বাড়ি না গিয়ে কারখানাতেই এল। এসে দেখে নাসির, বাদল, হাসান এরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ব্রিজ খেলা শুরু হয়ে গেছে। আয়ান পাশে বসে গেল।

ত্রিশ

সাত-আট মাস হয়ে গেল আয়ানের বি. এস.-সি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ফল খারাপ হয়েছে। তাই সে এম. এস.-সি পড়ার সুযোগ পায়নি। বড় বৈজ্ঞানিক হওয়ার স্বপ্ন তার স্বপ্ন হয়েই হারিয়ে গেছে। কিছুদিন সে একদম লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়িয়েছে। একসময় সে বুঝতে পেরেছে বড় রকমের কিছু করা তার জীবনে আলেয়ার মতোই অলীক হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সে ছোটখাট যে কোনরকম কাজের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে। কিন্তু হয়নি। আবার সেই বি. এস.-সি-র ফল। বি. এস.-সি-র ফল ভালো হলে তার ডাক বিভাগের কেরানির পদটা পাকা হয়ে যেত। বি. এস.-সি-র ফল ভালো হলে তার হাই মাদ্রাসার মাস্টারিটাও হয়ে যেত। বি. এস.-সি-র ফল যেন তার জীবনটাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। দুনিয়ার কোথাও যেন তার প্রবেশাধিকার নেই। কারণ বি. এস.-সি-র ফল। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে, সেই

বি. এস.-সি-র ফল! আয়ান তাদের কিছুতেই বোঝাতে পারে না, তার ফল কি করে এত খারাপ হল। আয়ান তাই এই বি. এস-সি-র ফলকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলতে হলে এমন একটা সাফল্যের দরকার যার পর আর কেউ তাকে বি. এস.-সি-র ফলের কথা জিজ্ঞেস করবে না। আর তারও মনে করার দরকার হবে না। সে যদি এখন ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আরম্ভ করতে পারত, তাহলে হয়ত বি. এস. সি-র ফলকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু আয়ানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই ঠিক করেছে সে প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। বি. এ. পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। তারপর সে ভুলে যাবার চেষ্টা করবে যে, সে কোনদিন বি. এস.-সি. পড়েছিল। কিন্তু ভালো ফল করতে হলে ভালো প্রস্তুতি চাই। আর তার জন্য অনেক বই দরকার। আয়ান তার টিউশনি করার পয়সা থেকেই কয়েকটা বই কিনেছে। সে তারই একটা খুলে দেখছিল। এই বইটা বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর ওপর।

বৈষ্ণব পদাবলী আয়ানের খুব ভালো লাগে। সমালোচকেরা এর মধ্যে আত্মা, পরমাত্মা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু আয়ানের মনে হয় যে, আসলে বৈষ্ণব কবিতা প্রেমের কবিতা। এই যে কবিতাটা— ভাবটা কত সুন্দর। কত গভীর। কৃষ্ণের বিরহ-যন্ত্রণা রাধা সহ্য করতে পারছে না। অথচ তার যে কি যন্ত্রণা তা কৃষ্ণকে বোঝাতেও পারছে না। তার যন্ত্রণা যে কত গভীর, কত সুদূরপ্রসারী, কত সুদীর্ঘস্থায়ী তা রাধা কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। কে কবে পেরেছে? যাকে ভালোবাসা যায় তার জন্য যে কি কষ্ট, কি অনুভূতি, কি যন্ত্রণা তা ভালবাসার ধনকে কেউ কোনদিন বোঝাতে পারেনি। রাধাও পারছে না। না পেরে কৃষ্ণকে বলছে যে, এবার মরে সে কৃষ্ণরূপে জন্মাবে। আর কৃষ্ণকে রাধা করবে। রাধারূপী কৃষ্ণ যখন জলকে যাবে কৃষ্ণরূপী রাধা তখন কদমডালে বসে বাঁশী বাজাবে। রাধার বক্তব্য, কৃষ্ণ তখনি কেবল বুঝতে পারবে রাধার কেমন জ্বালা। আয়ান এর মধ্যে কোনরকম তত্ত্ব খুঁজে পায় না। তার শুধুই মনে হয় এর সমস্তটাই যেন এক মানবের তরে এক মানবীর গভীর ভালবাসা। কি সুন্দর কথা—মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন/তোমারে করিব রাধা। আয়ান বার বার করে পদটা পড়ে। পড়তে পড়তে সে ভালবাসার স্বর্গলোকে চলে যায়।

আয়ানের বাবা ইব্রাহিম খোলা থেকে মুসুরির ভুষি এনে ভুষির ঘরে তুলছিল। ঢাকিটা ঘরে রেখে সে আয়ানের সামনে দাঁড়ায়। ছোন্‌চ্যাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, 'পোড়্‌হ্‌ছো? আবার পরীক্ষা দিবা?' সবাই যে বোলে ফেল্‌ ফেল্‌। তুমি কলেজের পড়্‌হায় ফেল পড়েছো?' আয়ান এক ঝটকায় ভাবের স্বর্গ থেকে বাস্তবের নরকে চলে আসে। আবার বি. এস.-সি! কিন্তু সে বাবাকে কি উত্তর দেবে! বি. এস.-সি., অনার্স—এসব বাবাকে বোঝান যাবে না। সে ফেলও করেনি। আবার পাসও করেনি। সে বলল, 'ফেল করিনি। তবে আগের মতো ভালো ফল হয়নি।' কিন্তু ইব্রাহিম কিছু বুঝল কিনা, বোঝা গেল না। সে খানিকক্ষণ বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর 'কি হয়েছে তা আমার বুঝে কি কাজ' এরকম একটা ভাব করে আবার ঢাকিটা নিয়ে খোলায় চলে গেল। আয়ান আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাগলী এসে সামনে দাঁড়ল। পাগলী খুবই বুড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। পাগলী বলল, 'ডাইডোলের সাহায্য আস্যাচে। লাতি একটা কাগোচ লেখ্যা দে।' বলেই সে বসে পড়ল। আয়ান বই রেখে একটা কাগজ বের করে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত লিখতে লাগল।

লেখা হলে পেনের কালিই পাগলীর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে দরখাস্তের ওপর একটা টিপছাপ দিয়ে আয়ান সেটা পাগলীর হাতে দিয়ে দিল। পাগলী তার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দোয়া করতে করতে চলে যেতে লাগল—'তোর ব্যাটার আল্লা দানা-পানি দেক। বাড়িতে সাতটা গোলা হোক। কোলে সাতটা পুত হোক।' আয়ানের মা তার গ্রাম সম্পর্কে শাশুড়ীর কথায় কথা জুড়ে দিল, 'ওমা, আমার ব্যাটার যে এখুনো বিহ্যাই হোল না, সাতটা পুত কি কোর্য়্যা হবে?' শাশুড়ীও কথার ওপর কথা দিল, 'তুরা ব্যাটার ভাত খাবার লাগ্যা বিহ্যা দিবি ন্যা তো কি কোর্য়ে হবে? বিহ্যা দে।' আয়ান বুঝতে পারে যে তার মার এটা বিয়ের কথা তোলার ছুঁতো। সে আয়ানের কাছে এসে বলতে লাগল, 'দেখছিস পাগলীকে। পাগলীও বোলছে যে আমি ব্যাটার ভাত খাওয়ার জন্যা বিহ্যা দিছি ন্যা। এবের তোর বি. এ. পাস হোয়ে গেলছে। এবের কিন্তু আমি বিহ্যা দিব। নূর মহাম্মদ বোলছেলো। মেয়েডা নাকি পরীর মতোন। এবার হাই ইস্কুল পাস দিয়েছে।' আয়ান বলল, 'মা, আমি একটু পড়ব।' সালমা রাগ করে চলে গেল, 'কি জানি বাপু তোর সারা জীবন শুদু পড়হা আর পড়হা।'

আয়ান আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসতে চায় না। সেই যে শবকত খালিফা লোকজন নিয়ে তাকে দেখতে এলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে তার বাবা-মা আর তার বিয়ের কথা বলত না। বছর সাতেক সে এ ব্যাপারটায় নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু এই মাসখানেক থেকে তার মা আবার শুরু করেছে। তার বাবার পেছনেও লেগেছে— ছেলের বিয়ে দিতে হবে। আয়ান মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল যে, সে এখনও চাকরি-বাকরি করছে না। তার বিয়ে করা উচিত নয়। তাতে তার মা কোন পাত্তাই দেয়নি। বলেছে, 'সে থাকবে আমার কাছে। তোর অতো খাবারের ভাবনা ক্যানে? আমরা যা খাবো সেও তাই খাবে।' আয়ান আর বোঝাবার চেষ্টা করেনি। সে কি করে বোঝাবে যে, বিয়ের ব্যাপারে তার একটা নিজস্ব ধারণা আছে। কি করে বোঝাবে যে, সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যে হবে তার মনের মতো। আর মনের মতো কাউকে সে তখনই বেছে নিতে পারবে যখন সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এসব কথা সে তার মাকে বলতে পারে না, তাই সে কেন যে এখন বিয়ে করতে চায় না তা বোঝাতে পারে না। সে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাঠ থেকে তার মেজভাই এসে দাঁড়ায়, 'বাবজী শুদাতে বুললো, তালতালার ভুঁইয়ে পাট এখুনি বুনে দিবে, না ছ্যাচের পানি লিয়্যা বুনবে?' আয়ান বই রেখে ভাবছিল কি বলবে। এখন বুনলে আইখোর হবে। তবে পাটের চারা রস কম থাকার জন্য কম বেরুতে পারে। তাহলে পাতলা হয়ে যাবে। ফলন কম হবে। কিন্তু সেচ দিয়ে বুনলে যথেষ্ট রস থাকবে। কাজেই সব বীজ থেকে চারা বের হবে। কিন্তু পাটটা নামলা পড়ে যাবে। কেটে বোরো ধান লাগাতে দেরী হয়ে যাবে। আয়ান ভাবছিল সে কোন্‌টা করতে বলবে। কিন্তু কিছু ঠিক করার আগেই গ্রামের চৌকিদার জংলী এসে হাজির হল।

জংলী আয়ানের মাকে বলল, 'আজ রাইতে মুঝাদের খো-ল্যানে জামালের নামে ডায়েরী করার বিচ্যার হবে। বড়ভাইকে যাত্যা বুলো।' এরপর আয়ানের কাছে এসে বলল, 'মুন্‌ডোল তুমাকেও যাত্যা বুল্যাছে বাপ।' মুনডোল মানে নাদের মন্ডল। নাদের মন্ডল এখন সব কিছুতেই

তাকে থাকতে বলে। মিটিঙ হোক, মজলিস হোক তাকে কাছে ডেকে বসাবে। তারপর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, 'আমি আর কতোদিন আছি বাপু। তুমরা একটু বুঝেসুঝে ল্যাও। পাড়াপোড়শি এই অবুঝগুলানকে তুমাধেরকেই এখুন আগ্‌ল্যা লিয়ে থাকতে হবে।' তার মনের ইচ্ছে যে, মোড়লীর ভারটা আয়ানের হাতেই দিয়ে যান। নাদের মণ্ডল এটা তাকে ভালবেসেই বলে। কিন্তু আয়ানের ওই মোড়লী ভালো লাগে না। সে তো মাত্র এই গ্রামের মোড়ল হয়ে থাকতে চায় না। তাছাড়া বিচার করা বড় শক্ত। কোন বিরোধে যত নিরপেক্ষ ভাবেই মত দেওয়া যাক, সব সময় মনে হয় ঠিক করলাম তো ; সব সময় মনে হয়, কারো প্রতি অন্যায় করলাম না তো! বাড়িতে এসেও শান্তি পাওয়া যায় না। বার বার মনে হয়, ঠিক নিরপেক্ষভাবে হয়েছে তো! এখন আয়ানের আর কোন কাজে মন লাগে না। অথচ নাদের মণ্ডল ঠিক তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কি কোরবো বলো, তুমার কি মুনে হয়?' আয়ান ঠিক করল আজ সে কিছুতেই মজলিসে যাবে না। সে শ্যামের টালি কারখানায় চলে যাবে। কিন্তু ওখানে ডাকতে লোক পাঠাবে। সে সফিউলের বাড়িই চলে যাবে।

আয়ান বেরিয়ে পড়ল। সে সফিউলের বাড়ি চলে যাবে। তার মনে হতে লাগল, এই বাড়িতে থেকে তার কিছুতেই পড়াশোনা হচ্ছে না। এখানে থাকলে তার পড়াশোনাও হবে না। তার বি. এ. পাস করাও হবে না। এখানে থাকলে সে পাকাপোক্ত চাষী হয়ে যাবে। সে পাড়ার মোড়ল হয়ে যাবে। কিন্তু সে কিছুতেই ওরকম হবে না। অথচ আশ্চর্য, এই বাড়িতে থেকেই সে সারা স্কুল-জীবন পড়াশোনা করেছে। আর তখন সে খুব ভালো ফল করেছে। কলেজ-জীবনেরও অনেকটা সে এই বাড়ি থেকে করেছে। অবশ্য কলেজে সে পড়াশোনা করেছে বলা চলে না। কলেজে যাতায়াত করেছে। পড়াশোনা সে যা করেছে তা স্কুলেই। আয়ান বুঝতে পারে তখন তাকে কেউ পাঁচ কাজে টানাটানি করত না। তার একটাই কাজ ছিল, পড়াশোনা করা। গরু চরান বা ঘাস কাটা.যে সামান্য কিছু কাজ তাকে করতে হত তাকে সে কোনদিনই কাজ মনে করেনি। পড়তে যেতে হলে ওগুলো করে যেতে হবে। তাই করত। ফলে ঐ কাজগুলো আয়ান তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে লেখাপড়ায় লেগে যেত। তাই তার একটি মাত্র কাজ ছিল—লেখাপড়া। সেইজন্যই তখন তার লেখাপড়া হয়েছে। কিন্তু এখন সে সবরকম ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। কারো লোনের দরখাস্ত লিখতে হলে তার কাছে আসছে। কারো রেশন কার্ড হারিয়ে গেলে তার কাছে আসছে। কারো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার হলে তার কাছে আসছে। পাড়ায় কোন ঝামেলা হলে মেটানোর জন্য তার কাছে আসছে। বাড়ির কোন্ জমিতে এবার কি বোনা হবে তার জন্য তার কাছে আসছে। মজলিস ডাকা হলে নাদের মণ্ডল তার কাছে আসছে। সবাই মিলে এত বেশি করে তাকে টানাটানি করছে যে, তার পড়াশোনা করার কোনরকম সুযোগ হচ্ছে না। অতএব পড়াশোনা করতে হলে তাকে এসব ছাড়তে হবে। ছোটখাট একটা কাজ পেয়ে গেলে সুবিধা হত। কিন্তু পেল না। বাধ্য হয়ে তাকে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, আর সব ঝামেলাগুলোও পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর এসে জুটেছে তার বিয়ের প্রস্তাব। তার মা উঠে-পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রস্তাব আসছে। কিন্তু আয়ান কিছুতেই বিয়ে করবে না। দরকার হলে সে আবার পালাবে।

ডোমকলে এসে আয়ান বৈদ্যনাথ ফার্মেসীতে উঠল। সফিউলের বাড়িতে যাওয়ার আগে সে খবরের কাগজটা দেখে নিতে চায়। কিন্তু কাগজটা তখন একজন অপরিচিত লোক পড়ছে। আয়ান বেঞ্চটার ওপর চুপ করে বসে থাকল। লোকটি কাগজটা রাখতেই আয়ান তুলে নিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপনের পাতাটা খুলল। তারপর বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় গিয়ে তার চোখ আটকে গেল। ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন। খানাকুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াবার জন্য মুসলমান গৃহশিক্ষক চাই। থাকা-খাওয়া, একশ টাকা। যোগাযোগ করুন—নিউ ইন্ডিয়া বেকারী, ১২ ফুলবাগান রোড, কলিকাতা-১৪। আয়ানের মনে হল, এই একটা সুযোগ। বাড়িতে থাকা-খাওয়া এবং মাইনে দিয়ে মাস্টার রেখে যখন ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছে তখন নিশ্চয় বেশ শিক্ষানুরাগী লোক হবে। বাড়িতে কিছু বইপত্তর থাকবে। আর কাছাকাছি স্কুল-কলেজ তো থাকবেই। কলেজ না থাক, ছেলেমেয়েরা যখন পড়ছে, স্কুল থাকবেই। তাহলে আয়ানের বইয়ের অভাব হবে না। আবার মাসে মাসে একশ টাকা করে পাবে, তাতে সে কিছু বইও কিনতে পারবে। সব থেকে সুবিধা হবে সেখানে তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। সে পড়াশোনা করতে পারবে। সে একটা চিঠি লিখে কলিকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল। তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে প্রাইভেটে পড়িয়ে সে শ-দুয়েক টাকা জমিয়েছিল, তা তুলে নিল। আয়ান ঠিক করল সে চলে যাবে। শুধু তার একমাত্র ভয় হল, যদি ওরা তাকে না নিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে নেয়। সেক্ষেত্রে তাকে তো আবার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু আয়ান ঠিক করল, সে ফিরে আসবে না। অন্য কোথাও কোন না কোন কাজ যোগাড় করার চেষ্টা করবে। আপাতত তো তার কাছে দু'শ টাকা থাকছে। ঠিক করল সে কালই রওনা হয়ে যাবে।

আয়ান আর সফিউলের বাড়ি গেল না। সে শ্যামের টালির কারখানায় এসে শ্যামের সঙ্গে একান্তে কথা বলে নিল। আয়ান শ্যামকে জানাল যে, সে এরকম একটা কাজ নিয়ে যাবার কথা ভাবছে। কি হয় গিয়ে তাকে চিঠি দিয়ে জানাবে। তবে সে ঠিকানা শ্যাম যেন কাউকে না দেয় বাড়ির খবরাখবর সে শ্যামের কাছ থেকেই নেবে। শ্যাম তার কথায় রাজী হয়ে গেল। আয়ান তখন বাড়িতে এসে তার কয়েকটা বই একটা টিনের বাক্সে ভরে তার মাকে বলল যে, সে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। কবে ফিরবে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে।

পরের দিন সকালে উঠে সে বাসের জন্য রওনা হল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘডাঙা গ্রামটাকে তার অনেক সুন্দর, অনেক আপন মনে হল। আজ কুড়ি-বাইশ বছর সে এখানে আছে। কিন্তু কাল সকালে সে আর এখানে থাকবে না। সে জানে না আবার কবে এখানে, এই গ্রামের মাটিতে ফিরে আসবে। তার মার জন্য মন খারাপ করতে লাগল, তার বাবার মুখটা মনে পড়তে লাগল। ভাইবোনগুলোর কচি কচি মুখগুলো মনে পড়তে লাগল। সে জানে না আবার কবে তাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে। সে এম. এস.-সি. পড়তে চেয়েছিল। বড় বৈজ্ঞানিক হতে চেয়েছিল। তার জন্যও ঘর ছাড়তে হত। কিন্তু সে আজ ঘর ছাড়ছে একশ টাকা বেতনের এক গৃহশিক্ষকের কাজের জন্য। অবশ্য সেটাও সে পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। আয়ান বাস ধরার জন্য হাঁটতে লাগল। পেছনে পড়ে থাকল বাঘডাঙা। পায়ের ধাপে ধাপে সে দূরে সরে যেতে লাগল।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

বেলা প্রায় ন'টা হয়েছে। আয়ান সিমেন্টের বেঞ্চটার ওপর উদাসভাবে বসে আছে। স্কুলে যেতে হবে। তাই ছাত্রছাত্রীরা চলে গেছে। কবির সাহেবেরও স্কুল আছে। তিনি জামা-কাপড় পরে খেতে বসেছেন। আজ শুক্রবার। মসজিদে জুম্মার নামাজ আছে। ওস্তাদজী তাঁর গামছা আর টুপিটা নিয়ে গোসোল করতে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি আজান দিতে হবে। আয়ানের দুটোর একটাও নেই। তার খাবারও এখন আসেনি। তার স্নান করারও তাড়া নেই। ভালো লাগছে না। সেই সকালে রশিদ সাহেবের ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসেছিল। ঘন্টা তিনেক রীতিমতো লড়াই করে উঠেছে। কিন্তু তাতে পড়া কতটুকু হয়েছে তা আয়ান জানে না। শত চেষ্টা করেও আয়ান রশিদ সাহেবের ছেলে মুরসালিন এবং মেয়ে মমতাজকে ঠিকমত পড়াতে পারছে না। এরা কি করে যে সেভেন-এইট পর্যন্ত উঠল, সেটাই আয়ানের কাছে পরম আশ্চর্য লাগে। ছেলেটির বয়স চৌদ্দ। সেভেনে পড়ে। ভগ্নাংশ, লসাগু, গসাগু দূরে থাক, গুণ-ভাগও জানে না। শেখালেও যেদিন শিখবে তার পরের দিনই সব ভুলে বসে থাকবে। ইংরেজির কথা না তোলাই ভাল। সে বাংলাও ভালো করে রিডিং পড়তে পারে না। তাকে ভূগোল, ইতিহাস বা বিজ্ঞান যে কিভাবে পড়ানো যায় তা আয়ান নিজেও বুঝতে পারে না। সে ভেবেছিল, আগের ক্লাসের বইগুলো আগে পড়িয়ে নেবে। তাতে ছাত্রের ঘোর আপত্তি, 'ওগুলো তো নিচের ক্লাসের বই। আমার পড়া হয়ে গেছে।' আপত্তি ছাত্রের বাবারও, 'এটা কিরকম কথা মাস্টার? ও পড়ছে সেভেনে, আর ওকে তুমি ফাইভের বই পড়তে বলছ? ওকে তুমি আবার ফাইভে ভর্তি করতে চাও না কি?' আয়ান বোঝাতে চেয়েছিল যে, ফাইভ-সিক্সের পড়াগুলো না করলে সেভেনের পড়া বুঝতেই পারবে না। রশিদ সাহেব বলেছেন, 'পাস যখন করে এসেছে তখন ঠিকই বুঝতে পারবে। তুমি আসলে ভালো মতো বোঝাতে পারছ না।' অঙ্ক যখন কিছুতেই বোঝাতে পারে না, খাতায় করে দেয়। ছাত্র সেটা স্কুলের খাতায় কপি করে নেয়। অন্যান্য বিষয় সে যতটা সহজ করে পারে বুঝিয়ে দেয় । বলাই বাহুল্য, তাতেও ছাত্র কিছুই বুঝতে পারে না। তখন সে ছাত্রকে পড়তে বলে। ছাত্র যতটা না। পড়ে তার থেকে বেশি সামনে পেছনে দোলে। রবীন্দ্রনাথ.... অ্যাঁ... খুব অল্প...অ্যাঁ বয়সেই ...অ্যাঁ অ্যাঁ কবিতা... অ্যাঁ.... লিখতে....অ্যাঁ শুরু ....অ্যাঁ ....করেন....অ্যাঁ.... রবীন্দ্রনাথ ...অ্যাঁ.....।

ছাত্রীটি আরেকটি রত্ন। তার বয়স সতের। ক্লাস এইটে পড়ছে। সেও প্রায় কিছুই শেখেনি। তবে চিঠি লেখাটি শিখেছে। আয়ান যেই ছাত্রের দিকে নজর দেবে অমনি সে চিঠি লিখতে বসে যাবে, প্রাণের রহমান, অনেকদিন তোর চিঠি পাইনি....। কিছু বললেই গোঁজ হয়ে বসে থাকবে। কোনো কথার উত্তর দেবে না। কোনো কথা শুনবেও না। এক রকমের গোরু আছে। গ্রামের লোকেরা বলে গোড়ে গরু। খানিকক্ষণ কাজ করার পর এই গোরুগুলি কাজ করতে করতেই সটান শুয়ে পড়বে। তখন তাকে যতই মার ধর, ঠেলা ধাক্কা দেওয়া যাক, 'নট নড়ন

চড়ন।' গোঁজ হয়ে পড়ে থাকবে। আয়ানের এই ছাত্রীটিও তাই। একটু বকাবকি করলেই গোঁজ হয়ে বসে থাকবে। কোনো কথা শুনবে না, কোনো কথার উত্তর দেবে না। পড়াশোনাও কিছু করবে না। আজো শেষের ঘন্টাখানেক সে এমনিভাবেই বসে ছিল। আয়ানের অসহ্য লাগে। মনে হয়, গালে এক থাপ্পড় দিয়ে তুলে দেয়। কিন্তু পারে না। রাগে গা জ্বালা করে। সে অসহায়ের মতো বসে থাকে। এক সময় ছুটি হয়, ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি যায়। সে হতাশভাবে উঠে বেঞ্চটায় বসে। মনে হয় কারো বাড়ি থেকে-খেয়ে-বেতন নিয়ে তার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর মতো অপমানজনক কাজ বোধ হয় দুনিয়াতে আর নেই। এর থেকে মাঠে মুনিষ খাটা অনেক ভালো। আয়ানের মনে হয়, বাঘডাঙায় থেকে মুনিষ খেটে খেলেও সে এর থেকে ভালো থাকত।

সিমেন্টের বেঞ্চটার ওপর বসে আয়ান এরকম অনেক কথা ভাবছিল। সে বড় হতে চায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। বি. এস.-সি.-র রেজাল্ট তাকে হতাশ করেছে। তাই সে আবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এম. এ. পরীক্ষা দেবে। তার জন্য সে অনেক কষ্ট করে কিছু বইও যোগাড় করেছে। কিন্তু বাঘডাঙায় থেকে তার পড়াশোনা কিছুতেই হচ্ছিল না। আয়ান ভেবেছিল, এখানে এলে তার পড়াশোনাটা হবে। যারা থাকা-খাওয়া এবং বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক রাখে তারা নিশ্চয় অবস্থাপন্ন এবং শিক্ষার গুণগ্রাহী। সেই আশাতেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেই আয়ান দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্ত করেই বসে থাকেনি, কলকাতায় এসে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে দেখা করেছিল। তারপর তাঁর সঙ্গে চলে এসেছিল রায়পুরে। রায়পুরে এসে আয়ান দেখেছে যে, বিজ্ঞাপনদাতা রশিদ সাহেবরা অবস্থাপন্ন লোক, এব্যাপারে কোনোরকম সন্দেহ নেই। কলকাতায় তাদের পাঁউরুটির কারখানা আছে। দেশে অনেক জমিজমা আছে। তিনতলা বাড়ি আছে। কিন্তু এরা শিক্ষার গুণগ্রাহী মোটেই নয়। পঞ্চাশের দশকে খাদ্য-সঙ্কটের সময় পাঁউরুটি তৈরির জন্য বরাদ্দ ময়দা কালোবাজারে বিক্রি করে এরা বড়লোক হয়েছে। সেই কালো টাকায় তিনতলা বাড়ি করেছে। কিন্তু এদের কোনোরকম শিক্ষা-সংস্কৃতি নেই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও যে এরা খুব আগ্রহী তা নয়। বরং এরা মনে করে যে, ছেলেকে রুটির কারখানায় বসিয়ে দিলে মাস্টারির চেয়ে বেশি আয় করবে। তবুও যে এরা থাকা-খাওয়া-বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক রাখে, তার কারণ বেকার দু-একজন শিক্ষিত ছেলেকে বাড়িতে রাখা এরা স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করে। না রাখলে অন্যদের কাছে সম্মান থাকে না। আয়ান সেই সম্মানের উপকরণ মাত্র। বোধ হয় বাড়ির কাজের মেয়েটিও সেকথা জানে। জানে বলেই সে আয়ানকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না।

কাজের মেয়েটি তার খাবারের থালাটা এনে দলিজের বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এত অবজ্ঞা ভরে দেওয়া খাবার তার খেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না খেলেও এখানে কারো কিছু এসে যায় না। বরং তাতে তারই শরীর খারাপ হবে। সে খাবারের থালাটা তুলে এনে রাখে। তারপর গামছাটা নিয়ে পুকুরের দিকে রওনা হয়। পুকুরের পাড়েই ওবাইদুল্লার দোকান। তাই রায়পুরের এই পাড়াটাকে বলে 'দুকান বাকুল'। দুকান বাকুলে আজ পিওন এসেছে। দোকানের লোকগুলি তাকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু কেউই আয়ান কে সেটা বলতে পারছে না। এমন সময় আয়ান সেখানে উপস্থিত হওয়ায় পিওনকে আর চিঠিখানা ফেরত নিয়ে

যেতে হল না। আয়ান দেখল শ্যামাপদর চিঠি। অবশ্য শ্যামাপদ ছাড়া বন্ধু-বান্ধবরা কেউই তার ঠিকানা জানে না। এই কাজটি আয়ানের একদমই পছন্দ নয়। তাই তার বন্ধু-বান্ধব কাউকেই সে তার বর্তমান ঠিকানা দেয়নি। বাড়িতে বাবা-মাকেও না। শ্যামাপদকেও দিত না। কিন্তু বাড়ির খবরাখবর একটু রাখা দরকার। আর সে যে ভালোই আছে সে কথা বাড়িতে জানানো দরকার। সেজন্যই শুধু সে শ্যামাপদর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। শ্যামাপদ তাকে চিঠি লিখে প্রয়োজনীয় খবরাখবর দেয়। বাড়ির কোনো চিঠিপত্র এলে তাও পাঠিয়ে দেয়। আয়ান শ্যামাপদর কাছে যে চিঠি লেখে তাতে সে বর্তমান ঠিকানা লেখে না। আয়ানের বাবা ঠিকানার জন্য চাপ দিলে শ্যাম আয়ানের ঠিকানা বিহীন চিঠি বের করে দেখায়, 'কি করব, আমাকেও ঠিকানা দেয়নি।' আয়ানের বাবা হতাশ মুখে ফিরে যায়। আয়ান যেন বাবার করুণ মুখখানা দেখতে পায়। শ্যাম লিখেছে, তার বাবা এসেছিল, ঠিকানা জানতে চান, মায়ের নাকি খুব অসুখ। আয়ানকে একবার দেখতে চায়। আয়ানের খারাপ লাগে। বাবা-মায়ের অসহায় মুখ দুটো মনে পড়ে। ভাইবোনদের কচি কচি অবাক হওয়া মুখগুলি মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। অভাবের সংসারেও অনেক কষ্ট করে বাবা-মা তাকে স্কুলে দিয়েছিল। না না করেও কলেজে ভর্তি করছিল। কিন্তু পড়াশোনা শিখে সে কি না আজ এই অজ্ঞাতবাসে! অসুস্থ মা তাকে একবার দেখতেও পাচ্ছে না!

আয়ানের মনে হয় তার একবার বাড়ি যাওয়া দরকার। বাঘডাঙার আমের ছায়াঘেরা খড়ের বাড়িখানি তাকে খুব টানতে থাকে। গ্রামের বকুলতলা, পাকুড়তলা, চারা আমগাছতলা তাকে টানতে থাকে। অসুস্থ মায়ের প্রত্যাশী মুখ তাকে টানতে থাকে। মাস তিনেক হল সে এখানে এসেছে। এর মধ্যে একবারও বাড়ি যায়নি। সে বাড়ি যেতে চায় না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তবে সে বাড়ি যাবে। তার প্রথম ধাপ বি. এ. পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্য সে ফর্ম ফিল-আপ করেছে। কিছু কিছু পড়াশোনাও করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তার পড়াশোনাটা রশিদ সাহেব মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা মাস্টার সারাদিন পড়াশোনা করলে, ছাত্রদের পড়াশোনার সময় পরিশ্রম করতে পারবে না। আয়ান নিজে যদি অত পড়ে তাহলে তার ছেলেমেয়েকে পড়াবে কি করে? তাই আয়ানকে পড়তে দেখলেই তিনি গজ গজ করেন। ডেকে একথা সেকথা জিজ্ঞেস করেন, যাতে আয়ানের পড়া না হয়। 'হ্যাঁ মাস্টার, তোমার অত পড়া কিসের? সারা দিন পড়লে যে তোমার নিজেরই মাথা ঘুরবে। তুমি আর পড়াবে কি!' আয়ান প্রথম প্রথম বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, নিজে পড়াশোনা করেও ভালোভাবে পড়ানো যায়। কিন্তু বোঝাতে পারেনি। তাই এখন আয়ান প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যায়। অন্য কথা বলে। তারপর রশিদ সাহেব চলে গেলে পড়তে শুরু করে। মাঝে মাঝেই রশিদ সাহেব রুটির কারখানার তদারকির জন্য কলকাতা যান। আয়ান সেই সময়টাকে ভালোভাবে ব্যবহার করে। কিন্তু কয়েকদিন পড়েই রশিদ সাহেব এসে হাজির হন। আজো এসেছেন।

রশিদ সাহেব আসতেই আয়ান বলল, 'বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, মায়ের শরীর খারাপ। আমি চার-পাঁচ দিনের জন্য বাড়ি যাব।' রশিদ সাহেব বললেন, 'তুমি বাড়ি যাবে।' তাহলে ওদের পড়াশোনার কি হবে?' আয়ান বলল, 'এসে আবার পড়াব।' 'এসে তো পড়াবে। কিন্তু চার-পাঁচ দিন তো পড়া হবে না।' রশিদ সাহেব অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আয়ান বলল, 'কিন্তু

আমার মায়ের অসুখ, সেটা তো দেখতে হবে।' রশিদ সাহেব বললেন, 'ওসব অসুখ-টসুখ কিচ্ছু না। তুমি যাতে যাও তাই অসুখের কথা লিখেছে।' আয়ানের মনে হয়, নিজেরা জালিয়াতি করে বলে সবাইকেই এরা জালিয়াত ভাবে। এদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হয়। তার থেকে সে বরং বাড়িতে যাবে না। বাড়ি তো সে যেতেই চায় না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সে বাড়িতে যেতে চায় না। কিন্তু মায়ের অসুখের কথা শুনে সে আর স্থির থাকতে পারছিল না। রশিদ সাহেবের কথা তার মনটাকে আবার শক্ত করে দিল। আয়ান ঠিক করল, সে আর এখন বাড়ি যাওয়ার কথা বলবে না। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইটা খুলে হেগেল পড়তে লাগল। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পূর্বসূরী এই হেগেল। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক রাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল 'মার্চ অব গড অন আর্থ'। কিন্তু আয়ানের কিছুতেই মন বসে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। আয়ান বই বন্ধ করে গ্রামের জুনিয়র হাই স্কুলের দিকে যায়।

স্কুলের দক্ষিণে একটা মাঠ আছে, সেখানে বিকেলবেলায় গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলে। আয়ান দেখে, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কয়েকটি ছেলে একটা ফুটবলকে এলোপাথাড়ি পেটাচ্ছে। যে যেদিকে পারছে মারছে। আর মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছে। তা দেখে আয়ানের মনটা ছটফট করছে। পা দুটো নিশপিশ করে উঠছে। বাঘডাঙা গ্রামে কোনও দিনই খেলার প্রচলন ছিল না। পাশের গ্রাম ভুবনডাঙায় তাদের প্রাইমারী স্কুলের মাঠে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলা হত। সে সুযোগ পেলে এক-আধ দিন নেমে পড়ত। সবাই বলত তার বাঁ পায়ের শট নাকি একদম মাপা। আয়ানের মনে হয় এখনো সে ওরকম মাপা শট করতে পারবে। মনে হয় দু-একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? সে মনে মনে ভাবে, কেউ তাকে অনুরোধ করলেই সে নেমে পড়বে। কিন্তু না, কেউ তাকে খেলতে বলে না। তার যেন এখানে কোনো অস্তিত্বই নেই। একপা দুপা করে সে আবার তার দলিজের দিকে ফিরে আসে। তার ছাত্রছাত্রী আসে। আয়ান পড়াতে বসে যায়। বারান্দার ওদিকটায় কবির সাহেব রশিদ সাহেবের দাদার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসেছেন। এদিকটায় দশ-বারোজন ছাত্র-ছাত্রীকে ওস্তাদজী পড়াচ্ছেন। সিমেন্টের বেঞ্চটার ওপর পাড়ার বৃদ্ধরা তাদের কালের গল্প জুড়েছে। এর মধ্যে কি করে যে পড়ান সম্ভব আয়ান বুঝতে পারে না। রশিদ সাহেবের তিনতলা বাড়ি। বাড়ির একটা ঘরে কি নিরিবিলিতে পড়ার ব্যবস্থা হতে পারে না? কিন্তু সেকথা রশিদ সাহেবদের মাথায়ই আসে না। পাড়ার সকলে মিলে একটা টিনের দলিজ করে রেখেছে। সেখানেই গল্প-গুজব হবে, সেখানেই পড়ার মাস্টার মুন্সিরা থাকবে, আবার সেখানেই তাদের ছেলেমেয়েরাও পড়তে বসবে। আয়ানের মনে হয়, কিছু শিখতে হলে নিজের চেষ্টা থাকা চাই। সুস্থিরভাবে পাঁচ দণ্ড ভাবা দরকার। কিন্তু রশিদ সাহেবের ছেলেমেয়েদের সে সুযোগ নেই। তারা স্কুলে যায়। হৈ-হুল্লোড় করে ফিরে আসে। বাড়িতে মাস্টারের কাছে বসে, সেখানেও হৈ-হুল্লোড়। শেখায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই। যতক্ষণ বাধ্য হয়ে বসে থাকতে হয় বসে থাকে। তারপর উঠে বাড়ি চলে যায়। আয়ানও উঠে যায়। কাজের মেয়েটি রাতের খাবার দিয়ে যায়। খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে সে বারোয়ারি দলিজে কবির সাহেব, ওস্তাদজী ও আরো অনেকের সঙ্গে শুয়ে পড়ে। রাতে সুন্দর স্বপ্ন দেখে। সে এম. এ. পাস করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হয়েছে, তার কত খ্যাতি হয়েছে। সে দু-তিনটে বইও লিখেছে। সবাই তার কথা আগ্রহ সহকারে শুনছে। আয়ানের বুকটা গর্বে ভরে

ওঠে। কিন্তু দিনের আলো তার এ স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে নিয়ে আসে আরো একটা দাসত্বের দিন। চলতে থাকে তার দিনগত পাপক্ষয়।

এই করতে করতে মার্চ মাস চলে গেল। পিওন এসে তার বি. এ. পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডটা দিয়ে গেল। শিয়ালদায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তার সিট পড়েছে। পরীক্ষা দিতে তাকে কলকাতা আসতে হবে।

পরীক্ষার দিন চলে এল। কিন্তু রশিদ সাহেব বাড়িতে নেই। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া আয়ান কোনমতেই বানচাল করবে না। সে ছাত্রকে ব্যাপারটা বলে কলকাতা রওনা হয়ে গেল। এসে উঠল বালিগঞ্জে হামিদের হোস্টেলে। হামিদ আয়ানদের সাথে একই সঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ত। হামিদ এখন সায়েন্স কলেজে এম. এস.-সি. পড়ছে। হামিদ আয়ানকে সাদরে গ্রহণ করল। রাত্রে হোস্টেলের মেসে গিয়ে দুজনে খেয়ে এল। কিন্তু ঘরে খাট একটা। হামিদ আয়ানকে খাটটা ছেড়ে দিয়ে নিজে মেঝেতে একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সকালবেলায় স্নান-খাওয়া করে আয়ান পরীক্ষা দিতে গেল। আয়ানও হামিদের মতোই এরকম এম. এস.-সি. পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। কি করে পড়বে? অনার্সই পেল না। জীবনে সে কিছুই পায়নি। তবু স্কুল-জীবনে ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা তাকে সেই ভালো ছাত্রও থাকতে দিল না। এক বুক দুঃখ নিয়ে আয়ান বি. এ. পরীক্ষা দিল। সে কোথায় আছে, এখন কি করছে, হামিদ বার বার তা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আয়ান কিছুতেই কিছু বলল না। সে যদি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবেই তার পরিচয় দেবে। না হলে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন জানবে আয়ান হারিয়ে গেছে। পরীক্ষা শেষ হতেই আয়ান রায়পুর ফিরে এল।

আয়ান যখন দলিজে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কবির সাহেব তার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসে পড়েছেন। ওস্তাদজীর ছাত্র-ছাত্রীরাও আসছে। আয়ান হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে তার ছাত্র-ছাত্রীকে খবর দিতে বলল। কবির সাহেব তার এক ছাত্রকে পাঠালেন খবর দিতে। সে খবর দিয়ে এল। কিন্তু আয়ানের ছাত্র-ছাত্রী কেউ পড়তে এল না। খানিকবাদে তাদের কাজের লোকটি এল। সে বিনা ভূমিকাতেই বল, 'মাস্টারমশায়, আমরা নতুন মাস্টার ঠিক কর‍্যা নিয়েছি। আপনার আর দরকার নাই।' আয়ান চমকে উঠল। কবির সাহেব ফিরে তাকালেন। ওস্তাদজীও না তকিয়ে পারলেন না। সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর বসা লোকগুলি আয়ানের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগল। কিন্তু কাজের লোকটি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। সে যেমন এসেছিল, কথাটা বলে তেমনি সটান চলে গেল। আয়ান বসে ভাবতে লাগল, সে এখন কি করবে? রায়পুরে থাকতে তার এক মুহূর্ত ভালো লাগে না। কিন্তু থাকবার মতো আর কোনো ভালো জায়গায়ও তার নেই। বাড়ি থেকে সে চলে এসেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সে বাড়ি ফিরতে চায় না। ছোট-খাট একটা কাজের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো কাজ পায়নি। সে জন্যই তো সে রায়পুরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। বি. এ. পরীক্ষাটা সে ভালোই দিয়েছে। অন্তত ফল বেরুন পর্যন্ত সে এখানে থেকে যেতে পারত। বি. এ.-র ফল ভালো হলে হয়ত সে একটা চাকরি পেলেও পেতে পারে।

কিন্তু এখন গিয়ে উঠবে কোথায়? কলকাতা তার ভালো লাগে না। এত ভিড় যে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাছাড়া সেখানে সে করবেই বা কি! কিন্তু এখানেও তো আর থাকা যায় না।

আশেপাশে কেউ জানাশোনাও নেই। হঠাৎ তার হামিদের কথা মনে পড়ল। হামিদকে বললে কয়েকটা টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারে। সে হামিদের কাছেই যাবে। রাতটা প্রায় বসে থেকেই কাটিয়ে দিয়ে সে রাজহাটিতে এসে বাস ধরল। বাসটা যখন রাধানগরের কাছে এল আয়ান কি মনে করে বাস থেকে নেমে পড়ল।

মাস দুয়েক হল সুমিতা রাধানগর কলেজে লেকচারার হয়ে এসেছে। সারা বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এসে সুমিতার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। মাসখানেক আগে রাধানগর কলেজে সেই সুমিতার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে দেখা। একবার সুমিতার সঙ্গে দেখা করলে হয় না? একবার মনে হয়, সুমিতা যে আয়ানকে চিনত, জানত, সে তার সমকক্ষ। আজ এ ভিখারি বেশে তার কাছে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু সে যাবে কোথায়? হামিদের কাছে হয়ত আশ্রয় মিলবে। কিন্তু তার লুকিয়ে থাকা হবে না। তার বাবা এসে তাকে নিয়ে যাবে। তার এম. এ.পাস করা হবে না। তার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর হবে না। তার থেকে সুমিতা যদি কোনোরকম সাহায্য করতে পারে! আয়ান দ্বিধাজড়িত পায়ে কলেজের দিকে হাঁটতে থাকে। কলেজে এসে দেখে সুমিতা ক্লাসে আছে। সে টিচার্স রুমের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুমিতা আসে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। সুমিতার আর ক্লাস ছিল না। সে আয়ানকে তার বাসায় নিয়ে আসে। আয়ানের তবুও সংকোচ কাটে না। সুমিতার প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, 'এমনি বেড়াতে এসেছিলাম।' সুমিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু হাঁটতে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়ায়। সে কোথায় যাবে? সে আবার সুমিতার কাছে ফিরে আসে। সুমিতা আশ্চর্য হয়। ডেকে বসায়। কি হয়েছে বলার জন্য জোর করে। আয়ান সংক্ষেপে তার অবস্থা বর্ণনা করে। সুমিতা হতবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকে। তারপর বলে, 'তবুও শেষ পর্যন্ত বলেছিস। আমার কাছে এসে ভালো করেছিস। আমাকে সপ্তাহখানেক সময় দে। একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে।' আয়ান বলে, 'তাহলে সাত দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা করব।' 'আর এই সাত দিন কোথায় যাবি?' সুমিতা জানতে চায়। কোথায় যাবে তা আয়ান নিজেও জানে না। 'ক'টা দিন তুই আমার কাছেই থাকবি।' সুমিতা জোর করেই আয়ানকে বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে পাঠিয়ে দিল। আয়ান হাত-মুখ ধুয়ে এসে সবে বসেছে। একজন ভদ্রলোক এলেন। সুমিতা বলল, 'ইনি সুমন সান্যাল। আমাদের কলেজে ইংরেজি পড়ান। আর ও আয়ান। খুব ভালো ডিবেটর। সারা বাংলা বিতর্কে প্রথম হয়েছিল।' সে সংবাদে সুমনবাবু বিশেষ প্রীত হলেন না। খানিকক্ষণ বসলেন বটে। তবে সারাক্ষণ এমন উসখুস করলেন যে, আয়ানের মনে হল তাঁকে ছারপোকায় কামড়াচ্ছে। একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। কোনো মহিলা একা থাকলে তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে যায়। বিশেষ করে সেই মহিলা যদি সুন্দরী হয় তাহলে তো কথাই নেই। তার শুভ চিন্তায় অনেকেরই ঘুম আসে না। সুমিতা বলল, 'এ ভদ্রলোক সেরকম একজন স্বয়ং শুভকাঙ্ক্ষী।' এত দুঃখের মধ্যেও আয়ানের মুখে হাসি দেখা দিল।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই সুমিতা বলল, 'একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের লাইব্রেরিতে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট প্রয়োজন। কয়েক মাসের জন্য প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তোকে ডেলি বেসিসে নিতে রাজি হয়েছেন। অবশ্য বেতন ভালো নয়। ডেলি দশ টাকা করে পাবি। তা মাসে কুড়ি-পঁচিশ দিন কাজ হলে দুশ আড়াই শ টাকা পাবি।' আয়ান বলল, 'আমার এখন সেটাই অনেক।'

সুমিতা বলল, 'আর থাকার ব্যাপারেও ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি রাজি হয়েছেন। তার বড় মেয়েটা ইলেভেনে পড়ে। ওকে একবেলা একটু দেখিয়ে দিবি আর থাকবি।' আয়ান বলল, 'আর যাই হোক, লোকের বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়ানোর কাজ আমি আর করব না। সুমিতা হেসে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন?' ইমাম সাহেব তো তোর হঠাৎ বড়লোক হওয়া রুটিওয়ালা নয় যে, মাস্টার রেখেই ভাববে যে, মাস্টার সব গুলে খাইয়ে দেবে। আর মাস্টার কোনো কাজে একদিন বাইরে গেলেই এমনি ছাড়িয়ে দেবে। ইমাম সাহেব আমাদের কলেজেই বাংলা পড়ান। যেমন বিদ্বান, তেমনি ভদ্র। আমার বিশ্বাস, তোর খারাপ লাগবে না। যদি খারাপ লাগে, আমি তো আছি। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুই মন খারাপ করিস নে। ইমাম সাহবের বাসায় চলে যা। কালই হয়ত ইমাম সাহেব আসবেন তোকে নিয়ে যেতে। তুই রাজি হয়ে যা।' আয়ান রাজি হয়ে গেল।

দুই

পরের দিন ইমাম সাহেব এসে আয়ানকে নিয়ে গেলেন। আয়ানের জিনিসপত্র বলতে একটা টিনের বাক্সে কয়েকটা বই। আয়ান বাক্সটা নিয়ে ইমাম সাহেবের সঙ্গে একটা রিক্সায় উঠে বসল। আয়ানরা আশানগরে ইমাম সাহবের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দরজা খুলল একটি সতের-আঠার বছরের ফুটফুটে মেয়ে। ইমাম সাহেব বললেন, 'আমার মেয়ে রাজিয়া।' আয়ানের মনে হল তাহলে এই মেয়েকেই পড়াতে হবে। মেয়েটি হাত তুলে আয়ানকে নমস্কার করল। ইমাম সাহেব এবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর এ আয়ান। তোমাকে তো বলেছি।' আযান হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল। বাড়িতে ঢুকে আয়ান দেখল একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ি। তাকে দরজার পাশে একটি ঘর দেওয়া হল। ঘরটিতে একটা ছোট খাট আছে। খাটের ওপর পরিষ্কার চাদর বিছানো। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো এবং পাখাও আছে। আয়ান বিশ্বাসই করতে পারছে না, এত সুন্দর একটা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। ইমাম সাহেব বললেন, 'ঘরটা তেমন বড় নয়। তোমার বোধ হয় একটু অসুবিধা হবে।' আয়ান কি বলে যে এর বিরোধিতা করবে ঠিক করতে পারল না। শুধু বলল, 'ঘরটি খুব সুন্দর আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার খুবই ভালো লেগেছে।' ইমাম সাহেব শুনে খুশি হলেন। আয়ান দেখল ঘরের মধ্যে তার টিনের বাক্সটাই বড় বেমামান। বাক্স থেকে বইগুলো বের করে সে টেবিলে রাখল। তারপর বাক্সটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ইমাম সাহেব আয়ানকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। হাত-মুখ ধুয়ে আয়ান বলল, 'তাহলে এবার পড়তে বসা যেতে পারে।' ইমাম সাহেব বললেন, 'তুমি আজকে এলে। প্রথম দিন আর কি পড়াবে! একটু বিশ্রাম কর। কাল থেকে পড়াবে।' আয়ান বলল, 'আমি তো ক্লান্ত নই। বিশ্রাম করার দরকার নেই। কোথায় বসব বলুন।' ইমাম সাহেব মেয়েকে ডাকলেন। আয়ানকে বললেন, 'দুবেলা পড়াবার দরকার নেই। ও এমনিতে কারো কাছে পড়তে চায় না— একা একাই পড়ে। কোথাও কিছু অসুবিধা হলে একটু দেখিয়ে দিও। সন্ধ্যাবেলায় একবার বসলেই হবে।' রাজিয়া এসে আয়ানকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেল।

পড়ার ঘরটি নিখুঁতভাবে সাজানো-গোছানো। ঝকঝকে তকতকে। টেবিলটির ওপরে কভার দেওয়া, তার চারপাশে কয়েকটি চেয়ার। রাজিয়া একটাতে বসল। আয়ান বসল অপরদিকে। রাজিয়া বলল, 'কেমিস্ট্রির আমাদের এখন অ্যাভাগ্যাড্রো প্রকল্প পড়াচ্ছে। কোয়েশ্চেন পেপার থেকে অ্যাভাগ্যাড্রো সংখ্যা বের করার একটা অঙ্ক করছিলাম। কিন্তু উত্তর মিলছে না।' আয়ান খাতাটা নিয়ে দেখতে লাগল। দেখল রাজিয়ার হাতের লেখা খুব সুন্দর। কিন্তু অঙ্কটাতে ভুল যে কোথায় হয়েছে সে বুঝতে পারে না। প্রথম দিনেই একটা অঙ্ক দেখতে গিয়ে যদি এরকম হয়...! আয়ান ঘামতে লাগল। অঙ্কটা আরেকবার পড়ল। তারপর অঙ্কের সূত্রটা আরেকবার দেখল। তখনই ভুলটা তার চোখে পড়ল। আয়ান বলল, 'ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির কোনো সূত্রের সাহায্যে অঙ্ক করতে হলে এককগুলি ঠিক ঠিক হতে হবে।' এখানে ওজন পাউন্ডে দেওয়া আছে। সূত্রে প্রয়োগ করতে হলে তাকে গ্রামে আনতে হবে।' রাজিয়া পাউন্ডটাকে গ্রামে রূপান্তর করে অঙ্কটা করতেই উত্তর মিলে গেল। রাজিয়ার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। আয়ানও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রাজিয়া কেমিস্ট্রি রেখে ইংরেজি বই বের করল। ইংরেজির পর অঙ্ক। সে নিজে নিজেই পড়ল। কেবল মাত্র কোথাও অসুবিধা হলে আয়ানকে জিজ্ঞাসা করল। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল। ইমাম সাহেব তাদের খেতে ডাকলেন। বললেন, 'চল, আজকের দিনটা সকলে একসঙ্গেই খেয়ে নিই।' খাবার টেবিলে রাজিয়ার মার সঙ্গে পরিচয় হল। ইমাম সাহেব বললেন, 'আমার স্ত্রী, আর এ আয়ান।' আয়ান হাত তুলে নমস্কার করল। রাজিয়ার মা খাবার তুলে দিতে লাগলেন। রাজিয়া মাকে সাহায্য করতে লাগল। খাবার শেষে হাত মুখ-ধুয়ে আয়ান তার ঘরে এল।

অনেক দিন পর তার কেমন যেন মনে হচ্ছে ছোটবেলায় মা-বাবা যেমন তাকে ভালোবাসত, ইমাম সাহেবরা সেরকমই ভালোবাসছেন। অনেকদিন পরে তার মার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। রাজিয়ার মুখটাও মনে পড়ছে। রাজিয়া আজ একটা সাদা শাড়ি পরেছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিচ্ছন্ন ব্যবহার। পড়াশোনায় কত ভালো! মাধ্যমিকে আটষট্টি পারসেন্ট মার্কস পেয়েছে। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। কিন্তু তার জন্য এতটুকু অহঙ্কার নেই। পাশাপাশি রশিদ সাহেবের মেয়ে মমতাজের কথা মনে পড়ে। একই বয়স। এখনও এইটে পড়ে। কিচ্ছু শেখেনি। ব্যবহারটাও বাজে। কি অবাধ্য, কি দুর্বিনীত! আর ওরই বা দোষ কি? বাবা-মারা মাস্টারকে বাড়ির কাজের চাকরের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব মনে করে। মেয়ে আর তার কথা কি করে শোনে? তাকে কি করে সম্মান করে? তবে এখানে মুশকিল হচ্ছে, রাজিয়া পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো। কাজেই তাকে পড়াতে হলে নিজের পড়া ছাড়াও আয়ানকে রাজিয়ার জন্য পড়তে হবে। আয়ান তাই পড়বে। ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে, তার এম. এ. পরীক্ষা আগামী কালই শুরু হবে। অথচ সে আজো রাজিয়াকে পড়াচ্ছে। আয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। আয়ান তাড়াতাড়ি করে উঠে বসে। সত্যি সত্যি এম. এ. পরীক্ষা কাল শুরু হচ্ছে না দেখে সে আশ্বস্ত হয়। হাত-মুখ ধুয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে বসে। একটু বাদে রাজিয়া এসে এক কাপ দুধ দিয়ে যায়। স্নান-খাওয়া করে ইমাম সাহেবের সঙ্গে আয়ান কলেজে যায়। সুমিতা নিয়ে গিয়ে তাকে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লাইব্রেরিয়ান তাকে তার কাজ বুঝিয়ে দেয়। ছাত্র-

ছাত্রীরা যে বই চাইবে সে সেগুলো র‍্যাক থেকে নিয়ে আসবে। আবার যখন বই ফেরত দেবে তখন তা যথাস্থানে রেখে দেবে। অবসর সময়ে র‍্যাকগুলো ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করবে। আয়ানের কাজটি খুবই পছন্দ হল। বেতন যাই পাক, সে অনেক বই পড়তে পাবে। সে তো এরকমই চায়।

এখানে আয়ানের দিন ভালোই কাটতে লাগল। সকালে উঠে সে পড়াশোনা করে। বেলা হলে স্নান-খাওয়া করে কলেজ চলে আসে। সন্ধ্যায় রাজিয়াকে পড়ায়। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। পড়াশোনা করতে পেরে তার মনে আশা জাগে। কিন্তু কলেজে সুমিতার সঙ্গে দেখা হলেই একটা কষ্ট অনুভব করে। সারা বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যখন তাদের দেখা হয়েছিল তখন তারা ছিল তুল্যমূল্য। কিন্তু আজ সুমিতা লেকচারার। আয়ান একই কলেজে পিওন। অন্তরের ভেতর থেকে সে একটা প্রবল ইচ্ছে অনুভব করে, তাকে জীবনে দাঁড়াতেই হবে। ইচ্ছের প্রাবল্য তাকে লাইব্রেরিতে ঠেলে নিয়ে যায়। আয়ান বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য বই খুঁজতে থাকে। প্রয়োজনীয় বইগুলো বাড়িতে নিয়ে যায়। রাজিয়াকে দেখেও তার কষ্ট হয়। রাজিয়া কত সুন্দর। স্বচ্ছ সপ্রতিভ ভদ্র এবং বিনয়ী। পড়াশোনায়ও ভালো। আবার মাকে ঘরের কাজেও সাহায্য করে। কিন্তু রাজিয়াকে নিয়ে সে কিছু ভাবতেও পারে না। কারণ সে তার উপযুক্ত নয়। এমনিভাবে কেটে যায়। রাজিয়া ইলেভেন থেকে ফার্স্ট হয়ে টুয়েলভ-এ ওঠে। আয়ানেরও বি. এ.-র ফল বের হয়। দেখা যায়, আয়ান ছাপান্ন পারসেন্ট নম্বর পেয়ে পাস করেছে। সে এম. এ পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করে। কাগজ দেখে দু-একটা স্কুলেও দরখাস্ত করে। দেখতে দেখতে বছর দু-এক কেটে যায়। এম. এ. পরীক্ষার দিন চলে আসে। আয়ান কলকাতা এসে হামিদের কাছে ওঠে। হামিদের তখন এম. এস.-সি. পরীক্ষা হয়ে গেছে। পি.এইচ. ডি.-র জন্য চেষ্টা করছে। হামিদের হোস্টেলে থেকেই আয়ান এম. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিল। পরীক্ষার পরের দিনই সে আশানগর ফিরে এল। আবার সেই কলেজের লাইব্রেরির কাজ এবং সন্ধ্যায় পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তার পড়াশোনা চলতে লাগল। এম. এ. পাস করলে সে পি.এইচ. ডি.-ও করবে। এম. এ.-তে সে স্পেশাল পেপার নিয়েছে উপন্যাস ও ছোটগল্প। সে উপন্যাসের ওপরই কাজ করবে। কিন্তু কি করে করা যায়। আয়ান মনে মনে ভাবতে থাকে। ভাবতে যেন ভালো লাগে।

কয়েকদিন পরে আয়ানের নামে একটা চিঠি আসে। চক হাইস্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে নিয়োগের জন্য তাকে ইন্টারভিউতে ডেকেছে। কিছুদিন আগে সে দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু কল পাবে আশা করেনি। আয়ান পড়াতে বসেই খবরটা রাজিয়াকে দিল। রাজিয়ার কাছে থেকে ইমাম সাহেব জানলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'খুব ভালো খবর। দেখো, তোমার হয়ে যাবে। কবে ডেকেছে যেন?' আয়ান বলল, 'আগামী সোমবার।' সোমবার আয়ান চক হাইস্কুলে হাজির হল। ইন্টারভিউ বোর্ডে হেডমাস্টার আর সেক্রেটারি ছাড়াও আরো একজন শিক্ষক আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'উচ্চ-মাধ্যমিকের পাঁচ বছর পরে আপনি বি. এ. পাশ করেছেন। তাহলে এ সময়টা কি করলেন?' আয়ান বলল, 'বি. এস.-সি. পড়েছি।' হেডমাস্টার নড়ে বসলেন, 'কিন্তু আপনি যে বি. এস.-সি. পাস করেছেন তা উল্লেখ করেননি তো?' আয়ান একটু চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বি. এস.-সি.-তে আমি ভালো ফল

করতে পারিনি। তাই বি. এস.-সি.-র কথা আমি ভুলে যেতে চাই। কিন্তু সেক্রেটারি তখন বি. এস.-সি. নিয়েই পড়লেন। মার্কসিট সার্টিফিকেট সবই তাকে দেখাতে হল। হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের বিতর্কে তাহলে আপনি কলেজ থেকেই অংশগ্রহণ করেছেন?' আয়ান বলল, 'হ্যাঁ, কলেজ থেকে করেছি। তবে শুরু করেছি স্কুল থেকে।' তার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেল। আয়ান আশানগর ফিরল। কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এল। এক সপ্তাহের মধ্যে জয়েন করতে হবে। সবাই খুশি হল। রাজিয়া বলল, 'এবার তো সত্যি সত্যি স্কুলের মাস্টার হয়ে গেলেন। তা সত্যি, স্কুলের মাস্টার। তবে কিনা মাত্র দশ মাসের জন্য।' আয়ানের ঐ একটাই খটকা ছিল। দশমাস পরে তো আর মাস্টারি থাকবে না। ইমাম সাহেব বললেন, 'দশ মাসের মধ্যে নিশ্চয় অন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পরের চাকরি পেতে অভিজ্ঞতাটাও সাহায্য করবে।' আয়ানের কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সে যাত্রা করল।

তিন

নদীয়া জেলার ছোট একটি শহর চক। পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। সেই নদীর তীরে হাইস্কুল। আয়ান তার টিনের বাক্সটা নিয়েই সেই স্কুলে হাজির হল। হেডমাস্টারমশাই অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আয়ান নাইনের একটা ক্লাস নিতে গেল। নাইন থেকে এসে সেভেন এবং সেভেন থেকে টেনের ক্লাস। এই করতে করতে স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। এতক্ষণ নতুন চাকরি পাওয়ার আনন্দে আয়ানের কিছুই মনে ছিল না। এবার মনে হল, তাকে থাকার জন্য একটা জায়গা দেখতে হবে। হেডমাস্টারমশাইয়েরও খেয়াল হল, হ্যাঁ তা দেখতে হবে। কিন্তু জায়গা কোথায়? স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই স্থানীয়। তাঁরা বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করেন। দুজন শিক্ষক বাইরের আছেন। তাঁরা একটা ঘর ভাড়া করে মেস করে থাকেন। হেডমাস্টারমশাই তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সেখানে জায়গা হবার নয়। হোটেলে কয়েক দিন থাকা যেতে পারে। কিন্তু হোটেলের খরচ অনেক বেশি। হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'যে ক'দিন কোনো ব্যবস্থা না হয় আপনি আমার বাড়িই চলুন।' আয়ান হেডমাস্টারমশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি দু-এক দিন কোনো ছোটখাট হোটেলে উঠি। এরে মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না হলে তখন দেখা যাবে।' হেডমাস্টারমশাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আয়ান খোঁজ করতে করতে গিয়ে উঠল মডার্ন হোটেলে। অবশ্য নামেই মডার্ন, ব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলের। ওপরে ছোট্ট একটা ঘর। যেমন নোংরা তেমনি অপরিষ্কার। কমন বাথরুম। এত অপরিষ্কার যে, ঢোকা যায় না। ইমাম সাহেবের বাড়িতে থাকার পর থেকে কোনো অপরিষ্কার স্থানে আয়ান থাকতে পারে না। কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। তার কাছে বেশি টাকা নেই। ভালো হোটেলে সে উঠতে পারে না। তাই এখানেই থাকতে হয়। আয়ান মডার্ন হোটেল থেকে স্কুল করে আর রোজ থাকার জায়গা খোঁজ করে। কিন্তু বাড়ি পায় না। প্রথমত সে মুসলমান। তাই হিন্দুপাড়ায় কেউ তাকে বাড়ি দেয় না। মুসলমানপাড়ায় থাকার মতো বাড়ির সংখ্যা কম। যা দু-একটা আছে সেখানে অত্যধিক ভাড়া। তার ওপর সে একা।

একা একা কোনো যুবক ছেলেকে পরিবার-সংলগ্ন একটা ঘর থাকলেও কেউ তা দিতে চায় না। কেউ কেউ বাড়িতে রাখতে চায়। কিন্তু আয়ান তাতে রাজি নয়। আলাদা বাড়ি সে পায় না। প্রতিদিনই কেউ না কেউ একটা খোঁজ দেয়। আয়ান আশা নিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। স্কুলের পিওন ঝোগড়ু একটা বাড়ির খোঁজ দিয়েছিল। সে নিশ্চয় বাড়ির মালিককে তার নাম বলেনি। বড়িটি খুব ভাল। আয়ানের পছন্দ হল। মালিকও ভাড়া দিতে রাজি হল। হঠাৎ সে আয়ানের আদি বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করল। আয়ান বলল মুর্শিদাবাদ। মালিক একটু আশ্বস্ত হল। সে বলল, 'দেখুন মশায়, আমি খোলাখুলিই বলি। আপনি ঘটি আছেন বলেই দিচ্ছি। আমরা মশায় বাঙালদের একটু সামলে চলি। ওরা পারে না, এমন কোনো কাজ নেই। স্বার্থের জন্য ঘরের মেয়েকেও অন্যের কাছে এগিয়ে দেয়।' আয়ান শিউরে ওঠে। এ কোথায় সে এসে পড়েছে! তার পুরো পরিচয় পেলে এ নিশ্চয় তাকে ঘর ভাড়া দেবে না। আয়ান তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে পালিয়ে আসে। এসে ঝোগড়ুকে বলে, 'বাড়ির কথা বলার সময় আমার পুরো পরিচয় বলা উচিত ছিল।' ঝোগড়ু বলে, 'না বাবু, ওরা লোক খুব ভালো।' সে তাড়াতাড়ি করে যায়। কিন্তু মুখ কাঁচুমাচু করে ফিরে আসে। এমন সময় হোটেলের মালিক খবর দেয় যে, ব্লকের এ. ই. ও. নিশার সাহেব কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। কিন্তু দরকার হলে যাতে এখানে থাকতে পারেন তার জন্য একটা ঘর ভাড়া করে রেখেছেন। ঘরটা ফাঁকাই পড়ে আছে। এ. ই. ও. নিশার সাহেব লোক ভালো। তাঁকে অনুরোধ করলে থাকতে দিতে পারেন। আয়ান নিশার সাহেবের কাছে গেল। নিশার সাহেব বললেন, 'হঠাৎ করে ওপরওয়ালার চাপাচাপি করলে যাতে থাকতে পারি, তার জন্যই ঘরটা রাখা। কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিলে আমার কি হবে?' আয়ান বলল, 'সেরকম হলে আপনার ঘর আপনারই থাকবে, তাতে আমার যা হবার হবে।' নিশার সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। আয়ান নিশার সাহেবের ঘরে এসে উঠল।

ঘরে এসেই আয়ান চিঠি লিখতে বসল। প্রথম চিঠি লিখল সুমিতাকে। আয়ানের মনে হল রাজিয়াকেও একটা চিঠি লেখা দরকার। কিন্তু কেমন সংকোচ হল। ইমাম সাহেব যদি কিছু মনে করেন! সে ইমাম সাহেবকেই লিখল। মা-বাবাকে খবরটা জানানো দরকার। সে শ্যামকে অনুরোধ করল, মাকে যেন খবরটা দেওয়া হয়। তারপর সফিউলকে লিখল। কালামকে লিখল। পরিশেষে অমর মাস্টারকে লিখল, 'আশীর্বাদ করুন যেন আপনার মতো শিক্ষক হতে পারি।' কয়েকদিনের মধ্যেই শ্যামের চিঠির উত্তর এল। চাকরির খবর শুনে সে নিজে এবং আয়ানের বাড়ির সকলেই খুব খুশি হয়েছে। আয়ানের মা যত শীঘ্র সম্ভব তাকে একবার বাড়ি যেতে বলেছে। প্রথম মাসের মাইনে পেলেই সে যাবে। কয়েকদিন পরেই সুমিতার চিঠি এল। শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি। সফিউল ও কালামেরও চিঠি এল। কিন্তু ইমাম সাহেবের কোনো চিঠি এল না। কিছু লেখার নেই বলেই বোধ হয় লেখেননি। আয়ান স্কুলের কাজে মন দিল। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় নাইন-টেনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। বিতর্ক শুরু হওয়ার আগে আয়ান উঠে এর নিয়ম-কানুন ঘোষণা করল। সভার মতে আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আয়ান বলল, 'পক্ষের ছেলেমেয়েরা মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। বিপক্ষের ছেলেরা এর

বিরোধিতা করবে। তারা বলবে যে, ভূমি-সংস্কারের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বা বেকার সমস্যা সমাধানের আরো অনেক উপায় আছে। এতে যে নিজের বক্তব্যকে যত যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করবে এবং বিপক্ষের বক্তব্য যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করবে সে তত ভালো বলবে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর মনে রাখবে বিতর্কে ব্যক্তিগত আক্রমণ অচল।' বিতর্ক শুরু হল। নাইন-টেনের ছেমেয়েদের তর্ক-বিতর্ক দেখে তো সকলে চমৎকার। তার সঙ্গে ছিল চিরাচরিত আবৃত্তি, গান এবং সব শেষে নাটক। মনে পড়ে সেই কবে ডোমকল স্কুলে সে নাটক করেছিল। এবার আয়ান আবার ছেলেদের সঙ্গে নাটকে অভিনয় করল। স্কুলে নতুন মাস্টারের জয়-জয়কার পড়ে গেল।

পুরস্কার বিতরণী সভা শেষ হওয়ার দিন সাতেকের মধ্যেই আয়ানের এম. এ.-র রেজাল্ট বের হল। দেখা গেল, আয়ান আটান্ন পারসেন্ট মার্কস পেয়ে বাংলায় এম. এ. পাস করেছে। হেডমাস্টারমশাই আয়ানকে ডাকলেন। তিনি বললেন, 'আপনার ডেপুটেশনের অবশ্য আর মাত্র মাস তিনেক আছে। তবে আমরা ভাবছি আপনাকে এই স্কুলে স্থায়িভাবেই রাখব।' আয়ান হেডমাস্টারমাইকে কি বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পায় না। বাড়ি ফিরেই ইমাম সাহেব আর সুমিতাকে চিঠি লেখে। রাতের ট্রেন ধরে বাড়ি রওনা হয়। রবিবারটা বাড়িতে কাটিয়ে সে সোমবার এসে স্কুল করবে। বহরমপুরে ট্রেন থেকে নেমে সে ভোরের জন্য অপেক্ষা করে। প্রথম বাস ধরেই ডোমকলে নামে। তখন সূর্যটা একবাঁশ ওপরে উঠেছে। এরকম সময়েই সে বাঘডাঙা থেকে কলেজ রওনা হত। আয়ানের মনটা বাঘডাঙ্গার জন্য ছটফট করে। মোড়ের দোকান থেকে মিস্টি কিনে সে চলতে শুরু করে। ভুবনডাঙা পেছনে রেখে সে বিলের ধারে এসে পড়ে। মা তাকে দেখেই ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বাবা ছুটে আসে। ভাই-বোনেরা তাকে ঘিরে ধরে। পাড়ার লোকজন ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে নাদের মণ্ডলও আসে। সে বলে, 'ব্যাটা-ছেলে। বিদেশ গেলছো। দোষ আমি দিবো না। আর খারাপ কাজ তো কিছু করনি। চাকরি লিয়েছো। এই গেরামে চাকরি এই পরথম। ভালো খবর। কিন্তুক কুথায় আছো, এ খবরডা দিলে কি ক্ষতি হয়?' আয়ান মৌন থাকে। এলোপাথাড়ি সবাই জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে? এখন কোথায় আছ? কি কাজ করছ?' আয়ান বলে, 'চক হাইস্কুলে মাস্টারের চাকরি পেয়েছি।' গ্রামের লোকেরা জানতে চায়, সেটা কি ডোমকলের মতো হাই স্কুল? আয়ান বলে, ডোমকলের থেকেও বড় হাই স্কুল। গ্রামের লোকেরা বোঝে, তাহলে ইব্রাহিমের ব্যাটা বড় চাকরিই পায়্যাছে। রবিবারটা কোন্‌দিক দিয়ে কেটে যায়। সোমবার একদম সকালে উঠে আয়ান থানা থেকে কলকাতাগামী স্টেটবাস ধরে কৃষ্ণনগর আসে। ওখান থেকে অন্য বাস ধরে চকে আসে। সোমবারই হেডমাস্টারমশাই তাকে স্থায়িভাবে নিয়োগ করার নিয়োগপত্র দিয়ে দেন। আয়ান পায়ের তলায় মাটি পায়। এতদিন সে মূলহীন শেওলার মতো স্রোতে স্রোতে ভেসে বেড়িয়েছে। এবার একটু সুস্থির হয়ে দাঁড়াবে। তবে সে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে না হোক, কলেজে সে ঢুকবেই। তাই বিজ্ঞাপন দেখলেই সে দরখাস্ত করে। আর গান শেখার চেষ্টা করে।

গান আয়ানের বরাবরই খুব ভালো লাগে। তাদের গ্রামে যাত্রার দল ছিল। গ্রামের লোকেরা তখন দানবীর হরিশ্চন্দ্র পালা অভিনয় করত। হারমোনিয়ম বাজত, ডুগি-তবলা বাজত। তার

ইচ্ছে করত সেও গান করে। কিন্তু তার বাবা যাত্রার দলের ছোকরা সাজতে গিয়েই কোনোদিন সফল গৃহস্থ হতে পারেনি। তাই গান-বাজনার প্রতি তার বীতরাগ না থাকলেও ভয় ছিল। ছেলে সেই গান-বাজনা শিখুক ইব্রাহিম তা চায়নি। আয়ানেরও গান শেখা হয়নি। কিন্তু স্কুলে যখন ছেলেমেয়েরা গান করত, তখন আয়ানেরও গান করতে ইচ্ছে করত। প্রাইমারী স্কুল থেকে সে গান শোনার জন্য তনুজাকে ধরে বসত। হাইস্কুলে পড়ার সময়ও আয়ান ক্লাসমেটদের মধ্যে যারা গান জানত তাদের গান শোনানোর জন্য অনুরোধ করত। নিজেও গান শিখতে চাইত। কিন্তু শেখার কোনোরকম সুযোগ ছিল না। রাজিয়া এক মাস্টারের কাছে গান শিখত। মাঝে মাঝে সে হারমোনিয়ম নিয়ে বসত। তখন আয়ানের গান শেখার জন্য তীব্র ইচ্ছে হত। কিন্তু সে ইচ্ছে প্রকাশ তখন কত অশোভন ছিল তা সে জানত। তাই মনের সে ইচ্ছেকে সে কখনও মুখে প্রকাশ করেনি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে দাঁড়াতে পারলে 'গান আমি শিখবই।' তা সে প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে। স্থায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা হারমোনিয়াম আর একজোড়া ডুগি-তবলা কিনেছে। এখানে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের একটা গানের স্কুল আছে। আয়ান সেখানেই ভর্তি হবে ঠিক করেছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছে, তার ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই ঐ স্কুলে গান শেখে। কাজেই সে ভর্তি হতে পারেনি। তার অবস্থা বিবেচনা করে দিলীপবাবু তার বাড়িতে এসে গান শেখাতে রাজি হয়েছেন। প্রতি রবিবার সকালে দিলীপবাবু আসেন। মাস তিনেকের মধ্যেই আয়ান স্বরগম রপ্ত করে ইমন রাগ শিখতে শুরু করেছে — পিয়া কি নজরিয়া যাদু ভরি। মোহিলে ও মন প্রেম ভরি। দিলীপবাবু তাকে এখুনি গান তুলতে বারণ করেছেন। কিন্তু আয়ান সে নিষেধ মানতে পারেনি। গুল বাগিচার বুলবুলি আমি রঙিন প্রেমের গাই গজল— এই নজরুল গীতিটা স্বরলিপি দেখে দেখে তুলে ফেলেছে। আর নতুন গান তুললে গাইতে ইচ্ছে করে। তাই একটু সময় পেলেই আয়ান গানটা গাইতে থাকে। এখনও গাইছিল। হঠাৎ দরজা ধাক্কা। আয়ান দরজা খুলতেই পিওন নিশার সাহেবের নামের একটা নোটিশ তার হাতে ধরিয়ে দিল। সাত দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করতে হবে।

আয়ানের খুবই কষ্ট হতে লাগল। নিশার সাহেব না থাকাতে হাউসিং-এর অধিকাংশ লোকেই খুশি ছিল। বিয়েতে বা উৎসবে দরকার হলে বিনা ভাড়ায় বাড়িটা পাওয়া যায়। আয়ান আসার পরও তারা সে আশা ত্যাগ করেনি। গতমাসে পাশের বাড়ির মেয়ের বিয়েতে আয়ানকে কয়েকদিনের জন্য বাড়িটা খালি করে দিতে বলেছিল। আয়ানের আর কোথাও থাকার জায়গা নেই। কাজেই সে বাড়িটা একদম খালি করতে পারেনি। একটা ঘরে থেকে দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। অসন্তোষ থেকে তাদের নাগরিক কর্তব্য বোধ জেগে ওঠে। কর্তৃপক্ষের কাছে তারা দরখাস্ত দেয় যে, নিশার সাহেব বাড়িতে না থেকে অন্য লোককে ভাড়া দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি এই নোটিশ। আয়ানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এখানে বাড়ি পাওয়া যে কি কঠিন তা আয়ান জানে। তা আবার সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে! যাইহোক, নিশার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু কাল অফিসের আগে নিশার সাহেবকে পাওয়া যাবে না। আয়ান হেডমাস্টারের কাছেই গেল। হেডমাস্টার তাকে হাউসিং-এর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নিয়ে গেল। আয়ান অনেক দিন থেকেই একটা বাড়ির জন্য চেষ্টা করছিল। হাউসিং-এর ফ্ল্যাটের জন্যও দরখাস্ত করেছিল।

কিন্তু পায়নি। আয়ান এই ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও কয়েকবার দেখা করেছে। ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে এবার তাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ছেলের মাধ্যমে আয়ানের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তার জন্যই হোক আর আয়ানের পাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল বলেই হোক ইঞ্জিনিয়ার হাউসিং-এর একটা ফ্ল্যাট আয়ানের নামে অ্যালট করে দিল। আয়ান একটা টেম্পোয় বইগুলো তুলে নিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেল। তবে তার জন্য নিশার সাহেবকে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হল।

নতুন হাউসিং-এ তিনটি ব্লক— এ, বি এবং সি। আয়ানের ফ্ল্যাটটা বি ব্লকের এক তলায়। নম্বর বি দুই। হাউসিং-এর সব আবাসিকই প্রায় সরকারী কর্মচারী। সরকারী কর্মচারীরা সব সময়ই দু পয়সা বেশি রোজগারের ধান্দায় থাকে। কেউ যদি সে রোগ থেকে মুক্ত হয় তবে সহকর্মীদের সব সময় দোষ দেখে এবং ওপরওয়ালার নিন্দা করে। এসব করার পর অন্য কিছু করার জন্য শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তাই বাড়িতে এসে সটান শুয়ে পড়ে। আর কারো কপাল আরো একটু ভালো হলে সে বসে বসে গিন্নির বচন শোনে। কিন্তু আয়ান নতুন গান শিখেছে। তাদের মধ্যেও গানজানা লোক খোঁজ করছে। প্রায় সকলের সঙ্গেই সে গিয়ে গিয়ে আলাপ করেছে। এ ব্লকের সমীর মুখার্জী, ছোটবেলায় নাকি তিনি গান করতেন। সি ব্লকের গণেশ দত্ত শুধু নিজে নয়, তার স্ত্রীও নাকি গান জানেন—ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক। তাদের বাড়িতে তানপুরাও আছে। আয়ান বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে এঁদের ধরে নিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় জলসা। খানিক রাত পর্যন্ত চলে। আয়ানের গানে উৎসাহ দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। যারা অনেকদিন আগে গানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিল, তারাও দু-একটা গান গেয়ে দেয়। যেদিন বি ব্লকের ডেপুটি বাবুর স্ত্রী গান গাইল, সেদিন তো সকলে থ। আজ দুবছর এখানে আছে। কোনোদিন কেউ গান গাইতে দেখেনি। সেও কিনা গান গাইল! আয়ানটার এলেম আছে। সবাই যেন তার ভক্ত হয়ে পড়েছে। তবে আয়ানের এখানে সব থেকে বড় ভক্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা সুযোগ পেলেই কেউ এসে গান শোনায়, কেউ নাচ দেখায় আর নাচ-গান হয়ে গেলে একটা চকলেট পেলেই খুশি। তাও যদি না হয়, একটুখানি আদর। আয়ানকাকু বলতেই তারা পাগল। আর আয়ানের একডাকে হাজির।

মাঝে মাঝেই আয়ানের ঘরে গানের আসর বসে। সমীরবাবু আসেন, গণেশবাবু আসেন, সি ব্লকের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে বাসন্তী আসে। পাশের ফ্ল্যাটের সুধীরবাবু পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার। কিন্তু ভালো তবলা বাজান। আমুদে লোক। তাঁকে আলাদা করে ডাকতে হয় না। আসর বসলেই চলে এসে তবলা ধরেন। আর গান বন্ধ থাকলে খৈনির মহত্ত্ব বর্ণনা করে হাসান। ... 'বাসে যাবেন, ট্রেনে যাবেন, সিনেমা হলে যাবেন, লেখা থাকবে— নো স্মোকিং। লেকিন খৈনি ইজ অ্যালাউড। তবে খৈনিরও একটা বিপদ আছে। ইন্দিরা গান্ধী মরি গেলো, জ্যোতি বসু মরি গেলো। বড় বড় নেতাদের শোক সভা হল। সেখানে খৈনি বানাবেন তো লোকে আপনার পশ্চাৎ দেশে লাথি মেরে তাড়াবে।' বিশেষ উচ্চারণে বলা শুনে সবাই হাসতে থাকে। গণেশবাবু বলেন, 'সুধীরবাবু, আপনার সর্দারজির ব্যাপারটা বলুন।' সুধীরবাবু বলেন, 'সর্দারজি বন্ধুর বাড়ি গেছে। বন্ধুর কোলের বাচ্চাটাকে সে আদর করে নিতে গেল। কিন্তু বাচ্চা কিছুতেই যাবে না। সর্দারজি ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করার জন্য বিশেষ পাঞ্জাবি উচ্চারণে বলল, দাড়ি হ্যায়, পাগড়ি হ্যায়। বাচ্চা শোচতে হ্যায় কি আদমি হ্যায় আউর

জানোয়ার হ্যায়।' সমীরবাবু বলেন, 'এটা না, ঐ লাইসিন ভি হ্যায়টা।' সুধীরবাবু শুরু করেন, 'এক সর্দারজি ড্রাইভারকে থানার লোকেরা ধরে এনেছে। বড়বাবু জানতে চান কি হয়েছে। সর্দারজি বলে, লাইসিন ভি হ্যায়, পারমিট ভি হ্যায়, ফিরভি পাকাড় লিয়্যা।' কথাগুলো তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে, না হেসে পারা যায় না। গান-বাজনা চলতেই থাকে। তাঁর স্ত্রী আর সাত-আট বছরের মেয়ে সোমাকেও তিনি নিয়ে আসেন। বাবার তবলার তালে তালে সোমা গান গায়। বাবা না থাকলেও সোমা আয়ানকাকুর কাছে চলে আসে। তার সঙ্গে মিমি আর রাখি। হাউসিং-এর শিশু বাহিনীর তারাই হোতা। এবার স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সেই নাচটি হাত নেড়ে পা ঘুরিয়ে নেচে দেখায়। আর বড়রা এসে গেলে তারা শ্রোতা হয়ে যায়। সেদিক থেকে আয়ানের বাড়িটা হাউসিং-এর গান-বাজনার ক্লাবের মতো হয়ে গেছে।

চার

বিকেল বেলা। সোনালি রোদ সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে ঝলমল করছে। সে রোদের খানিকটা এসে আয়ানের ফ্লাটের বারান্দায় পড়েছে। আয়ান সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। সুধীরবাবু এসে বললেন, 'কাল নাইট ডিউটি ছিল। সারাদিন ফ্রি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিরক্ত হয়ে গেলাম। হারমোনিয়ামটা বের করুন। গান-বাজনা হোক।' আয়ান হারমোনিয়াম এবং ডুগি-তবলা বের করল। সুধীরবাবু ডুগি-তবলা নিয়ে বসে গেলেন। কিন্তু গান গাওয়ার লোক নেই। গণেশবাবু, সমীরবাবু কেউ অফিস থেকে ফেরেননি, বিনীতার শরীর খারাপ। সুধীরবাবু বললেন, 'সব চলে আসবে। আপনি একবার শুরু করুন দেখি।' আয়ান শুরু করল। সম্প্রতি সে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছে— 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।' মিমি, রাখি ওরা মাঠে খেলা করছিল। গান শুনে তারা ঘরে এসে ঢুকল। আয়ান রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষ করে নজরুল গীতি ধরল। কিন্তু তবলা বাজিয়ে সুধীরবাবুর সাধ মিটল না। সুধীরবাবু বললেন, 'অন্যদিন তবলা বাজাবার জন্য সাধাসাধি করে। আর আজ নিজে থেকে বাজাতে চাইছি তো কারো পাত্তা নেই।' আয়ান বলল, 'বাড়িতেই যে কেউ নেই, না হলে আমি ঠিক ধরে আনতাম।' সুধীরবাবু বললেন, 'একটি মেয়ে আছে। কিন্তু বয়স্কা। ডাকলে আসবে কিনা বলতে পারছি না।' আয়ান আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'আপনি বলুন না। আনার দায়িত্ব আমার।' সুধীরবাবু বললেন, 'আমাদের ওপরে থাকে, ডাক্তারবাবুর মেয়ে।' ডাক্তারবাবুর মেয়ে, এখানে ডাক্তারবাবু তো একজনই— মিমির বাবা অবিনাশ রায়। তার মানে মিমির দিদি। আয়ান বলেই ফেলল, 'আপনি কি মিমির দিদির কথা বলছেন?' সুধীরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, মিমির মেজদি কাকলি খুব ভালো গান গায়।' ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আয়ানের আলাপ আছে। স্পোর্টসের দিন স্কুলের একটি ছেলে বর্শা ছোঁড়ায় সামান্য আহত হলে আয়ান তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

তখনই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। ডাক্তারবাবুর চার ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার— দুর্গাপুরে চাকরি করে। বড় মেয়ে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে। মেজ মেয়েটার নাকি ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং এসবের থেকে গানের প্রতি বেশি ঝোঁক। বারো ক্লাস

পাস করে স্থানীয় কলেজেই ভর্তি হয়েছে। আর ছোট মেয়ে এই মিমি। ডাক্তারবাবুর কাছেই আয়ান শুনেছিল, তাঁর মেজ মেয়ের গানের দিকে ঝোঁক। কিন্তু এতদিন এত কাছে থেকেও তার গান শোনা হয়নি। আয়ানের মনে হল, সে গিয়ে ডাকলে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু আবার ভয়ও হল। সুধীরবাবু এখানকার পুরানো লোক। তিনিই যখন আসবে কিনা বলতে পারছেন না, তখন হুট করে ডাকতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। যদি না আসে? মিমি সামনে বসে ছিল। আয়ান বলল, 'মিমি, তোমার মেজদিকে একবার জিজ্ঞেস করে এসো তো, আমরা ডাকলে আসবে কি না।' মিমি তার ছোট ছোট চুল সমেত মাথাটিকে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে সে ফিরে এসে বলল, 'মেজদি আসছে। কাপড় পরে নিচ্ছে।'

একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটি আঠারো-উনিশ বছরের টুকটুকে ফরসা মেয়ে। লাল ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচ করে একটা লালপাড় হলুদ শাড়ি পরা। হয়ত দুপুরে ঘুমিয়ে ছিল। মুখের ত্বক সতেজ। মুখটি ঘিরে যেন একটি সৌন্দর্যের আভা ছড়িয়ে আছে। লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। হাতের আঙুলগুলি ক্রমশ সরু হয়ে চাঁপা কলির মতো সুদৃশ্য। নখে শাড়ির পাড়ের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নেল-পালিশ লাগানো। কপালে একই রঙের একটি কুমকুমের টিপ। প্রথম দেখেই ভালো লাগা যাকে বলে, আয়ানের তাই লাগল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। পদ্মের মৃণালের মতো হাত দুটি তুলে কাকলি প্রতি-নমস্কার করল। আয়ান ইঙ্গিতে খাটের ওপর হারমোনিয়ামটা দেখিয়ে দিল। কাকলি গিয়ে খাটের ওপর বসল। আয়ান স্বপ্নাবিষ্টের মতো একটি চেয়ার নিয়ে একটু দূরে বসে কাকলির দিকে চেয়ে রইল। দেখে দেখে যেন সাধ মেটে না। যত দেখে মনে হয় পাতার কোলে একটি স্ফুটনোন্মুখ সতেজ কুঁড়ি বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ফোটার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছে। এক ফোঁটা শিশিরের ছোঁয়া। একটুখানি হাওয়ার দোলা যেন তার একান্ত কাম্য। বিকেলের সোনা রোদ সে মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক্ হয়ে আছে। আয়ান কবিতায় পড়েছে, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় ও পদে তপস্যার ফল।'

আয়ানের মনে হয়, শুধু তপস্যার ফল কেন, 'জীবন-যৌবন-ধন-মান' সবকিছু ও পায়ে সমর্পণ করেও যেন শান্তি নেই। আয়ানের অস্বস্তি লাগে। জীবনে সে অনেক মেয়ে দেখেছে। সে কো-এডুকেশন স্কুল-কলেজে পড়েছে। সেখানে অনেক সুন্দরী মেয়ে পড়ত। সে বিতর্কে জেলা, রাজ্য, এমনকি সর্ব-ভারতীয় স্তরে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সেসব অনুষ্ঠানেও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু তাদের কারো সামনা-সামনি হতে আয়ানের নিজেকে দুর্বল মনে হয়নি। কিন্তু আজ যেন আয়ানের নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল। আয়ান কাকলির দিকে তাকায়। কাকলি বলে, 'আমি তো ক্লাসিক্যাল গান শিখি। শোনাবার মতো গান তোলা নেই।' সুধীরবাবু বলেন, 'কেন, তুই তো রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতিও জানিস।' কাকলি বলে, 'জানি ঠিক নয়। দুয়েকটা নিজে নিজে তুলেছি।' সুধীরবাবু তবলায় একটা চাটি মেরে বলেন, 'ঐ একটা ধর।' কাকলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরে— 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো তুমি তাই'। কাকলির গান শোনার জন্য অনেকেই আয়ানের ঘরে আসে। আয়ান তাদেরকে চেয়ার-টুল এগিয়ে দেয়। এক সময় গান শেষ হয়। আয়ান কি বলে প্রশংসা করবে ঠিক করতে পারে না। আনমনেই বলে ফেলে, 'যেমন গলা মিষ্টি তেমনি সুর তালজ্ঞান।' আপনার গান

চমৎকার হয়েছে। আরেকদিন কিন্তু আসতে হবে।' কাকলি ঘাড় কাত করে বলে, 'আসব।' আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন।' আয়ান রাজি হয়। কাকলি মিমিকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'মিমু, নিয়ে যেয়ো।' মিমিও রাজি হয়। কাকলি বেরিয়ে যায়। ঘরে তখনো অন্যান্যরা হৈ চৈ করছে। আয়ানের একটু একা হতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঘরে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। সে দরজা বন্ধ করে নদীর দিকে চলে যায়।

রবিবার দিন সকালেই মিমি এসে হাজির হল। 'আয়ানকাকু, তুমি আমাদের বাড়ি যাবে বলেছিলে। মেজদি নিয়ে যেতে বলল। এখনই যেতে হবে, চল।' আয়ান কাপড় পরে নিল। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকতেই আয়ান এক দঙ্গল লোকের মধ্যে পড়ল। কাকলি আলাপ করাতে শুরু করল। 'আমার বাবা। আর বাবা, ইনি আয়ানবাবু।' বাবা হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে আর আলাপ করাতে হবে না। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েই আছে।' কাকলি আপত্তির সুরে বলল, 'কিন্তু বলনি তো?' বাবার হয়ে আয়ানই উত্তর দিল, 'বলার মতো কিছু না। আমার এক ছাত্রকে নিয়ে আমি হাসপাতালে ওনার কাছে গিয়েছিলাম।' বাবা বললেন, 'শুনলাম, আপনি এম. এ.-তে খুব ভালো ফল করেছেন।' আয়ান বিনয়ের সুরে বলল, 'ভালো ঠিক নয়— কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না।' বাবা বললেন, 'বাংলায় আটান্ন পারসেন্ট যথেষ্ট ভালো। বিশেষ করে প্রাইভেটে আটান্ন পারসেন্ট মানেই রেগুলার হয়ে দিলে অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস পেতেন। তা ভালো রেজাল্ট করে স্কুলমাস্টারিই করবেন। না অন্য কিছু চেষ্টা করছেন?' 'মাস্টারিই করব। তবে স্কুলে নয়, চেষ্টা করছি কোনো কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে। বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকটা দরখাস্তও করেছি।' 'বাবা বললেন, 'আপনার রেজাল্ট ভালো ছিল। সিভিল সার্ভিসে বসতে পারতেন। অথবা সি. এ. কিম্বা ম্যানেজমেন্টও পড়তে পারতেন।' আয়ান নিচু গলায় উত্তর দিল, 'তা পারতাম। তবে ওগুলো আমার ভালো লাগে না। যা ভালো লাগে না, তা নিয়ে সারাজীবন থাকব কি করে? তার থেকে আমার শিক্ষকতাই ভালো। একটা কলেজে চান্স হলেই পি.এইচ. ডি.-টা শুরু করব।' বাবা চুপ করে গেলেন। তাঁর মনে হল এ ছেলেটা তাঁর মেজ মেয়ের মতো। বলে, ওগুলো ভালো লাগে না। দুনিয়াতে কি ভালো লাগে? কিচ্ছু ভালো লাগে না। সোজা কথা, বেঁচে থাকতে হলে টাকার দরকার। তাহলে যেখানে কম পরিশ্রম করে বেশি টাকা পাওয়া যায়, সে কাজই ভালো।

তিনি উঠে পড়েন। কাকলি এবার তার দিদির সঙ্গে আয়ানের আলাপ করিয়ে দেয়। 'আমার বড়দি, শিউলি রায়। বাবার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন বাবা নিশ্চয় বলেছেন যে দিদি এম. বি. বি. এস. পড়ে।' দিদি একথায় বিরক্ত হয়। সে বলে, 'তোরা কথা বল। আমি মা কি করছে দেখি।' মা ইতিমধ্যেই উঠে গেছেন। এবার ঘরটা একটু ফাঁকা মনে হয়। ঘরে এখন আয়ান, কাকলি আর ছোট বোন মিমি। কাকলি বলল, 'আজ আমাদের একটা গান শোনান।' আয়ান বলল, 'আপনার মতো ভালো গাইতে পারলে না বলতেই শোনাতাম।' কাকলির মা ঘরে ঢুকছিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি যে দেখছি কাকলিকেও আপনি আপনি করছেন! ও কত ছোট না, ওকে আপনি বলবেন কি?' কাকলি বলল, 'আমি ওনাকে সেদিনই বলেছিলাম। কিন্তু উনি নাকি সকলকেই আপনি বলেন।' মা হেসে বলেন, 'মিমুকেও আপনি বলেন?' মিমি বিব্রত বোধ করে। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'আমাকে আপনি বলবে কেন? আমি কত ছোট না?' মা

হাসেন। বলেন, 'দেখুন মিমির বুদ্ধি আছে। আপনি ওদের তুমি বলবেন।' আয়ান রাজি হয়ে যায়। কাকলি মিষ্টি নিয়ে আসে। আয়ান বলে, 'সেদিন কিন্তু আমি শুধু এক কাপ চা খেতে বলেছিলাম। আপনি—না তুমি খাওনি। আমি মিষ্টি খাব কেন?' কাকলি চটপট জবাব দিল, 'আপনি একাই থাকেন। তখন কাজের মেয়েটিও ছিল না। চা করতে হলে, আপনাকেই উঠে যেতে হত। তাই খাইনি। কিন্তু আমরা তো আর একা থাকি না। না খাওয়ার কোন কারণ নেই। তাই খাবেন। নিন, খেয়ে নিন।' আয়ান কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। বাধ্য ছেলের মতো মিষ্টি খেতে থাকে। যাবার সময় কাকলিকে বলে, 'আপনি যাবেন।' কাকলি মধুর হেসে বলে, 'আপনি নয়, তুমি।' আয়ান বলে, 'হ্যাঁ তুমি। তুমি যেয়ো।' কাকলি সম্মতি জানায়, 'যাব। আপনি আবার আসবেন।' আয়ান উত্তর দেয়, 'আসব। আর তোমাকেও গান শোনাতে ডাকব।'

এরপর মাঝেমধ্যেই আসরে কাকলির ডাক পড়ে। কাকলি আসে। আয়ানও কাকলিদের বাড়িতে আসে। মিমিই ধরে নিয়ে আসে। আয়ান এমন ভাব দেখায়, যেন মিমির অত্যাচারেই তার না এসে উপায় নেই। কিন্তু মনে মনে সে মিমিকে ধন্যবাদ দেয়। মিমি ধরে আনে বলেই তো এত ঘন ঘন কাকলির সঙ্গে তার দেখা হয়। কাকলির গানও শোনা হয়। অবশ্য কাকলিকে গানও শোনাতে হয়। সেদিন, 'খোল খোল দ্বার' রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আয়ান গাইছিল। কাকলি বলল, 'তারা' এবং 'নীড়ে' জায়গা দুটোর রিডগুলো ঠিক থাকছে না, এতে মাত্রা এদিক-ওদিক হচ্ছে। আপনি প্রথমে একটা রিডের ওপরই মাত্রাটা ঠিক করুন না। তারপর মাত্রাটা ঠিক হয়ে গেলে সব রিডগুলো তুলবেন।' হারমোনিয়ামটা নিয়ে সে একবার দেখিয়ে দিল। আয়ান তার সঙ্গে গাইতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা আয়ানের ঠিক হয়ে গেল। আয়ান বলল, 'মাস্টারমশাই ভুলটার কথা বলেননি কেন?' কাকলি বলল, 'বোধ হয় উনি জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করেননি।' কিন্তু তুমি ঠিক খেয়াল করেছ।' কাকলি বলল, 'সকালে যখন প্র্যাকটিশ করছিলেন, তখনই আমার মনে হল।' আয়ানের মনে হল, তাহলে আয়ান যখন অভ্যাস করে, তখন কাকলি খেয়াল করে শোনে। তার মধ্যে কিরকম একটা সুখকর অনুভূতি হল। মনে হল, তাকে আরো ভলো করে গান শিখতে হবে।

ঘরে ফিরে আয়ান হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। সকালে সন্ধ্যায় আরো ভালো করে রেওয়াজ করে। রবিবারে দিলীপবাবু এসে আয়ানের উন্নতি দেখে খুশি হন। মাস্টারমশাইয়ের প্রশংসা শুনে আয়ান উৎসাহিত হয়। মাস্টারমশাই বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আয়ান কাকলিদের বাড়ি রওনা হয়। তার পরামর্শে কত কাজ হয়েছে তা তাকে বলতে হবে। শুনে কাকলি নিশ্চয় খুশি হবে। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাবে। আয়ান চোখের সামনে তার গভীর দৃষ্টি দেখতে পায়। সে দরজার টোকা দেয়। দরজা খোলে মিমি। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই আয়ানের সব উৎসাহ নিভে যায়। কাকলি দুটো ছেলের সঙ্গে বসে হেসেই সারা। ছেলে দুটোও হো হো করে হাসছে। একটি ছেলে কাকলির চেয়ে বয়সে কিছু বড়। অপরটি তার সমবয়সী। কিন্তু এত হাসাহাসি কিসের? আয়ানের অসহ্য মনে হয়। একদণ্ড সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় এই মুহূর্তে চলে যেতে পারলেই ভালো হয়। কিন্তু তা করলে অভদ্রতা করা হয়। তাই সে অপ্রতিভের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কাকলি এসে আলাপ করিয়ে দেয়। তার থেকে বেশি বয়সী ছেলেটিকে দেখিয়ে বলে, 'অমিতাভ চৌধুরী, আমার বড় মামার ছেলে, মাদ্রাজ আই. আই.

টি-তে ইলেকট্রনিকস্ পড়ছে। আর এ রামকৃষ্ণ, পরমহংস দেব নন— আমার ছোট মাসির ছেলে প্রেসিডেন্সিতে বি. এ. পড়ছে। একটু বেশি আঁতেল। দুজনেই গতকাল সন্ধ্যাবেলায় এসেছে। পরশু সকালে দেশের বাড়ি চলে যাবে। আর উনি আয়ানবাবু। ওনার কথা তোদের বলেছি। কাকলি তার সম্বন্ধে ওদের কি বলেছে তা আয়ান জানে না। তবে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সে নিজের কাছে লজ্জা পায়। কাকলির সঙ্গে কত সহজ সম্পর্ক। আর সে কিনা সাত-পাঁচ কত কি ভাবতে শুরু করেছিল! তার খুব খারাপ লাগে। আহত মনে দুটো হাত তুলে ওদের নমস্কার করে। ওরা প্রতি-নমস্কার করে। কাকলি বসতে বলে। আয়ান বসে । কিন্তু সে যা বলতে এসেছিল সকলের সামনে তা আর বলতে পারে না। অমিতাভ আর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে সে ঘরে ফিরে আসে।

দুদিন ধরে কাকলির গান শোনা যায়নি। তার পরিবর্তে শোনা গেছে হৈ-হুল্লোড়, হাসাহাসি, কথা-কাটাকাটি এইসব। হলই বা মামাতো দাদা, মাসতুতো ভাই। তাই বলে এত মাতামাতি কিসের? আয়ানের একদম ভালো লাগে না। একটু যে খবর নেবে, তা মিমিটাও বাইরে আসছে না। আয়ানের মনটা কেমন করে। সে বারান্দায় এসে বসে। সোমা আর রাখি মাঠের দোলনা দুটোতে দোল খাচ্ছে। একটা কাঠবিড়ালি মাঠের ইউক্যালিপটাস গাছটায় কিরির-কিরির করছে। হঠাৎ গেটের সামনে কাকলির বাবার হাসপাতালের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। অমিতাভ এবং রামকৃষ্ণ দুটো ব্যাগ নিয়ে সে গাড়িতে গিয়ে উঠল। একটু পরে তার বাবার সঙ্গে কাকলিও একটা নীল শাড়ি পরে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়িটা চলে গেল। হ্যাঁ, আজকেই ওদের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাকলির যাওয়ার তো কথা ছিল না! অথচ কাকলি চলে গেল। আর যাওয়ার আগে তাকে একবার বলেও গেল না! এটা ভারি অন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সে তো কেউ নয়। তাহলে কাকলি তাকে বলে যাবে কেন? কিন্তু সে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না যে, কাকলি তার কেউ নয়। কাকলিকে তার পৃথিবীর সকলের থেকে আপন মনে হয়। মনে হয়, তার ভালো-মন্দে আয়ানের অধিকার আছে। সে বুঝতে পারে না, এরকম কেন মনে হয়। আরো তো অনেক মেয়ে আছে। তারা কারো সঙ্গে কথা বললে বা কোথাও গেলে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু কাকলির জন্য তার কষ্ট হয় কেন? একেই কি ভালোবাসা বলে? তাহলে আয়ান কি কাকলিকে ভালোবাসে? একা বসে বসে আয়ান নানা কথা ভাবে। অনেক রাতে কাকলির ঘর থেকে রাগ ভেসে আসে। 'সীতা রামো রহমানো মহানোরে।' তাহলে কাকলি যায়নি! আয়ান আশ্বস্ত হয়।

কয়েকদিন পরে স্কুল থেকে ফিরতেই মিমি এসে বলল, 'মাস্টারমশাই ফোন করেছিল। তোমাকে কথা বলতে বলেছে।' কোন্ মাস্টারমশাই ফোন করেছিল, কখন করেছিল? কি কথা বলতে বলেছে তা সে কিছু বলতে পারছে না। অগত্যা তাকে মিমিদের বাড়ি যেতে হল। বাড়িতে যেতেই কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখন এত দেরি করে ফেরেন কেন?' কোথায় থাকেন? আয়ান চমকে ওঠে। সে তো ঠিক সময়েই ফেরে। কাকলি বলে, 'না। আমি কালও আপনার ঘরে যাব বলে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু আপনি সন্ধ্যার পর ফিরেছেন।' আয়ানের মনে পড়ে, ঠিক কথা, গত দিন তিনেক ধরে সে স্কুলের লাইব্রেরির গ্রান্ট-এর জন্য ডি. আই. অফিসে ঘোরাঘুরি করছে। আজো সেই দুপুরে গিয়েছিল, সন্ধ্যার পর ফিরেছে। কাকলি ঠিকই

লক্ষ করেছে। তাহলে কি কাকলিও তার গতিবিধির ওপর নজর রাখে? তাহলে কাকলিও কি তার মতো তাকে ভালোবাসে? আয়ানের মনে যেন একটুখানি আশার আলোক উঁকি দেয়। সেকথা ভাবতে ভাবতে সে বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তিনদিন ধরে ডি. আই. অফিসে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। কাকলি বলল, 'আপনার হেডমাস্টার শুনে খুশিই হবেন।' তার মানে হেডমাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন? আয়ান জানতে চায়। 'কিছু বলেছেন কি?' কাকলি উত্তর দিল, 'না মশায়। আপনার হেডমাস্টারমশায় তার আয়ানবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন।' আয়ান ফোনে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ফোন বেজেই চলল। কেউ ধরল না। তার মানে তিনি বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে ফোন নেই। কিসের জন্য ফোন করেছিলেন জানতে না পেরে আয়ানের মনটা উসখুস করে। কাকলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে।

গ্র্যান্টের খবর শুনে হেডমাস্টারমশাই খুশি হন। কিন্তু তিনি সেজন্য ফোন করেননি। আপনারও একটা খুশির খবর আছে। বকুলপুর কলেজ থেকে আপনার ইন্টারভিউ-র কল এসেছে। শুক্রবারই ইন্টারভিউ। আমার মনে হচ্ছে, আপনার হয়ে যাবে। আচ্ছা, হলে কি আপনি চলে যাবেন?' আয়ান কোনো উত্তর দিতে পারে না। হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে তিনি বহুভাবে ঋণী। স্কুলে কাজ পাওয়া থেকে স্থায়ীকরণ প্রতিটি ব্যাপারেই হেডমাস্টারমশাই তাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে ফেলেছেন। তাই তাঁকে ছেড়ে যেতে হলে আয়ানেরও কষ্ট হবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আয়ান বলে, 'পাব কি না, জানি নে। তবে যাই করি, আপনার পরামর্শ ছাড়া করব না।' হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'তা আমি জানি। তাই আপনার চিঠিটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ফোন করেছিলাম। আমার মন বলছে আপনার হয়ে যাবে। হয়ে যাক। আমার প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে। একজন ভালো সহকর্মী না থাকলে স্কুল চালানো কি যে মুশকিল তা তো জানেন। তা আর কি করা যাবে!' হেডমাস্টারমশাই খুশি হয়েও খুশি হতে পারেন না। আয়ান নমস্কার করে বাড়ি রওনা হয়।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে আয়ান সুমিতার একখানা চিঠি পেল। সুমন তাকে বিয়েব প্রস্তাব দিয়েছে। সুমিতা আয়ানের মতামত চেয়েছে। কিন্তু সে কি মতামত দেবে? সুমনকে তার ভালো লাগে না। কিন্তু বেচারা কত আশা করে প্রস্তাব দিয়েছে! নিরাশ করতে বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিন্তু তার আগে সুমিতার নিজের কি মত সেটা জানতে হবে। সে সুমিতাকে সেকথাই লিখবে। বাড়ি ফিরে আয়ান কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে। এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল কাকলি, সঙ্গে মিমি। ঘরে ঢুকেই কাকলি বলল, 'কাল গ্র্যান্টের খবর শুনে হেডমাস্টারমশাই নিশ্চয় খুব খুশি হলেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, উনি খুবই খুশি হয়েছেন। তবে তার জন্য টেলিফোন করেননি।' 'তবে কিসের জন্য করেছিলেন?' কাকলি প্রশ্ন করে। আয়ান বলে, 'বকুলপুর কলেজ থেকে লেকচারারের জন্য আমার একটা ইন্টারভিউ লেটার এসেছে। উনি সেই খবরটাই দিতে চেয়েছিলেন।' কাকলি একটু চুপ করে গেল। তারপর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, 'তাহলে ভালো খবর, বলুন! কবে যাচ্ছেন?' আয়ান বলল, ইন্টারভিউ তো দিই, পাব কি না ঠিক নেই। পেলেও এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছি না। তুমি বস।' কাকলি বলল, 'এখন বসব না। পরে আসব।' আয়ান সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল। অনেক দিন থেকে বলব বলব ভাবছি, কিন্তু বলতে পারছি না।' কাকলি

হাল্‌কাভাবে বলল, 'বলে ফেলুন।' সে বোনের হাত ধরে খাটের ওপর বসে পড়ল। কিন্তু আয়ান কিছুতেই বলতে পারল না। বলল, 'এখন থাক, পরে বলব।' কাকলি বলল, 'না শোনা হলে আমার আবার অশ্বস্তি লাগবে। সারা রাত ঘুম হবে না।' আয়ান যেন একটা মহাসুযোগ পেল। সে মুখটা নিচু করে বলল, 'আমি তো অনেক রাত জেগে কাটিয়েছি, তুমি না হয় দু-এক রাত কাটাও।' কাকলি সেকথা গায়ে না মেখে বলল, 'বলে ফেলুন, বলে ফেলুন।' আয়ান আবার বলল, 'এখন না, পরে বলব।' মিমি হেসে উঠল, 'বুঝেছি, আমি আছি বলে তুমি বলছ না।' আয়ান কাকলি দুজনেই মিমির মুখের দিকে তাকায়। না, সেখানে কোনো কুটিল ছায়া নেই। ছেলেমানুষ, ও এমনিই বলেছে। কাকলি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। শেষবারের মতো আয়ানকে বলে, 'আমার কিন্তু খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।' আয়ান বলল, 'আমারও খুব বলতে ইচ্ছে করছে। বলতে না পারায় কষ্ট হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়িই বলব।' আয়ান আশ্বাস দেয়। কাকলি বোনের হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

আয়ান কিভাবে কথাটা বলবে ভাবতে থাকে। মনে মনে সে কাকলিকে ভালোবাসে। কাকলিকে সে ভালোবাসে কথাটা ভাবতে বুকটা ভরে ওঠে। তাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করে পেতে চায়। কাকলির কথাবার্তা শুনে মনে হয় কাকলিও আয়ানকে ভালোবাসে। তবুও সন্দেহ হয়, সত্যি সত্যি ভালোবাসে তো? আয়ানের ভয় হয়। শুনে কাকলি যদি রেগে যায়! যদি ডাক্তারবাবুকে বলে দেয়! ডাক্তারবাবু যদি তাকে অপমান করে! যদি লোক জানাজানি হয়ে যায়! সে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না। আর যদি কাকলি তাকে ভালোওবাসে, তাহলেও কি তাকে বিয়ে করতে রজি হবে! কলেজের চাকরিটা হয়ে গেলে সে মোটামুটি একটা ভদ্রস্থ চাকরি করবে বটে। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হল ধর্ম। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে প্রায় অসম্ভব। কাকলি কি আয়ানের জন্য এতটা ঝুঁকি নিতে চাইবে? সে চাইলেও কি ওর বাবা-মা রাজি হবেন? আয়ান কোনোরকম আশার আলো দেখতে পায় না। তাহলে কি এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভালো! আয়ান ভেবে দেখে। কিন্তু পারে না। কাকলির চিন্তা সে ত্যাগ করতে পারে না। কাকলিকে ছেড়ে সে বাঁচবে না। কাকলিকে ভালোবাসার কথা না জানিয়ে তার শান্তি নেই। কাকলিকে জানাতেই হবে যে, আয়ান তাকে ভালোবাসে। কাকলির কাছে জানতে হবে, সে আয়ানকে ভালোবাসে কি না! আয়ান ভাবতে থাকে কি করে জানাবে? আয়ান ভাবে কাকলিকে একা পেলে সে বলবে, 'কাকলি, আমি তোমাকে খুব খুব খুব ভালোবাসি।' না, 'খুব' দিয়ে সে কাকলিকে কিরকম ভালোবাসে তা ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না। 'অনেক' বললে কেমন হয়?' না, তাও হচ্ছে না। 'দারুণ'? তাতেও সে কাকলিকে কেমন ভালোবাসে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। ভাষার কোন শব্দ-সজ্জাই হৃদয়ের আকৃতিকে রূপ দিতে পারে না। তা যখন পারে না তখন আয়ান সাধারণ-ভাবেই বলবে, 'কাকলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আর? 'আর আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।' কাকলি কি বলবে? কাকলিও বলবে, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।' কি সুখ, কি সুখ! সমস্ত হৃদয়-মন ভরে একটা সুখ বিরাজ করে। একেই বোধ হয় লোকে ভালোবাসা বলে। ভালোবাসা এত সুন্দর আয়ান আগে তা কখনো জানতে পারেনি।

ক'দিন থেকে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই আয়ান কাকলিকে একা পায়নি। কাকলির মা

বাবার বাড়ি গেছেন। কিন্তু সকালবেলায় বাবা থাকেন। দুপুরে আয়ান স্কুলে যায়। রবিবার দুপুরে সে বাড়ি থাকে। কিন্তু কাকলি রবীন্দ্র ভবনে গান শিখতে যায়। রাস্তায়ও কথা বলার উপায় নেই। কাকলি রিক্সা দাঁড় করিয়ে রেখে গান শিখতে ঢোকে। আবার বের হয়েই রিক্সাতে উঠে পড়ে। আয়ান একদিন রবীন্দ্র ভবনেই গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল ওরা দোতলায় গান শেখে। আয়ান রবীন্দ্র ভবনের এক কর্মচারিকে ওকে ডেকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। কর্মচারিটি ফিরে এসে ওকে ওপরে যেতে বলেছিল। আয়ান উঠতেই দেখে সিঁড়ির মুখে কাকলি তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্রথম দিনের পোশাক। তবে আজ খোঁপা বাঁধা। খোঁপায় সাদা ফুল। সে নিজেও যেন একটি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। সিঁড়ির মুখে অথবা আয়ানের হৃদয়ের পথে ফুটে আছে। আয়ান অপার বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কাকলি আস্তে করে জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে ডেকেছেন?' 'তোমাদের যিনি তবলা বাজান, তিনি খুব ভালো বাজান বলেছিলে। আমি ওনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।' 'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ডেকে দিচ্ছি।' এই বলে কাকলি জায়গাটাকে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল। আয়ানও তবলার মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল। কাকলির বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারেনি। তাই কথা না বলেই চলে আসতে হয়েছিল।

বিকেলে কাকলি বাড়িতে থাকে। কিন্তু তখন আয়ানের কাছে অনেক লোক থাকে। সে কিছুতেই একা হতে পারে না। তাই কাকলির সঙ্গে কথাও বলা হয় না। আজ আয়ান স্কুলে গেল না। বসে বসে কাকলিকে কিভাবে কথাগুলো বলবে সেটাই ভাবতে লাগল। কাকলির বাবা বেরিয়ে যেতেই সে কাকলির কাছে গিয়ে হাজির হল। আয়ানকে দেখেই কাকলি বলল, 'আপনি স্কুলে যাননি?' আয়ান বলল, 'না, আজ ছুটি নিয়েছি।' 'কেন? আপনার শরীর খারাপ? মুখটা অত শুকনো শুকনো লাগছে কেন?' কাকলি একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে। আয়ান বলে, 'শরীর খারাপ নয়। তবে আমার কিছু ভালো লাগছে না। তোমাকে কথাটা না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।' কাকলি বলে, 'আমি তো শুনতেই চেয়েছিলাম। আপনিই বললেন না। এখন বলুন।' 'আয়ান চারিদিকে তাকায়। 'বাড়িতে আর কেউ নেই?' কাকলি বলে, 'না, মিমি ওঘরে ঘুমুচ্ছে।' আয়ান বলে, 'তার আগে তোমায় একটা কথা দিতে হবে।' 'কি কথা?' কাকলি জানতে চায়। আয়ান বলে, 'আমার কথা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তুমি আমাকে যা খুশি বল, যা খুশি কর ; কিন্তু অন্য কাউকে কথাটা বলবে না।' কাকলি বলে, 'কথা দিচ্ছি, কাউকে বলব না।' আয়ানের তবুও যেন বিশ্বাস হয় না। বলে, 'আমার গা ছুঁয়ে বল তো।' কাকলি অভিমান করে, 'আমার মুখের কথায় আস্থা রাখতে পারছেন না!' তবুও আয়ানের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, 'আপনি আমাকে যে কথা বলবেন তা আপনার বিনা অনুমতিতে আব কাউকে বলব না। হল তো? এবার বলুন।'

আয়ান লজ্জায় লাল হয়। অনেক চেষ্টা করেও সে যা যা বলবে ভেবেছিল তার কিছুই বলতে পারে না। শুধু অস্ফুটে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, 'আমি যদি তোমাকে নিয়ে কিছু ভাবি, তাহলে কি অন্যায় হবে?' কাকলি স্পষ্ট উত্তর দেয়, 'নিশ্চয় হবে।' আয়ান ঘামতে থাকে। কি লজ্জা, কি লজ্জা! তার মানে কাকলি তার কথা পছন্দ করেনি। নিজেকে ভিখারির মতো মনে হয়। সে একটি মেয়ের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মেয়েটি তার

দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আয়ান কিছু বলতে পারছে না। যে বজ্রাহতের মতো বসে আছে। হঠাৎ বৃষ্টি হয়। কাকলি আস্তে করে বলে, 'আপনার কিছু বলার থাকলে বাবাকে বলুন।' তাহলে কি কাকলি তার প্রতি বিরূপ নয়! আয়ান বলে ওঠে, 'সেসব পরে হবে। কিন্তু তোমার আপত্তি নেই তো?' কাকলি রাগ করে, 'আপনার কি তাই মনে হয়? আমি তো বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি কি বলতে চান। আপনি বুঝতে পারেন না?' আয়ান কোন উত্তর দিতে পারে না। সে তো অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছিল। সেই মামাত দাদার সঙ্গে হাসাহাসির সময় বুঝতে পেরেছিল, কাকলিকে গাড়িতে উঠতে দেখে বুঝতে পেরেছিল, আর কাকলি নিজের ঘরে থেকেও তার গান শোনে এবং তার যাওয়া-আসা খেয়াল করে সেকথা জেনেও বুঝতে পেরেছিল। তবুও যেন বুঝতে পারে না। কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। কেন যে এমন হয়! আয়ান সেকথাই ভাবছিল। কাকলি আবার বলল, 'আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন।' আয়ান বলল, 'সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যার কথা তো জানো। বাবার সঙ্গে কথা বলতে গেলে উনি যদি রাগ করেন?' কাকলি বলে, 'জানি, তবে বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করে। আমার ধারণা, আপনি প্রস্তাব দিলে বাবা আপত্তি করবে না।' আয়ানের ভারি ভালো লাগে। পৃথিবীতে নিজেকে সব থেকে সুখি বলে মনে হয়। ও ঘর থেকে মিমি চোখ মুছতে মুছতে আসে। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। মিমি তুলে বলে, 'হ্যালো। বাবা? বলো। আমি? আমি কিছু করছি না। দিদি? আয়ানকাকু এসেছে, গল্প করছে। আয়ানকাকু, আয়ানকাকু। না, আর কেউ আসেনি। তুমি কখন আসবে? না তাড়াতাড়ি এসো। বাজারে যাবে? তাহলে আমার জন্য একটা পুতুল এনো। আচ্ছা।' মিমি ফোনটা নামিয়ে রাখে। কাকলি আর আয়ান একে অপরের দিকে তাকায়। আয়ান বলে, 'ফোনটা তোমার ধরা উচিত ছিল।' কাকলি বলে, 'আমি কি করে জানব বাবার ফোন? আর ফোন তো সব সময় মিমিটাই ধরে।' মিমি এসে আয়ানের কোলের কাছে দাঁড়ায়। 'তোমাদের কি হয়েছে গো? তোমাদের ঘুম পায় না?' আয়ান বলে, 'হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে।' সে কাকলির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে। ঘরে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

জীবনের সব কাজের মধ্যেই আয়ান এখন ছন্দ খুঁজে পায়। সকালবেলায় উঠে রেওয়াজ করতে বসে। স্নান-খাওয়া করে স্কুলে যায়। স্কুলের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে আপন মনে হয়। তাদের প্রাণভরে পড়ায়। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে। একটু দূরেই কাকলির উপস্থিতি টের পায়। কিছুদিন বাদে কাকলি একই সঙ্গে তার ঘরে থাকবে। ভাবতেই আয়ানের বুকটা আনন্দে ভরে যায়। কাকলিকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কিছু খাওয়াতে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কাকলির কি মজা! তাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করলেই মিমিকে পাঠিয়ে দেবে। মিমি এসে বলবে, 'মা ডাকছে।' আর গেলেই খাবার এগিয়ে দিয়ে বলবে, 'খেয়ে নিন।' আয়ানের কেমন সংকোচ হয়। কিন্তু না করতে পারে না। খেয়ে নেয়। সেদিন তার বাবা কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন। সরপুরিয়া এনেছিলেন। কোন কথা নেই। মিমি এসে আয়ানকে ধরে নিয়ে গেল। একটা কিছু উপলক্ষ পেলেই নিয়ে যায়। আয়ান আপত্তি করেছিল। মা বললেন, 'কি করব বলুন? আপনাকে না দিয়ে মিমি খাবে না।' মিমি কি নিজে থেকেই এরকম করে, না এতে কাকলির হাত আছে আয়ান বুঝতে পারে না। সে ভাবতে থাকে, কি করে কাকলিকে খাওয়ানো যায়।

আয়ানের সুযোগ হয়ে গেল। তার গানের মাস্টারমশাই গীতশ্রী উপাধি পেলেন। সেই উপলক্ষে আয়ান তাঁকে খেতে নিমন্ত্রণ করল। আয়ান তার হেডমাস্টারমশাইকেও ডাকল। কাকলির মাকে বলল, 'গানের মাস্টারমশাই আসবেন, গান-বাজনা হবে। কাকলি থাকলে ভালো হয়!' মা রাজি হয়ে গেলেন। আয়ান কাকলিকে গানের মাস্টারমশাই এবং হেডমাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। গানের মাস্টারমশাই কাকলিকে গাইতে বললেন। কাকলি গাইল ঝুমুর জাতীয় একটি নজরুলগীতি—'নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা।' আয়ানের অপূর্ব লাগল। আয়ান বলল, 'গানটি আমায় শিখিয়ে দেবে?' কাকলি রাজি হল। খাওয়া-দাওয়া হল। আয়ান আজ দুই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কাকলিকে নিজহাতে খাওয়াল। মাস্টারমশাইরা বিদায় নিলে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

স্কুলে যাওয়ার পথে আয়ান দেখল, সিনেমা হলে মৃণাল সেনের 'কোরাস' চলছে। কিছুদিন আগে সে ছবিটা দেখেছিল। ভালো লেগেছিল। কাকলিকে ছবিটা দেখানোর জন্যে তার ইচ্ছে হল। ফেরার পথে সে রবিবারের বিকেলের শোয়ে ব্যালকনিতে দুটো টিকিট কাটল। একা একা তো আসবে না। যদি আয়ানের সঙ্গে আসতে চায় আসবে। না হলে কাউকে সঙ্গে করে যাবে। আজই টিকিট দুটো সে কাকলিকে দিয়ে দেবে। স্কুল থেকে ফিরে সে হাত-মুখ ধুচ্ছে। কাকলি এসে হাজির হল। সে বলল, 'রবীন্দ্র ভবনে রবিবার বিকেলে আমাদের গানের স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনেক শিল্পী আসবেন। আপনার জন্য দুটো কার্ড এনেছি।' আয়ান তার টিকিট কাটার কথা চেপে গেল। সিনেমা অন্য দিনও দেখা যাবে। সে বলল, 'আমি একা কিন্তু যাব না। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে অবশ্যই যাব।' কাকলি বলল, 'আমার আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর মাও নিশ্চয় রাজি হবে না।' আয়ান বলল, 'আমি একা কিন্তু যাব না।' কাকলি বলল, 'কার্ড দুটো রাখুন। আপনি চারটের সময় তৈরি হয়ে থাকবেন। সাড়ে চারটের মধ্যে যদি আমি বের হয়ে না আসি তবে জানবেন যে, আমার যাওয়া হচ্ছে না।'

আয়ান সিনেমার টিকিট দুটো সুধীরবাবুকে দিয়ে দিল। পৌনে চারটের সময় আসার জন্য একটি রিক্সাকে বলে রাখল। সাড়ে তিনটে নাগাদ সে কাপড়-জামা পড়ে তৈরি হয়ে গেল। কার্ড দুটো পকেটে পুরে সে কাকলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পৌনে চারটের সময় রিক্সা এসে গেল। আয়ান রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে পথের দিকে কান পেতে থাকল, কখন কাকলির পায়ের শব্দ শোনা যায়! সাড়ে চারটে বেজে গেল। কাকলির কথা অনুসারে এবার ধরে নিতে হবে তার যাওয়া হবে না। কিন্তু সেকথা সে মেনে নিতে পারল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল, যদি শেষ পর্যন্ত কাকলি আসে! কিন্তু কাকলি এল না। আয়ানের একবার মনে হল, বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করে। সংকোচ আর শংকায় তাও হল না। পাঁচটার সময় রিক্সাওয়ালা তাড়া দিল। আয়ান রিক্সায় চড়ে বসল।

মিমি মাঠে খেলা করছিল। সে এসে বলল, 'আয়ানকাকু, কোথায় যাচ্ছ গো? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' মিমি রিক্সায় উঠে বসল। আয়ানের যাওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্র ভবন। কিন্তু এখন রবীন্দ্র ভবন যাওয়া বৃথা। সে বাজারে গেল। মিমিকে একটা পুতুল কিনে দিল, আর কাকলির জন্য একটা সঙ্গীত শিক্ষার বই কিনে ফিরে এল। মিমি বাড়ি চলে গেল। আয়ান একা

পড়ে থাকল। রাতে সে ঘুমোতে পারল না। কাকলি তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যেতে চাইলে তাই নিয়ে হয়ত বাড়িতে ঝামেলা হয়েছে। কাকলিকে হয়ত বাবা-মা খুব বকেছেন। কাকলি এখন কেমন আছে! তার জন্যই এমন হল। একসঙ্গে না যেতে চাইলে তো কাকলি যেত। তারও যাওয়া হত। কিন্তু একসঙ্গে যেতে চেয়ে সব গণ্ডগোল হল।

হাউসিং-এ থাকতে তার একদম ভালো লাগল না। স্কুল থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু বাড়িতেও তার মন টিকল না। পরের দিনই আবার হাউসিং-এ হাজির হল। কাজের মেয়েটি এসে ছুটি চাইল। সে বগুলায় তার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি যাবে। আয়ান বলল, 'আমি তো এখন বাড়ি যাচ্ছি না। ছুটি কেমন করে হবে?' মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, 'আপনি আবার বাড়ি যাবেন কেন? আপনার তো এখানেই সব হবে!' মেয়েটি যে কাকলিকে ইঙ্গিত করছে তা আয়ান বুঝতে পারল। তার খারাপ লাগল। কিন্তু কাজের মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে তার রুচিতে বাধল। সে তাকে ছুটি দিয়ে দিল। পরের দিন সকালে মিমি এসে আয়ানকে ডেকে নিয়ে গেল। মিমি অন্য ঘরের দিকে চলে যেতেই কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে গিয়ে আবার চলে এলেন কেন?' আয়ান ভাববাচ্যে উত্তর দিল, 'স্কুল আছে না!' 'কিন্তু আমি তো শুনলাম, আপনি স্কুল থেকে চারদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। দুদিন না যেতেই ফিরে এসেছেন।' কাকলি পাল্টা প্রশ্ন করল। এবার আয়ানকে স্বীকার করতেই হল, 'বাড়িতে ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম।' কাকলি বলল, 'তা ফ্ল্যাটের ঘরটিকেই যদি এত ভালো লাগে তাহলে রাত দুপুরে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন কেন? আপনার খারাপ না লাগতে পারে। কিন্তু আর কারো তো খারাপ লাগতে পারে? বাড়িতে মা কেমন আছেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'ভালো।'. কাকলি জানতে চাইল, 'বাবা?' আয়ান আবার বলল, 'ভালো।' কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'ভাইবোনেরা?' আয়ান বলল, 'ভালো।' 'আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন কেন?' 'ভালো লাগল না।' 'এখানে ভালো লাগছে?' 'না।' 'কেন?' আয়ান বলল, 'সেকথা তুমি জান। সেদিন আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তুমি অনুষ্ঠানে গেলে না কেন?' মা যে রাজি হননি সেকথা কাকলি বলতে পারল না। সে বলল, 'আমার মতো একজন অনাত্মীয়া কলেজের ছাত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে গেলে হাইস্কুলের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইয়ের কি খুব সুনাম হত?' আয়ান পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার অনাত্মীয়া?' কাকলি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, 'লোকের চোখে তো তাই। আপনার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কি জানে যে আমি আপনার বিশেষ আত্মীয়া?' বিশেষ কথাটা বলতে গিয়ে কাকলির গলায় কিরকম কৌতুক খেলে গেল। আয়ান রাগের ভান করে বলল, 'আমাকে বসিয়ে রেখে গেলে না। আবার ঠাট্টা হচ্ছে। আমি কিন্তু বাড়িতে মাকে তোমার কথা বলেছি।' 'মা কি বললেন?' কাকলি প্রশ্ন করল। আয়ান বলল, 'মা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।' কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'মাকে নিয়ে এলেন না কেন?' আয়ান বলল, 'বাড়ি ছেড়ে মার বের হওয়া সহজ নয়।' কাকলি বলল, 'আপনার তো স্কুল যাওয়া কঠিন নয়। বাড়িতে যখন থাকলেন না তখন স্কুলে যান।' আয়ান হাল্কা মনে স্কুলে গেল।

স্কুলে হেডমাস্টারমশাই তাকে অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটারটা ধরিয়ে দিলেন। বকুলপুর কলেজে লেকচারারের চাকরিটা তার হয়েছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই জয়েন করতে হবে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'আমার স্কুলের ক্ষতি হবে। তবুও বলব আপনি যান। আপনার জীবন সুখের হোক।' স্কুলের তরফ থেকে তিনি একটা ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা করলেন। খবরটা হাউসিং-এ ছড়িয়ে পড়ল যে, আয়ানবাবু বকুলপুর কলেজের লেকচারারের কাজ পেয়েছেন। আসছে মাসেই চলে যাবেন। কাকলি আয়ানের ঘরে এসে ঢুকল। 'আপনি চলে যাচ্ছেন?' আয়ান বলল, 'তুমি না করলে যাব না।' কাকলি বলল, 'আপনি যেরকম কাজ চান সেরকম কাজই পাচ্ছেন। আপনি নিশ্চয় যাবেন। আমি না করব কেন? কিন্তু আমার খুব ভয় করছে। আপনি কাছে ছিলেন। আমার খুব ভালো লাগত। কিছু বলার থাকলে সহজেই বলতে পারতাম। দূরে চলে গেলে, সেটা তো হবে না। আমার কিছু বলার থাকলে বলব কি করে?' আয়ান বলল, 'তুমি চিঠি লিখো। বকুলপুরের ঠিকানা তো তুমি জান। কখনো ঠিকানা ভুলে গেলে বাড়ির ঠিকানায় লিখো। আমি যেখানেই থাকি তোমার চিঠি পাব। তুমি কোনোরকম চিন্তা কোরো না। আমি যেখানেই থাকি, তোমারই থাকব। তুমি নিজে না চাইলে আমি অন্য কারো হব না। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। মন খারাপ কোরো না। দরকার মনে করলে আমাকে খবর দিও। একদম অসম্ভব না হলে আমি অবশ্যই আসব।' কাকলি আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। মুখে কোনো কথা বলল না।

পাঁচ

বর্ধমান জেলার এই বকুলপুর জায়গাটা খুব সুন্দর। শহর হলেও এখানে গ্রামের ছোঁয়া পাওয়া যায়। কলেজটি আরো সুন্দর। আমবাগানের পাশে একটা বড় মাঠের মধ্যে কলেজ। কলেজের সামনে ফুলের বাগান। তাতে রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। একপাশে ছাত্রদের হোস্টেল। হোস্টেলে দু'টি ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে। একটি, হোস্টেল সুপারের। অপরটি ডেপুটি সুপারের। ডেপুটি সুপারের কোয়ার্টারটি ফাঁকা ছিল। আয়ান তাতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের ডেপুটি সুপার হয়ে গেল। হোস্টেলের পেছনে একটা সেচের খাল। খালের পাড়ে শাল-পিয়াল আর ইউক্যালিপটাসের গাছ। প্রিন্সিপ্যাল করিম সাহেবের কোয়ার্টারটা খানিকটা দূরে। আয়ানের কলেজটি বেশ পছন্দ হল। মাসের পয়লা তারিখেই সে জয়েন করল।

চকে থাকতেই আয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমরবাবুর সঙ্গে পি-এইচ. ডি.-র কাজ আরম্ভ করার জন্য যোগাযোগ করেছিল। সমরবাবু তাকে এমাসে দেখা করতে বলেছিলেন। শনি-রবিবার কলেজ বন্ধই থাকে। শুক্রবারে একদিনের ছুটি নিয়ে আয়ান কলকাতা এল। সমরবাবু তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজ পরিবর্তনের ছবির ওপর কাজ করাতে রাজি হলেন। আয়ান রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত জমা দিয়ে দিল। আয়ান ঠিক করেছে সে গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা এবং ধাত্রীদেবতার ওপর জোর দিয়ে কাজ করবে। গণদেবতা তার আছে। কলেজ স্ট্রিটে এসে অপর বই দুটো সে কিনে নিল। সবে তিনটে বেজেছে। এখন বকুলপুর ফিরে যেতে পারা যায়। কিন্তু সে ঠিক করল নিশার সাহেবের বাড়ি যাবে। চকে যখন কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছিল না, তখন নিশার সাহেব তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়ে খুবই উপকার করেছিলেন। আয়ানের উপকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফ্ল্যাটটা ছাড়তে

হয়েছিল। তাই আয়ান নিশার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ। চকে থাকতে সে মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে যেত। শেষের দিকে নিশার সাহেবও যেতেন। একদিন রাতে আয়ানের ফ্ল্যাটে ছিলেনও। তিনি বারবার আয়ানকে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলেছেন। আয়ান যাব-যাব বলেছে। কিন্তু যাওয়া হয়নি। তাই আজ যখন হাতে সময় আছে সে যাবে।

নিশার সাহেবের বাড়ি বর্ধমান জেলার কোনো এক গ্রামে। সেখানে তাঁদের অনেক জমিজমা আছে, দোতলা বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে তাঁরা কেউ থাকেন না। নিশার সাহেবের স্ত্রী শহরের মেয়ে। গ্রামে গিয়ে থাকতে পারেন না। তাছাড়া নিশার সাহেব শহরে শহরেই চাকরি করেছেন। তাঁর মেয়ে দু'টিও শহরে মানুষ হয়েছে। তারাও গ্রামে গিয়ে থাকতে চায় না। তাই নিশার সাহেব কলকাতাতেই একটা বাসা ভাড়া করে থাকেন। বড় মেয়ের কলকাতাতেই বিয়ে হয়েছে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার। দুবাইয়ে থাকেন। মেয়ে এখন নিশার সাহেবের কাছেই। তাঁর ছোট মেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম. এ. পড়ছে। সে নাকি ভালো গান করে। আয়ান ঠিকানাটা মনে করার চেষ্টা করে। তিন নম্বর হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা ছয়। নিশার সাহেব বলেছেন, মানিকতলা মোড়ের কাছে রাস্তার ওপর যে মন্দির আছে তারই কাছাকাছি। হিন্দুপাড়া। এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতেই তাঁরা ভাড়া থাকেন। বাড়িওয়ালা খুব ভালো। বিপদে-আপদে দেখাশোনা করেন। নিশার সাহেব তার ভরসাতেই বাড়িতে স্ত্রী এবং মেয়েদের রেখে বাইরে চলে যেতে পারেন।

আয়ান একটা মিনিবাসে করে মানিকতলা মোড়ে নামল। মোড়ের কাপড়ের দোকানে জিজ্ঞেস করতে মন্দিরটা দেখিয়ে দিল। আয়ান দেখল, আর একটু আগে নামলেই ভালো হত। সে মন্দিরের দিকে হাঁটতে লাগল। মন্দিরের কাছে গিয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানল, আরো একটু এগিয়ে উত্তরে যে গলিটা গিয়েছে ঐটাই হরিতকি বাগান লেন। আয়ান নম্বর ধরে এগোতে লাগল। যে বাড়িটা তিন নম্বর হওয়ার কথা তার সামনে রাস্তার ধারে এক প্রৌঢ়া দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়ে দুটি বেশ লম্বা। তারা সালোয়ার-কামিজ পরে আছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাল্‌কা গড়ন, দেখতে ফরসা, ছোট মেয়েটি তো বেশ সুন্দরী। সপ্রতিভ কথাবার্তা। আয়ানের তাদের জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা চায়ের দোকান। সেখানে জিজ্ঞেস করতে একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল। কিন্তু বাড়িটা তালাবন্ধ। আয়ান আবার চায়ের দোকানে এল। দোকানদার এদিক-ওদিক দেখল। তারপর রাস্তার ধারের সেই তিন মহিলার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওনাদের জিজ্ঞেস করুন।' আয়ান অগত্যা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তিন নম্বর বাড়ি কোন্‌টা দয়া করে বলবেন?' প্রৌঢ়া মহিলা জানতে চাইলেন, 'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?' আয়ান বলল, 'নিশার সাহেবের সঙ্গে।' মহিলা বললেন, 'কিন্তু তিনি তো এখন বাড়িতে নেই। আপনি কোথা থেকে আসছেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'বকুলপুর থেকে।' মহিলা জানতে চাইলেন, 'কিছু বলতে হবে?' আয়ান বলল, 'না, শুধু বলবেন আয়ান এসেছিল।' এতক্ষণ মহিলা কোনো আগ্রহই দেখাচ্ছিলেন না। রাইটার্সে কেরানীবাবুর কাছে কেউ কাজের খোঁজে গেলে যেমন ব্যবহার করেন, মহিলা সেরকমই ব্যবহার করছিলেন। নাম বলাতে তিনি হেসে ফেললেন, 'তাই বলুন! নাম বলবেন তো। অফিস থেকে অনেক লোক আসে। আমি মনে করেছি কোন অফিসের কাজে এসেছেন। ওঁর কাছে

আপনার কথা অনেক শুনেছি। চলুন, বাড়িতে চলুন। উনি একটু পরেই চলে আসবেন।' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জোছ্না, চাবি তোর কাছে আছে, না ঝরনার কাছে?' বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে দেখাল। মহিলা বললেন, 'জোছ্না, দারজাটা খোল তো।' জোছ্না দরজা খুলল। আয়ান তাদের সঙ্গে বাড়িতে এসে বসল। মহিলা গুচ্ছের মিষ্টি বের করলেন।

খেতে খেতেই নিশার সাহেব এসে গেলেন। তিনি বললেন, 'আজ রাতে কিছুতেই যাওয়া হবে না। এত তাড়া কিসের? কাল তো আপনার কলেজ ছুটি। আয়ানের যাওয়া হল না। নিশার সাহেবের স্ত্রী রান্না করতে লাগলেন। জোছ্না গান শোনাল। ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল, 'আলো আমার আলো, ওগো আলো ভুবন ভরা'। গানটা আয়ানেরও তোলা। চকেই তুলেছিল। জোছ্না যে খুব ভালো গায়, তা নয়, তবে খারাপও গায় না। নিশার সাহেব বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একদম বসে না। কথাবার্তা চলতেই থাকল। রান্না হল, আয়ানকে নিয়ে নিশার সাহেব খেতে বসলেন। তাঁর স্ত্রী এত বেশি রান্না করেছেন যে, খেয়ে শেষ করা যায় না। খাওয়া শেষ হলে একই ঘরে নিশার সাহেব এবং আয়ানের আলাদা আলাদা বিছানা হল। জোছ্নাই বিছানা করে দিল। মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আরেক দফা গল্প-গুজব হল। আয়ান সকলকে বকুলপুর বেড়াতে যেতে বলল। নিশার সাহেব বললেন, তাঁর গ্রামের বাড়ি বকুলপুর থেকে বেশি দূর নয়। আয়ান ইচ্ছে করলে বাড়িতে থেকে কলেজ যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু আয়ান বলল, সে কলেজেই কোয়ার্টার পেয়েছে। কোয়ার্টারটি ভালোই। নিশার সাহেবরা যেন একবার অবশ্যই যান। নিশার সাহেব রাজি হলেন। সকালে উঠে আয়ান বকুলপুর রওনা হল। রওনা হওয়ার আগে আর একবার সকলকে বকুলপুর যাবার জন্য অনুরোধ করল। নিশার সাহেব আয়ানকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বকুলপুরে ফিরে আয়ান কোয়ার্টারটা গোছগাছ করতে লাগল। কিছুদিন পরেই তো কাকলি আসবে। কাকলির জন্য ফুলের নক্সাকাটা একটা সুন্দর খাট কিনল। বেডিং-এর দোকানে অর্ডার দিয়ে একটা তোষক এবং লেপ করাল। খাটের নক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক জোড়া বেড সিট এবং বালিশের কভার কিনল। ঘরে নতুন পর্দা লাগাল। কার্তিকবাবু কলেজের হেডক্লার্ক। তিনি গান-বাজনার জগতের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলে একজন গানের মাস্টারও ঠিক করল। সামনের মাস থেকেই সে আসবে। এখানে এসে আয়ানের সময় যেন আর কাটতে চায় না। সকালে উঠে রেওয়াজ করতে বসে। তারপর পড়াশোনা। কিন্তু কলেজের পাশেই হোস্টেল, দশটায় বেরুলেও চলে। আবার ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু একা একা ভালো লাগে না। বিকেলে তাই আয়ান ছেলেদের সাথেই ফুটবল খেলতে লেগে যায়। অন্য সময় লাইব্রেরিতে কাটায়। কলেজটা নতুন। লাইব্রেরিতেও বেশি বই নেই। বরং এখানে একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে। সেখানে অনেক বই আছে। আয়ান লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আলাপ করেছে। বিশ্বনাথবাবু অমায়িক লোক। সুযোগ পেলেই আয়ান তাঁর কাছে চলে যায়। মাঝে মাঝে তার ক্লাস অফ্ থাকে। তখন তো আর দূরে কোথাও যাওয়া যায় না। তখন সে কলেজের লাইব্রেরিতে থাকে। ভাল না লাগলে কোয়ার্টারেই চলে আসে।

সেদিন তার পরপর দুটি ক্লাস অফ্। সে কোয়ার্টারেই চলে এসেছিল। একটু পরে দেখে,

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হাজির। 'আপনি তো ঘরটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন।' আয়ান আর কি বলবে? আমতা আমতা করে বলল, 'না এমনি। আপনি বসুন।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। 'আপনার কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না তো?' একা একা থাকতে অবশ্য কিছু অসুবিধা হবেই।' আয়ান অস্বীকার করে বলল, 'না, স্যার, কোনোরকম অসুবিধাই হচ্ছে না। হোস্টেলের লোকেরা খুব ভালো। ওরা ভালোই দেখাশোনা করছে।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'সে ভালোই।' আয়ানের হারমোনিয়ামটা দেখে তিনি বললেন, 'আপনি তো আবার গান করেন। আপনার বাড়িতেও কি গানের চর্চা আছে?' আয়ানের বাবা যে গুনাই যাত্রার দলে ছোকরা সাজত সেকথা সে বলল না। 'না, আমিই চাকরি পাবার পর শুরু করেছি।' 'আপনার বাড়িতে আর কে কে আছেন।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জানতে চাইলেন। আয়ান বলল, 'মা, বাবা, ভাই, বোন সকলেই আছে।' তিনি জানতে চাইলেন, 'তাঁরা কি সকলেই চাকরি করেন?' আয়ান বলল, 'না, সামান্য জমি আছে। তারা মাঠে কাজ করে।' কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, আয়ানের মনে হয় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব এত কথা বলছেন, তারও কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কতদিন আছেন?' তিনি বললেন, 'প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। সিটি কলেজে পড়াতাম। লোকচারার ছিলাম। প্রিন্সিপ্যালের অফার পেয়ে চলে এলাম।' আয়ান জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এখানে একাই থাকেন?' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উত্তর দিলেন, 'না, আমরা বাড়িতে পাঁচজন লোক। আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে। আরো একটি মেয়ে থাকে। আমার মেয়ের মতোই। আমার শ্যালিকার মেয়ে। ছোটবেলায় ওর বাবা মারা যায়। মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। ও আমাদের কাছেই থেকে গেছে। পলি আমার স্ত্রীকেই মা বলে।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব থামেন। আয়ান জানতে চায়, 'আপনার ছেলেমেয়েরা কি করে?' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, 'মেয়ে হিস্ট্রি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ছে। ছেলেটি ছোট। এবার নাইনে উঠেছে। আর পলি বারো ক্লাসে পড়ছে। এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন। আলাপ করিয়ে দেব।' আয়ান বলে, 'যাব। আপনাদের বাড়িতে কি গানের চর্চা আছে?' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, 'হ্যাঁ, পলিটা ভালো গান করে। এক দিদিমনি গান শেখাতে আসেন।' আয়ান বলে, 'তাহলে আমি অবশ্যই যাব।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, 'যাবেন। কিন্তু এবার আমাকে উঠতে হবে। ক্লাস আছে।' আয়ান বলল, 'আমারও ক্লাস আছে। আমিও যাব। আর একটু বসুন।' হোস্টেলের বয় প্রতাপ মিষ্টি নিয়ে এল। প্রিন্সিপ্যাল আপত্তি করলেন, 'এটা আপনি ঠিক করেননি।' আয়ান আধো আধো স্বরে বলল, 'না, আপনি আমার ঘরে প্রথম দিন এলেন তো!' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন। আয়ানও দরজা লাগিয়ে ক্লাসে রওনা হল।

রবিবার দিন সকালে আয়ান প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাড়ি গেল। দরজা খোলাই ছিল। কোয়ার্টারের সামনে সামান্য কিছুটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেই প্রাচীরের গায়েই বাড়িতে ঢোকার দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকতেই আয়ান দেখল, ডানদিকে রান্নাঘর। সেখানে একজন মহিলা রান্না করছেন। বাঁদিকে পড়ার ঘর। একটি ছেলে পড়ছে। দুই ঘরের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা ছোট খাবার টেবিল। সেই টেবিলের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খাতা দেখছেন। একটু দূরে পাশাপাশি দু'টি বেতের চেয়ারে বসে একটি

মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আয়ানকে দেখেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খাতা থেকে মুখ তুললেন। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে, হাসিমুখে সম্ভাষণ করলেন, 'আসুন আসুন।' তিনি একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আয়ান জুতো জোড়া খুলে চেয়ারে বসল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আলাপ করিয়ে দিলেন, 'আমার মেয়ে শিরিন, আমার ছোট ভাই বীরু জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাশ করে শেওড়াফুলিতে সর্বোপরি আয়রন মিলে কাজ করছে। আর ইনি আয়ানবাবু। আমাদের কলেজে নতুন জয়েন করেছেন।' আয়ান হাত তুলে তাদের নমস্কার করল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তখন স্ত্রীকে ডাকতে লাগলেন, 'মলি, এদিকে এসো। আয়ানবাবু এসেছেন।' মলি খুন্তি হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'আমার স্ত্রী।' আয়ান উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মলি প্রতি-নমস্কার করে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন, 'ডালটা ধরে যাবে বাবা, আমি আসছি।' ইতিমধ্যে আরো দু'টি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'আমার ছেলে তোতন। আর আমার ছোট মেয়ে পলি।' পলি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শিরিন আর বীরু উঠে শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বারান্দায় চলে গেল। আয়ান দেখল, কোয়ার্টারের পেছনের দিকটাও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঘেরা জায়গাটায় একটা ডালিম গাছ। প্রাচীরের গা ঘেঁষে একটা পেয়ারা এবং একটা আমের গাছ। শিরিন আর বীরু ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, 'তোমরা এখানে না বসে থেকে, তোতনের ঘরে গিয়ে বস।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আয়ানকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে পলি আর তোতনও এল। কিন্তু পেছন থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্য তোতনের ডাক এল। তোতন একটা দশ টাকার নোট হাতে করে বাইরে চলে গেল। আয়ান এসে একটা চেয়ারে বসল। পলি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পাশে খাটের ওপরই বসল। আয়ান লক্ষ্য করল শিরিন আর তোতন দেখতে তাদের বাবার মতো শ্যামলা আর বেশ লম্বা। কিন্তু পলি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী মলির মতো বেশি লম্বা নয়, আর ফুটফুটে ফরসা। পলির মাও হয়ত দেখতে ওরকমই।

একটু পরে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী প্লেটভর্তি মিষ্টি আর ফল সজিয়ে নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, 'খেয়ে নিন।' আয়ান বলল, 'খাচ্ছি। কিন্তু তার আগে গান শুনব।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পলিকে গান করতে বললেন। পলি দুষ্টু ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'আমার অনেক দিন বসা হয়নি, গান করতে পারব না।' আয়ান বলল, 'এখানে বাইরের লোক তো কেউ নেই। যেরকমই হয় শুরু কর।' 'আমি গান জানলে তো, না বলতেই শোনাতাম।' পলি অমনি উৎসাহ পেয়ে বলে উঠল, 'বাপির কাছে শুনেছি, আপনি তো গান করেন, তাহলে আপনি শোনান।' আয়ান বলল, 'আমার বাড়ি যেয়ো, অবশ্যই শোনাব।' পলি প্রশ্ন করল, 'কেন? আমাদের বাড়িতে শোনাতে আপত্তি কি?' আয়ান উত্তর দিল, 'তোমাদের বাড়িতে এসেছি। তুমি শোনাচ্ছ না। আমি শোনাব কেন?' পলি জানতে চাইল, 'তাহলে আমি শোনালে আপনি শোনাবেন?' আয়ান বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' পলি হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। সে একটা নজরুল গীতি গাইল, 'আমি যার নুপুরের ছন্দ।' প্রথমটা খুবই ভালো হল। কিন্তু শেষের দিকে দু-এক জায়গায় তাল কেটে গেল। দু-একবার রিডেরও গণ্ডগোল হল। তবুও সামলে নিয়ে পলি গাইল। গান শেষ হলে আয়ান মন্তব্য করল, 'গলাটা মিষ্টি। একটু অভ্যাস করলেই তোমার

গান খুব সুন্দর হবে।' পলি বলল, 'তা হবে। নিন, এবার আপনি করুন।' আয়ান বলল, 'আমার বাড়ি যখন যাবে তখন অবশ্যই করব।' পলি সেদিক দিয়েই গেল না। সে বলল, 'আপনি করবেন সেই শর্তেই আমি গান করেছি। আপনাকে করতেই হবে।' সে হারমোনিয়ামটা আয়ানের সামনে বসিয়ে দিল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মৃদু হেসে পলিকে সমর্থন করলেন। বাধ্য হয়ে আয়ানকে গাইতে হল। আয়ান সদ্য তোলা একটা আধুনিক গান গাইল। সুবীর সেনের সেই বিখ্যাত আধুনিক গান— এত সুর আর এত গান। তার গান শুনে শিরিন, বীরু, মলি সকলেই চলে এল। আয়ান গান থামিয়ে উঠে পড়ল। মলি বললেন, 'না খেয়ে যাওয়া হবে না।' আয়ান বলল, 'অন্যদিন খাব। আজ হোস্টেলে আমার জন্য রান্না করবে। আপনারা কিন্তু একদিন যাবেন।' পলি বলল, 'গান শোনালে নিশ্চয় যাব।' আয়ান আশ্বাস দিল, 'গান শোনাব, যেয়ো।' প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা একদিন যাব।' আয়ান বিদায় নিল।

হোস্টেলের কোয়ার্টারে এসে আয়ান জামা-কাপড় ছেড়ে খেতে বসল। কিন্তু ভালো লাগল না। বকুলপুরে এসে অবধি তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। স্কুল-জীবনের পর থেকেই বলতে গেলে সে একা একা থেকে এসেছে। কিন্তু আগে কখনো এত একা লাগেনি। আজ করিম সাহেবের বাড়িতে পলির গান শোনার পর থেকে কাকলির কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে। একটা চিঠি লিখলে হয়! কিন্তু কাকলিরই আগে লেখার কথা ছিল। দু-সপ্তাহ হয়ে গেল। সে লেখেনি। হয়ত লিখেছে, ডাকের গণ্ডগোলে ঠিকমত পৌঁছয়নি। ভাবতে ভাবতে আয়ান বই-পত্তর খুলল। খাতা খুলতে খুলতে মনে পড়ল, সমরবাবু পিটার রবের রুর‍্যাল ইন্ডিয়া বইটা দেখতে বলেছিলেন। ওখানে নাকি তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম এবং হাঁসুলি বাঁকের উপকথার ওপর একটা ভালো আলোচনা আছে। কিন্তু বইটা তাদের কলেজ লাইব্রেরিতে নেই, পাবলিক লাইব্রেরিতেও নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে থাকতে পারে। কাল আয়ানের অফ ডে আছে। সে একবার খোঁজ করবে।

এগারটা নাগাদ আয়ান বর্ধমান স্টেশনে নামে। একটা রিক্সা নিয়ে রাজবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যায়। করিম সাহেবের মেয়েকে যদি পায়, তবে তাকে দিয়েই খোঁজ করাবে। জিজ্ঞেস করতে করতে আয়ান হিস্ট্রি বিভাগে যায়। ভবনে ঢোকার আগেই আয়ানের চোখে পড়ে মাঠের মাঝে কতগুলি ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে করিম সাহেবের মেয়ে শিরিনও আছে। অতগুলো ছেলেমেয়ের মাঝখান থেকে তাকে ডাকতে আয়ানের সংকোচ হল। যদি চিনতে না পারে? একবার মাত্র দেখা হয়েছে, তাও আবার কোনো কথা হয়নি। শিরিনও নিশ্চয় তাকে দেখেছে। কিন্তু তাকে চেনার চিহ্নমাত্র প্রকাশ করছে না। আয়ান ওর কাছে না যাওয়াই ঠিক করল। নিজে আবার জিজ্ঞেস করে করে লাইব্রেরিতে গেল। লাইব্রেরিয়ানকে নিজের পরিচয় দিয়ে বইটার খোঁজ করল। হ্যাঁ, বইটা আছে। বইটার একটা অধ্যায়ে ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা এবং হাঁসুলি বাঁকের উপকথার ওপর আলোচনাও আছে। কিন্তু বই তো তার নামে ইস্যু করা যাবে না। আয়ান ভাবল, বইটা সে কিনেই নেবে। কিন্তু দাম দেখে সে আশা ছাড়তে হল। প্রায় সাড়ে চার শ টাকা দাম। তাহলে ইস্যু করে নিয়েই পড়তে হবে। একটা চ্যাপ্টারের জন্য সাড়ে চারশ টাকা খরচ করে বই কেনার কোনো মানে হয় না। সে

আবার শিরিনের খোঁজে গেল। শিরিনের নিশ্চয় লাইব্রেরির কার্ড আছে। ওর কার্ডেই ইস্যু করে নেবে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। আয়ান হতাশ হয়ে ফিরে এল।

ফিরে আয়ান কলেজের কাজে মন দিল। কলেজে একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। তাছাড়া বাৎসরিক অনুষ্ঠানে একটা নাটক করার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে রিহার্সাল শুরু করল। এই সময় হোস্টেল সুপার কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে গেলেন। হোস্টেল সুপারের দায়িত্বও আয়ানের ওপর পড়ল। এতদিন হোস্টেলে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। যার যেমন খুশি চলত। খাওয়া-শোওয়ারও কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা ছিল না। ফলে রাত বারোটা পর্যন্ত কেউ না ফিরলে মেসের লোকদের খাবার নিয়ে বসে থাকতে হত। যার যখন-খুশি হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যেত এবং যাকে খুশি নিয়ে এসে হোস্টেলে উঠত। আয়ান কতগুলো নিয়ম করে দিল। খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় করে দিল। নিয়ম করে দিল রাত দশটার মধ্যে সকলকেই হোস্টেলে ফিরতে হবে। আর হোস্টেলে বাইরের কাউকে রাখতে হলে সুপারের অনুমতি নিতে হবে। ছেলেরা প্রথম প্রথম খুব আপত্তি করেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সকলেই এসব মেনে নিয়েছে। মেসে যারা কাজ করে তারা খুব খুশি হয়েছে, কারণ রাত দশটা হলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দু-তিনটি ছেলে কিছুতেই নিয়মগুলো মানছে না। তাদের মধ্যে তেইশ নম্বর রুমের ডাম্বেল অন্যতম। সে প্রায়ই বারোটা-একটা পর্যন্ত বাইরে থাকছে এবং সময়ে-অসময়ে বাইরে থেকে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসে মদ-গাঁজা খাচ্ছে। আয়ান একদিন ঘরে মদ খেতে মানা করেছিল। কিন্তু সে বলেছে, 'মদ খাওয়া কোন বে-আইনি কাজ নয়। মাতলামি না করলেই হল। আমি মাতলামি করি না।' আয়ান আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে যে, এরকম যুক্তিও কোনো ছাত্র দিতে পারে! সে তখন কিছু বলেনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, ডাম্বেল বিরাট ধনীর একমাত্র বখাটে ছেলে। সে প্রায় পাঁচ বছর কলেজে আছে। একদিনও পড়াশোনা করে না। পাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু মদ খায় আর শয়তানি করে। ওর দেখাদেখি আরো কয়েকটি ছেলে বখে যাচ্ছে। আয়ান ঠিক করে সে এটা বন্ধ করবে।

সেদিন এগারটা নাগাদ গিয়ে দেখে ডাম্বেল ফেরেনি। সে হোস্টেলের দারোয়ানকে বলে, ডাম্বেল এলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়। রাত একটা নাগাদ দারোয়ান এসে খবর দিল, 'বাবু, ডাম্বেলবাবু ফিরেছেন। তবে সঙ্গে একটা লেড়কি!' 'লেড়কি?' দারোয়ান বলল, 'হ্যাঁ বাবু।' আয়ান মেসের রাঁধুনে বামুন ঠাকুরকে ডাকতে বলল। ঠাকুরের সঙ্গে বয় প্রতাপও এল। আয়ান তাদের নিয়ে ডাম্বেলের ঘরে গেল। দরজায় ধাক্কা দিতে ডাম্বেল দরজা খুলল। তার হাতে তখন মদের বোতল। বিছানায় সত্যি সত্যি একটা মেয়ে। আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'বিছানায় মেয়েটি কে?' ডাম্বেল বলল, 'আমার আপন বোন।' আয়ান জানতে চাইল, 'বোনকে হোস্টেলে রাখার জন্য কি তুমি পারমিশন নিয়েছ?' ডাম্বেল তার কোন উত্তর দিল না। আয়ান প্রিন্সিপ্যালের কাছে খবর পাঠাল। আর ডাম্বেলের বাবাকেও আসতে বলল টেলিগ্রাম করে। কিন্তু কেউ আসার আগেই ডাম্বেল মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। আয়ান তখন ফোন করে পুলিশে খবর দিল। পুলিশ এসে ডাম্বেল সমেত মেয়েটিকে নিয়ে গেল। পুলিশকে মেয়েটি জানাল যে, সে আসলে শহরে পতিতা পল্লীর সদস্যা। আয়ান ডাম্বেলকে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দিল।

পরিচিত। সবাই তাকে স্বাগত জানালেন। এই কলেজে সে একদিন পড়তে এসেছিল। কেমিস্ট্রি পড়তে। পয়সার অভাবে ভালোভাবে পড়তে পারেনি। আজ সেই কলেজেই সে পড়াতে এসেছে। এসেছে বাংলা পড়াতে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কিরকম রোমান্টিক। আয়ান ভাবতে ভাবতে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দিকে চলেছে। সেখানেও সবাই স্বাগত জানাল। আয়ান অ্যাটেন্ডেন্স খাতা নিয়ে ক্লাসে চলে গেল। বাড়ি থেকে যাতায়াত করে ক্লাস করানো সম্ভব নয়। আয়ান একটা বাড়ি খোঁজ করছিল। জজ কোর্টের মোড়ে একটা বাড়ি পেয়ে গেল। ভাড়াটা একটু বেশি। কিন্তু অবস্থানটা ভালো। আয়ান নিয়ে নিল।

সপ্তাহখানেক পরে কলেজে গিয়ে আয়ান রাজিয়ার চিঠি পেল। রাজিয়া লিখেছে, 'যখন আপনি আমাকে পড়াতেন, তখন থেকেই আমি আপনকে ভালোবাসি এবং আপনাকে আমার জীবন-সাথী হিসেবে পেতে চাই। অবশ্য জানি নে, আমাকে আপনার পছন্দ কি না। আপনার বর্তমান ঠিকানা আমি সুমিতাদির কাছে পেলাম। সুমনদার সঙ্গে সুমিতাদির বিয়ে হয়ে গেছে। পার্ট ওয়ানে অনার্সে আমি বাহান্ন পারসেন্ট পেয়েছি। পার্ট টু পরীক্ষা সামনের মাসে। আপনার মুখেই শুনেছি কৃষ্ণনাথ কলেজ খুব নামকরা কলেজ। এখন তো আপনি নামকরা কলেজের প্রফেসর। আমাদের কথা না মনে আসাই স্বাভাবিক তবুও অপেক্ষায় রইলাম।' আয়ান চিঠিটা কয়েকবার পড়ল। রাজিয়ার স্নিগ্ধ মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাজিয়া ভালো ছাত্রী, ভদ্র, বিনয়ী, সুন্দর স্বভাবের অধিকারিণী, মার্জিতা এবং রুচিশীলা। রাজিয়াকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে আয়ানের কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ সে যেরকম চায় রাজিয়া সেরকমই। কিন্তু রাজিয়া তো তাকে একটুও আভাস দেয়নি। অবশ্য যখন ওদের বাড়ি ছিল, তখন সে আয়ানকে সহানুভূতির চোখে দেখত। কিন্তু আয়ানের তখন যা অবস্থা তাতে তার কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না। চকে জয়েন করেই সে ইমাম সাহেবকে চিঠি লিখেছিল। বকুলপুর কলেজে জয়েন করার পরও চিঠি লিখেছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। ইতিমধ্যে আয়ান কাকলিকে ভালোবেসেছে। তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। তার পক্ষে এখন রাজিয়ার কথা ভাবা কোনোমতেই সম্ভব নয়। সে ঠিক করল, একটা চিঠি লিখে পুরো ব্যাপার তাকে জানিয়ে দেবে। কিন্তু চিঠিটা অন্য কারো হাতে পড়লে রাজিয়া ছোট হয়ে যাবে। রাজিয়ার চিঠিটা সে ছিঁড়ে ফেলল।

কলেজ থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে রাতের ট্রেনেই রাধানগর রওনা হল। কলেজে পৌঁছে আয়ান অপেক্ষা করতে লাগল। রাজিয়া ক্লাস থেকে বেরুতেই সে এগিয়ে গেল। রাজিয়া তাকে দেখে চোখ নিচু করল। আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ছুটি কখন হচ্ছে?' রাজিয়া বলল, 'সাড়ে চারটেয়। তবে দেড়টার ক্লাসটা অফ্ আছে।' আয়ান বলল, 'তাহলে দেড়টার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলব।' দেড়টার সময় কলেজের মাঠে দাঁড়িয়েই আয়ান রাজিয়াকে সব কথা খুলে বলল। রাজিয়া বলল, 'একেই লোকে ভাগ্য বলে। না হলে আমার সঙ্গেই তো আপনার আগে দেখা হয়েছিল। আমি আপনাকে ছোট হতে বলব না। আমার চিঠি লেখাই ভুল হয়েছে। সবকথা জানলে আমি চিঠি লিখতাম না।' রাজিয়া প্রতিটি কথা কেটে কেটে বলছিল। প্রতিটি কথাই আয়ানের বুকে কেটে কেটে বসছিল। অনেকক্ষণ সে কিছু বলতে

পারল না। তারপর আস্তে করে বলল, 'তাহলে আমি যাচ্ছি।' রাজিয়া জিজ্ঞেস করল, 'বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না? আয়ান বলল 'না, ভালো লাগছে না।' রাজিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'সেটা হয় না। আপনি এসেছিলেন, এটা জানাজানি হয়েই যাবে। বাবার সঙ্গে দেখা না করলে তিনি খারাপ ভাববেন।' আয়ান সেকথা অস্বীকার করতে পারল না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার আশানগরের বাড়িতে গেল। বাড়িতে তাকে পেয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী খুবই খুশি হলেন। তাকে কিছুতেই রাতে ছাড়লেন না। অস্বস্তির মধ্যে রাতটা কাটিয়ে সকালে আয়ান বিদায় নিল। মা-বাবার সঙ্গে রাজিয়াও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ দেখে বোঝা গেল না, তার মনের মধ্যে কি হচ্ছে। শুধু হাত নেড়ে আয়ানকে বলল, 'আবার আসবেন।' আয়ান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলতে পারল না।

বহরমপুর এসে আয়ান কাকলির চিঠি পেল। কাকলি এ কি লিখেছে! যত পড়ছে আয়ান তত বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে। কাকলি লিখেছে, 'বাড়িতে আমাদের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। আমি কাউকে বলতে চাইনি। তবুও জানাজানি হয়ে গেছে। আগামী মাসে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। কিন্তু তার আগেই বাবা আমার বিয়ে পাকা করতে চেয়েছিলেন। দুর্গাপুরে এক ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সম্বন্ধ এসেছিল। আমাকে দুর্গাপুরে দাদার ওখানে নিয়ে গিয়ে দেখানো ঠিক হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরে যেতে অস্বীকার করি। মা তখন চেপে ধরেন। আমি তখন মাকে বলে দিই যে, বিয়ে করলে আপনাকে করব। না হলে আর কাউকে করব না। মা হয়ত আগেই কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। আমাকে কিছু বলেননি। সম্বন্ধটা ভেঙে গেল। মা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ি গেলেন। সেখানে আমি একদম চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আমার মাসতুত বোন পলা সহানুভূতি জানিয়ে আমার কাছে সব জেনে নিল। আর পলার কাছ থেকে সবাই জেনে ফেলল। ছোটমাসি মাকে যাচ্ছেতাই বললেন, চোখের মাথা খেয়েছ। জাত-বেজাত কিছু দেখ না! মুসলমানের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে পরের মেয়ের আর বিয়ে হবে? না, আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারব? কে কি করবে জানি না, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না, বলে রাখছি। শুধু বড়মামা আমাকে সমর্থন করেছিলেন। ছোটমাসি বড়মামাকেও যা-তা বলল। মুসলমানের মুখের মামা না শুনলে তো তোমার সাধ মিটছে না। তা কাকলির কেন, অমিতাভর বিয়েটাও মুসলমানের ঘরে দাও, বৌমা এসে একদম বাবা ডাকবে। মামা ছোটমাসিকে কিছু বলেননি। মাও না। বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে মার কি কথা হয়েছে তাও আমি জানি না। এখন বাবা আমাকে নিয়ে পড়েছেন। বাবা.বলছেন, আয়ান খারাপ ছেলে আমি বলছি না। তবে তার ধর্ম অন্য। ধর্মকে, বর্তমান সমাজকে অস্বীকার করে বাঁচবার মতো সাহস আমার নেই। আয়ানের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে আত্মীয়-স্বজনেরা সব আমাদের পরিত্যাগ করবে। আমি ওরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারব না। আমি তোকে অনেক আদর করে মানুষ করেছি। আমাকে এমন কষ্ট তুই দিস নে। আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ের কথা ভাবতে পারছি নে। আবার বাবার কথাও ফেলতে পারছি না। আমার বোধ হয় বিয়ে করা হবে না। আমার জন্য আপনি কেন কষ্ট পাবেন? আনি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলুন। ইতি আপনার কাকলি।'

আয়ান চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আয়ানের প্রথমেই এ আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু কাকলি বার বার বলেছে যে, মার আপত্তি থাকলেও বাবা বাধা দেবেন না। জানি না কাকলি কোন্

বিশ্বাসে কথাটা এত জোর দিয়ে বলত। কিন্তু এখন তো সেই আয়ানের কথাই ঠিক হল। কিন্তু তার যে আর ফিরে আসার পথ নেই। সে প্রাণ দিয়ে কাকলিকে ভালোবেসেছে। সব কাজে তার গোলমাল হতে লাগল। রবিবার সকালেই সে চক রওনা হল।

দরজা খুললেন কাকলির বাবা। তিনি আয়ানকে ভদ্রভাবেই বসতে বললেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই আয়ান বুঝল তার আগমনে বাবা খুশি নন। একটু পরে কাকলির মা এলেন। তিনিও মুখ ভার করে আছেন। তাঁরা আয়ানকে ভদ্রতাসূচক কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। আয়ানও উত্তর দিল। বাবা চেম্বারে বেরিয়ে গেলেন। মাও রান্নাঘরে গেলেন। এবারে কাকলি এসে বসল। একটা মলিন শাড়ি পরা, তার মুখটাও মলিন। চোখের কোণে কালি। সে বলল, 'ভালো আছেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'ভালো কি করে থাকি? তুমি এসব কি লিখেছো?' কাকলি শান্ত দৃঢ় স্বরে বলল, 'ঠিকই লিখেছি। চিন্তা করে দেখলাম, আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে না। আমার জন্যে আপনি কেন কষ্ট পান? আপনি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলুন।' আয়ান বলল, 'সেরকম তো কথা ছিল না। তুমি বলেছিলে.....।' তার কথা শেষ না হতে দিয়েই কাকলি কথা শুরু করল, 'বলেছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম, সেটা সম্ভব নয়। আগের কথা ছেড়ে দিন। আমি এখন যা বলছি তাই শুনুন।' আয়ান বলল, 'সেটা হয় না। শুধু মন্ত্রটাই পড়নি। কিন্তু মন থেকে তো তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ। আমিও মন থেকে তোমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারি না।' কাকলি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আমাকে আমার বাবার দিকটাও দেখতে হবে।' আয়ান বলল, 'তুমি যদি অনুমতি দাও আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারি।' কাকলি বলল, 'না, সেটা হয় না। বাবা আপনার কোনো কথাই রাখবেন না। আপনি শুধু শুধু অপমানিত হন, আমি তা চাই না।' আয়ান বুঝল, কোনো লাভ নেই। সে বিদায় নিয়ে চলে এল।

স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে আয়ান বাড়িতে এল। কিন্তু তার শরীর-মন কিছুই আর কাজ করছিল না। সে কোনোরকমে মশারিটা টাঙিয়ে শুয়ে পড়ল। সারা রাত ঘুমোতে পারল না। সকালে কলেজে গিয়ে দেখে আরেক চিঠি। এবার চিঠি লিখেছে বকুলপুর থেকে পলি। 'দাদা, গিয়ে চিঠি লেখার কথা ছিল। লেখেননি। আপনি ব্যস্ত মানুষ, সময়ের অনেক দাম। আমাদের মতো নগণ্য লোকদের কথা না মনে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার কথার তো দাম আছে। তার জন্যও একটা চিঠি লেখা দরকার ছিল। এখানে আমরা ভালো আছি। কলেজের অবস্থাও ভালো। এখন সবাই আপনার নাম করে। হোস্টেলের ঠাকুর আর বয় তো এখনো আপনার ভক্ত। আমাদের বাড়িতে মা-বাপি ভাই-দিদি সবাই আপনার কথা আলোচনা করে। আপনি দয়া করে একবার বেড়াতে আসুন। না এলে দারুণ দুঃখ পাব। আর কবে আসছেন আগে থাকতে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন। উত্তর পেতে দেরি হলে রাগ করব। পলি।'

খোলামেলা সহজ সুন্দর চিঠি। পৃথিবীতে সবাই যে কেন এমন সহজ সরল হয় না! আয়ান কলেজে বসেই চিঠির উত্তর লিখতে শুরু করল। 'পলি, তোমার চিঠিটি পেলাম। চিঠি সত্যিই একটা লেখার কথা ছিল। কিন্তু কথা কি কেবল আমিই দিয়েছিলাম? চিঠি লেখার কথা তো তোমাদেরও ছিল। নতুন চাকরিতে ঢুকে আমি সত্যিই একটু ব্যস্ত আছি। কিন্তু তোমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই তোমার এত দেরি করে চিঠি লেখার কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

আর তোমাদের বেড়াতে আসার কথা ছিল না? আমি তো বাসা পেয়েছি। তাহলে এবার চলে এসো। দুদিন হৈচৈ করা যাবে। আমি সময় পেলে একবার অবশ্যই যাব। তবে তোমরাও আসবে। ইতি দাদা।' খামে ঠিকানাটা লেখা হলেই ডাকে দেওয়া যেত। কিন্তু ঘন্টা পড়ে গেল। এবার চর্যাপদ পড়াতে যেতে হবে। আয়ান খাতাটা নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। এই পড়ানোর সময়টাতে আয়ান সব কিছু ভুলে যায়। কাকলির কথা ভুলে থাকার জন্য আয়ান ভালো করে পড়াশোনাতে মন দিল। আর পি-এইচ. ডি.-র জন্য পড়াশোনাও করতে লাগল। অফ পিরিওডগুলো সে লাইব্রেরিতে বসেই কাটায়।

সেদিন লাইব্রেরিতে পিওন একটা রেজিস্ট্রি করা চিঠি দিল। আয়ান খুলে দেখল, ছোট্ট একটা চিঠি, লিখেছে অমিতাভ চৌধুরী। কাকলির সেই মামাতো দাদা। 'কাকলির কাছ থেকে আপনাদের সমস্যার কথা জানলাম। আমি আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। যদি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি, আমাকে জানাতে সংকোচ করবেন না।' চিঠি পড়ে আয়ানের উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না। দুটো কারণে সে চিঠি লিখতে পারে। এক, কাকলিকে নিয়ে আয়ান কি ভাবছে, সেটা জেনে পিসেমশাইকে জানানো। সেক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া উচিত নয়। দুই, সত্যিই সে কাকলির সঙ্গে আয়ানের বিয়েতে সাহায্য করতে চায়। সেটার প্রয়োজন নেই। কারণ এ ব্যাপারে সব মত প্রথমে প্রয়োজন সে হল কাকলি। কাকলি রাজি থাকলে অমিতাভর সহযোগিতার কোনো দরকারই নেই। আর কাকলির মত না থাকলে অমিতাভর সহযোগিতা অর্থহীন। তাই আয়ান অমিতাভর চিঠির কোনো জবাব দিল না। কেন জবাব দিল না, সেকথা ব্যাখ্যা করে কাকলিকে একটা চিঠি লিখল।

দেখতে দেখতে দোল এসে গেল। এ উৎসবটা আয়ানের কোনো দিনই ভালো লাগে না। তবে কাকলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর থেকে তার খুব ইচ্ছে করছিল, সে কাকলির গালে আবীর মাখাবে। আর কাকলি তার আবীর রাঙানো হাতখানা তার কপালে ঠেকাবে। সে সাধ বোধ হয় আর পূর্ণ হল না। আয়ানের মনটা টনটন করতে লাগল। সে তার মনের কথা প্রকাশ করে একটা চিঠি লিখল। চিঠির সঙ্গে খানিকটা আবীর পাঠিয়ে দিল। দিন তিনেক পর কাকলির উত্তর পেল। না, উত্তর নয়। তার চিঠি পাওয়ার আগেই, দোলের দিনই কাকলি তাকে লিখেছে। 'আজ দোল। আমাদের হাউসিং-এ রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। কিন্তু আমার দিনটা বড় দুঃখে কাটছে। অনেকে আবীর দিতে এসেছিল। নিইনি। কাউকে দিই-ওনি। এমন কি বাবা-মা বা মিমিকেও না। আমার ইচ্ছে ছিল আপনাকে আবীর মাখাব। কিন্তু তা আর হল না। তাই আপনার কথা মনে করে দেওয়ালে আবীর দিয়েছি। একদিন এমনি করেই বোধহয় আমাদের সমাজে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল। আর আজ আমি নিজেই যেন মূর্তিপূজা করলাম। সেই পূজার একটু আবীর পাঠালাম। আমাকে মনে করে পরবেন। আর আমি মনে করেছিলাম, বাব-মার কাছে সুখে-শান্তিতে থাকব। কিন্তু সে সম্পর্ক যেন নষ্ট হয়ে গেছে। কথায় কথায় বাব-মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি। অর্থাৎ আপনাকে ছেড়ে তাঁদের কাছে থেকেও তাঁদেরকে সুখি রাখতে পারছি না। তাই ঠিক করেছি, আপনার কাছেই চলে যাব। তবে বাবা-মার মত নিয়ে সামাজিকভাবে যাওয়া সম্ভব না। কোনোরকম অনুষ্ঠান না করে, বাব-মার অনুমতি নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় একমাত্র পথ কাউকে কিছু না বলে

চলে যাওয়া। আমি ঠিক করেছি আমি তাই যাব। রবিবার আমি রবীন্দ্রভবনে গান শিখতে যাই। ওখান থেকে যাওয়াই সব থেকে সোজা হবে। আগামী তিরিশ তারিখ আপনি স্টেডিয়ামের কাছে থাকবেন। রবীন্দ্রভবনে না গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব। তারপর আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে বাবাকে জানিয়ে দিলেই হবে।'

কাকলির প্রস্তাব আয়নের পছন্দ হল না। এর মধ্যে তার নিজের ছাড়াও বড় রকমের গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। কাকলিকে নিয়ে চলে আসার সময় কেউ দেখতে পেলে একটা ঝামেলা হবে। আর যেহেতু তার এবং কাকলির ধর্ম আলাদা, সেই ঝামেলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টিও করতে পারে। কিন্তু কাকলির বোধ হয় এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। যা হয় হবে, সে তিরিশ তারিখে যাবে। সে কাকলির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। খামের ভেতর থেকে আবীরের পুরিয়াটা বের করল। এই আবীরে কাকলির হাতের ছোঁয়া আছে। সেটা মনে হতেই সে সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করল। আবীর সমেত কাগজের টুকরোটা সে কপালে ঠেকাল। যেন কাকলি স্বয়ং এসে তার কপালে আবীরের টিপ পরিয়ে দিল। অনেক দিন পরে শান্ত মনে পরিতৃপ্ত চিত্তে আয়ান কলেজে গেল। অনেক দিন পর আবার পৃথিবীটা সুন্দর মনে হল। অনেক দিন পর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে পরিতৃপ্তি এল।

স্টাফরুমে ফিরে আয়ান পলির চিঠি পেল। পলি লিখেছে, 'নিজে চিঠি লেখেননি। আবার দোষ ঢাকতে উল্টো চাপ! ওসব ক্লাসে চলতে পারে। আমার কাছে চলবে না। তাই উল্টো চাপের জন্য আপনার জরিমানা করা হল। সশ্রম ভ্রমণ দণ্ড। এখানে এসে অন্তত দিন তিনেক থাকতে হবে। অন্যথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার কবে আসবেন জানাবেন। আমরা যেতাম। কিন্তু দিদির পড়াশোনা। দিদির ছুটি হলে বাপির সময় হয় না। সবার ছুটি হয়, বাপির নাকি ছুটি হয় না। সেজন্যই যাওয়া হয় না। কারণ আমরা একা একা তো যেতে পারি না। অর্থাৎ পারলেও ছাড়া হয় না। চিঠি পাওয়ার দু সপ্তাহের মধ্যে না এলে আড়ি। আশা করি আসবেন।' আয়ান পড়ে আর হাসে। পলি দারুণ চিঠি লেখে । আয়ান ঠিক করে সে বকুলপুর যাবে। আজ বিশ তারিখ। তিরিশ তারিখ রবিবার চক-এ যেতে হবে। সে আর দুদিন ছুটি নিয়ে আঠাশ তারিখ বকুলপুর চলে যাবে। তিরিশ তারিখ ওখান থেকেই চকে যাবে। তারপর কাকলিকে সঙ্গে করে বহরমপুর চলে আসবে। আয়ান কলেজের অফিসে দরখাস্ত জমা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আয়ান বকুলপুরে পলিদের কোয়ার্টারে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। প্রিন্সিপ্যাল করিম সাহেব কলেজ থেকে ফেরেননি। শিরিনও ক্লাস থেকে ফেরেনি। তোতন সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। সেই এসে দরজা খুলল। তারপর হাসতে হাসতে মাকে বলতে গেল, 'মা, দেখ, দাদা এসেছেন।' তার কথা শুনে ঘুম থেকে উঠে পলি বেরিয়ে এল। 'তাহলে আড়ি করাতে ভয় আছে বলুন?' আয়ান বলল, 'দারুণ ভয়। তার থেকে ভ্রমণ দণ্ডই সই।' ততক্ষণে মা উঠে এসেছেন। তিনি বললেন, 'সেটা আবার কি গো?' আয়ান বলল, 'জরিমানা।' পলি হাসতে লাগল। সব শুনে মা বললেন, 'কি শয়তান রে বাবা! আসতে বলবে ব্যস। তা ওসব জরিমানা দণ্ড কি?' পলি বলল, 'তুমি ওসব বুঝবে না। জরিমানা না করলে দাদা আসতেন নাকি?' মা কৃত্রিম রাগ দেখালেন, 'তোরা যা বুঝিস কর বাপু, আমি ওসব বুঝি না।' পলি হাসতে লাগল।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। পলি গিয়ে দরজা খুলে বলল, 'দিদি, দাদা এসেছেন।' দিদি রোদে পোড়া মুখটা ঘুরিয়ে, নাকটা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন?' পলি খিলটা লাগিয়ে, পরনের কাপড়টাকে একটা দোল দিয়ে, মুখে হাসি টেনে বলল, 'এই একটু আগে।' পলির কাছে শোনার পরও শিরিন আয়ানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলেন?' আয়ান বলল 'পলি তো বলল' শিরিন লজ্জা পেল। 'হ্যাঁ, বলেছে বটে। আপনি না হয় আরেকবার বললেন। এটা তো আর বিতর্ক সভা নয়।' আয়ান বলল, 'না, বিতর্ক সভা নয়, এই একটু আগে এসেছি।' তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। মা ততক্ষণে প্লেটে করে খাবার এনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'ওদের সঙ্গে বকবক পরে করবেন। অনেকটা পথ কষ্ট করে এসেছেন, হাত-মুখ ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নিন।' শিরিন অনুযোগ করে বলল, 'আমিও কিন্তু মা সারাদিন ক্লাস করে অনেক কষ্ট করে ফিরেছি।' মা বললেন, 'তা তুই মুখ ধুয়ে আয়। তোকেও খেতে দিচ্ছি।' মা-মেয়ে দুজনেই ঘরে ঢুকে গেলেন। আয়ান হাত-মুখ ধুয়ে এসে পলিকে বলল, 'শুরু কর।' পলি বলল, 'আমাকে তো মা দেননি। আপনাকে দিয়েছেন, আপনি খান।' আয়ান বলল, 'মা আমাকে দিয়েছেন, আমি তোমাকে দিচ্ছি। হে দণ্ডদাতা, দণ্ডপ্রাপ্তের দান গ্রহণ কর।' আয়ানের কথা শুনে পলি হাসতে লাগল। আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। পলি গিয়ে দরজা খুলতে করিম সাহেব ঢুকলেন। আয়ানকে দেখে মুখে মৃদু হেসে বললেন, 'কখন এলেন।' আয়ান বলল, 'এই একটু আগে। আপনি কলেজ থেকে ফিরছেন?' করিম সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার নতুন কলেজ কেমন লাগছে?' আয়ান বলল, কর্মসূত্র হিসেবে নতুন বটে। তবে আমি তো ওখানে পড়াশোনা করেছি। ভালোই লাগছে।' করিম সাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, 'হ্যাঁ, ওটা তো আপনার পুরানো কলেজ। আপনার খারাপ লাগার কথা নয়।' তিনি উঠে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন। আয়ান পলির হাতে মিষ্টি তুলে দিল। মা এসে পলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, 'কেন, তুই কি মিষ্টি ফ্রিজ থেকে নিতে পারতিস না? ওখান থেকে নিতে হল!' আয়ান বলল, 'আমি জোর করে দিয়েছি। এতগুলো খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' তোতন এসে মাকে বলল, 'আহ্লাদ দেখ না। দাদার সঙ্গে খেতে হবে।' পলি কি বলতে যাচ্ছিল। আয়ান তোতনের হাতেও মিষ্টি ধরিয়ে দিল। তোতন মার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মা দেখ।' পলি বলল, 'দাদার সঙ্গে আমি খাচ্ছি বলে তো জ্বলে যাচ্ছিস বাবা। নিয়ে নে।' তোতন দারুণ অভিযোগের সুরে মাকে ডাকল, 'মা দেখেছ্। পলি আমাকে ক্ষেপাচ্ছে।' মা বললেন, 'জানিনে বাপু। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।' তোতন পলির পিঠে একটা কিল বসিয়ে রান্নাঘরে মার কাছে চলে গেল। পলি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল, 'দেখ বাপি, আমি কিছু বললে তো দোষ হয়। আর এখন তোতন যে আমার পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দিল।' বাবা চিৎকার করে তোতনকে ডাকতে লাগল, 'এই তোতন, তোতো-ন। পলিকে কেন মারলি?'

বিকেলবেলায় তোতন এসে বলল, 'ছায়াছবি হলে একটা বাংলা বই চলছে। দাদা যাবেন?' আয়ান বলল, 'কোন কাজ তো নেই, যাওয়া যেতে পারে।' সঙ্গে সঙ্গে তোতন ছুটে পলির কাছে গেল। 'পলি, আমরা সিনেমা দেখতে যাব। তুই যাবি?' পলি জানতে চাইল, 'তোরা কে কে?' তোতন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'আমি আর দাদা।' পলি বলল, 'মা বললে যাব।' তোতন সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে গেল। 'মা, পলি সিনেমা দেখতে যাবে?' মা বললেন, 'তা আমি কি

জানি?' তোতন বলল, 'তুমি বললেই যাবে।' মা বললেন, 'যাবে যাবে। মানা করছে কে?' তোতন নাচতে নাচতে ওঘরের দিকে ছুটল, 'দিদি— দিদি, আমরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি রে?' দিদিও রাজি হল। মা তখন করিম সাহেবকে বললেন, 'রিনারা সিনেমা দেখতে যাবে বলছে।' শিরিনকে বাড়িতে সবাই রিনাই বলে। করিম সাহেব বললেন, 'যাবে তো কি হয়েছে?' মা বললেন, 'হবে আবার কি? ওরা গিয়ে টিকিট পাবে কি পাবে না। হলে তোমার তো জানাশোনা কে একজন আছে। তা টিকিটা কেটে দাও।' করিম সাহেব সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ব্যালকনির চারটে টিকিট নিয়ে ফিরলেন। আয়ান করিম সাহেবের টিকিট কাটার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু মা যুক্তি দেখালেন যে, গিয়ে টিকিট না পেলে তো সেই ফিরে আসতে হত। এখানে টিকিট খুব ব্ল্যাক হয়। কাজেই গিয়ে টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রিনার বাবার জানাশোনা আছে। ওরা ভেতর থেকে ব্যবস্থা করে দেয়।

আয়ান আর কিছুই বলতে পারল না। সাজগোজ চলতে লাগল। তোতন শার্টপ্যান্ট, পলি সালোয়ার-কামিজ আর রিনা শাড়ি পরে বের হল। আয়ান জুতো পরে সঙ্গে চলল। দুটো রিক্সা করে একটাতে পলি আর রিনা উঠল, অপরটাতে আয়ানের সঙ্গে তোতন চাপল। একেপাশে চারটে সিট ছিল। তোতন পাশে বসল। তার পাশে রিনা। রিনার পরে পলি। সবশেষে আয়ান বসল। নায়ক-নায়িকার আবেগঘন মুহূর্তে আয়ান পলির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। খানিকক্ষণ পরে হাফ টাইম হল। আয়ান সকলের জন্য বাদাম কিনল। পলি বাথরুমে গেল। হলের আলো নিভিয়ে স্লাইড দেখাতে লাগল। পলি ফিরে এসে বলল, 'দিদি তুই এদিকটায় বস। আমি ভাইয়ের কাছে বসি।' রিনা এসে আয়ানের পাশে বসল। আয়ানের অস্বস্তি হতে লাগল। পলির হাত ধরাটা নিশ্চয় ঠিক হয়নি। পলি হয়ত রাগ করেছে। বসে বসে সে এসব কথাই ভাবতে লাগল। সিনেমা তার আর দেখা হল না। সিনেমা শেষ হতে সে অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে গিয়ে রিক্সায় উঠল। বাড়িতে ফিরেও সে কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারল না। বারবার মনে হতে লাগল, পলি যদি এখন রিনা বা তার মাকে সিনেমা হলের কথা বলে দেয়! হঠাৎ করে ভারি ভুল হয়ে গেছে। কোনোরকমে ঘটনাটাকে তার জীবন থেকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যেত! কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। পলি রান্নাঘরে ঢুকে মার সঙ্গে কি কথা বলছে। কিন্তু চোরের মন পুলিস-পুলিস করে। আয়ানের মনে হল পলি মাকে সিনেমা হলের কথাই বলছে। এক্ষুণি যদি করিম সাহেবের স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে সে কি বলবে? আয়ান তার মনকে সামলায়। সে বলবে, সে ভালো মনেই হাতটা ধরেছিল, কোনো খারাপ ব্যবহার তো করেনি! কিন্তু না। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। খাওয়ার সময় সকলে হৈচৈ করে খেতে বসল। পলিও তার সঙ্গে বসে খেল। তারপর রিনার ঘরে তাকে বিছানা করে দেওয়া হল। রিনা আর পলি দুজনেই আজ তোতনের ঘরে শোবে। আয়ান শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকলে তারা খালের ধারে বেড়াতে গেল। আস্তে আস্তে রোদের তাপ বাড়তে লাগল। তখন তারা একটা গাছের তলায় বসল। অনেক সাধাসাধি করাতে পলি একটা গান গাইল। অবশ্য আয়ানকেও একটা গাইতে হল। তারপর খাপছাড়া কথাবার্তা। একসময় সার্কাসের কথা উঠল। ঠিক হল, আজ দুপুরেই তারা সার্কাস দেখবে। স্নান-খাওয়া করে আবার চারজনে সার্কাস দেখতে গেল। আজ প্রথম থেকেই রিনা আয়ানের পাশে বসল। টুলের ওপর

দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে নানারকম শারীরিক কসরৎ দেখাতে লাগল। শূন্যে ঝুলে ঝুলে খেলা দেখানোটা আয়ানের খুব ভালো লাগল। তারপর বাঘের খেলা। চার-পাঁচটা বাঘকে একটা লোক একটা বৈদ্যুতিক চাবুক দিয়ে কেমন খেলা দেখাচ্ছে। পরিস্থিতি বাঘগুলোকে কত অসহায় করে দিয়েছে। হঠাৎ আয়ানের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে বাকি খেলাগুলি আর উপভোগ করতে পারল না। সার্কাস ভেঙে গেলে তারা রিক্সায় উঠল। সন্ধ্যার সময় সবাই একসঙ্গে গল্প করল। আয়ান করিম সাহেবকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। করিম সাহেব যেতে রাজি হলেন। করিম সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'আমাদের সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তো সহজে যাওয়া হয় না। তা আপনার তো অত ঝামেলা নেই। আমরা যাই না যাই আপনি আসবেন।' আয়ান বলল, 'তা হবে না। আপনারা না গেলে আমিও আর আসব না।'

রাতের খাবার পর আয়ান ঘরে গেল। আগামী কালই তিরিশ তারিখ। কালই দুপুরের মধ্যে চক-এ পৌঁছতে হবে। আগামীকাল কাকলি তার সঙ্গে চিরকালের মতো চলে আসবে। আয়ান উত্তেজনা বোধ করল। সেটা চাপা দিতে সে একটা বই খুলে বসল। রিনা এসে দাঁড়াল। 'তাহলে মশারিটা টাঙিয়ে দিই!' আয়ান একটু একা থাকতে চাইছিল। সে বলল, 'থাক। আমি টাঙিয়ে নেব।' বিনা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'মা আমাকে টাঙিয়ে দিতে বলেছেন। আমি টাঙিয়ে দিয়ে যাব।' রিনার ব্যবহার খুবই আন্তরিক। সেখানে সামান্য সংকোচ আছে বটে। তবে ওর মুখের দিকে চাইলেই যেন ওর মনটা দেখা যায়। মুখে যা বলে, মনে হয় মন থেকেই বলছে। সেটা মনের কথা, কথার কথা নয়। দুদিন থেকেই রিনা অনেক আপনজনের মতো ব্যবহার করছে। রিনার ব্যবহার এত আন্তরিক যে, আয়ানের তাকে আপন ভাবতে ইচ্ছে করছে। রিনারও কি এরকম ইচ্ছে করছে? রিনাও কি আয়ানকে আপন করে পেতে চাইছে? কিন্তু সে তো কাকলির। আগামী কালই তো কাকলি তার সঙ্গে চলে আসছে। তাহলে রিনার সঙ্গে তার মেলামেশা তো ঠিক হচ্ছে না। সব কথা রিনাকে খুলে বলা দরকার। আয়ান বলল, 'কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।' রিনা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলে উঠল, 'মনে করব না। বলুন।' রিনার উৎসাহ দেখে আয়ান দমে গেল। কি করে কথাটা শুরু করা যায়, ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন রাস্তাই খুঁজে পেল না। তখন খুব সাধারণভাবেই বলল, 'দেখ, আমাদের এরকম মেলামেশা করা উচিত নয়।' রিনার মুখটা অভিমানে ফুলে উঠল। সে বলল, 'মেলামেশা কি একা আমি করছি?' আয়ান বলল, 'না, একা একা কি মেলামেশা হয়? তবে আমি চাই না তুমি কষ্ট পাও।' রিনা জানতে চাইল, 'আমি কষ্ট পাব কেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তাকে বিয়ে করব কথা দিয়ছি। খুব তাড়াতাড়িই আমাদের বিয়ে হবে।' রিনার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আয়ান বিব্রত বোধ করল। রিনা রাগতভাবে বলল, 'আমার কি ভালো লাগারও অধিকার নেই? আমি ভেবেছিলাম জীবনে একটি ছেলেকেই মন দেব, যাকে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব। সে আশাটুকুও আমার পূরণ হবে না কেন?' রিনা চোখ মুছতে মুছতে বাথরুমে ঢুকে গেল। ফিরে এসে আয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই মশারি টাঙাতে লাগল। মশারির ধারগুলো গুঁজে দিয়ে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আয়ান বিমূঢ়ের মতো অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকল। ভোরের দিকে চোখটা এঁটে এলে সে শুয়ে পড়ল।

কথামতো খুব ভোরবেলায় উঠেই আয়ান বিদায় নিল। মা রিনাকে ডেকে তুলল। অন্যান্যদের সঙ্গে রিনাও তাকে বিদায় জানাল। আয়ান চক-এ যখন বাস থেকে নামল তখন বেলা ন'টা। এগারোটা থেকে কাকলির গানের ক্লাস। নিশ্চয়ই সাড়ে দশটা নাগাদ ও চলে আসবে। আয়ান স্টেডিয়ামের কাছটায় দাঁড়িয়ে কাকলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। মানুষের প্রতীক্ষার ক্ষণগুলো বড় দীর্ঘ হয়। আয়ান কাকলির পথের দিকে তাকায় আর বারবার ঘড়ি দেখে। কিন্তু ঘড়িতেও এগারোটা বাজে না, কাকলিও আসে না। দুঘণ্টা সময় যে এত দীর্ঘ হয় আয়ানের সেটা ধারণায় ছিল না। পরীক্ষা হলের কথা মনে পড়ে। তিনটে ঘণ্টা যেন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এখন দেখ, দুটো ঘণ্টা কিছুতেই কাটতে চায় না। মনে হয়, সে যেন কত যুগ ধরে কাকলির জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কাকলি আসছে না। মাত্র দশটা বাজল। পৌনে এগারটা বাজল। কাকলি আসছে না। আয়ান থামটার আড়ালে সরে দাঁড়াল। বিপরীত দিক থেকে সমীরবাবু আসছেন। শেষ পর্যন্ত দেখে না ফেলেন। দেখে ফেললেই বিপদ। কথা বলতে শুরু করবেন। আর তখনি কাকলি চলে এলে মুশকিল হবে। এই রে, সমীরবাবু যে এই দিকেই তাকাচ্ছেন! আয়ান মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। সমীরবাবু তাকে দেখতে পাননি। তিনি চলে যাচ্ছেন। আয়ান আবার সহজভাবে দাঁড়ায়। আবার কাকলির পথের দিকে তাকায়। কিন্তু কাকলি আসে না। একজন দুজন করে ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রভবনে ঢোকে। আয়ান ভাবে তার কাকলি এক্ষুণি এসে যাবে। কিন্তু কাকলি আসে না। এগারটা বেজে যায়। ছেলেমেয়েদের আসা বন্ধ হয়। তবুও কাকলি আসে না। আয়ান উৎকণ্ঠিত হয়। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত চলতে শুরু করে। আয়ান একবার পথের দিকে তাকায়, একবার ঘড়ির দিকে তাকায়। এগারটা থেকে সওয়া এগার, সাড়ে এগারটা বেজে যায়।

আয়ানের মনে এবার সন্দেহ দেখা দেয়। তবুও সে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কারণে দেরি হলেও কাকলি আসবে নিশ্চয়। একটা বাজে। রবীন্দ্রভবন থেকে ছেলেমেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসে। আরেক দল ছেলেমেয়ে এসে ভবনে ঢোকে। আয়ানের মনে একটু আশা জাগে। কাকলির গান শেখার সময় হয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। চিঠিতে বোধহয় সেটা জানাতে ভুলে গেছে। এবার সে নিশ্চয় আসবে। ভালোই হয়েছে সে যে চলে যায়নি। না হলে কাকলি বেরিয়ে এসে তাকে পেত না। যে কোনো মুহূর্তেই কাকলি আসতে পারে। কিন্তু না, কাকলি আসে না। দেখতে দেখতে তিনটে বেজে যায়। দ্বিতীয় ব্যাচের ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রভবন থেকে বের হতে শুরু করে। আর কেউ আসে না। আয়ান এবার হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে সে যেতে পারে না। আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। আয়ান ঐ থামের পাশটায় বসে পড়ে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। আয়ান কি করবে ঠিক করতে পারে না। মানুষের জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্ভাবনা সমান সমান। কিন্তু মানুষের সব থেকে বড় দোষ ব্যর্থ হলে কি করবে সেকথা সে ভাবে না। সফল হলে কি করবে তার হাজারো স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। তাই ব্যর্থতা যখন আসে তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। হতাশ হয়ে কান্নাকাটি করে। আরো হতাশার দিকে এগিয়ে যায়। আয়ান যখন চক-এ আসছিল তখন তার ভাবা উচিত ছিল যে, কাকলি আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এলে সে কি করবে সেটা সে অনেকদিন ধরে

অনেক করে ভেবেছিল। কিন্তু না এলে কি করবে সেটা সে একবারও যদি ভেবে রাখত, তাহলে এখন তার এ অবস্থা হত না। কিন্তু সে একবারও সেকথা ভাবেনি। তাই এখন কি করবে সে ঠিক করতে পারে না। ঠিক করতে না পেরে সে হাঁটতে হাঁটতে সেই হোটেলটায় এসে হাজির হয়, যে হোটেলে চক-এ প্রথম এসে সে উঠেছিল। হোটেলের মালিক তাকে সাদরে গ্রহণ করে। রাতে হোটেল থেকে আয়ান কাকলিদের বাড়িতে ফোন করে। কিন্তু বেল বেজে যায়। কেউ ধরে না। সকালে উঠে সে হাউসিং-এ যায়। দেখে কাকলিদের ফ্লাট তালাবন্ধ। সে এসে বহরমপুরের বাসে ওঠে।

সাত

প্রেমে বিপর্যয় আয়ানকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। ভয়ঙ্কর হতাশা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। আয়ান বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকতে পারল না। সে নিমতলায় প্রফেসর মেসে গেল। সে শুভদার ঘরেই গেল। সে নিজে নীলকণ্ঠ নাম নিয়ে অনির্বাণরূপী শুভদার সঙ্গে জজকোর্টের মাঠে দেখা করতে গিয়েছিল। তারপর শুভদা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি ছাড়া পেলেন। সেই সঙ্গে গার্লস কলেজের চাকরিটাও ফিরে পেলেন। শুভদা এখানে আয়ানের সব থেকে কাছের বন্ধু। শুভদা আয়ানের মুখ দেখেই কি হয়েছে জানতে চাইলেন। আয়ান এতদিন যে কথা মা ছাড়া আর কাউকে বলেনি শুভদাকে তা খুলে বলল। শুভদা সব শুনে বললেন, 'তুমি ও মেয়েটার আশা ছেড়ে দাও। তার কথা যত মনে করবে ততই কষ্ট পাবে।' আয়ান ভুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু যেকথা মানুষ ভুলতে চায় সেকথাই বেশি করে মনে পড়ে। আয়ানেরও কাকলির কথা মনে পড়তে লাগল। আয়ান শুভদার ওখান থেকেই কলেজে গেল। কলেজে ক্লাস শেষ করে সে বাস ধরে সোজা বাড়ি গেল। অনেক দিন পর আয়ানকে পেয়ে মা সালমা খুব খুশি হল। সে বলল, 'তুমার চাকরি পাবার পর থাক্যা এখ্যানে ম্যালা সম্বন্ধ আসছে। তুমার সঙ্গে কথা না বুল্যা তো আমরা ঠিক করতে পারছি ন্যা।' সালমা এখন আয়ানকে 'তুমি' করেই বলে। সালমা বলল, 'তুমার ব্যাটার খুব বৌ দেখার সক। ল্যাখাপড়হা জানা বৌ দেখার সক আমারও। তুমি তো চক-এর সেই মেয়েটিকে বৌমা করবা বুল্যাছিলে। তা আর দেরি করছ ক্যানে?' আয়ান কিছুই বলতে পারল না। ছেলেকে নিরুত্তর দেখে সালমা অন্য কথা পাড়ল। আয়ান একটু শান্তি পাবার জন্য বাড়ি এসেছিল। কিন্তু এখানে অশান্তি আরো বেশি। আসলে নিজের মনে শান্তি না থাকলে, শান্তি কোথাও মেলে না। তবুও ভালো যে, কাকলির কথা আয়ান আর কাউকেই বলেনি।

পরের দিন সকালেই আয়ান বহরমপুর রওনা হল। এরকম কত সকালে উঠে সে বহরমপুর রওনা হয়েছে। তবে তখন সে কলেজে পড়তে যেত। আজ পড়াতে যাচ্ছে। তখন অনেক কষ্ট ছিল। বাসের ভাড়া জুটত না। পরনে ভালো কাপড় ছিল না। তবু বুকে আশা ছিল। চোখে পৃথিবীটা রঙিন মনে হত। আজ সেসব দুঃখ নেই। কিন্তু আছে একবুক হতাশা। পৃথিবীটা অর্থহীন মনে হচ্ছে।

বহরমপুরে এসে আয়ান কাকলির চিঠি পেল। 'যে কারণে আপনি অমিতাভর চিঠির উত্তর দেননি, সেই কারণে আমি শুভদাকে কোনো উত্তর দিচ্ছি না। আপনি বলে দেবেন, যদি সেদিন

কখনো আসে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। গণেশবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে জানলাম তিরিশ তারিখ আপনি এসেছিলেন। পরের দিন হাউসিং-এ এসেছিলেন। আমি জানতাম আপনি আসবেন। তবে আমি অনুরোধ করব, আপনি আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না। আমাদের বাড়িতে এলে বাবা হয়ত আপনাকে অপমান করবেন। আমি ঠিক করেছিলাম তিরিশ তারিখে আপনার সঙ্গে চলে যাব। বাবা হয়ত কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে বিয়ে করলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। বাবা আমাকে কত ভালোবাসেন তা আপনি জানেন। আগে আমাকে না নিয়ে রাতের খাবার খেতেন না। কিন্তু এখন খেয়ে আছি, না, না খেয়ে আছি খোঁজ নেন না। আমি চলে গেলে হয়ত তিনি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতেন না। কিন্তু যদি করেন তাহলে আমি কোনোদিনও শান্তি পাব না। শুধুই মনে হবে, আপনাকে পাবার জন্য আমি বাবাকে নিজের হাতে হত্যা করেছি। আমি তা সহ্য করতে পারব না। আপনারও নিশ্চয় সেটা খুবই খারাপ লাগবে। এসব চিন্তা করে আগের দিন আমি বাবাকে সব কথা বলে দিই। বলে দিই, আপনাকে তিরিশ তারিখ আসতে বলেছি। বাবা শুনে বিমূঢ় হয়ে যান। একটি কথাও বলেন না। আমি ঠিক করি, বাবাকে ছেড়ে এভাবে যেতে পারব না। কিন্তু আপনি এলে আপনাকেও আমি সামনা-সামনি ফিরিয়ে দিতে পারব না। তাই মার সঙ্গে পরামর্শ করে তিরিশ তারিখ সকালেই আমরা সবাই মিলে মামার বাড়ি চলে যাই। আমি আবারও বলছি, আমার কথা আপনি ভুলে যান।'

শুভদাও বললেন কাকলির কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। শুভদা কাকলিকে আর কোনো চিঠি না লেখারও পরামর্শ দিলেন। যে মেয়ে তাকে আসতে বলে নিজে মা-বাবার সাথে মামার বাড়ি চলে যায় তাকে চিঠি না লেখাই উচিত। কিন্তু আয়ান না লিখে পারল না। খুব কঠিন কঠিন ভাষায় লিখল। সে লিখল, 'আমার সঙ্গে চিরদিনের মতো চলে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিনে যেতে লিখে সেদিন স্বেচ্ছায় তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে পার, তা আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। তবু তুমি নিজের হাতে লিখেছ সে কাজ তুমি করেছ। এরপর আর তোমার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক না রাখাই উচিত। তবুও আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। আমি এ মাসের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তুমি ইচ্ছে করলে আমার কাছে চলে আসতে পার। আমরা একসঙ্গে জীবন শুরু করব। একত্রিশ তারিখের মধ্যে তুমি যদি না আস তবে আমি ধরে নেব, তুমি আমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাও না। সেক্ষেত্রে আমি তোমার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চাই না। একত্রিশ তারিখের পর আমি তোমার কাছ থেকে কোনো চিঠিও আশা করি না।'

চিঠিটা নিজে পোস্ট অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে আয়ান কলেজে গেল। কয়েক দিন পরে পলির চিঠি পেল। পলি লিখেছে, 'আপনি শুধু মুখেই বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই সব ভুলে যান। খুব তো বলে গেলেন যে, গিয়েই চিঠি লিখবেন। কিন্তু দশ দিন হয়ে গেল, আপনার চিঠি নেই। এর থেকে প্রমাণ হয় আপনার কথার কোনো দাম নেই। যার কথার দাম নেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমিও রাখতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার জন্য আগামী একত্রিশ তারিখ বহরমপুর যাচ্ছি। বাপি দুদিন ছুটি নিয়েছেন। সকালের বাসে আমরা সকলে মিলে রওনা হচ্ছি। আমরা তো আপনার বাসা চিনি না। তাই

বাস স্ট্যান্ডে থাকবেন। যদি না থাকেন তবে পরের বাসে ধরে আমরা বকুলপুর ফিরব। আশা করি আপনি চান না যে আমরা বাসস্ট্যান্ড থেকেই ফিরে আসি। অতএব আমাদের রিসিভ করার জন্য বাসস্ট্যান্ডে থাকবেন।

পরের দিনই কাকলির বাবার কাছ থেকে চিঠি এল। তিনি লিখেছেন, 'আপনি আমার সমস্যা উপলব্ধি করবেন, এই আশা নিয়েই এই চিঠি লিখছি। আপনাকে আমি একজন প্রকৃত ভদ্র এবং রুচিশীল মানুষ বলেই জানি। সেইজন্যই আপনার আমার বাড়িতে আসা এবং আমার মেয়েদের আপনার কাছে যাওয়াতে আমি কোনোরকম আপত্তি করিনি। আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে তখনই হয়ত বাধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আমি করতে পারিনি। ফলে আমার মেয়ে এবং আপনি পরস্পরকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন এবং আপনারা বিয়ে করতে চান। এতে আমি অন্যায়ের কিছু দেখি না। কিন্তু আপনি নিজেও একথা স্বীকার করবেন যে, আমরা যে সমাজে বাস করছি তাতে এটা সম্ভব নয়। যতটা সাহস থাকলে সমাজের বাধাকে উপেক্ষা করে এই চাওয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, আমার ততটা সাহস নেই। তাই আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি আমার পরিবারের শান্তি ফিরিয়ে দিন। আপনাদের ধর্মেও অনেক উপযুক্ত মেয়ে আছে। আপনি তাদের একজনকে বিয়ে করুন। আপনি বিয়ে না করলে, আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না। আর আমার পরিবারে শান্তিও আসছে না। আমি যদি আপনার সঙ্গে কোনোদিনও সামান্য ভালো ব্যবহার করে থাকি, তার পরিবর্তে এই ভিক্ষে চাইছি যে, আপনি আর আমার মেয়ের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখবেন না।' আয়ান বুঝতে পারে না, এ চিঠির কি উত্তর দেওয়া যায়। সে কাকলি কি করে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কাকলি এল না। তার কোনো চিঠিও এল না। একত্রিশ তারিখ সকালে আয়ান পলিদের রিসিভ করতে বাসস্ট্যান্ডে গেল। বাস থেকে নেমেই পলি বলল, 'তাহলে আমাকে ভয় করেন বলুন। দিদি কিন্তু বলছিল যে, আপনি আসবেন না। বাপি, দেখলে তো আমার কথাই ঠিক হল।' করিম সাহেব হাসলেন। কিন্তু দিদি কিছু বলল না। আয়ান তিনটে রিক্সা ঠিক করল। তোতন বাবার সঙ্গে একটা রিক্সায় উঠল। করিম সাহেবের স্ত্রী আর রিনা আরেকটাতে উঠলেন। পলি আর আয়ান সবের আগেরটাতে উঠে বসল। আয়ানের বাসায় রীতিমতো উৎসবের মেজাজ চলে এল। তোতন রাতে আয়ানের কাছে শুল। সকালবেলায় উঠে সে আর পলি হৈ-হুল্লোড় করে নীরব বাড়িটকে সরব করে তুলল। দুপুরে আয়ান তোতন আর পলিকে সাথে নিয়েই কলেজে গেল। পলির কলেজটা খুবই পছন্দ হল। গঙ্গার ধারে উঁচু উঁচু গীর্জার চূড়ার মতো কলেজটার একটা বাহ্যিক আভিজাত্য আছে। পলি বলল, 'আমি কিন্তু এবার এই কলেজে ভর্তি হব।' আয়ান বলল, 'তুমি তো রেজাল্ট ভালোই করবে। কোনো অসুবিধা নেই। তবে সায়েন্স নেবে, না আর্টস?' পলি বলল, 'আর্টস পড়তে আবার কলেজে আসতে হয়? ও তো বাড়িতে বসেই পড়া হয়। আমি সায়েন্সই পড়ব।' আয়ান জানতে চাইল, 'অনার্স কিসে নেবে?' পলি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার কিসে ছিল যেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'কেমিস্ট্রিতে।' পলি বলল, 'তাহলে আমিও কেমিস্ট্রিতে নেব।' আয়ান বলল, 'আমি শেষ পর্যন্ত কেমিস্ট্রিতে অনার্স পাইনি, সেটা জান তো?' পলি বলল, 'তাই বলে আমিও পাব না ভাবছেন নাকি! আমি ঠিক পাব।' আয়ান বলল, 'তাহলে আমি ফর্ম নিয়ে পাঠিয়ে দেব।' পলি রাগ

করল। 'কেন, ফর্ম দিতে শুরু করলে আমাকে খবর দেবেন না কেন? আমি এসে ফর্ম পূরণ করে যাব। আসলে আপনি চান না যে, আমি আপনার বাড়ি আসি। আপনি চানও না যে, আমি এই কলেজে ভর্তি হই। ঠিক আছে, আমি এ কলেজে ভর্তি হব না।' আয়ান বাধা দিল, 'আমি কি তাই বললাম নাকি? তোতন বল তো!' তোতন কিছু বলল না। তাকে রেখে আয়ান যে শুধু পলির সঙ্গে কথা বলছে, এতে সে আয়ানের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। আয়ান সেটা বুঝতে পেরে তোতনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। পৌনে বারোটায় আয়ানের ক্লাস ছিল। আয়ান পলি ও তোতনকে স্টাফরুমে বসিয়ে রেখে ক্লাসে গেল। বিকেলবেলায় আয়ান পলি আর তোতনকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউ। আয়ানরা একটা সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর বসল। আয়ান মাঝে। একপাশে পলি, অন্যপাশে তোতন। একটা বাদামওয়ালা এল। আয়ান বাদাম কিনল। পলি বলল, 'দাদা খুব বাদাম খেতে ভালোবাসেন, না? এবার আমাদের বাড়ি গেলে শুধু বাদাম খাওয়াব।' সময় বয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ আয়ান গুণগুণ করে গেয়ে উঠল, 'ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে।' পলি আয়ানের হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল, 'দাদা গান না। একটু জোরে গান না!' আয়ান বলল, 'আশেপাশে আমার ছাত্র আছে। আমাকে গান গাইতে দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। বরং তুমি একটা গাও।' আয়ান পলির হাতটা হাতের মুঠিতে নিল। ব্যাপারটা যাতে দৃষ্টিকটু না হয় তার জন্য অন্য হাতের মুঠিতে তোতনের একটা হাতও নিল। পলি গান গাইতে রাজি হল না। তারা বাড়ির পথে রওনা হল।

বাড়িতে আসতেই রিনা পলিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোদের এত দেরি হল যে?' পলি বলল, 'দাদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম।' রিনা রাগটা সামান্য চাপা দিয়ে বলল, 'আমরা তোদের জন্যে বসে আছি, আর তোরা গঙ্গার ধারে গিয়ে মজা করছিস। আমাদের নিয়ে কি গঙ্গার ধারে যাওয়া যেত না!' পলি বলল, 'তুই যেতে চাস কাল যাবি। অত [illegible]কছিস কেন?' আয়ান ছুটে এল, 'পলি, কি হয়েছে?' পলি বা রিনা কেউ কোনো কথা বলল না। আয়ান গিয়ে পড়ার ঘরে বসল। তোতন তার সঙ্গে কলেজের গল্প করতে লাগল। এমন সময় করিম সাহবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি তোতনকে বললেন, 'পলি, দিদি ডাকছে, কি বলছে শুনগে যা।' তোতন চলে গেল। একটু পরে করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন। দুজনেই পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলেন। করিম সাহেবের স্ত্রীই কথা শুরু করলেন, 'আপনাকে এটা কথা জিজ্ঞেস করছি।' আয়ান বলল, 'করুন।' তিনি বললেন, 'আপনি কি রিনাকে বলেছেন যে, একটি মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, বলেছি।' করিম সাহেব মুখ নিচু করলেন। তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'মেয়েটি কে?' আয়ানের খুবই খারাপ লাগল। সে বলল, 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চাই না।' তিনি বললেন, 'তার মানে কথাটা বানানো।' আয়ান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'না, বানানো নয়। আমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলি না।' তিনি বললেন, 'না, আমি ওরকমভাবে বলতে চাইনি। তবে রিনা এতবড় হল। কারো সঙ্গে মেলামেশা তো দূরের কথা, কথাবার্তাই বলতে চায় না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ও আপনার সঙ্গে সহজেই কথাবার্তা বলে। ও বলে, আপনার সঙ্গে ওর স্বভাবের নাকি অনেক মিল আছে।' আয়ান বলল, 'ও ঠিকই বলে।' করিম সাহেবের স্ত্রী উৎসাহ পেলেন, 'তাহলে আপনাকে পেলে ও সুখী হত।'

আয়ান উত্তর দিল, 'কিন্তু আমি ওসব কথা এখন ভাবতেই পারছি না। আমি এখন বিয়েই করব না।' কথা আর অগ্রসর হতে পারল না। ঠিক হল রিনাকে যেন এ ব্যাপারে কিছু না জানানো হয়। রাতে একসঙ্গে খেতে বসে আয়ানের সংকোচ হতে লাগল। পরের দিন সকালে করিম সাহেবরা চলে গেলেন।

মাসখানেক পর বকুলপুর কলেজ থেকে এক ছাত্র তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আয়ানকে নিমন্ত্রণ করতে এল। 'স্যার, আপনি যে নাটকটির অভিনয় শুরু করিয়েছিলেন, সেটা আমরা মঞ্চস্থ করছি। বিতর্ক প্রতিযোগিতাও থাকবে। আপনাকে যেতেই হবে।' আয়ান বলল, 'যাব। আমার জন্য কলেজের কাছে ফরেস্ট বাংলোতে একটা সিট বুক করে রেখো। মিত্র সাহেব ওখানে রেঞ্জার আছেন। তাঁকে বললেই হবে।'

আয়ান গিয়ে ফরেস্ট বাংলোয় উঠল। সকালে করিম সাহেবের বাড়িতে দেখা করতে গেলে উনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। পলি অভিমান করে কথা বলল না। রিনা একফাঁকে বলল, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি গেস্ট হাউসে যাব।' রাতে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। দুপুরে স্নান-খাওয়া হয়ে গেলে আয়ান রিনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চারটে নাগাদ রিনা এল। এসে সে সামনের বিছানাটায় বসল।

আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ?'

রিনা বলল, 'আমাদের তো সিমেস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা হয়। আজ পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরিয়েছে।'

আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তোমার রেজাল্ট কেমন হয়েছে?'

রিনা বলল, 'আমি প্রথম হয়েছি।'

'খুব ভালো। চেষ্টা কর যাতে পার্ট টু-তেও প্রথম হতে পার।'

'প্রথম হলে আপনি খুশি হবেন?' রিনা সংকোচের সঙ্গে সলজ্জভাবে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়।' আয়ান উত্তর দিল। রিনা বলল, 'আমি প্রাণমনে চেষ্টা করব। আয়ান দেখল রিনা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো খুঁটছে। তার বাঁ হাতের তর্জনীর নখটা অনেক বড় হয়েছে। তাতে নেল-পালিশ লাগানো। আয়ান বলল, 'তুমি নখ রেখেছ?' রিনা সংকুচিত হয়ে বলল, 'আপনার ভালো না লাগলে কেটে ফেলব।' আয়ান সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'না না, আমি তা বলিনি।' তবে তাকে খুশি করার জন্য রিনার আপ্রাণ চেষ্টা তার মন স্পর্শ করল। সে খুশি হবে জেনে রিনা প্রথম হওয়ার চেষ্টা করবে। তার ভালো না লাগলে, সে নখ কেটে ফেলবে। তার মানে রিনা তাকে কত ভালোবাসে! আয়ানেরও রিনাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হল। মনে হল রিনা তার অনেক আপন। রিনা বলল, 'কাকলিদির সঙ্গে আপনার কবে বিয়ে হচ্ছে?' আয়ান রিনাকে সব কথা খুলে বলল। রিনা সলজ্জভাবে জানতে চাইল, 'এর পরও কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে পারেন না?' আয়ান আর না বলতে পারল না। সে বলল, 'আর কেউ বোধ হয় আমাকে এত করে চায়নি। তুমি যখন আমাকে এত করে চাও আমি তোমাকেই গ্রহণ করব। তবে এক্ষুণি পাকা কথা দিতে পারছি না। আমাকে কিছুদিন ভাবতে সময় দাও।' আয়ান দেখল, রিনা খুশি হল। খুশিতে তার হাতের সাদা পাথরের আংটিটাও ঝকঝক করে উঠল। আয়ানের ঐ আংটিটা পেতে খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু আয়ান সে কথা বলতে পারল না।

সে রিনাকে সঙ্গে করে স্বর্ণকারের দোকানে গেল। সেখানে একটা লাল পাথরের আংটি কিনে আয়ান রিনার হাতে পরিয়ে দিল। রিনা লজ্জায় অথবা খুশিতে চোখ বন্ধ করে নিল। আয়ানের আশা ছিল, আয়ান তার হাতে আংটি পরিয়ে দিলে সেও নিশ্চয় তার আংটিটা আয়ানের হাতে পরিয়ে দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। আয়ান রিনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাংলোতে চলে গেল। পরের দিন সকালের বাস ধরেই সে বহরমপুর চলে এল।

পূজার ছুটিতে রিনা-পলি-তোতন বহরমপুরে বেড়াতে এল। তিনজনকে পেয়ে আয়ান খুশিই হল। বিকেলে তারা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল। পরের দিন দুপুরে মোহন হলে সিনেমা দেখতে গেল। পলি আয়ানের পাশে বসল। সিনেমায় বিয়ের অনুষ্ঠানে একটা গান হচ্ছিল। একটি মেয়ে বিভিন্ন বিবাহিত মেয়েদের কাছে গিয়ে প্রথম রাতে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করছে, 'শুনো সখি, শুনো সখি, পহেলি রাতোঁ মে কিয়া হুয়ি থী?' কানে কানে মেয়েরা তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে। আর মেয়েটি সেকথা গানে গানে বলছে। বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার কথা জানা যাচ্ছে। সব শেষে যে মহিলার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হচ্ছে তার স্বামী ভোলাভালা। সে চুপ করে শুয়ে আছে। রাত শেষ হয়ে এসেছে। মহিলা ভাবল, এমন মধুর রাত কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই কাটল। সে তার স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বলছে, 'কুছ তো করো।' সঙ্গে সঙ্গে হলের সমস্ত লোক হো হো করে হেসে উঠেছে। পলিও হেসে ফেলেছে। রিনা পলিকে ধমক দিল, 'অসভ্যের মত হাসছিস কেন?' পলি আয়ানের হাতে চাপ দিল। আয়ান উল্টো পলির হাতে চাপ দিল। রিনা কিন্তু চুপ করে বসে সিনেমা দেখতে লাগল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা শুতে যায়। পলিরা তিন ভাইবোন ভেতরের ঘরটায় শোয়। আয়ান রাস্তার দিকের ঘরটায় ঢোকে। সে মশারিটা ঠিক করছে তখন রিনা তার ঘরে আসে। আয়ান বলে, 'বসো।' রিনা গিয়ে বিছানাতে তার পাশে বসে। আয়ান জিজ্ঞেস করে 'তুমি কিছু বলবে?' রিনা বলে, 'হ্যাঁ বাবা তো আমাকে আসতেই দিচ্ছিলেন না। আপনি নাকি একদম না করে দিয়েছেন। বলতে গেলে আমি জোর করে এসেছি। এরপরে হয়ত আর আসতে দেবে না। আপনিও তো যাবেন না। আপনি কি এখনো আমাকে কথা দিতে পারেন না।' আয়ান বলে,'পারি। এখন আমি কথা দিতে পারি।' আয়ান রিনাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। রিনা আয়ানের পায়ের কাছে বসে পড়ে, 'আপনি আর পাঁচজনের মতো করবেন না। আমার চোখে আপনি অনেক মহৎ।' আয়ান লজ্জা পায়। রিনার কাছে সংকোচ লাগে। মনে হয় রিনা তাকে অপমান করছে। রিনা যে কোনো দোষ করেছে, তা সে ভাবতে পারে না। তবে রিনার আচরণ বলে দিয়েছে, আয়ান অন্যান্য সাধারণের মতো আচরণ করেছে। আয়ানের খুব কষ্ট হয়। সে বালিশে মুখ লুকিয়ে ফেলে। রিনার খুব খারাপ লাগে। সে তো আয়ানকে দুঃখ দিতে চায়নি। সে শুধু তাকে ছোট হতে দিতে চায়নি। কিন্তু সে বোধ হয় তারই ভুল। কারণ আয়ান যতদিন বিয়ে করার কথা দেয়নি ততদিন তো তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। আর আজ তো আয়ান তাকে বিয়ে করার কথা দিয়েছে। সে আয়ানের পাশে শুয়ে পড়ে। আয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আয়ানের সব অপমানবোধ সে দূর করে দেয়। সারা রাত ধরে তারা কথা বলে। ভোরের দিকে খেয়াল হয় ওঘরে পলি আর তোতন শুয়ে আছে। এঘরে তাদের দুজনে থাকা ভালো দেখায় না। রিনা বলে, 'আমি এখন ওঘরে যেতে পারব

না।' তখন আয়ানই গিয়ে ওদের সঙ্গে শুয়ে পড়ে। রিনা আয়ানের বিছানায় থেকে যায়। পরের দিন সকালে উঠেই পলি বাড়ি যেতে চায়। আয়ান অনেক বোঝায়; কিন্তু পলি আয়ানের কোনো কথা শুনতে চায় না। অগত্যা রিনাকেও যেতে হয়। আয়ান ওদের বাসে তুলে দেয়।

কয়েকদিন পরেই রিনার চিঠি আসে। 'পলি বাড়িতে সব বলে দিয়েছে। বাবা-মা আমাকে যা-তা বলছেন। আমার পড়াশোনা করায় মুশকিল হয়েছে। তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি আমার সবকিছু জেনেছ এবং সবকিছু নিয়েছ। এবারে আমাকে বিয়ে করে স্বাভাবিক হতে দাও। না হলে আমার বেঁচে থাকায় মুশকিল হয়েছে।' চিঠি পেয়ে আয়ান চমকিত হয়ে গেল। একথা ঠিক, রিনার সঙ্গে তার একটু বেশিই মেলামেশা হয়েছে। কিন্তু সে তো রিনাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। আয়ান তাকে বিয়ে করবে। তবে গ্রামে তার বাড়িটা শেষ হয়নি। মাস ছয়েক সময় পেলেই সে শেষ করে ফেলতে পারবে। তাহলেই সে বিয়ে করবে। আয়ান সেকথা জানিয়ে রিনাকে চিঠি লিখল। লিখল, রিনা যেন মোটেই চিন্তা না করে। কিন্তু পরের চিঠিতে রিনা আয়ানকে আরো চিন্তিত করে তুলল। রিনা লিখেছে, 'বাবা-মা আমাকে সবসময় বকাবকি করছে। বলছে কাকলিকেও তো বিয়ে করবে বলেছিল। করেনি। কিছুদিন পরে তোকেও করবে না। তোকে যদি মাস কয়েক পরেই করবে তাহলে এখন করতে অসুবিধা কি?'

আয়ান এবার চিঠি না লিখে নিজেই গেল। গিয়ে করিম সাহেবের বাড়িতেই উঠল। বিকেলে পলি-রোজনকে নিয়ে খালের ধারে বেড়াতে যেতে চাইল। কিন্তু পলি কাজ আছে বলে গেল না। সন্ধ্যার সময় রিনা এসে কাঁদতে লাগল, 'বাবা বলছে, বিয়ে করবে না তো এত মেলামেশা করলে কেন? তুমি আমাকে বিয়ে কর। না হলে আমার পড়াশোনা কিচ্ছু হবে না।' আয়ান বলল, 'আমি তো বিয়ে করবই বলছি। শুধু মাস ছয়েক পর।' রিনা বলল, 'অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি যখন ছ মাস পরেই বিয়ে করবে, তখন এখন করতেই বা এত আপত্তির কিসের?' আয়ানের মনে হল, এটা বাড়াবাড়ি। সে তার দায়িত্ব এড়াতে চাইছে না বলে তার ওপর এত চাপ। সে যদি সব অস্বীকার করে বলতে পারত, আমি কিছু জানি নে, তাহলে কেউ তার ওপর চাপ দিতে পারত না। কিন্তু সে তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। কথাও ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কাজেই তাকে বিয়ে করতেই হবে। তবে যারা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, তাদের সঙ্গে সে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি এখনই বিয়ে করব। তবে আমি তোমাদের বাড়ির কিছু নেব না। আর এরপরে কোনোদিনও তোমাদের বাড়ি আসব না। রেজিস্ট্রি বিয়ে হবে। তোমরা ফরম পূরণ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি সই করে দেব।' করিম সাহেব তাতেই রাজি হলেন। আয়ান বহরমপুর চলে গেল।

পরের দিনই তার অফিসের চৌধুরীকে নিয়ে নিশার সাহেব এলেন। রাত্রে তাঁরা আয়ানের কাছে রইলেন। সকালে চৌধুরী আয়ানকে একান্তে ডেকে নিশার সাহেবের আগমনের হেতু বললেন। 'নিশার সাহেব তো আপনাকে মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। ওনার ছোট মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে চান।' আয়ান বলল, 'ওনার সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের আলাপ। ওনার বাড়িতেও আমি গিয়েছি। উনি যদি একবারো আমাকে বলতেন তাহলে আমি খুশি হয়েই রাজি হতাম। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই। আমার বিয়ের কথা হয়ে গেছে।' চৌধুরী বললেন, 'তাহলে সত্যি তো আর কিছু করার নেই।' তাঁরা চলে গেলেন।

আয়ান করিম সাহেবের চিঠি পেল। করিম সাহেব লিখেছেন, 'স্থানীয় কাজির সাথে কথা বলেছি। বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়। তবে ব্যাক ডেটে নোটিশ দিয়ে রেজিস্ট্রি করা যাবে। তুমি সামনের সপ্তাহের শুক্রবার নাগাদ চলে এসো।' অর্থাৎ তাঁরা নোটিশ দেওয়ার সময়টুকুও অপেক্ষা করতে রাজি নন। তাতে একটা গোঁজামিল দিয়েই মেয়ের বিবাহিত জীবন শুরু করতেও তাঁদের আপত্তি নেই। আয়ানের খুবই খারাপ লাগল। সে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখল, 'আমি তো বলেইছি যে, মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে আমি বিয়ে করব না।' করিম সাহেব উত্তরে লিখলেন, 'তুমি কি মনে করেছ কাজি মানেই টুপি পরিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবে? এখানেও রেজিস্ট্রি হবে। তুমি চলে এসো।' আয়ানের আরো খারাপ লাগল। তার আপত্তিটা যে কোথায় তাও তাঁরা বুঝতে চান না। আয়ান ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ফরম নিয়ে পূরণ করে পাঠাল। লিখল, 'টুপি পরতে আমার আপত্তি নেই। জীবনে অনেকরকম টুপি পরেছি। এখনো পরে চলেছি। তবে আমার আপত্তি অন্যখানে। আমি স্ত্রী কিনতে চাই না। মুসলিম আইনে বিয়ে মানেই মোহরের পরিবর্তে স্ত্রী কিনে নেওয়া। আমি কতকগুলো ফরম পূরণ করে পাঠালাম।' বাকিটুকু পূরণ করে পাঠাবেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফর্মগুলো পূরণ হয়ে রিনার সই হয়ে এল। আয়ান দেখল, স্থায়ী ঠিকানার জায়গাতেও রিনা বকুলপুরের ঠিকানা দিয়েছে— দেশের বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। আয়ানের ব্যাপারটা ভালো লাগল না। কিন্তু সংশোধন করতে পাঠালে আবার ভাববে যে, আয়ান ইচ্ছে করেই দেরি করছে। তাই সে ফরমগুলি জমা দিয়ে দিল। জমা দিয়ে রিনাকে তিরিশ দিন পরে আসতে লিখল।

ঠিক উনত্রিশ দিনের দিন করিম সাহেব মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন। আয়ান শুধু শুভদাকে বলেছিল আর কালাম আর সফিউলকে বাবাকে নিয়ে আসতে বলেছিল। অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বাবা ইব্রাহিম এল। এগারটার দিকে তারা রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে বিয়ের চুক্তিতে সই করল। সাক্ষী হিসেবে সই করলেন রিনার বাবা এবং কালাম। ইব্রাহিম অফিস থেকেই বাড়ি চলে গেল। এরকম বিয়ে সে চৌদ্দ পুরুষেও দেখেনি। রেজিস্ট্রারের সামনে আয়ানকে শপথ নিতে হল, 'আমি শিরিন করিমকে আজ থেকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম।' আয়ানের কিরকম বাধো-বাধো লাগল। সত্যিই এই মুহূর্তে মন থেকে সে এ বিয়ে মেনে নিতে পারছে না। শুধুমাত্র রিনার সঙ্গে সে মেলামেশা করেছে, তাই বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু কালাম বা সফিউল কাউকে সে সেকথা জানতে দিতে চায় না। সে সকলকে দেখাতে চায় যে, সে ইচ্ছে করেই বিয়ে করছে। তাই বিয়ের আগে মার হাতে একটা সোনার হার দিয়ে সে রিনাকে দেখতেও পাঠিয়েছিল। মা সালমা রিনাকে পছন্দ করেছে। আয়ান বলছে, মার পছন্দের পরেই সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আসলে বিয়ের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই বরং মাকে দেখতে পাঠিয়েছিল। আয়ানের তার জন্যও নিজেকে অপরাধী বোধ হয়। আয়ানের মনে হয়, সে কিনা বন্ধু-বান্ধবদের উপদেশ দেয়। আর নিজে ফাঁদে পড়ে বিয়ে করছে। কালাম আর সফিউলকে সঙ্গে নিয়ে আয়ান বাড়ি আসে। বাড়ি এসে ওরা চলে যায়। করিম সাহেবও চলে যান। আয়ান রিনাকে নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু করিম সাহেব নিয়ে যেতে রাজি হননি। রিনা যেতে চায়নি। রাতে আয়ান আলাদা ঘরে বিছানা করে। বিয়েই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের সঙ্গে আর সে

কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। রিনাও তো শুধু বিয়ের জন্যই উদগ্রীব ছিল। বিয়ে হয়ে গেছে। এবার সে বকুলপুর গিয়ে পড়াশোনা করুক। কিন্তু রিনা আলাদা ঘরে শুতে গেল না। সে বলল, শুধু বিয়ে করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তোমার কাছে আসতে চাই। বিয়ে না হলে আসতে বাধা। সেই বাধাকে সরানোর জন্যই আমি বিয়ের জন্য এত পীড়াপীড়ি করেছি। আয়ান বেশিক্ষণ তার রাগ ধরে রাখতে পারল না। এক বিছানাতেই তারা শুয়ে পড়ল। দুদিন পরে রিনা বলল, 'এবার আমাকে ফিরতে হয়। দিন চারেক ক্লাস কামাই হয়েছে। আর কামাই করা উচিত নয়।' আয়ান বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারি এই শর্তে যে, স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করবে না।' রিনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতেই রাজি হল। আয়ান রিনাকে রিক্সায় করে নিয়ে খাগড়াঘাট স্টেশনে গেল। ট্রেনে করে বকুলপুর স্টেশনে নামল। স্টেশন থেকে বের হয়ে রিনাকে একটা রিক্সায় তুলে দিয়ে আবার ট্রেনে চাপল।

আট

আয়ানের বিয়েটা খুব গোপনে হলেও ক্রমে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। স্টাফরুমে সহকর্মীরা তাকে চেপে ধরল, 'আমাদেরকে একেবারে ফাঁকি দিলেন মশাই! মিষ্টি খাওয়ান। আয়ান মিষ্টি খাওয়াল। গ্রামে ফিরতে পাড়া-পড়শীরা অনুযোগ করল, তাদের একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তারা গ্রামে খানা খেত। তারপর বাসে চড়ে বরযাত্রী যেত। কিন্তু দুটোর একটাও হল না। আয়ান আশ্বাস দিল—পরে বোনের বিয়েতে ভালো করে খাইয়ে দেব। তখন তারা সমস্বরে বলল, 'আমরা বৌ দেখব।' সালমা তো প্রায় কাঁদতে লাগল, 'বৌমাকে কেনে আনলি না! তোর বড় ব্যাটা কত দেখতে চাহাছে।' বড় ব্যাটা মানে নাদের বক্স। নাদের বক্স অসুস্থ। আয়ানের নাদের বক্সের কথাই বেশি করে মনে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার জীবনে নাদের বক্সের কথাই সত্যি হল। নাদের বক্স বলতেন, বাবা, শহর-বাজারে যাচ্ছ। সাবধানে থেকো। তুমি এখুন ভালো চাকরি পায়্যাছ। বড়লোকেরা তাদের মেয়ে এগিয়ে দিবে। তুমি না বুঝে মিশবে। তারপর বুলবে বিহ্যা করো। তোমাকে ফাঁদে পড়ে বিহ্যা করতে হবে। আয়ানকে সত্যি সত্যিই ফাঁদে পড়ে বিয়ে করতে হল। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আর দেখা করতে ইচ্ছে হল না। সে বহরমপুরে এসে কলেজ করতে লাগল।

মাস খানেক পরে তোতনের মাস্টারকে সঙ্গে করে রিনা আর পলি এল। মাস্টার তাদের পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। পলিও চলে যেতে চাইছিল। আয়ান অনুরোধ করায় থেকে গেল। থেকে গেল, কিন্তু আগের মতো স্বাভাবিকভাবে আয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলল না। সেই যে বিয়ের আগে রিনা রাতে আয়ানের ঘরে এসেছিল। তারপর থেকে পলি আয়ানের থেকে দূরে সরে গেছে। সে আয়ানের সাথে পরের মতো ব্যবহার করে। আগে সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠি লিখত, এখন একদম লেখে না। বললে বলে, 'আমার চিঠি লেখা ঠিক হয় না। আর দিদি লেখে তো। আগে তো দিদি লিখত না। তাই আমাকেই লিখতে হত।' পলির বক্তব্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই। তবুও পলি ওকথাই বলে, আজো বলল। আয়ান ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার দিদির সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় তুমি কি রাগ করেছ?' পলি সজোরে আপত্তি তুলল, 'তা করব কেন? ভালোই তো হয়েছে। আপনি আত্মীয় হয়ে গেছেন।' 'আর সেজন্যেই অনাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করছ।

বরং যখন আত্মীয় ছিলাম না তখন ভালো ব্যবহার করতে।' পলির সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলতেই থাকল।

রাতের খাবার খেয়ে তারা শুতে গেল। পলিকে রাস্তার দিকের ঘরটায় শুতে দিয়ে আয়ানরা ভেতরের ঘরে বিছানা করল। আয়ানকে একা পেয়ে রিনা বলল, 'তুমি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে বাড়িতে গেলে না। আমাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে চলে এলে। বাবা-মা খুব দুঃখ করছিলেন।' আয়ান নিস্পৃহভাবে জবাব দিল, 'বিয়ে করার তো একটা শর্তই ছিল, আমি কোনোদিনও তোমাদের বাড়ি যাব না।' রিনা বলল, 'বাড়ির আশেপাশের লোকেরা সবাই বলছে, বিয়ে হল আর জামাই দেখতে পেলাম না। এ কেমন বিয়ে? মা খুব দুঃখ করছিলেন। তুমি না থাক, একবার গিয়ে শুধু দেখা দিয়ে চলে এসো।' আয়ান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'সেটা হয় না। কেউ দেখতে চাইলে এখানে পাঠিয়ে দিও।' রিনা আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন যাবার কথা হচ্ছিল। পলি বলল, 'আমরা একা একা যেতে পারব না। আমাদের পৌঁছে দিতে হবে।' আয়ান বলল, 'সত্যিই যদি তোমরা একা একা না যেতে পার তাহলে আমি তোমাদের বকুলপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। তবে বাড়িতে যাব না।' রিনা বলল, 'সেটা খুব খারাপ দেখাবে। তার থেকে আমাদের বাসেই তুলে দাও।'

কয়েকদিন পরে আয়ান রিনার মার চিঠি পেল। তিনি লিখেছেন, 'বিয়ের আগে তুমি তোমার বাবাকে বলেছিলে বটে যে, তুমি আমাদের বাড়ি কোনোদিনই আসবে না। তোমার বাবা মনে করেছিল, ওটা তোমার রাগের কথা। বিয়ে হলে ঠিকই আসবে। আমাদের হিসেবে যে ভুল হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু ভুলেরও তো ক্ষমা হয়। তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার মায়ের মতো। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাদের অবস্থাটা ভাব। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীরা কেউ জামাই দেখেনি। সবাই বাঁকা মন্তব্য করছে। কেউ কেউ আবার বিয়েতেই সন্দেহ করছে। তুমি একবার এসো। রিনা তো কিরকম হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। তবে পলি তোতন তোমার কথা খুব বলে। তোতনটা তো রিনার সঙ্গে ঝগড়া করে যে, তুই দাদাকে আসতে মানা করেছিস। ওদের দিকে তাকিয়েও একবার এসো।' কিন্তু আয়ান যায় না। এ চিঠির কোনো উত্তরও দেয় না।

গরমের ছুটিতে রিনা বহরমপুর আসে। আয়ান তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। রিনা বলে, 'তুমি আমার বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তোমাদের বাড়িতে যাব কেন?' আয়ান বলে, 'তোমার না যাবার কোনো কথা ছিল না।' রিনা পাল্টা জবাব দেয়, 'যেতেই হবে এমন কথাও ছিল না। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে না যাও, আমিও তোমাদের বাড়িতে যাব না।' আয়ানের রাগ হয়। কিন্তু সে কিছু বলে না। তবে রিনাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাবার আশা ছেড়ে দেয়। দু-একদিনের মধ্যেই রিনা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা করে। আর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আয়ান ডাক্তার ডাকে। ওষুধ খেয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। কিন্তু পেটের ব্যাথা কমে না। রিনা বারবার বলতে থাকে, 'আমাদের পাড়ার ডাক্তারকে না দেখালে আমার অসুখ সারবে না। অন্য ডাক্তারদের চিকিৎসায় আমার ভরসা হয় না।' অগত্যা আয়ান রিনাকে নিয়ে ট্রেনে চাপে। স্টেশনে নেমে রিনাকে সে রিক্সা করে দেয়। কিন্তু রিনা রিক্সায় উঠেই কাঁদতে থাকে। অসুস্থ রিনাকে কাঁদতে দেখে তার খুব খারাপ লাগে। তাকে আর একা ছেড়ে দিতে

পারে না। নিজেও রিক্সায় উঠে বসে। কিন্তু তার প্রচণ্ড খারাপ লাগে। বিয়ের আগে সে দ্বিধাহীন স্বরে বলেছিল, কোনোদিনও করিম সাহেবের বাড়িতে আসবে না। করিম সাহেব ভেবেছিলেন, ওটা রাগের কথা। বিয়ে হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আয়ান নিশ্চয় আসবে। আজ তাঁর ভাবনাই ঠিক হতে যাচ্ছে। আয়ান কথা রাখতে পারছে না। আয়ানের প্রতিজ্ঞা। রিনার, অসুস্থ রিনার কান্নার কাছে ভেসে যাচ্ছে। আয়ান মনে মনে ছটফট করছে। আর মনের মধ্যে নিজের ওপর নিজেই রেগে যাচ্ছে। রিক্সাটা বাড়ির কাছে রাস্তায় এসে থেমেছে। রিক্সা থেকে নেমে রিনা বাড়ির দিকে হাঁটছে। কিন্তু আয়ানের পা চলছে না। অথচ তাকে যেতেই হচ্ছে। রিনা এসে দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। রিনা তোতনকে কি বলল। তোতন এসে আয়ানকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। আয়ান রিনার শোবার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এলেন রিনার মা। তিনি এসে আয়ানের হাত ধরে বললেন, 'বাবা খেয়ে নাও।'

আয়ানের বিরক্ত লাগছিল। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছিল । নিজের মনের রাগকে কোনোরকমে দমন করে সে বলল, 'আমি কিছু খাব না।' তিনি কথা শুনলেন না। বললেন, 'আমি তোমার মার মতো। তুমি না খেলে আমি তোমার পায়ে ধরব।' আয়ান বিব্রত বোধ করল। সে সরবতের গ্লাসটা নিয়ে বিষ খাওয়ার মতো চোখ বুজে খেয়ে নিল। করিম সাহেব পাড়ার ডাক্তারকে ডাকলেন। ডাক্তারকে অসুখের বর্ণনা দিয়ে আয়ান বিদায় নিল। করিম সাহেব আপত্তি করতে পারলেন না। পলি এসে দু-একবার থাকার জন্য বলল, কিন্তু আয়ান কারো কথা শুনল না। সে বহরমপুর রওনা হয়ে গেল।

অনেক দিন পর সে ডোমকলে গিয়ে রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। রহমান সাহেব খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। শেষে বললেন, 'তোমার তো তুষারের সঙ্গে আলাপ আছে। আর তুমি সত্যবাবুকেও চেনো। এবার আমাদের পার্টির সঙ্গে একটু যোগাযোগ রেখো। বেশি না হলে তোমাদের কলেজের রেনুপদবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই হবে। তুমি তো এখন অনেক কিছু বোঝ। জোট না বাঁধলে আমরা কিছু করতে পারব না।' আয়ান রাজি হয়। স্কুলে পড়ার সময় সে রহমান সহেবের অনুপ্রেরণায় পার্টির মিটিং-মিছিলও করেছে। কিন্তু কমল হালদার আর খালেক বিশ্বাসরা পার্টিতে নেতা হলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আয়ান দূরে সরে যায়। কলেজ জীবনে তার আরো অনেক অভিজ্ঞতা হয়। ব্যক্তিগত জীবনেও তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এখন হল্লোড় হুজুগ তার আর ভালো লাগে না। এমন সময়ে রহমান সাহেব আবার পার্টির কাজে মন দিতে বলায় সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বহরমপুর এসে সে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলল। পার্টিও তাকে তার পছন্দমতো কাজে লাগাতে লাগল। গ্র্যান্ড হলে জেলা সম্মেলন উপলক্ষে একটি বিতর্ক হবে। তুষারদা এসে বললেন, আয়ানকে বিচারক হতে হবে। বহরমপুর থেকে পার্টি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে। রেনুপদবাবু বললেন, আয়ান যদি লেখাগুলো একটু দেখে দেয়। আয়ানের ভালোই লাগে। ঘন্টা-প্রহরগুলো আর বোঝার মতো ঘাড়ে চেপে বসে না।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে যায়। রিনার এম. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। এবার রিনা আয়ানের সঙ্গে স্থায়িভাবে থাকার জন্য চলে আসে। আয়ান দেখে রিনা বাবার দেওয়া একজোড়া মোটা মোটা রুলি এবং আরো ছোটখাট দু-একটা গয়না পরে এসেছে। কতকগুলো

শাড়িও নিয়ে এসেছে। আয়ান রিনাকে মনে করিয়ে দেয় যে, কথা ছিল, বাবার বাড়ির কোনো জিনিস রিনা আয়ানের বাড়ি নিয়ে আসবে না। রিনা মুখ ভারি করে বলল, বাবা শখ করে দিয়েছেন, সে ফেরত দিতে পারবে না। আয়ানের রাগ হল। সে বলল, 'তাহলে কি তুমি চাও আমি আলাদা কোনো বাড়িতে গিয়ে থাকি? তুমি বাবার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে থাক?' রিনা গয়নাগুলো খুলে রেখে বলল, 'এবার গেলে ফেরত দিয়ে আসব।' আয়ান কলেজে চলে গেল। দিন দু-এক পরে রিনা বলল, 'আমি তোমাদের গ্রামের বাড়ি যাব।' আয়ান বলল, 'তুমি আমাদের বাড়ি গেলেই আমি তোমাদের বাড়ি যাব, তা কিন্তু ভেবো না।' রিনা বলল, 'তোমার যা খুশি তুমি কোরো। আমি তোমাদের গ্রামে যাব। আমাকে নিয়ে চলো।' আয়ান রিনাকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হল। ততদিনে তার বাড়ি শেষ হয়েছে। বাড়িতে বাথরুমও তৈরি হয়ে গিয়েছে। কাজেই রিনার বাড়িতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ডোমকলে নেমে আয়ান রিক্সা করল। ভুবনডাঙার মোড় থেকে রিনাকে নিয়ে হাঁটতে লাগল। স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গ্রামের মাটিতে পা দেওয়ার যে ছবিটা তার মনে ছিল তার থেকে এ ছবির কত ফারাক! সে কত সাদামাটাভাবে রিনাকে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে।

গ্রামের কাছে আসতেই প্রত্যেক বাড়ি থেকে ছেলে-মেয়ে-বৌরা আয়ানের বৌ দেখতে ছুটল। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই তাদের বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল। সালমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বৌকে বরণ করল। রিনা সালমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ইব্রাহিমকেও রিনা একইভাবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বাড়ির বড় বৌয়ের ওপর ইব্রাহিমের যা রাগ ছিল সব ধুয়ে মুছে গেল। সে ডোমকলে মিষ্টি আর ইলিশ মাছ আনতে ছুটল। খবরটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল। আশেপাশের গ্রাম থেকেও রিনাকে দেখতে লোক এল। দুদিন বাড়িতে মেলার মতো ভিড় থাকল। একের পর এক লোক এল। সালমা সকলকেই বড় বৌকে দেখালো। বৌয়ের গুণগান করল। বৌমা কত লেখাপড়া করেছে সে কথা সবিস্তারে বলল। তারপর বিকেলে বৌমাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুল। বৌমাকে পেয়ে সালমা আয়ানের ওপর যে রাগ করেছিল তা ভুলে গেল। তাকে বাদ দিয়ে শুধু বাবাকে নিয়ে আয়ানের বিয়ে করাকে সালমা ভালো চোখে দেখতে পারেনি। তাই আয়ানের ওপর তার অভিমান ছিলই। তার ওপর বিয়ের ছ' মাস হয়ে গেলেও আয়ান বাড়িতে বৌ আনেনি। তাতেও তার রাগ কম হয়নি। রাগ হবেই বা না কেন? একে একে পাড়ার সকলেই তার কাছে বৌ দেখানোর বায়না ধরেছে। কিন্তু বৌ তো তার কাছে নেই। সে-ই বৌ দেখেনি, তো অন্যদের দেখাবে কি! তাই সালমা মনের সুখ মিটিয়ে বৌ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। জবা মামীদের বাড়িতে গিয়ে বলছে, 'কৈ গো ভাজ! বৌ দেখব দেখব করে পাগোল হৈছিল্যা। দ্যাখো, বৌ আজ তুমার বাড়িতেই আস্যাছে।' খালেক বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে বলে, মাই ল্যাও। তুমার লাতি বৌ দ্যাখো।' এমনি করে সে বৌ নিয়ে সাড়া পাড়া ঘুরে বেড়ায়। সবাই পাটি পেতে বসতে দেয়। কেউ বা চেয়ারই বের করে। তার বৌ তো যেমন তেমন নয়। এম. এ. পড়া বৌ। গেরামে আছে কারো? কারো নেই। সালমা খুশি মনে বাড়ি ফেরে। ইব্রাহিম বাজার থেকে শাড়ি-ব্লাউজ আনে। 'তোমার গরীব শ্বশুড়ের কেনা। তুমাকে পরতেই হবে।' রিনা পরে নেয়। এই প্রাণখোলা মেলামেশার মধ্যে কেমন একটা আনন্দ হয়। তার বাবা-মা বেশ শিক্ষিত। তার তুলনায় তার শ্বশুর-শাশুড়ি তেমন

কিছুই নয়। তবুও রিনার ভালো লাগে। ভালো লাগে গ্রামের মানুষদের। হেসে খেলে চার-পাঁচ দিন কেটে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে রিনা আয়ানের সঙ্গে বহরমপুর আসে। বহরমপুর এসেই রিনা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাবা কত ভালোবেসে এই শাড়িটা আমাকে দিয়েছেন। আমি ফিরিয়ে দিলে তাঁর কেমন লাগত?' আয়ান কোনো উত্তর দিতে পারে না। রিনা আবার বলে, 'তোমার বাবা যাই করুন, এই শাড়িটা তুমি ফেরত দিতে পারবে?' আয়ান বুঝতে পারে রিনা কি বলতে চাইছে। সে বলে, 'ঠিক আছে, তোমার বাবা তোমাদের কিছু দিলে আমি আর ফিরিয়ে দিতে বলব না। তবে 'দয়া করে তুমি এটুকু দেখো যেন আমাকে কিছু না দেওয়া হয়। আমি কিছু নিতে পারব না। তোমরা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, আমার বাবা-মা যদি তোমার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করে তবে তুমিও তাদের কাছ থেকে কিছু নিও না। এর বেশি আমি আর কিছু বলব না।' রিনাও আর কিছু বলে না।

পলিকে সঙ্গে করে করিম সাহেব আসেন। তিনি বলেন, 'ভুল আমাদেরই হয়েছে। তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে আর রাগ করে থেকো না। একবার আমাদের বাড়ি চলো।' পলি এগিয়ে এসে বলল, 'দাদা, চলুন না। আমি তো আপনার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করিনি। আমার জন্যও চলুন।' আয়ান হাল্কা সুরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আড়ি। তুমি তো আমাকে একটা চিঠিও লেখ না।' পলি পাল্টা অভিযোগ করল, 'আপনিও তো আমাকে লেখেন না। আপনি আপনার কলেজের ফরম পাঠাবেন বলেছিলেন। কিন্তু পাঠাননি। বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য কলেজে ভর্তি হতে হল।' আয়ান বলল, 'তুমি তো বলেছিলে এ কলেজে পড়বে না।' পলি বলল, 'বারে, ওটা তো আমার রাগের কথা ছিল। আমি কি সত্যি সত্যি পড়ব না বলেছি?' আয়ান বলল, 'কোন্‌টা তোমার সত্যি সত্যি, আর কোন্‌টা রাগের কথা, তা বুঝব কেমন করে?' পলি বলল, 'আহারে বেচারা, তাও বুঝতে পারে না। কি হতভাগ্য আপনি? সুন্দরী যুবতীদের মনের কথাও বুঝতে পারেন না।' আয়ান রসিকতা করে বলল, 'সে পণ্ডশ্রমও করি না। কারণ মেয়েদের মনের কথা দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা?' পলি খুশি হয়ে বলে উঠল, 'এই তো বুলি ফুটেছে। এবার বলুন, আমাদের সঙ্গে কবে যাবেন?' আয়ান হাসতে হাসতে বলল, 'যদি বলি যাব না?' পলি ওড়নাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'তাহলে আমিও যাব না। এখানেই থাকব।' আয়ান খুশি হওয়ার ভান করে বলল, 'তাহলে তো আরো ভালো হয়। একটা বিয়ে করে যদি দুটো বৌ পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কি!' পলি ভীষণ রাগ করার ভান করল। বলল, 'দাঁড়ান আমি দিদিকে বলছি। কেমন টাইট দেয়।' পলি চলে গেল। আয়ান পলির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কলেজে পালাল।

কিন্তু বিকেলে এসে আবার পলির হাতে পড়ল। পলি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আপনি কি চান যে আমি আর আপনার বাড়ি না আসি?' আয়ান হাসিমুখে বলল, 'আহা তাই কি হয়? আমার প্রিয় শ্যালিকা আমার কাছে আসবে না, সেটা কি আমি প্রাণে ধরে চাইতে পারি?' পলি নড়েচড়ে বসল। বকমবকম করার সময় পায়রাগুলো যেমন ঘাড়ের পালকগুলো ফোলায়, পলি তেমনি নড়াচড়া দিয়ে তার ঘাড়ের ওড়নাকে ফুলিয়ে নিল। তারপর প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যদি আমাদের বাড়ি না যান তাহলে আমি আপনার বাড়ি আসব কেন?' এ প্রশ্নের কোন উত্তর আয়ানের কাছে ছিল না। আয়ানের বলতে ইচ্ছে করছিল, না

আসতে চাইলে আসবে না। কিন্তু সেটা সে প্রকাশ্যে বলতে পারল না। করিম সাহেবকে যেকথা বলা যায়, পলিকে তা বলা যায় না। অথচ একটা কিছু বলতে তো হয়। তাই পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য আয়ান বলল, 'হতভাগার কাছে কেউই আসতে চায় না। তা তুমিই বা আসবে কেন?' কিন্তু পলি এবার আয়ানের ফাঁদে পা দিল না। সকালের অভিজ্ঞতা থেকে সে হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। 'ওসব নাটুকে কথাবার্তা ক্লাসের ছাত্রীদের শোনাবেন। আমার কাছে ওতে সুবিধে হবে না। আর পেছনে যাবার উপায় নেই। সোজসুজি বলুন, 'আপনি যাবেন কি না।' আয়ান বলল, 'পলি, তুমি ভাই ওকালতি পড়ো। আসামীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়বে।' পলি তাতেও ভুলল না। সে বলল, 'আমি মোক্তারি পড়ব না ডাক্তারি পড়ব সে আলোচনা পরে হবে। আপাতত বলুন, আমি কাল সকালেই বাড়ি যাব, না আপনাকে নিয়ে দু-একদিন পরে যাব?' আয়ান বলল, 'কাল যাবার অত তাড়া কিসের?' পলি বলল, 'তাড়া নেই, তবে যেতে হবে। আপনি না যেতে চাইলে আমি কাল সকালেই যাব।' আয়ান বলল, 'না, কাল গেলে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।' পলি বলল, 'আপনি যাবেন বলুন। আমি দরকার হলে দশদিন থাকতে রাজি আছি।' আয়ান বলল, 'আচ্ছা, দশদিন থাক।' পলি বলল, 'তাহলে একাদশতম দিনে আপনি যাবেন!' আয়ান আর না করতে পারল না। পলির কাছে হেরে যেতে রাজি হল। করিম সাহেব পলিকে রেখে চলে গেলেন। দশদিন নয়, দিন পাঁচেক পরে আয়ান পলি আর রিনাকে নিয়ে ট্রেনে উঠল।

জামাইকে পেয়ে রিনার মা খুবই খুশি হলেন। কখন কি খাওয়াবেন সে চিন্তাতেই তাঁর সময় কাটতে লাগল। আয়ান বুঝল, এবার খাওয়ার ঠেলাতেই ডাক্তার ডাকতে হবে। খাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে তোতন আর পলিকে নিয়ে সিনেমায় গেল। খালের দিকে বেড়াতে গিয়ে শ্যালক-শ্যালিকার সঙ্গে বাদাম ভাজা খেল। ফুচকাও বাদ গেল না। তিন-চারটে দিন কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল আয়ান বুঝতে পারল না। যাবার সময় আয়ানের অজান্তে তার জন্য শার্ট-প্যান্টের কাঁপড় রিনার বাক্সে ঢুকল। এবারে বহরমপুরে এসে আয়ান অনেক বেশি স্বস্তি পেল। রিনাকে সত্যিই অনেক আপন মনে হল। রিনাকে সে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে চাইল। তার জজকোর্টের মোড়ের বাড়িটা তার কাছে স্বর্গ মনে হল। দিন কেটে যেতে লাগল। একদিন রিনা বলল, 'তোমার আপত্তি না থাকলে, বাড়িতে আমার কয়েকটি প্রিয় জিনিস আছে, আমি নিয়ে আসব!' আয়ান বলে, 'আমার আপত্তি নেই। তবে জিনিসগুলি কি?' রিনা বলে, 'তেমন কিছু নয়। কয়েকটি ছবি আঁকার সরঞ্জাম, একটা ল্যাম্পস্ট্যান্ড আর এক সেট সালোয়ার-কামিজ।' ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো আনতে পার। কিন্তু ল্যাম্পস্ট্যান্ড আর সালোয়ার-কামিজ তো এখানেও ভালো পাওয়া যায়।' আয়ান বলল। রিনা বলল, 'পাওয়া যায় না বলে নয়। ছোটকাকা যখন জলপাইগুড়িতে পড়ত তখন ভুটানের ফুন্টসিলিং থেকে ওগুলো এনে আমাকে দিয়েছিল। তাই।' আয়ান জানতে চাইল, 'আর সবাই থাকতে তোমার কাকা তোমাকেই কেন দিল?' রিনা প্রথমটা চুপ করে গেল। তারপর ভেবে নিয়ে বলল, 'বাবা-কাকাদের পরিবারে আমি প্রথম মেয়ে তো, তাই আমাকে সবাই খুব স্নেহ করতেন। তাই আমাকে দিয়েছে।' আয়ানের মনে হল সেটা খুব স্বাভাবিক। সে বলল, 'তোমার কাকার দেওয়া জিনিস, তুমি নিয়ে আসবে তাতে আর আপত্তি কি?' রিনা পরের বার ওগুলো নিয়ে এল। মিলেমিশে সময় নদীর স্রোতের মতো বয়ে যেতে লাগল।

নয়

বেলা প্রায় দশটা। আয়ানের স্নান-খাওয়া হয়ে গেছে। এবার সে কলেজে বেরুবে। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বলল, 'প্রিয়ে, তবে এখনকার মতো আসি।' রিনা বলল, 'কলেজ যাওয়ার আনন্দে তর সইছে না। একদিন ছাত্রীদের মুখ না দেখে হাঁপিয়ে উঠেছ। অত তাড়া কিসের বাপু? এখনও তো দশটাও বাজেনি। ক্লাস তো সেই সাড়ে দশটায়।' আয়ান বলল, 'চলে গেলে তোমার মুখচন্দ্রিমা অনেকক্ষণ দেখতে পাব না জানি। কিন্তু কলেজটা যে দু' কিলোমিটার দূরে। যেতে আধ ঘন্টাখানেক লাগে।' রিনা বলল, 'আর তামাশা করতে হবে না, আজ ক'টায় ফিরবে?' আয়ান উত্তর দিল, 'সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস। পাখির মতো পাখা নেই যে উড়ে আসব। বাস-ট্রাকও নেই যে ধরে বসব। হেঁটেই আসতে হবে। খুব জোর করতে পারি একটা রিক্সা। তাতে আধঘন্টা খানেক লাগবে। তা ধরে রাখতে পার, পাঁচটা নাগাদ বান্দা হাজির হবে।' রিনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ক'টায় ফিরবে জিজ্ঞেস করেছি, আর অমনি বান্দা হয়ে গেল। আর আমি যে সারাক্ষণ বাড়িতে একা একা বসে থাকব তার বেলা?' আয়ান কৌতুকের হাসি হেসে বলল, 'কেন একা একা বসে থাকবে? তুমি রাজি থাকলে তোমাকে সঙ্গে করে কলেজে নিয়ে যেতে পারি। স্টাফরুমে বসে থাকবে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হবে। আমি অন্যান্যদের বলব, আমার সহধর্মিনী, না না, আমার অর্ধাঙ্গিনী বাড়িতে বসে আমার বিরহ জ্বালা সইতে পারেন না। তাই আর কি! সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। শুধু সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে যেতে চেয়ো না, ব্যস। তাহলে আর চাকরিটা থাকবে না।' রিনা বলল, 'আসলে ক্লাসে না নিয়ে যেতে চাওয়ার আপত্তির কারণ আমি জানি। আমি থাকলে তো আর ছাত্রীগুলোর দিকে চুরি করে করে তাকাতে পারবে না। আমি জানি না, তোমার ক্লাসের প্রতি অত টান কেন? কেন তুমি একটা ক্লাসও ছেড়ে আসতে চাও না?' আয়ান এবার পাল্টা আক্রমণ করল, 'তোমাদের ক্লাসেও মাস্টারমশাইরা ওরকম চুপি চুপি তাকাত নাকি?' রিনা তেড়ে এল, 'তবে রে....।'

এমন সময় বাইরে থেকে দরজার কড়া নড়ল। আয়ান দরজা খুলে দেখল, তার বয়সীই একটি শ্যামলা লম্বা মতো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে আয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পেরেছেন?' আয়ান সত্যি চিনতে পারেনি। তাই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। ছেলেটি বলল, 'আমি বীরু, করিম সাহেবের ছোট ভাই। আপনি যেদিন প্রথম ও বাড়িতে যান, সেদিন আমি ওখানে ছিলাম।' আয়ান এবার চিনতে পারল। সে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন আসুন।' রিনাকে ডেকে বলল, 'দেখো কে এসেছেন!' কিন্তু রিনা তাকে দেখে মোটেই খুশি হল না। দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এসেছ?' যেন তার আসাটা মোটেই উচিত হয়নি। বীরু বলল, 'হ্যাঁ। কোম্পানির একটা কাজে এখানে এসেছিলাম। ভাবলাম তোদের সঙ্গে দেখা করে যাই। তোরা ভালো আছিস?' রিনা এর কোনো উত্তর দিল না। আয়ান বীরুকে বসার জন্য অনুরোধ করল। দু-একটা কথা বলে আয়ান বিদায় নিল। ঘড়িতে দশটা কুড়ি হয়ে গেছে। হেঁটে গিয়ে আর কিছুতেই সাড়ে দশটার ক্লাসটা ধরা যাবে না। সে মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে নিল।

কলেজ থেকে ফিরতে আয়ানের পাঁচটা হয়ে গেল। দরজা খোলাই ছিল। রিনা রান্নাঘরে রান্না করছিল। বীরু তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আয়ানকে দেখে সে বসার ঘরে এল। রিনাও রান্না ছেড়ে এদিকে এল। আয়ান এক ফাঁকে রিনাকে জিজ্ঞেস করল যে, কিছু বাজার

করতে হবে কি না। রিনা বলল, দরকার নেই। আয়ান বসে বীরুর সঙ্গে গল্প করতে লাগল। রিনা তাড়াতাড়ি রান্না করে ফেলল। খাওয়ার পর বীরু বলল, 'আমি এবার তাহলে যাব।' আয়ান বাধা দিল, 'রাতে এত কষ্ট করে যাওয়ার কি আছে? কাল সকালে গেলেই হবে।' বীরুর যাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। সে রাতটা থাকতে রাজি হয়ে গেল। রিনা কিন্তু থাকতে বলল না। সে বলল, 'তোমার কাজ আছে বলছিলে না?' বীরু বলল, 'হ্যাঁ কাজ আছে বটে।' রিনা বলল, 'কাজের ক্ষতি করে থাকতে হবে না। যাবে তো তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও। না হলে দেরি হয়ে যাবে।' একরকম জোর করেই সে বীরুকে বের করে দিল। আয়ানের খুব খারাপ লাগল। সে রিনাকে বলল, 'ভদ্রলোক প্রথম আমাদের বাড়ি এসেছেন। আর তুমি ওরকমভাবে বের করে দিলে? উনি ভাববেন কি?' রিনা শান্ত গলায় বলল, 'ভাবার কিছু নেই। এসেছে, খাইয়েছি-দাইয়েছি, তারপর আর কাজ কামাই করে থাকার দরকার নেই।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'থাকলে কি আমরা এখন এত কাছাকাছি বসে গল্প করতে পারতাম?' আয়ান এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে বলল, 'তাই বলে আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে অমন করে তাড়িয়ে দেবে? তাছাড়া তুমি বল, তোমার কাকা-জ্যাঠারা তোমাকে বিশেষ করে স্নেহ করেন। তোমার এই কাকাই তো তোমাকে ফুন্টসিলিং থেকে ল্যাম্পস্ট্যান্ড, জামা-কাপড় প্রভৃতি এনে দিয়েছিল। এই কাকাই তোমাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।' রিনা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আর কেউ এলে তাড়াব না। বার বার ধরাধরি করে বলব, বসুন থাকুন, কিছুতেই যাওয়া হবে না।' এবার আয়নও না হেসে পারল না। হাত মুখ-ধুয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে দিন দু-একের জন্য রিনাকে নিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে গেল। গ্রাম থেকে ফিরে রিনা বকুলপুরে তার বাবা-মার কাছে গেল। আর আয়ান গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার কলেজ শিক্ষকদের সামার ক্যাম্প হচ্ছে। আয়ানকেও ডেকেছে। যাদবপুরে সামার ক্যাম্প শেষ করে আয়ান বহরমপুরে না ফিরে সোজা গেল বকুলপুরে। রিনা কি কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে। পলি ও করিম সাহেব কলেজে। তোতন স্কুলে। বাড়িতে আছে কেবল তার শাশুড়ি। জামাইকে দেখে তিনি আবার রান্না চড়ালেন। খেয়ে-দেয়ে আয়ান শুয়ে শুয়ে একটা গানের বই পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। এলোমেলো বাতাস বাড়ির পেছনের বাগানে ঢুকে সড়সড় শব্দ করছে। তার শাশুড়ি একজন অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। আয়ানের কানে হঠাৎ বীরুর নামটা এসে ঢুকল। আয়ান কৌতূহলী হয়ে কান খাড়া করে রাখল। অপরিচিতা মহিলা বলল, 'ঐ যে আমাদের পাড়ার মুস্তাফার সঙ্গে বীরুর খুব ভাব। তা একদিন যখন মুস্তাফা ছিল না। ওর বোনটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল। কি যে করেছিল জানি না, তবে মুস্তাফারা ক' ভায়ে ধরে কি মারটাই না দিল! মারতে মারতে একদম ফ্ল্যাট করে দিল। আমরা গিয়ে না ধরলে হয়ত মেরেই ফেলত।' আয়ানের শাশুড়ি বলল, 'বীরুর চিরদিনই স্বভাব খারাপ। স্কুলে যখন পড়ত তখন গ্রামেরই একটি মেয়ের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক করেছিল। পরে সে মেয়েটিকে আর বিয়ে করেনি। ক' বছর আগে বাবলুর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর শালীর সঙ্গে ও খারাপ ব্যবহার করেছিল। ওখানে তো ওকে আটকে রেখেছিল। বাবা-কাকারা গিয়ে

জরিমানা দিয়ে তবে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।' কথা চলতেই থাকে। আয়ান ভাবে এ লোকটাই সেদিন তাদের বহরমপুরের বাড়িতে গিয়েছিল। এই লোকটার সঙ্গে একা রিনাকে নির্জন বাড়িতে রেখে সে কলেজে চলে গিয়েছিল। এই লোকটাই রিনাকে অতসব জিনিস কিনে প্রেজেন্ট করেছে। রিনা এরই সঙ্গে দেশের বাড়ি গিয়ে মাসখানেক কাটিয়েছে। আয়ানের সব গোলমাল হয়ে যায়। যে একদিন একটু সামান্য সুযোগ পেলে বন্ধুর বোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে ছাড়ে না, সে একমাস একটি মেয়েকে কাছে পাওয়ার সুযোগ ছাড়বে কেন? আয়ান উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু শাশুড়িকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না। সে অপেক্ষা করতে থাকে।

সন্ধ্যার সময় রিনা ফেরে। আয়ানকে দেখে সে খুব খুশি হয়। কিন্তু রিনাকে দেখে আয়ান যেন খুশি নয়। রিনা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি হয়েছে?' আয়ান বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। সত্যি সত্যি উত্তর দেবে?' রিনা বিস্ময়ের সুরে বলে, 'না দেওয়ার মতো কি দেখলে?' আয়ান বলল, 'দেখিনি, তবে জেনেছি।' রিনা জানতে চাইল, 'কি জেনেছ?' আয়ান বলল, 'তোমার বীরুকাকার যে চরিত্র ভালো নয় তা তুমি জান?' রিনা বলল, 'জানি, কিন্তু সেকথা কেন?' আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'এরকম একজন লোকের কাছ থেকে তুমি উপহারগুলো নিয়েছ কেন? আর তার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে একমাস ছিলেই বা কেন?' রিনা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'সে আমার আপন কাকা। আর সে যে খারাপ লোক, সেকথা আমি তখন জানতাম না।' আয়ান রেগে গেল। সে বলল, 'এখন তো জান। সেদিন বহরমপুরে যখন গেল, তখন বললে না কেন?' রিনা বলল, 'আমি বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একেই তো আমার বাবা-মার ওপর রাগ করে আছ। তারপরে কাকার সম্পর্কে কিছু শুনলে, আমাদের বংশ সম্পর্কে তুমি কি ভাববে? সেই ভয়ে, আমি বলতে পারিনি। বরং যত তাড়াতাড়ি পেরেছি, তাকে বিদায় করে দিয়েছি। সেদিন তুমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলে, কেন তাড়িয়ে দিলাম। এখন তো বুঝতে পারছ।' আয়ান বলল, 'বুঝতে পারছি।' তবে বুঝতে পারছি না, কেন তুমি ঐ জঘন্য লোকটাকে সারাদিন বাড়িতে রাখলে।' রিনা কোনো উত্তর দিল না। আয়ান আর থাকতে পারল না। সে বলল, 'তুমি বলতে চাও, সেদিন সারাদিন তোমাকে একা পেয়েও সে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি!' রিনা এবার বলল, 'বিশ্বাস কর, সেদিন সে আমার সঙ্গে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করেনি।' আয়ান আরো রেগে গেল। সে বলল, 'তুমি বলতে চাও, তুমি তার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে একমাস ছিলে, তখনো তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি?' এবার রিনাও রেগে গেল। সে বলল, 'আমি বললেই বা তুমি বিশ্বাস করবে কেন? তবে জেনে রাখ, সে খারাপ ব্যবহার করেছিল।' রিনা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আয়ান ভাবতে লাগল, রিনা এত রাগ করল কেন? বীরুর সঙ্গে সে দেশের বাড়ি গিয়ে এক মাস ছিল সেকথা তো সত্য। বীরু অনেকগুলি উপহার কিনে দিয়েছে, তাও সত্য। আগে না হোক, এখন অন্তত সে জানে যে বীরুর চরিত্র ভালো নয়। তাহলে সে যখন বহরমপুরে তাদের বাড়িতে গেল, রিনা তাকে কেন বলল না? স্বামীর অধিকারে নয়, বন্ধু হিসেবেও তো সে একথা জিজ্ঞেস করতে পারে। আয়ান ঠিক করল, রিনা এলে এভাবেই সে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু রিনা আর ঘরে এল না। তোতন এসে ঘরে ঢুকল। কিন্তু আয়ানের মুখ দেখে সুবিধে হবে

না বুঝে চলে গেল। পলি এসে টিভি দেখার জন্য ডাকল। আয়ান বলল, 'ভালো লাগছে না, মাথা ধরেছে।' শাশুড়ি ছুটতে ছুটতে এলেন। 'কি হয়েছে বাবা?' পলি বলল, 'ওনার মাথা ধরেছে।' আয়ান পড়ল মুশকিলে। একটা মিথ্যা কথা চাপা দিতে তাকে আবার মিথ্যা কথা বলতে হল। সে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। ক'দিন ক্লাসে কাজের খুব চাপ গেছে। তাই মাথাটা ভারি হয়ে আছে।' শাশুড়ি আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন। গিয়ে রিনাকে বললেন, 'ছেলেটার মাথা ধরেছে, আর তুই এখানে বসে আছিস!' রিনা তাঁর কথার কোনো উত্তর দিল না। তিনি রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। তোতন এসে খেতে ডাকল। খেয়ে এসে আয়ান শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে রিনা এসে তার পাশে শুল। আয়ান জেগেই ছিল। কিন্তু সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। আয়ান ঠিক করেছে, সে আর কোনো কথা বলবে না। ভোরবেলায়ও আয়ান দেরি করে উঠল। রিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, তার এম.এ.-র ফল বের হতে পারে। করিম সাহেব, পলি কলেজে গেলেন, তোতন স্কুলে। শাশুড়ি ঘরের কাজ সেরে ওঘরে শুয়ে পড়লেন। আয়ান তখন এক এক করে খাতাপত্র খুঁজতে লাগল।

প্রথমে সে ফটোর অ্যালবামটা নিয়ে দেখতে লাগল। অনেকের ছবি আছে। তাদের অনেকেই আয়ানের পরিচিত নয়। তবে বীরুর গোটা পাঁচেক ছবি আছে। একটা ছবি সুন্দর করে মোড়ক কেটে রাখা। সেটা কোনও স্টুডিওতে তোলা একক ছবি। অন্যগুলো ফুন্টসিলিং বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তোলা ছবি। অ্যালবামটা রেখে সে এবার রিনার পুরোনো ডায়েরিটা খুলে দেখতে লাগল। দেখে, বীরুর নাম-ঠিকানা ডায়েরিতে দু' জায়গায় লেখা—জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের ঠিকানা। নাম-ঠিকানাগুলো ধরে ধরে—যত্ন-সহকারে দরদ দিয়ে লেখা। তার একটু পরেই আয়ানের বহরমপুরের নামহীন ঠিকানা, খুব সাধারণভাবে লেখা। পাশাপাশি দুটো ঠিকানা দেখে তার বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল। সে ডায়েরির পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখতে লাগল। মার বকুনি খেয়ে মন খারাপের কথা, পরীক্ষার ফল বেরুবার কথা, বান্ধবীদের ব্যবহার, এরকম নানারকম অভিজ্ঞতা ডায়েরির পাতায় বিবৃত হয়ে আছে। কিন্তু আয়ান আজ ওসব কিছু খুঁজছে না। হঠাৎ যা খুঁজছে তাই পেয়ে যায়। রিনা লিখেছে, 'বীরুকাকাকে একটা চিঠি লিখে বাড়ির কাজের মেয়ে হারানিকে ডাকবাক্সে ফেলতে দিয়েছিলাম। বাবা তার কাছ থেকে নিয়ে সে চিঠি পড়েছেন। চিঠিতে লেখা ছিল, এখানে যে একজন তোমাকে ভালোবাসে সেকথা কি তোমার মনে পড়ে? এটা যে আমি কোনো খারাপ অর্থে লিখিনি, সেকথা বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। মাঁও অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাবা কারো কথা মানলেন না। উল্টে আমাকে এরকম চিঠি লেখার জন্য বকলেন এবং আর চিঠি না লিখতে বললেন।' আয়ান ডায়েরির অবশিষ্ট পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। কিন্তু আর কিছু সেরকম পেল না। সে তখন করিম সাহেবের পুরানো ডায়েরিগুলো ওল্টাতে লাগল। ওগুলোর মধ্যে অনেকগুলো চিঠি পাওয়া গেল। কিন্তু সে যা চাইছে সেরকম কিছু পেল না। তখন সে খুব পুরানো একটা ছেঁড়া ডায়েরি দেখতে লাগল। ওটার নিচের দিকে একটা ইনল্যান্ড লেটার পাওয়া গেল। করিম সাহেবের এক ভাই বাবলু চিঠিটা করিম সাহেবকে বকুলপুরের ঠিকানায় লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'শিরিন বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। বাবা এটা মোটেই পছন্দ করছেন না। কিন্তু বীরু বা শিরিন কেউই তাঁর কথা

শুনছে না। বাড়ির মধ্যে যা করছে করছেই, বাইরেও ওরা হাত-ধরাধরি করে এমনকি গলা-জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে গ্রামে আমাদের বদনাম হচ্ছে। তুই তাড়াতাড়ি এসে শিরিনকে নিয়ে যা। না হলে আরো দুর্নাম হবে।' চিঠির এক-একটা অক্ষর পড়ে আর আয়ানের মাথার মধ্যেটা ঝাঁ ঝাঁ করে। রাগে-দুঃখে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। এখন সব ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়। সে বুঝতে পারে কেন বিয়ের জন্য করিম সাহেবের এত তাড়াতাড়ি, কেন বিয়ের ফরমে দেশের বাড়ির ঠিকানা দেয়নি, কেন প্রথম যখন এ বাড়িতে এসেছিল তখন রিনা বীরুর সাথে পেছনের বারান্দায় চলে গিয়েছিল, কেন বীরুর দেওয়া জিনিসগুলো রিনার এত প্রিয়, কেন বীরু বহরমপুরের বাড়িতে গেলেও রিনা তাকে কিছুই বলেনি। রিনার বাবা-মা সবাই ব্যাপারটা জানতেন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা চেপে রেখে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বাবা, মা, মেয়ে সকলে মিলে তাকে ঠকিয়েছে। সকলে মিলে তারা তার জীবনটাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। তার মনে হয় যে বিছানায় সে শুয়ে আছে সে বেডসিটটা পর্যন্ত বীরুর কিনে দেওয়া। আয়ান বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। এ বাড়িতে তার আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না। শাশুড়িকে ঘুম থেকে ডাকতেও তার ঘৃণা করে। সে টেবিলের ওপর এক লাইন লিখে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আয়ান বহরমপুর না গিয়ে শেওড়াফুলি যায়। স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে সর্বোপরি আয়রন মিলে যায়। সেখান থেকে বীরুর বাসার ঠিকানা যোগাড় করে। মিলের লোকেরা বলে, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তিনি মিলে আসবেন। আয়ানের এরকম সময়ই দরকার। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে বীরুর দরজার কড়া নাড়ে। দরজা খুলে বীরু বিরক্ত হয়। বিরক্ত মুখেই সে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে। আয়ানকে বলে, 'বসুন।' সেখানে একটা টুল ছিল। সেই টুলের ওপরই বসে পড়ে। বীরু বলে, 'আমি এক্ষুণি অফিসে বেরুব।' আয়ানকে চলে যেতে বলার ইঙ্গিত। কিন্তু আয়ানের তো চলে গেলে চলবে না। তাই সে ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেনি, এমনভাবে বলল, 'তাহলে অসময়ে এসে অসুবিধা করলাম।' বীরু বলল, 'অসুবিধা কিছু নয়। তবে আমাকে একটু মিলে যেতে হবে।' আয়ান বলল, 'তা আপনি মিলে চলে যান, আমি একটুখানি বসছি। আপনার আসতে কি খুব দেরি হবে?' বীরু বলল, 'না, খুব দেরি হবে না। ঘন্টা দুয়েক পরেই আমি চলে আসব।' আয়ান বলল, 'তাহলে আপনি মিল থেকে ঘুরেই আসুন। আমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি।' সে ব্যাগ থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে বলল, 'আমি বসে বসে পত্রিকাটি দেখি। আপনি ফিরে এলে দু-একটি কথা বলেই আমি বিদায় নেব। আমাকে আবার আজই বহরমপুর যেতে হবে।' এবার বীরু খানিকটা খুশি হল। সে ড্রয়ার থেকে একটা চাবির গোছা বের করে একটা সুটকেসে তালা লাগিয়ে আবার চাবির গোছাটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর সে বেরিয়ে গেল। আয়ান বারান্দায় এসে দেখল, বীরু দূরে মিলিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা বের করে সুটকেসটা খুলল। প্রথমে চোখে পড়ল কতগুলো উলঙ্গ মেয়ের ছবি। সম্পূর্ণ নগ্ন। কোন ভদ্রলোকের সুটকেসে এসব ছবি থাকতে পারে তা আয়ান ভাবতে পারে না। অবশ্য আয়ান বীরুর সম্পর্কে যা জেনেছে তাতে তাকে ভদ্রলোক বলা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আয়ান কাগজগুলো তুলে ফেলল। নিচে কয়েকটি ফাইল। প্রতিটি ফাইলে আলাদা আলাদা মেয়ের

চিঠি। চিঠিগুলো কে লিখেছে আয়ান সেগুলো খুলে খুলে দেখে। হঠাৎ একটা ফাইলের চিঠিগুলোর লেখার ওপর তার চোখ আটকে যায়। দেখে সবগুলি চিঠিই রিনার লেখা। মোট তেষট্টিটি চিঠি আছে। আয়ান সব চিঠিগুলিকে একটা প্যাকেটের মধ্যে ভরে তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। না, রিনার ব্যাপারে সুটকেসে আর কিছু নেই। টেবিলের ড্রয়ারগুলো সে খুলে খুলে দেখে। সেখানেও আর কিছু পাওয়া যায় না। আয়ান সুটকেসে তালা লাগিয়ে চাবির গোছাটা ড্রয়ারে রেখে জানলা-দরজা খুলে দেয়। তারপর সাপ্তাহিক পত্রিকাটা খুলে পড়ার ভান করে। উত্তেজনায় সে কিছুই পড়তে পারে না। শুধু ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলায়।

দু' ঘন্টার অনেক আগেই বীরু ফিরে আসে। আয়ান বলে, 'সেদিন গিয়ে তো থাকলেন না, আর একদিন আসুন।' বীরু খুশি হয়ে রাজি হয়। আয়ান বলে, 'আমার আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। আমাকে কাল সকালের মধ্যেই বহরমপুর পৌঁছাতে হবে। কাল কলেজে একটা মিটিং আছে।' বীরু বলে, 'তাহলে একদিন সময় হাতে নিয়ে আসবেন।' আয়ান 'আসবে' বলে হাঁটতে শুরু করে।

ট্রেনে উঠেই আয়ানের চিঠির প্যাকেটটা খুলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বোঝাই যায় চিঠিগুলোতে যা লেখা আছে তা তার পক্ষে সুখকর নয়। অন্য কেউ দেখে ফেললে সেটা আরো লজ্জার হবে। সে কোনো রকমে কৌতূহল দমন করে থাকে। রাত এগারটা নাগাদ সে বহরমপুর পৌঁছায়। ঘরে ঢুকেই সে চিঠিগুলো খুলে পড়তে শুরু করে। এক-একটা চিঠি পড়ে আর আয়ান আশ্চর্য হয়ে ভাবে। রিনা বীরুকে লিখছে, 'এ সপ্তাহে আরো দুটো চিঠি তোমাকে লিখেছি। একটা খামে, একটা ইন্‌ল্যান্ডে। তুমি নিশ্চয়, এতদিনে সেগুলো পেয়েছ। আমরা এমনিতে ভালো আছি। তবে তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না। এবার পূজার ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে সোজা আমাদের এখানে আসবে। আর অন্তত দশ-বারো দিন থাকবে। এসেই দুদিন পরে যাব-যাব করবে না।' আয়ান ও চিঠিটা রেখে অন্য একটা চিঠি তুলে নেয়। রিনা লিখেছে, 'ঈদের দিনটা তোমার একদম নিরানন্দে কেটেছে লিখেছ। আমারো একদম ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। তুমি ওখানে একা একা আছ। সেকথা ভেবেই খারাপ লাগছিল। মাও তোমার জন্য দুঃখ করছিল। মা সেদিন নতুন কাপড় পরেনি। আমিও পরিনি। তুমি এলে পরব।'

আয়ান আরো একটা চিঠি তুলে নেয়। রিনা লিখছে, 'আমি তোমার সঙ্গে গ্রামে না গেলে তোমার পড়া জমত না। তোমার পড়া না জমলে এত বেশি করে পড়তে হত না। এত বেশি করে পড়তে না হলে তোমার মাথা ধরত না। দেখছ তো বীরুকাকা, মেয়েরা কত বিপজ্জনক। মেয়েদের থেকে সাবধান!' এ চিঠিকে কোনো কাকার কাছে কোনো ভাইঝির লেখা চিঠি বলেই মনে হয় না। মনে হয় কোনো প্রেমিকের কাছে এক প্রেমিকার মেয়ের লেখা চিঠি। আয়ান একটা একটা করে চিঠিগুলি পড়ে। পড়ে আর মনে হয় রিনা তাকে যে চিঠিগুলি লিখেছিল তার প্রত্যেকটিই অনেকদিন আগে বীরুকে লেখা চিঠির কপি মাত্র। একই বিষয়, একই বক্তব্য, একইরকম ভাষা। শুধু সম্বোধনটা আলাদা, আর দুটো সম্বোধনের মধ্যে হৃদয়াবেগের যা ফারাক। আয়ান চিঠির তারিখগুলো মিলিয়ে দেখে যে, প্রতিটি চিঠিই গ্রামের থেকে ফিরে আসার পর লেখা। এ থেকে মনে হয় ঘটনার শুরু গ্রামেই। আয়ানের মনে হয় যে, গ্রামে যেতে পারলে আসল ঘটনা জানা যাবে। কিন্তু কে তাকে বলবে। গ্রামের সকলেই

তো রিনার আত্মীয়। তারা যা বলবে রিনার পক্ষেই বলবে।

আবার আয়ানের মনে হয়, যেখানে মিত্র আছে, সেখানে শত্রু থাকবেই। পাঁচজন পক্ষে বললে একজন বিপক্ষে বলবেই। কিন্তু তার সঙ্গে আয়ানের যোগাযোগ হবে কি করে? সে যখন আসল ঘটনা জানতে চায় তখন যোগাযোগ তাকে করতেই হবে। আয়ান রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায়।

পচাগড় স্টেশনে নেমে সে একটা রিক্সা নেয়। রিক্সাওয়ালার বাড়ি ঐ গ্রামেই। আয়ান তাকে একথা-সেকথা জিজ্ঞেস করে। রিক্সাওয়ালা আনন্দ সহকারে উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ আগেই বোধ হয় পচুয়ের দোকানে সুধা পান করেছে। ফলে তার কোনো কিছু বলতেই আপত্তি নেই। আয়ান এক-একটা বিষয় তুলে দিচ্ছে আর সে একতরফা বকে যাচ্ছে। আয়ান সুযোগ বুঝে করিম সাহেবের বাবার 'গুষ্টির' কথা তুলে দিল। রিক্সাওয়ালা উৎসাহভরে বলে উঠল, 'উয়াধের কথা বুলবেন না। সব কটা লম্পট। মা-মাসি জ্ঞান নাই। যে যার সাথে সুযোগ পায় লেগে যায়।' আয়ান উস্কে দেওয়ার জন্য বলল, 'কিরকম?' রিক্সাওয়ালা বলল, 'কিরকম! এই যে উয়ার একটা ছেলে এদিকে কুথায় প্রপেসার না কি হয়েচে। উ তো চাচাত বুনের সাথে জোড় লাগিয়ে দিল। আবার উয়ার বিটিডাও বাপের বিটি বটে। আপন চাচার সাথে লটোখটো খটোমটো। মাস খানেক এখ্যানে ছিল। তা দিনের ব্যালাতেই গলা ধরে মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঘুর‍্যা ব্যাড়াত। গ্রামে একদম ছ্যা-ছ্যা-কার পড়ে গেলছল।' সে একটানা বকে যায়। হঠাৎ তার খেয়াল হয়। জিভ কেটে সে বলে, 'আপনি তো আবার উয়াধের বাড়ি যাচ্ছেন।' আয়ান বলে, 'না, আমি ওদের বাড়ি যাব না। আমি মসজিদে যাব।'

তখন সবে সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিমের আকাশ রক্তে রাঙা হয়ে আছে। পাখিরা বাসায় ফিরছে। মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিমের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। আয়ান রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মসজিদেই উঠল। মসজিদে তখন বেশ কয়েকজন লোক চলে এসেছে। সবাই হাত মুখ-ধুয়ে, ওজু করে নামাজের জন্য তৈরি হচ্ছে। আয়ানও একটা বধনাতে জল নিয়ে ওজু করতে লেগে গেল। অনেকদিন অভ্যাস নেই। বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। তবুও কোনোমতে ওজু শেষ করে মাথায় রুমাল বেঁধে সে নামাজের সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। নামাজ পড়াও সে ভুলে গেছে। সেই কবে গ্রামে থাকতে করেছে। তারপর থেকে সে আর এসব করে না। করে কোনো লাভ আছে বলে মনে করে না, তাই করে না। তাই প্রায় ভুলে গেছে। হঠাৎ নিজের মতলবে মসজিদে এসে তার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তবুও বাঁচোয়া যে, মগরেবের নামাজের প্রথম তিন রাকাত ফরজ নামাজ একসঙ্গে পড়তে হয়। আয়ান লাইনে দাঁড়িয়ে অন্যরা যা করল, সেও তাই করল। তাতে সে খানিকটা ধাতস্থ হল। তারপর সে বাকি নামাজটা পড়ার অভিনয় করল। নামাজ শেষ হলে একে একে লোকজন সব চলে গেল। শুধু খোতিব সাহেব বসে বসে তসবিহ্ গুণতে লাগলেন। আয়ানও বসে রইল। চোখ খুলে আয়ানকে দেখে তিনি বললেন, 'মহাশয়ের নিবাস কোথায়?' আয়ান বলল, 'বর্ধমান।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে?' আয়ান গলাটা একটু খাটো করে উত্তর দিল। 'উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্যই আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।' তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'বলুন, আল্লাপাক আমাকে দিয়ে আঁপনার কি কাজ করাতে পারেন?' আয়ান আস্তে করে বলল, 'এ বাড়ির এক

মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।' তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কিন্তু এ বাড়িতে তো বিয়ের উপযুক্ত কোনো মেয়ে নেই।' আয়ান বলল, 'না, মেয়েটি এখন এ বড়িতে নেই। তবে এ বাড়ির যে ছেলে বকুলপুরে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তার মেয়ে সে।' তার সঙ্গেই সম্বন্ধ এসেছে। তবে আমাদের বাড়িটা একটু ধর্মঘেষা। আব্বা চান না যে কোনো অসচ্চরিত্র মেয়ে বাড়িতে বৌ হয়ে আসুক। সেইজন্য তিনি আমাকে পাঠালেন, আপনার মতো কোনো মুরব্বির মতামত নেওয়ার জন্য।' তিনি এবার বিব্রত বোধ করলেন। উসখুস করে বললেন, 'আপনি আমাকে খুব মুশকিলে ফেললেন। আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি একজন ন্যায়পরায়ণ, পরহেজগার মানুষ। কোনো না-পাক আউরত আপনার স্ত্রী হোক তা আমিও চাই নে। কিন্তু মেয়েটির সম্বন্ধে আমি ভালো তো কিছু জানি না। কয়েক বছর আগে এখানে এসে কিছুদিন ছিল। তা চালচলন একেবারেই ভালো নয়। বেলেল্লার মতো ঘুরে বেড়াত। জুয়ান ছেলে সুমত্ত মেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো, ঘাড়ে হাত দিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে থাকা কি ভালো? লোকে বলে, রাতের বেলায়ও তারা এক ঘরে শুয়ে থাকত। আরো অনেক কথা শোনা যায়। সব কথা সত্যি নাও হতে পারে। তবে সকলের সামনে যারা ওরকম করতে পারে, একা একা না করতে পারার তাদের কিছুই নেই। কারো অনুপস্থিতিতে তার নিন্দে করলে আল্লা নারাজ হন। আমাকে আপনি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি আর কিছু জানি না।' আয়ান তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে খোতিব সাহেবকে সালাম করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল। সে যা জানতে চেয়েছিল তা প্রায় সবই জানা হয়ে গেছে। এখন সে শুধু সেই ঘরটা দেখতে চায়, যেখানে রিনা আর বীরু মাসখানেক রাত কাটিয়েছে। সে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা খুলল এক অতি বৃদ্ধা মহিলা। দরজা খুলেই অপরিচিত লোক দেখে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?' আয়ান অনুমান কবল, ইনিই রিনার ঠাকুরমা হবেন। সে বলল, 'দাদি আমি করিম সাহেবের জামাই।' বৃদ্ধার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল, 'তুমি রিনার বর? তা সে কোথায়?' আয়ান বলল, 'সে বকুলপুরে। আমি বহরমপুর থেকে আসছি। তাকে অনেক দিন বললাম, দাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। তা তার সময়ই হচ্ছে না। তাই আমি একাই চলে এলাম।' বৃদ্ধা খুবই খুশি হল। আয়ানের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। অন্য সময় হলে এ আত্মীয়তা অনেক মধুর হতে পারত। কিন্তু হতভাগ্য আয়ান এ আপ্যায়ন উপভোগ করতে পারল না। রিনার ঠাকুরমার আপ্যায়ন তার বিরক্তিকর লাগল। তার কাপড় থেকে আসা ঘামের গন্ধটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। সে নিজেকে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল। বৃদ্ধা হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করে ফেলল, 'ও বৌমা দেখ, আমার নাতজামাই এসেছে।' বৌমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। আশেপাশের বাড়ি থেকেও মেয়েরা এসে জড়ো হল। তারা আয়ানকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যে, আয়ানের মনে হল, তারা দেখতে চায়, রিনাকে যে বিয়ে করেছে, সে জীবটি কেমন! তারা দেখেশুনে চলে যায়।

আয়ানের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আয়ানের কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। অথচ থাকতে হলে কিছু খেতেই হবে। সে অল্প দুটো ভাত মুখে দিয়ে উঠে পড়ে। দাদি ঠাট্টা করে, 'তুমি অতকডা ভাত খাও, তো আমার লাতিনকে ভাত দিবে কি করে?' আয়ান জানে গ্রামের দিকে

এই ভাত দেওয়া কথাটা অনেক কিছু বোঝায়। কিন্তু আয়ান সেসব আলোচনায় জড়াতে চায় না। সে বলে, 'দাদি, আমি সারাদিন কাজ করেছি, খুব ঘুম পাচ্ছে।' দাদি তাকে বাইরের ঘরে বিছানা করে দেয়। এই ঘরটা একদম রাস্তার ওপরে। রাস্তার ওপাশেই গ্রামের মসজিদ। দাদি বিছানা করে দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। আয়ান বলে, 'রিনা আপনার খুব নাম করে।' দাদি খুশি হয়। আয়ান বলে, 'রিনা বলছিল, গ্রামে এসে সে মাসখানেক আপনার কাছে ছিল।' দাদি বলে, 'বাড়িতে ছিল বটে। তা আমার কাছে কি আর থাকত! সারাদিন তো চাচা-ভাইঝিতে গল্প করত।' আয়ান বলে, 'কিন্তু রাতে তো আপনার কাছেই শুত।' দাদি মুখে কাপড় দিয়ে হাসে, 'না, তখন তোমার দাদো বাঁচ্যা ছিল। আমরা....।' আয়ান বুঝতে পারে দাদি দাদোর সঙ্গে এক ঘরে শুত। দাদি বলে, 'তুমি যেখানে শুয়ে আছ, তোমার গিন্নি এই বিছানাতেই শুত।' আর ঐ যে ঐদিকের বিছানায় তোমার ছোটশ্বশুর শুত। আয়ান বুঝতে পারে যে খোতিব সাহেবের খবর ঠিক। আয়ান বলে, 'দিনের বেলায় তো আপনার সঙ্গে থাকত?' দাদি বলে, 'সারাদিন এখানে বসে চাচার সঙ্গে গল্প করত। সাঁঝের বেলা ছাদে উঠত। কোনো কোনো দিন বিকেল ব্যালা পুখোর পাড়ে গিয়ে বসত। আর এক-আধদিন মাঠের দিকে যেত।' আয়ান ভাবে, এর থেকে বেশিকিছু আর জানা সম্ভব নয়। সে এমন ভান করে যেন তার ঘুম আসছে। দাদি উঠে চলে যায়।

আয়ানের কিছুতেই ঘুম আসে না। বার বার সে এদিক-ওদিক, এপাশ-ওপাশ করে। এক সময় আঁধার ফরসা হয়ে আসে। মসজিদে মুয়াজ্জিম আজান দেয়। কিছুক্ষণ পরে খোতিব সাহেব নামাজ শুরু করেন। নামাজে খোতিব সাহেব যে সুরটা পড়েন সেটা এক সময় আয়ানের মুখস্থ ছিল। গানের কলির মতো একটা লাইন বার বার ফিরে আসে-- ফাবে আয়ে আলায়ে রাব্বি কুমা তুকাজ্জিমান। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসা পরিচিত সুরটা আয়ানের বঞ্চিত, রক্তাক্ত বুকের ওপর একটা মায়ার প্রলেপ সৃষ্টি করে। আয়ান কান পেতে তা শুনতে থাকে। একসময় তা শেষ হয়। আয়ান উঠে ছাদে যায়। ছাদটা দেখে নিয়ে সে রাস্তায় বের হয়। দাদি এসে দানি পুকুর, দশের পুকুর সব হাত দিয়ে দিয়ে দেখায়। বলে, 'ঐখানে বসে তোমার গিন্নি গল্প করত।' আয়ান দেখে আর হৃদয়ের রক্ত ঝরা অনুভব করে। সে দাদিকে বলে, আজ দুপুরের মধ্যে তাকে বহরমপুর ফিরতেই হবে। সে বরং রিনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আরেকবার আসবে। দাদি আপত্তি করে। কিন্তু কাজ আছে বলায় তত জোর করে না। আয়ান বিদায় নেয়। রাতের আগেই সে বহরমপুর ফিরে আসে।

বহরমপুরে এসেও আয়ান স্থির হতে পারে না। বাড়িতে বসতে পারে না। কলেজে যায়, ক্লাস নেয়। যতক্ষণ ক্লাসে থাকে ততক্ষণ ভুলে থাকে। ক্লাস থেকে বেরুলেই রিনার কথা মনে পড়ে। আয়ানের অস্থির লাগে। লাইব্রেরিতে বসতে পারে না। কলেজ থেকে বেরিয়ে দুপুর রোদেই গঙ্গার ধারে পায়চারি করে। বাসায় না থাকতে পেরে মেসে যায়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসে তখনই হাল্‌কা হওয়া যায় যখন নিজের মনের কথা তাদেরকে বলা যায়। নিজের সুখ-দুঃখ তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। কিন্তু আয়ানের দুঃখ এমনই যে, তা আর কাউকে বলা যায় না। মনের মধ্যে তা তুষের আগুনের মতো জ্বলে আর জ্বালায়। আয়ান মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগলের মতো লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়ায়।

এর মধ্যে রিনা আসে। আয়ান রিনাকে একদম সহ্য করতে পারে না। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, 'বীরুর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কিরকম ছিল?'

রিনা প্রথমে সবকিছু অস্বীকার করে। কিন্তু আয়ানের জেরার মুখে দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে, গ্রামে গিয়ে বীরু বাড়াবাড়ি করেছিল।

আয়ান জানতে চায়, 'কিরকম বাড়াবাড়ি?'

রিনা বলে, 'সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল আর.....।'

'আর কি?' আয়ান দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করে।

রিনা বলে, 'আর আমার হাত ধরত।'

আয়ান বলে, 'হাত ধরত, ব্যাস!'

রিনা বলে, 'ব্যাস, আর কিছু নয়।'

আয়ান একথা সত্য বলে মানতে পারে না। আয়ানের সমস্ত শরীর জ্বালা করে। রিনার সঙ্গ সে সহ্য করতে পারে না। আয়ান জিজ্ঞেস করে, 'সে কথা তুমি বিয়ের আগে আমাকে বলনি কেন? আমি তো আমার সবকথা তোমাকে বলেছিলাম।'

রিনা বলে, 'শুনলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না বলে বলতে পারিনি।'

'কি সুন্দর যুক্তি!' শুনলে তুমি বিয়ে করতে রাজি হবে না বলে বলতে পারিনি। কিন্তু এখন!' আয়ান জিজ্ঞেস করে, 'এখন কি হবে?'

রিনা উত্তর দেয়, 'এখন তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। তবে এটা জানবে যে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় খাদ নেই।' আয়ানের হাসি পায়। রিনা এখনো তাকে ভালোবাসার কথা বলে। সে রিনাকে আবার জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা তখন না হয় বিয়ে করব না বলে বলতে পারনি। কিন্তু যখন আমাদের বাড়িতে এল, তখন বললে না কেন?'

'তখন আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।' রিনা বলল, 'আগে কিছু বলিনি বলেই তখন বলতে পারিনি। ভয় হয়েছিল, তুমি রাগ করবে বলে। তাই আমি নিজেই তাকে বিদায় করে দিয়েছিলাম।' আয়ানের এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। রিনার কোনো কথাই এখন আয়ানের ঠিক মনে হয় না। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বকুলপুরে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে বলে, 'আপনারা এমন করে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলেন কেন?' করিম সাহেব কোন কথা বললেন না। শাশুড়ি বললেন, 'আমি কিছু জানতাম না, বাবা। জানলে আরেকটা জীবন নষ্ট করতে দিতাম না।' আয়ানের রাগ হয়ে গেল। সে বলল, 'মিথ্যা কথা। আপনারা সব জানতেন। জানতেন না তো রাগ করে বীরুর সঙ্গে রিনার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি করিম সাহেবকে বলেছিলেন কেন? আপনি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলেননি, হোলই বা চাচা, ওরা যখন অত চাইছে, তুমি বিয়েই দিয়ে দাও?' শাশুড়ি সেকথা বার বার অস্বীকার করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। তোমাকে যে বলেছে, মিথ্যা কথা বলেছে। আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে, আমি চাচার সঙ্গে বিয়ের কথা বলব?' আয়ান বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি বিয়ের কথা বলেননি। কিন্তু গ্রাম থেকে বাবলু করিম সাহেবকে যে চিঠি লিখেছিল সে চিঠি তো আপনারা পেয়েছিলেন। করিম সাহেব নিজেও তো

সে চিঠি পড়েছিলেন। তারপরেও বলছেন, আপনারা জানতেন না!' করিম সাহেবের স্ত্রী আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন। করিম সাহেব বললেন, 'মলি চুপ করো।' তারপর আয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি চাইলে রিনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আবার বিয়ে কর। আমাদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি নেই। তবে আমার মেয়ে আমি তো ফেলে দিতে পারব না।' আয়ানের অসহ্য মনে হল। সে ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দিয়ে বলল, 'ফেলে দিতে পারবেন না বলে, বাড়িতে দিনের পর দিন নোংরা ঘটনা ঘটবে, আপনি কিছু বলবেন না?' করিম সাহেব বললেন, 'সে ব্যবস্থা এবার করছি। এবার এলে, প্রথমে উত্তম-মধ্যম দেব। তারপর কথা।' করিম সাহেবের স্ত্রীও হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'আমিও কি ছেড়ে দেব। আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করল। আমি নিজে না পারলেও মহেশকে দিয়ে করাব।' মহেশ তোতনের প্রাইভেট মাস্টার। তিনি বলতে চান যে, বীরুকে নিজে হাতে না পারলেও মহেশকে দিয়ে জব্দ করবে। তারা কি করবে, আয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে তারই আলোচনা করতে থাকেন। বলা বাহুল্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য উভয়েই এক এক বারে এক এক মিটার চড়ান। তাতে শেষ পর্যন্ত যে শাসনের সিদ্ধান্ত হয় তা শুনে আয়ানের সান্ত্বনা পাওয়ার কথা। কিন্তু যার মনে শান্তি নেই সে কিছুতেই শান্তি পায় না। আয়ানও পেল না। অশান্ত বুক নিয়েই সে বহরমপুর ফিরে এল।

আয়ান বহরমপুর ফিরে এল। কিন্তু তার মনে শান্তি ফিরে এল না। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মাথায় যুক্তি থাকে না। বুদ্ধি খেলে না। আয়ানেরও স্বাভাবিক বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল। তার সারা দিন-রাতের চিন্তা হল রিনার অবৈধ সম্পর্ক। সে রিনাকে বলে, 'তুমি তো বলছ বীরুর সঙ্গে তুমি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে মেশনি। গ্রামে তোমাকে একা পেয়ে সে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।' রিনা বলে, 'হ্যাঁ।' 'তাহলে তার উপর তোমার নিশ্চয় রাগ হয়েছে?' রিনা বলে, 'নিশ্চয় হয়েছে।' 'তাহলে আমি তাকে ধরে এনে দেব, তুমি তার মুখে একটা লাথি মারতে পারবে?' রিনা চুপ করে যায়। আয়ান আবার জিজ্ঞেস করে, 'বল পারবে?' রিনা বলে, 'না, একটা লোকের মুখে লাথি মারতে আমি পারব না।' আয়ান উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একটু পরে আবার শান্ত হয়ে বলে, 'ঠিক আছে, লাথি মারতে হবে না। কিন্তু কেন সে এমন খারাপ ব্যবহার করেছে সে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে?' রিনা আবার চুপ করে যায়। আয়ান পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'কি, পারবে?' রিনা বলে, 'তখনই পারি নি। এতদিন পরে কি করে কৈফিয়ৎ চাইব?' আয়ান ক্ষেপে যায়। 'তার মানে তুমি মনে কর না যে, সে কোনওরকম অন্যায় করেছে। কারণ, সে যা করেছে তাতে তোমারও সায় ছিল। তোমরা দুজনেই তা উপভোগ করেছ।' আয়ান মনে মনে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমি কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চাই না। কিন্তু মুখে সেকথা বলতে পারে না। আয়ান জানে রিনার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না।' কারণ তাহলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। নিজের কাছে তো সে হেরেই গেছে, জানাজানি হয়ে গেলে অন্যের কাছেও তার মাথাটা নিচু হয়ে যাবে। আয়ান সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। তাতে সে যদি উন্মাদ হয়ে যায় তাও ভাল। তাছাড়া রিনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তো সে আরো খারাপ হয়ে যাবে। না, সেটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। সে যে সত্যিই রিনাকে ভালোবাসে। যাকে ভালোবাসে সে

কষ্ট পাবে এমন কাজ সে করে কি করে? কিন্তু সেটা করলে তবু ভালো ছিল। সেটা না করে সে এমন এমন কাজ করতে লাগল যাতে রিনার কষ্ট বাড়তেই লাগল। আয়ানের নিজের মানসিক যন্ত্রণাও বেড়ে চলল। এর মধ্যে একদিন কালাম এসে খবর দিল যে, তার বাবা ইব্রাহিম অসুস্থ। আয়ান বাবার অসুখের খবর শুনে বাড়ি রওনা হল।

দশ

গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ল, সে খবর বাঘডাঙার লোকেরা রাখে না। আয়ান বহরমপুরে বসে কি করছে, সে খবরও তারা রাখে না। তারা জানে, আয়ান বহরমপুরে যে কলেজে আই. এ., বি. এ. পড়ান হয় সেখানে পড়ায়। মোটা টাকা মাইনে পায়। তারা জানে, আয়ান 'লাভ ম্যারেজ করে বিহ্যা' করেছে। এখন স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বাসা ভাড়া করে বহরমপুরে আছে। এর বেশি তারা জানার দরকারও মনে করে না। আয়ানের মা-বাবাও মনে করে না। ইব্রাহিমের টাকার দরকার হলে বড় ছেলেকে খবর দেয়। আয়ান নিজে আসতে না পারলেও টাকা পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু গত মাস দুয়েক সে অসুস্থ। কয়েক বার বড়ছেলের কাছে খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু আয়ান নিজেও আসেনি, আবার টাকাও পাঠায়নি। ইব্রাহিম ভাবে, ছেলেটা এতদিনে বোধহয় খারাপ হয়ে গেল। ইব্রাহিমকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আয়ানের যে মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তার কোনো হাত নেই। সে জানেও না যে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আয়ান কাউকে সেকথা বলেনি। কেউ তার মনের খবর রাখে না। কাজেই সে যখন বাড়িতে এল, সবাই তাদের সমস্যাগুলো আয়ানের সামনে হাজির করল।

মা বলল, 'তোর ব্যাটার দুমাস শরীল খারাপ। এদিকে বাড়িতে টাকা নাই। বাকিতেই ডাক্তার দেখান্যা, বাকিতেই ওষুধ কিনা হয়্যাছে। ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম লিয়্যা তা দু' তিনশ টাকা তো হবে। এদিকে আবার বুবুর বিটির বিহ্যা লাগ্যাছে। সবাই বুলবে প্রপেসারের মা কি দিচ্ছে দেখি। একটা সোনার জিনিস কিছু তো দিতেই হবে।' মেজভাই বসে ছিল। সে বলল, 'সামনে ঈদ। বাড়িতে কারো জামাকাপুড় নাই। কাপুড় কিনতে হবে।' খবর পেয়ে বড় বোন এসেছে। সে বলল, 'সাহানার বাপ গুড়ের ব্যবসা করবে। তার কাছে তো পুঁজি নাই। বুলল, বড়ভাই যদি পাঁচ শডা টাকা ধার দেয়।' ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। সে বলল, 'বাবা প্রাইভেট পড়ার টাকা দেয়নি। ছ মাসের বেতন বাকি। এক শ আশি টাকা লাগবে।' ইব্রাহিম অসুস্থ শরীরেই বলল, 'হালের বলদ নাই। গরু না কিনলে আবাদ হবে না। আবার স্যালো মেসিনের তিন-তিনডে কিস্তি বাকি। লুটিশ হয়েছে। সে টাকাও দিতে হবে। না হলে সম্পত্তি ক্রুক করবে।' সেজ ভাই পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার আবাদের ভাবনা। সে বলল, 'হাঁসকলমের ভুঁইয়ে ছ্যাচ দিতে হবে। সার কিনতে হবে।' আয়ান দেখল বাড়িতে সমস্যা অনেক। মহাভারতের যুদ্ধে গিয়ে ভীষ্মের শরশয্যা হয়েছিল। আর বাড়িতে এসে তার সমস্যাশয্যা হয়েছে। আর প্রতিটা সমস্যা সমাধানের জন্যই টাকার দরকার। যত টাকার দরকার অত টাকা দেবার ক্ষমতা তার নেই। পকেটে হাজার দুই টাকা ছিল। শ'খানেক টাকা পকেট খরচের জন্য রেখে বাকিটা সে বাবার হাত দিয়ে দিল। সে বুঝতে পারে এবারে সব সমস্যাগুলো অসুস্থ

বাবার ওপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তার আর ভালো লাগছে না।

সে সফিউলের বাড়ির দিকে রওনা হল। সফিউল বাড়িতে ছিল না। সন্ধ্যার সূর্যাস্তটা কেমন মায়াবী মনে হচ্ছিল। বোধ হয় সেদিন পূর্ণিমা ছিল। সফিউলের স্ত্রীকে বলে মাঠের দিকে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সে আমবাগানটার কাছে এসে বসল। কত রাত হয়েছে তার খেয়াল নেই। এক সময় সফিউল এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর সফিউল বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'তোর কি হয়েছে?' আয়ান বলল, 'কৈ, কিছু হয়নি তো!' সফিউল জানতে চাইল, 'তাহলে তুই এত আনমনা হয়ে আছিস কেন?' আয়ান উত্তর দিল, 'বাড়িতে বাবা অসুস্থ। হাজার রকম সমস্যা। তিক্ত-বিরক্ত লাগছে। সেজন্য হতে পারে।' সফিউলের মনে হল, হতেও পারে। সে অন্য প্রসঙ্গে গেল। সকালে উঠেই আয়ান বাড়িতে এল। দুপুরে স্নান-খাওয়া করে বহরমপুর চলে এল।

বহরমপুরে এসে আয়ান কলেজ করতে লাগল। কিন্তু তার মানসিক অবস্থার উন্নতি হল না। সে কলেজে যায়। ক্লাস থাকলে ক্লাস করে। ক্লাস না থাকলে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ায়। রাতে কখন বাড়ি ফেরে ঠিক নেই। কখনো কুমার হোস্টেলের কাছে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকে। কখনো জজকোর্টের মাঠে গিয়ে বসে থাকে। রিনা নিজেকে অপরাধী ভাবে। মনে হয়, তার জন্যই আয়ানের এমন হয়েছে। সে না থাকলে আয়ান সুখে থাকবে কি? দেখা যাক। তাই আয়ানকে বলে সে বকুলপুরে বাবার কাছে চলে যায়। আয়ান বাড়িতে একা থাকে। অনেক দিন পর কাকলির কথা তার মনে পড়ে। হারমোনিয়মটা নিয়ে বসে। কিন্তু গান করতে পারে না। সা পা টিপে করুণ সুরে আ-করে একটানা একটা শব্দ করে। একটু যেন আরাম বোধ করে। কাকলির চিঠিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে। একটা চিঠিতে কাকলির একটা ফটো ছিল। কাকলি পাঠিয়েছিল। অবশ্য আয়ানই পাঠাতে বলেছিল। আয়ান কাকলির তানপুরা নিয়ে একটা ছবি চেয়েছিল। তানপুরা নিয়ে না থাকলে হারমোনিয়াম বাজানো অবস্থায়। কিন্তু কাকলি লিখেছিল, সেই মুহূর্তে সেরকম কোনো ছবি তার কাছে ছিল না। তাই সে পাসপোর্ট সাইজের একটা ছোট ছবিই পাঠিয়েছিল। আয়ান ছবিটা বের করল। একটা খয়েরি শাড়ি পরে ছবিটা তোলা। ছবিটা ছাপিয়ে কাকলির মুখটা আয়ানের মনে পড়ল। আয়ান জানে না কাকলি এখন কেমন আছে। তবে ক'দিন আগে গণেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় জেনেছিল, কাকলি এখনো বিয়ে করেনি। আয়ানের মনে হয়, কাকলিকে বুঝতে হয়ত তার ভুল হয়েছিল। কাকলি হয়ত তাকে খুবই ভালোবাসত। এখনো বাসে। না হলে আজো বিয়ে করেনি কেন? কাকলির কথা ভাবতে ভাবতেই অনেক দিন পরে আয়ান শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

আয়ান তার কেনা ফুলকাটা খাটে শুয়ে আছে। বিছানায় খাটের নক্‌শার সঙ্গে মিলিয়ে কেনা চাদরটা পাতা আছে। কাকলি লালপাড় হলুদ শাড়িটা পরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর জিজ্ঞেস করছে, তোমার এত কষ্ট কেন গো? আয়ান অনুভব করতে পারছে তার অনেক কষ্ট। কিন্তু কেন কষ্ট তা কাকলিকে বলতে পারছে না। কাকলি বলছে, বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি যে তোমার সব কথা বুঝতে পারি। দুঃখে তার চোখে জল ছলছল করছে। আয়ানের চোখেও জল এসে যাচ্ছে। আয়ান বলছে, কাকলি, তোমার হাতটা একটু আমার বুকের ওপর রাখবে? কাকলি তার ডানহাতটা আয়ানের শার্টের বোতাম খুলে বুকের

ওপর রাখছে। একটা সুখকর অনুভূতি আয়ানের বুকটাকে শান্ত করে দিচ্ছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আয়ান নিজের দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরল। দেখল সে তার ফুলকাটা খাটেই শুয়ে আছে। তবে পাশে কাকলি নেই। রাত ভোর হয়ে এসেছে। জজকোর্টের মাঠের গাছে গাছে কাকগুলি ডেকে উঠছে। পুবের জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকছে। আয়ান বিছানায় শুয়ে কাকলির মুখটা মনে করতে লাগল। দেড় বছর আগে দেখা মুখটা স্বপ্নে দেখা মুখটার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মশারিটা সরিয়ে আয়ান উঠে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে জজকোর্টের মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক সময় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সোনালি রোদ এসে মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর পড়ল। আয়ান ঘরে ফিরে স্নান-খাওয়া করে তৈরি হয়ে নিল। কিন্তু কলেজ না গিয়ে সে চকের বাসে উঠে বসল। স্টেডিয়ামের কাছে নেমেই তার উৎসাহটা কমে গেল। মনে হল, না এলেই ভালো হত। সে রিক্সা নিল না। সন্দিগ্ধপদে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। হাউসিং-এ এসে গেল। বাঁচা গেল! বাইরে কোনো পরিচিত লোক নেই। আয়ান ওপরে উঠে গেল। কড়া নাড়তে দরজা খুললেন কাকলির মা। দরজা খুলে আয়ানকে দেখেই তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। ভেতর থেকে কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'মা, কে এসেছেন?' তিনি তারও কোনো উত্তর দিলেন না। বিহুল ভাবটা কাটলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে?' আয়ান অপরাধীর মতো বলল, 'বেশিক্ষণ থাকব না। এক্ষুণি চলে যাব।' কিন্তু আয়ানকে তিনি বসতে বললেন না। আয়ান নিজে থেকেই সোফাটার একপাশে বসে পড়ল। মা ভেতরের দিকে চলে গেলেন। বাইরের ঘরে আয়ান অনেকক্ষণ একা বসে থাকল। একবার ভাবল চলে যায়। কিন্তু তাহলে কাকলিকে একবার দেখা হয় না। এতদূর আসাটাই ব্যর্থ হয়। সে বসে থাকে। কাকলির মা এসে বলেন, 'তাহলে এখন কি আপনি যাবেন?' আয়ান উঠে পড়ে। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও সে ফিরে দাঁড়ায়। কাকলির মাকে বলে, 'যদি কিছু মনে না করেন তো আমি কাকলিকে একবার দেখতে চাই। আপনি একবার ডেকে দিলে, একবার শুধু দেখেই চলে যাব। কোনো কথা বলব না।' মা ভেতরে গেলেন। আয়ান মনে করল, তাহলে সে একবারের তরেও কাকলিকে দেখতে পাবে! সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকল। কিন্তু মা ফিরে এসে বললেন, 'কাকলি দেখা করতে চায় না।' আয়ানের চোখে মুক্তোর মতো দু' ফোঁটা জল এসে গেল। আয়ান কাকলির মার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ জীবনে আর আপনাদের কাছে আমি কিছু চাইব না। আজকের মতো আমাকে একগ্লাস জল দিন।' মা একগ্লাস জল নিয়ে এলেন। আয়ান চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিল। তারপর দরজা ঠেলে সোজা বেরিয়ে এল। আর পেছনে ফিরে চাইল না। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, মন যদি ভেঙেও যায়, তবুও সে আর কারো দ্বারে ভিখারি হয়ে যাবে না। তাতে যত কষ্ট হোক সে সহ্য করবে। স্টেডিয়ামের কাছে এসে সে বহরমপুরের বাস ধরল। ফিরে বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজাসুজিই কলেজে গেল। পৌনে চারটের ক্লাসটা তখনো বাকি। আয়ান হাজিরা খাতাটা নিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়ল।

বাড়ি ফিরে আয়ানের নিজেকে অনেক বেশি শক্ত মনে হল। মনে হল তার জীবনে বিপর্যয়ের জন্য বীরুই দায়ী। বীরু তার জীবনটা বিষাক্ত করে দিয়েছে। সেও তাকে সুখে

থাকতে দেবে না। বীরুকে সে শেষই করে দেবে। কি করে শেষ করবে, আয়ান তার ফন্দি আঁটে। একবার ভাবে, বাড়িতে এনে বিষ খাইয়ে শেষ করে দেবে। তাতে যদি না হয়, গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলবে। কিন্তু তাতে ডেডবডি নিয়ে ঝামেলা। তার থেকে সে একটা রিভলবার যোগাড় করবে। তারপর তার বাসাতে গিয়েই গুলি করে মেরে আসবে। কিন্তু আয়ানের মনে হয়, তাতেও তার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তার থেকে তাকে একদিন করিম সাহেবের সামনে হাজির করবে। উত্তম-মধ্যমও হবে। আর রিনার সঙ্গে আসলে বীরুর কিরকম সম্পর্ক ছিল তাও জানা যাবে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? আয়ানের মাথায় বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বুদ্ধি আসে। বীরু তো এখনো রিনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। রিনা দেখা করতে বলেছে বললেই সে আসবে।

আয়ান শেওড়াফুলি যায়। স্টেশন থেকে সে বুদ্ধি আঁটতে থাকে। বাসায় পৌঁছেই আয়ান আন্তরিকতার ভান করে বলে, 'আপনাদের দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম। পরের দিন ক্লাস ছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল। আরেকবার যেতে হবে। রিনাও একবার যেতে চায়।' বীরু উৎসাহ দেখায়, 'কবে যাবে রিনারা?' আয়ান বলে, 'সেটা বরং আপনি একবার বকুলপুর গিয়ে জেনে নিন! রিনা এখন ওখানেই আছে।' বীরু বলে, 'করিমদার সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি।' আমি এমনিও যেতাম। তাহলে পরশুদিন যাই।' আয়ান রাজি হয়ে যায়। 'তাহলে পরশুদিন দুপুরেই দেখা হবে। আয়ান বকুলপুর রওনা হয়ে যায়। কলেজে করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলে যে, আগামী পরশু বীরু তাঁদের বাড়িতে আসছে। তাঁরা যেন তার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকেন। আয়ান নিজেও প্রস্তুত হয়ে নিল। সে একটা ছুরি কিনল। কাঠের একটা ছোট্ট লাঠি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখল। আর খানিকটা দড়িও রেখে দিল। যাতে দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় আয়ান বীরুকে নিয়ে করিম সাহেবের বাড়ি গেল। দরজা খুলল পলি। বীরু বাড়িতে ঢুকেই পলির সঙ্গে কথা বলতে গেল। পলি কোনো কথা বলল না। তখন সে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে গেল। করিম সাহেব বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। তোতন বীরুকে বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। করিম সাহেব কোনরকম ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিনাকে সেবার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কি করেছিস?' সঙ্গে সঙ্গে বীরুর গলা বদলে গেল। 'কিছু করিনি তো!' করিম সাহেব রিনাকে ডাকলেন, 'কি করেছে বল।' রিনা ঘরে না ঢুকে বাইরে থেকেই বলল, 'ভাইঝির সঙ্গে যা করা উচিত নয় তাই করেছে।' বীরু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ফল্স অ্যালেগেশন।' করিম সাহেব বললেন, 'তুই আমার বাড়ি থেকে চলে যা। আর কোনো দিন আসিস না।' করিম সাহেবের স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। 'ভাইরে, তোকে আমি ছেলের মতো ভালোবাসি। আর তুই আমার এই করলি?' আয়ান হতাশ হল। বীরু এলে কি করবে স্বামী-স্ত্রীর সেই ফিরিস্তির কথা মনে পড়ল। সকলের প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরে গেল। বীরু বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'থামুন। আমার কয়েকটি কথা আছে।' সে বীরুকে নিয়ে এসে সোফায় বসালো। সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'রিনা দেশের বাড়ি গিয়েছিল আপনার সঙ্গে। সেখানে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। তা না করে উল্টে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন কেন?' বীরু বলল, 'আমি কোন খারাপ ব্যবহার করিনি।' আয়ানের মেজাজ খারাপ

হয়ে গেল। রিনা তাকে যতটা বলেছিল, তার থেকেই সে ঘটনা ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগল। 'সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ও ছাদে দাঁড়িয়েছিল। আপনি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাননি? সেদিন রাতে ও শুয়ে ছিল। ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আপনি ওর কাপড় খোলেননি?' বীরু আর কোন উত্তর দেয় না। আয়ান সোফায় উঠে জিজ্ঞেস করে, 'জবাব দিন। আপনি করেননি?' বীরু কোনো কথা বলে না। আয়ান তার মুখের ওপর কষে এক লাথি মারে। বীরু 'বাবারে' বলে উল্টে পড়ে। আয়ান তার চুলের মুঠি ধরে তুলে মুখের ওপর কাঠের লাঠিটা দিয়ে গোটা দুই বাড়ি কষিয়ে দেয়। করিম সাহেব এসে লাঠিটা কেড়ে নেন। বলেন, 'মারছ কেন?' যেন তিনি কিছুই জানেন না। আয়ান ছুরিটা বের করতে যায়। করিম সাহেব সেটাও কেড়ে নেন। করিম সাহেবের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না ভাই। তুই স্বীকার কর।' বীরু বলে, 'আমি সব স্বীকার করছি।' আয়ান পকেট থেকে একটা খুর বের করে বলে, 'এই অপরাধের জন্য আপনার ঠোঁট কাটব, না কান?' বীরু 'কেটে দিচ্ছে গো' বলে চিৎকার করে ওঠে। রিনা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কাকাকে আর মেরো না।' আয়ান তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। সে তখন বার বার বলতে থাকে, 'মা কথা দাও, তুমি কাকাকে বাঁচাবে?' করিম সাহেব এসে আয়ানের হাত থেকে খুরটাও নিয়ে নেন। বীরু বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর কোনোদিন আসব না।' আয়ান বলে, 'সেটা আর প্রতিজ্ঞা করতে হবে না। কাছাকাছি কোনোদিন আসতে দেখলে আমি কিছু করব না। একটা রিভলবার দিয়ে গুলি করব। তারপর যা হবার হবে।' রিনার মা বলল, 'অনেক হয়েছে বাবা। এবার ছেড়ে দাও।' আয়ান বলে, 'না, ওকে রিনার পায়ে হাত দিয়ে মাফ চাইতে হবে।' রিনার মা গিয়ে রিনাকে ডেকে নিয়ে আসেন।' বীরু রিনার পায়ে হাত দিতে যায়। কিন্তু রিনা দু' হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে। নিয়ে গিয়ে বাড়ির বাইরে বের করে দেয়। বিধ্বস্ত আয়ান গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। করিম সাহেবের স্ত্রীও গিয়ে ও ঘরের বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। করিম সাহেব রিনাকে বললেন, 'তুই কোনোদিন আমার কথা শুনবি না। আর নিজে থেকে সব সময় গণ্ডগোল করবি। তোর জন্য আমার মান-সম্মান সব গেল। তুই বাড়ি থেকে চলে যা।' রিনা বলল, 'আব্বা, আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।' করিম সাহেব কিছু না বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন। রিনা এসে আয়ানের পাশে শুয়ে পড়ল। সারা রাত দুজনেই জেগে কাটাল। কিন্তু কোনো কথা হল না। আয়ানের আর কোনো কথা বলার মতো অবস্থা নেই। সে দেখতে চেয়েছিল কি, আর দেখল কি! সে দেখল তার থেকে বীরুর প্রতিই রীনার টান বেশি! সে বীরুকে কেন যে এখানে আনতে গিয়েছিল? না হলে এ দৃশ্য তো তাকে চোখে দেখতে হত না। তবে একটা লাভ হয়েছে। বীরু আর কোনোদিন আয়ানের বাড়িতে যাবে না। রিনার সঙ্গেও আশা করি আর দেখা করার চেষ্টা করবে না। সকাল হয়ে গেল। আয়ান জামা-কাপড় পরে বহরমপুর রওনা হল। রিনাও তার সঙ্গে এসে রিক্সায় উঠে বসল।

বহরমপুর ফিরে আয়ান কাকলির চিঠি পেল। কাকলি লিখেছে, 'সেদিন কেন এসেছিলেন? আমাকে একবার দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু দেখে কি লাভ? আপনি কি আগের মতো আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতেন? পারতেন না। তবে কি দেখতে এসেছিলেন, আমি বিয়ে করেছি কি না? হিন্দু মেয়ের বিয়ে একবারই হয়। আমার সে বিয়ে হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়বার আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না। তবে ভয় নেই, আমি কোনো দিনই আপনার ওপর কোনোরকম দাবি করব না। আপনি বিয়ে করে সুখি হয়েছেন তো?' আয়ান চিঠিখানি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ছিল। বাড়ি থেকে ছোট ভাই এসে খবর দিল, বাবা মারা গেছেন। খবরটা দিয়েই ভাই হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আয়ানেরও কান্না পাচ্ছিল। সে কোনোরকমে আত্মসম্বরণ করে ভাইকে সান্ত্বনা দিল। খবব শুনে রিনাও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'বকুলপুরে একটা খবর দেবে না?' আয়ান বলল, 'দরকার নেই। বেঁচে থাকতে যারা একবার আসার সময় পেল না মরে যাওয়ার পরে তাদের হয়রান করে কোনো লাভ হবে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।' রিনা বলল, 'আমিও যাব।' তারা তিনজনেই গিয়ে ডোমকলের বাসে উঠল।

আয়ান যখন বাড়ি পৌঁছল তখন ইব্রাহিমকে লোকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। পাশে ধূপবাতি জ্বলছে। শুধু অন্তিম প্রার্থনা জানাজা পড়ে কবরে শুইয়ে দেওয়া বাকি আছে। তাও হয়ে যেত। কিন্তু আয়ানের জন্য গ্রামের লোকেরা অপেক্ষা করছে। আয়ানকে দেখে সালমা ডুকরে কেঁদে উঠল। মরার আগে ইব্রাহিম নাকি বার বার আয়ানকে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু বহরমপুরে বাসায়, কলেজে লোক পাঠিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। ফলে লোকটার অন্তিম ইচ্ছাটাও অপূর্ণ থেকে গেল। সালমা কান্নার ভাষায় এরকম বিভিন্ন কথা বলছিল। আয়ানের ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও কাঁদছিল। আয়ান কাঁদতে পারছিল না। ইব্রাহিমের জীবনের নানা কথা তার মনে পড়ছিল। কবে এক গ্রাম্য বালক বিলে কুমির ধরা দেখতে গিয়ে. পণ্ডিতের হাতে মার খেয়ে পড়া ছেড়েছিল। তারপর একের পর এক সংসারে সবার কাছে সে শুধু মারই খেয়ে গেল। সংসারের দরদহীন যাঁতাকলে পড়ে সে সবকিছু চাইতে ভুলে গিয়েছিল। যাও বা চেয়েছিল তাও পায়নি। ইব্রাহিম বড় ধূমধাম করে আয়ানের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। আয়ান সে সুযোগ তাকে দেয়নি। অভিমানে তাই সে চিরনিদ্রায় সমাহিত। আর কোনোদিনও কারো কাছে সে কিছু চাইবে না।

আয়ান বাবার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সেসব কথাই ভাবছিল। ইমাজুদ্দিন এসে সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বলল, 'ধন্দ্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? তুমি বড়, তোমাকেই সকলকে দেখতে হবে। জানাজার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওজু করে আসো!' আয়ানের খেয়াল হল, সকলেই তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি এক বধনা জল নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ওজু সমাধা করল। তারপর গিয়ে জানাজার লাইনে দাঁড়াল। ইমাজুদ্দিন নামাজ শুরু করে দিল। নামাজ শেষ হলে চারজনে মিলে মৃতদেহ নিয়ে অন্তিম যাত্রা শুরু করল। কবরে মৃতদেহ নামিয়ে দিয়ে একবার মুখটা খুলে দেখল। আয়ানের মনে হল, কাল থেকে এ মুখটা আর কোথাও দেখা যাবে না। তার ভেতরটা ব্যথায় গুমরে উঠল।

কফিনটা ঠিক করে দিয়ে কবর থেকে লোকটি উঠে এল। খাপাচি দিয়ে তার ওপরে মাটি চাপিয়ে দিয়ে সকলে মিলে মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করল। তারপর সবাই যে-যার দিকে চলে গেল। আয়ান ভাইদের নিয়ে বাড়ি আসতে লাগল। এলোমেলো অনেক কথা তার মনে পড়তে লাগল। ছোটবেলায় বাবা তাদের কয়েকজনকে বসিয়ে কথায় গানে মিলিয়ে 'কাঞ্চনমালার কাহানি' শোনাত। আয়ানের এখনো মনে পড়ে। বাবা বলত, সুনার ঘর, রুপ্যার ব্যাড়্হা। তার মধ্যে চিড়ে পক্ষীর বাসা। আয়ানের মনে পড়ে একবার গরু চরাতে গিয়ে

'বড়বুনে' তাদের কালো গরুটা হারিয়ে আয়ান খুব কাঁদছিল। ইব্রাহিম গিয়ে তাকে গরুটা খুঁজে দিয়েছিল। আরেকবার ইব্রাহিম বড়বিলে জমি চাষ করছিল। আয়ান তার খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। ফলে হাতের বধনার খাবার জলটা গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। বাবাকে খাবার দিয়ে আয়ান আবার জল আনতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম বলল, দরকার নেই। দেরি হয়ে যাবে। খাবার পর সে বিলে নেমে বিলের জলই আঁজলা ভরে খেয়েছিল। আয়ান জানে না, কেন ঐ সব ছোটখাট ঘটনাগুলোই আজ তার বেশি করে মনে পড়ছে।

বাবা মারা যাওয়াতে মা একদম ভেঙে পড়েছে। তার ওপর মৃত্যু উপলক্ষে যেখানে যত আত্মীয় ছিল, সকলেই হাজির হয়েছে। শোক প্রকাশ তাদের শেষ হচ্ছে না। তাই তারা বাড়িতেও যেতে পারছে না। আত্মীয়দের মধ্যে এখন আয়ানদের অবস্থা ভালো। তাই সকলেই তাদের মন জুগিয়ে চলতে চায়, বিশেষ করে যখন আয়ান আছে। রহিম ভাবছে সলিম এখনো যায়নি। আয়ান হয়ত তাকেই বেশি আপন ভাববে। কিন্তু তা তো নয়। সলিমের থেকে রহিমই আয়ানের কাছের লোক। কাজেই তার যাওয়া ঠিক হবে না। ওদিকে সলিম ভাবছে রহিম এখনো যায়নি, সে কি করে যায়! এই করে প্রায় কারোরই বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাদের সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে সালমা হিমসিম খাচ্ছে। তার ওপর টাকা-পয়সার অভাব। আয়ানের কাছে শ পাঁচেক টাকা ছিল। আয়ান সেটা মায়ের হাতে দিয়ে বহরমপুর রওনা হল। সালমা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, 'বাপ মোলো, ব্যাটার দ্যাখা পালো না। আমি মোরবো, তাও ব্যাটার দ্যাখা পাবো না।' আয়ান বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন সে চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে রিনাও বেরিয়ে এল। সালমা আরো জোরে কাঁদতে লাগল। আয়ান রিনাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

এগারো

বাবার মৃত্যু আয়ানের মনটাকে সাময়িকভাবে হলেও অন্যদিক থেকে সরিয়ে বাবা-মায়ের দিকে নিয়ে গেল। বাড়ির খুঁটিনাটি ঘটনার কথা মনে পড়তে লাগল। ভুবনডাঙা প্রাইমারি স্কুলের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তে লাগল কোনোদিনই বাবা-মায়ের স্বপ্নের সঙ্গে তার স্বপ্ন মিলত না। বাবা-মা কিছুতেই চায়নি সে কলেজে ভর্তি হোক। তবুও সে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি হয়ে অনেক কষ্ট করে তাকে কলেজে আসতে হত। তবুও সব সহ্য করতে পারত। সেদিন সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে তার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সে কোনোদিন ভাবেনি তার জীবনটা এরকম হবে। আজ তার বারবার মনে হয়, তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। বাবা-মাকে সুখি করতে পারল না। নিজেও সুখি হতে পারল না। সে এমন একটা সংসার চেয়েছিল যেখানে তার স্ত্রী হবে তার বান্ধবী। তাদের মধ্যে কোনোরকম অবিশ্বাস থাকবে না। দেহ দু'টি থাকবে বটে, কিন্তু মন হবে একটি। একে অপরের মনের কথা জানবে। অপরের ভালোর কথা ভাববে। কাকলির মধ্যে আয়ান সেটাই দেখেছিল। তাই কাকলিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু সে

কাকলিকে পেল না। শিরিনকে দেখে মনে হয়েছিল, সে ঠিক যেরকমটা চায়, শিরিন তাই। শিরিনকে বিয়ে করা নিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের সম্পর্কে তিক্ততা আসেনি। তারা দুজনে দুজনকে পরম বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরেছিল। আয়ান চিরদিনই একজন সচ্চরিত্র, পবিত্র, বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী চেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, শিরিনের মধ্যে সে তাই পেয়েছে। তাই বাবা-মায়ের মতো সেও শিরিনকে আদর করে ডাকত রিনা বলে। এমন সময়ে আবির্ভূত হল বীরু। বীরু তার সব হিসেব গোলমাল করে দিল। প্রকাশ হয়ে পড়ল রিনার প্রথম জীবনে কিছু বিচ্যুতি ছিল। রিনা সেটা সম্পূর্ণ গোপন করে আয়ানের সঙ্গে মিশেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে। আয়ান এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আয়ানের শুধুই মনে হচ্ছে, রিনা তাকে ঠকিয়েছে। যে ঠিক, জীবনে তার স্থান হওয়া উচিত নয়। সে রিনাকে সহ্য করতে পারছে না। তার আরো মুশকিল, সে খুব আত্মসচেতন। তার এ দুঃখের কথা সে কাউকেই বলতে পারছে না— ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও না। রিনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও সে ভাবতে পারছে না। তাহলে সবাই ব্যাপারটা জেনে যাবে। তাছাড়া সে রিনাকে ভালোবাসে। রিনা ভেসে যাবে সেটা সে ভাবতে পারে না। সে রিনাকে ত্যাগ করতে পারে না। আবার মন থেকে গ্রহণ করতেও পারে না।

রিনা বাড়িতে আছে। দিন চলে যাচ্ছে। সংসার চলছে। এরকমভাবেই চলছে। রিনা আর আয়ানের জীবন পাশাপাশি চললেও সমান্তরালে চলছে। কোথাও মিলে যাচ্ছে না। তবে বাবা ইব্রাহিমের মৃত্যু তাদের মধ্যেকার দূরত্ব খানিকটা কমিয়ে দিল। আয়ান এখন কলেজে যায়, বাজার করে, আবার কখনো রিনাকে নিয়ে বেড়াতেও যায়। মাসে দু-একবার বাড়িতে গিয়ে মাকেও দেখে এসেছে। রিনা যতটা পারছে আয়ানের সঙ্গে মানিয়ে চলছে। তবে আয়ানের সংসারকেই সে জীবনের সবকিছু ভাবতে পারছে না। সে বোঝে সংসারে সে অসম্মান মাথায় নিয়ে পড়ে আছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সে একটা চাকরির খোঁজ করছে। তবুও সে আয়ানকে ভালেবাসে। আয়ান যাতে খুশি হবে, সে তাই করতে চায়। তার ধারণা আয়ান তাকে ভুল বুঝেছে। একদিন না একদিন আয়ান তার ভুল বুঝতে পারবেই। সে আয়ানকে আজকাল সবসময় খুশি রাখবার চেষ্টা করে। রবিবার সকালে খাওয়ার পর আয়ান কাগজ পড়ছিল। রিনা বলল, 'কল্পনায় অপর্ণা সেনের 'পরমা' চলছে। মহেশ মামা বলছিল, স্বামী-স্ত্রীতে দেখার মতো বই। চলো না দেখে আসি।' আয়ানেরও মনে হয় অনেকদিন সিনেমা দেখা হয়নি। গেলে মন্দ হয় না। জামা-কাপড় পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে তারা কল্পনা হলে আসে।

কল্পনা হলের সামনে প্রচুর লোক। লম্বা লাইন। এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছেলে টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি করছে। আয়ান ব্ল্যাকে না কিনে লাইনেই দাঁড়াল। কিন্তু লাইন শেষ না হতেই টিকিট শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। আয়ান কোনোরকমে বাইরে এসে রিনার পাশে দাঁড়াল। তখনো বাইরে টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু ব্ল্যাকে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আয়ানের বিবেকে বাধল। সে ভাবল, পরমা বরং অন্যদিন দেখা যাবে। রিনাকে বলল, 'চল সূর্যতে যা চলছে তাই দেখে নিই। পরে একদিন অ্যাডভ্যান্স টিকিট কেটে পরমা দেখে নেব।' রিনা পরমা দেখবে বলে এসেছিল। আয়ানের প্রস্তাবে সে তেমন খুশি হতে

পারল না। তবুও তার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এমন সময় আয়ানের এক ছাত্র এসে হাজির হল। সে বলল, 'স্যার আপনি?' আয়ান বলল, 'আর বলো না। পরমা দেখব বলে এসেছিলাম। তোমার বৌদিও এসেছিল।' ছেলেটি হাত তুলে রিনাকে নমস্কার করল। রিনা নমস্কার গ্রহণ করল। আয়ান বলল, 'তা এমন ভিড়, টিকিটই পাওয়া গেল না।' ছেলেটি বলল, 'আসুন স্যার। আমি দেখছি।' সে ভিড়ে হারিয়ে গেল। খানিক পরে সে ব্যালকনির দুটো টিকিট এনে আয়ানের হাতে দিল। আয়ান জানতে চাইল, 'তুমি যোগাড় করলে কি করে?' ছেলেটি বলল, 'হলের ম্যানেজার আমার জানাশোনা। তাকে বলতে দিয়ে দিল।' আয়ান তাকে টিকিটের দামটা দিয়ে হলে ঢুকল। একটু পরেই সিনেমা শুরু হল।

পরমা এক বনেদি পরিবারের টিপিক্যাল গৃহবধূ সারাদিন সংসারের সুখ-সুবিধা, খুঁটি-নাটি নিয়েই সে আছে। সংসারের বাইরে যে তার একটা অস্তিত্ব আছে, তার সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা মন্দলাগা আছে সেকথা কেউ ভাবত না। সে নিজেও ভাবত কি না সন্দেহ আছে। তার স্বামী নিজের কাজ নিয়ে যেখানে দরকার যায়। স্টেনোর সঙ্গে সময় কাটায়। সেই গৃহবধূকে স্টাডি করতে বাইরে থেকে এল পরিবারে পরিচিত এক যুবক। সে তার পছন্দ-অপছন্দের দিকে নজর দিয়ে, ভালো ভালো কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে তাকে ঘরের বাইরে বের করল। পরমা দেখল সংসারের বাইরেও একটা জীবন হতে পারে। তাদের মধ্যে মানসিক সম্পর্কের থেকে শারীরিক সম্পর্কই বেশি হল। যুবক তার কাজ শেষ করে পরমার ছবি তুলে চলে গেল। তখন আর পরমার সংসারে ফেরার পথ থাকল না। সে আত্মহত্যা করতে গিয়েও ব্যর্থ হল। এই হল পরমা।

ছবি শেষ হলে আয়ান রিনাকে নিয়ে রিক্সায় উঠল। রিক্সা থেকে নেমেই সে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। রিনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভালো লাগেনি? না?' আয়ান বিরক্তি সহকারে বলল, 'না।' রিনা জানতে চাইল, 'কেন বল তো?' আয়ান বলল, 'কাহিনীর কোনো মাথামুণ্ডু আছে? স্বামী আছে, সংসার আছে, যেই একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হল আর ছেলেটা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলল, অমনি ন্যাংটো হয়ে এক বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে?' রিনা বলল, 'তুমি ওরকমভাবে দেখলে তো খারাপ লাগবেই। তুমি একবার মেয়েটির দিক দিয়ে ভেবে দেখ।' আয়ান বলল, 'তুমিই বল, মেয়েটির দিক দিয়ে কিরকম ভেবেছ।' রিনা বলল, 'মেয়েটি সংসার নিয়ে ছিল। তার যে কিছু অভাববোধ থাকতে পারে সেকথা কেউ ভাবতই না। তার স্বামী দিব্যি-সুন্দর স্টেনোদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু স্ত্রী কি চায় সেটা সে খেয়াল করছে না। ছেলেটি এসে তার অভাববোধের দিকে তাকাতেই সে খুশি হয়ে উঠল। ছেলেটির সঙ্গে মিশতে তার সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু তাতে ভালোলাগাও ছিল। পিছুটানের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাপোর্টও ছিল। কিন্তু যেই ছেলেটা চলে গেল, সে ভেঙে পড়ল। প্রথম থেকে তার স্বামী যদি তার দিকে একটু নজর দিত, তাহলে সে এভাবে ভেসে যেত না।' আয়ানের কথাটা ভালো লাগল না। সে বলল, 'তার যে কোনো অভাববোধ ছিল তাকে দেখে তো মনে হয়নি। আর থাকলেও সেকথা সে তার স্বামীকে বলতে পারত।' রিনা বলল, 'ওখানেই তো ভুল করছ। স্বামীকে বলে কোনো লাভ হবে মনে করলে সে বলত। কিন্তু সে সেটাই ভাবতে পারত না। না হলে তো যখন ভেসে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রথম পদস্খলন হয়েছে তখনো ফিরে আসতে পারত। কিন্তু বাড়ির

সঙ্গে তার সেরকম সম্পর্ক ছিল না। থাকলে সে ওপথে যেতে পারত না। সে যেতেই চাইত না।' আয়ানের মনে হল রিনা সিনেমার কাহিনীকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনের বিচ্যুতির সমর্থন খুঁজছে। সে বলল, 'তোমার চিন্তাধারা পরমার মতোই। সেজন্যই তুমি তার কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছ না। তুমি বলতে চাচ্ছ যে, বাবা-মার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভালো থাকলে তোমার জীবনেও ওরকম ঘটনা ঘটত না।' রিনা বলল, 'ঘটতই না তো? অন্তত গ্রাম থেকে ফিরে এসে সব কথা বাবা-মাকে বলতে পারলে ওটার ওখানেই পরিসমাপ্তি হত।' আয়ান বলল, 'অর্থাৎ পরমার কোনো দোষ নেই? তোমার নিজেরও কোনো দোষ নেই?' রিনা বলল, 'আমি তো বলিনি যে, পরমার দোষ নেই। আমি বলছি না যে, আমার দোষ ছিল না। আমার অবশ্যই দোষ ছিল।' আলোচনা এসে সিনেমা ছেড়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেল। আয়ান বলল, 'তোমার দোষ ছিল, তবে তার থেকেও বেশি দোষ ছিল তোমার কাকার।' আয়ান টিপ্পনি কেটে বলল, 'অবশ্য তুমি তার দোষ দেখতে পাও না।' রিনা খুবই আঘাত পেল। সে মুখ ঘুরিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'কাকা গো, কাকা, তুমি দেখে যাও, তুমি কি করেছ।' যে কাকা তার সর্বনাশ করেছে সে কাকাকে অত আন্তরিক সম্বোধনে আয়ান ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রিনা শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। পরমা আবার তাদের সাংসারিক জীবন বিপর্যস্ত করে তুলল।

বকুলপুরে বীরুকে মারধোরের পরের দিনই রিনা আয়ানের সঙ্গে চলে এসেছিল। বলতে গেলে বাবা-মার ওপর রাগ করেই চলে এসেছিল। এখানে এসেই তার শ্বশুর মারা গেল। ফলে আয়ানকে একা রেখে সে যেতে পারেনি। কিন্তু বাবা-মা কেমন আছে সেকথা তার জানতে ইচ্ছে করছে। গতকাল পলির চিঠি এসেছে। মা একবার যেতে বলেছেন। রিনা বকুলপুর চলে গেল। আয়ান বাড়িতে আবার একা হয়ে পড়ল। রিনার বিগত জীবনের কথা আবার তার মনকে ঘিরে ধরল। আর আশ্চর্য, রিনা এটাকে বড় রকমের কিছু অন্যায়ও মনে করে না। হঠাৎ করে কিছু হয়ে যায়, সে এক কথা। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সে এটা কি করে চলল আয়ান কিছুতেই এটা বুঝে উঠতে পারে না। সে বার বার ঘটনাগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখে। একই কথা সে রিনাকে জিজ্ঞেসও করেছে অনেকবার করে। কিন্তু উত্তর শুনে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বার বার তার একটি কথাই মনে হয়েছে। বীরুকে সে বাস্তবিকই ভালোবাসত। বীরুকে সে বিয়েও করতে চাইত। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চাইলেও সে বীরুকেই বিয়ে করত। এটা তার ভালো লাগে না। আয়ান চায় অন্যরকম মনে হোক। কিন্তু কিছুতেই অন্যরকম কিছু মনে হয় না। বীরুকে লেখা রিনার চিঠিগুলো সে আর একবার পড়ে দেখবে। সে ড্রয়ার খুলে প্যাকেটটা বের করে। কিন্তু তাতে কোনো চিঠি নেই। পরিবর্তে রিনার হাতের এক লাইন লেখা— 'চিঠিগুলো তো আমারই লেখা, তাই আমিই নিয়ে নিলাম।' হঠাৎ আয়ানের মাথাটা ঘুরে গেল। তাহলে এই ক'দিন ভালো হয়ে থাকার অভিনয় করে রিনা এইসব করেছিল। তার আনমনা থাকার সুযোগে সে চিঠিগুলি সরাচ্ছিল। চিঠিগুলি রিনা চাইলে তো সে দিয়েই দিত। কিন্তু তা না করে, তাকে না জানিয়ে এরকম চুরি করে নিয়ে নিল? রিনা এরকমও করতে পারে! তাহলে প্রয়োজন হলে রিনা অনেক কিছুই করতে পারবে। আয়ান আর ভাবতে পারল না। তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ভেতরটা কেমন করে উঠল। মাথাটা ঘুরতে লাগল। চোখ

ঝাপসা হয়ে এল। সে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে হাসপাতালে। লোহার খাটে। সাদা বিছানা। তার পরনে সাদা কাপড়ের জামা-পাজামা। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। নার্স এসে বলল, 'এখন আপনার ভালো লাগছে?' আয়ান জানতে চাইল, 'সিস্টার, আমি এখানে এলাম কি করে?' নার্স বলল, 'আপনার শরীর খারাপ করেছিল। আপনার বন্ধুরা এসে ভর্তি করে দিয়েছে।' আয়ান জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি সদর হাসপাতাল?' নার্স বলল, 'হ্যাঁ।' আয়ান জানতে চাইল, 'আমাকে কে এখানে এনে ভর্তি করেছেন, একবার জানাবেন?' নার্স খাতা দেখে এসে বলল, 'শুভপ্রিয় সান্যাল।' আয়ান বুঝল, শুভদা তাকে ভর্তি করে দিয়েছেন। কিন্তু সে তো বাড়িতে ছিল। সেখানে শুভদা গেলেন কি করে? সন্ধ্যাবেলায় শুভদা এলেন। তিনি জানালেন যে, 'তাসখেলার পার্টনারের অভাব হওয়ায় তিনি আয়ানকে ডাকতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, আয়ান মেঝের ওপর পড়ে আছে। প্রথমে তিনি ঘাবড়ে যান। কিন্তু নাকে হাত দিয়ে দেখেন নিঃশ্বাস বইছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আয়ানের জ্ঞান ফেরে। কিন্তু সে খুব রেস্টলেস ছিল। তাই ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।' শুভদা আরও বললেন যে, বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে। আয়ান বলল, 'এইটে ঠিক করেননি।' এক্ষুণি সকলে মিলে এসে প্রাণটা অতিষ্ঠ করে তুলবে।' 'শুভদা বললেন, 'সে আমি দেখব। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন ঘুমাও।' শুভদা চলে গেলেন।

রাতের খাবার পর নার্স ইনজেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে হাজির। আয়ানের ইনজেকশানকে খুব ভয়। সে বলল, 'আমি ইনজেকশান নেব না।' নার্স বলল, 'ডাক্তারবাবু দিয়েছেন। আমার কিছু করার নেই। আর এটা নিলে আপনার ভালো ঘুম হবে।' কথা বলতে বলতেই সে আয়ানের বাঁ হাতের কাপড়টা সরিয়ে কুটুস করে সূঁচটা ফুটিয়ে দিল। ওষুধটুকু ঠেলে ঢোকানোর সময় আয়ানের খুবই কষ্ট হল। আয়ানের চোখে জল চলে এল। নার্স বোধ হয় একটু বিব্রত বোধ করল। একজন বয়স্ক লোক, ইনজেকশান নিতে কাঁদছে, এটা সে ভাবতেই পারে না। সে তো জানে না, আয়ানের বুকের ভেতর কত ব্যথা, কত না বলা কথা জমা হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি আয়ানের কপালে মুখে হাত বোলাতে থাকে। আয়ান বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলায় নার্সকে দেখে তার খুবই লজ্জা করতে লাগল। একটু পরেই ছোট ভাই আর মা এল। মা তো হাসপাতালের মধ্যেই কেঁদে-কেটে একাকার। এই জন্যেই আয়ান মাকে খবর দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু তাকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই শুভদা খবর দিয়ে দিয়েছেন।

মা প্রথমে ভেবেছিল, বাবা মরার শোকেই ছেলের অমন হয়েছে। কিন্তু বহরমপুরের বাড়ির আশেপাশের লোকেরা নানারকম কথা বলেছে। তার মধ্যে ভূতের ভয় অন্যতম। জজকোর্টে বিচারের জন্য কত লোক আসে। কিন্তু তারা বিচার পায় না। পয়সাওয়ালা লোকেরা হাকিম উকিলকে পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। ফলে সাধারণ মানুষ বিচার পায় না। বিচার না পেয়ে পেয়ে তারা মরে। কিন্তু তাদের অতৃপ্ত আত্মা কোর্টের আশেপাশেই ঘুর-ঘুর করে। হাকিম উকিলদের ঘাড় মটকাবার জন্যে। কিন্তু ওদেরকে তো একা পায় না। তাই রেগে গিয়ে যাকে একা পায়

তারই ঘাড় মটকায়। কোর্টের মাঠের প্রতিটি গাছেই অনেকগুলো করে আত্মা আছে। এখানে একা বাড়িতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। একা একা থাকার ফলেই ভূতে সুযোগ পেয়েছে। সালমার কথাটা খুব মনে ধরেছে। তাছাড়া কিছুদিন হল ওর বাবা মরেছে। বড় ভালোবাসত আয়ানকে। যাবার সময় অনেক করে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। হয়ত কোনো কথা বলার ছিল। বলতে পারেনি। সেইজন্য সেই ছেলের কাছে আসছে। না হলে, রোগ নেই ব্যধি নেই, জোয়ান মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়! সালমা বৌমাকে আনতে ছোট ছেলেকে পাঠালো। আয়ান অনেক আপত্তি করল। কিন্তু সালমা ছেলের কথা শুনল না। তাছাড়া শুভদাও সালমাকে সমর্থন করলেন। তিনিও জানতেন না যে, রিনা এলে আয়ানের অসুখ বাড়বে বই কমবে না। সন্ধ্যা নাগাদ ছোট ভাইয়ের সাথে রিনা এল। আয়ানের অবস্থা দেখে সে আর চোখে জল ধরে রাখতে পারল না। আয়ানের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল। ছোটখাট কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করল। বাকিটা শুভদার কাছ থেকে জেনে নিল। আয়ানকে বেশি বিরক্ত করল না। তারপর শাশুড়ি এবং দেওরকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। রান্না করে শাশুড়ি-দেওরকে খাওয়াল। কিন্তু নিজে খেতে পারল না। আয়ানকে সে কত ভালোবাসে। অথচ তার জন্যই আয়ানের কত কষ্ট।

বারো

ঘুমের ওষুধের ঘোরে হাসপাতালে আয়ান এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ও ঘরে তার দেওর ঘুমুচ্ছে। এ ঘরে শাশুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রিনা কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। তার খুবই আশা ছিল, অনি (আয়ানকে সে আদর করে অনিই ডাকে) একদিন তাকে বুঝবে। কিন্তু এ জীবনে বুঝি তা আর হল না। বাব-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন কেউই তাকে বুঝল না। অনিই বা কেন বুঝবে? মার মুখে শুনেছে সে, যখন জন্মেছিল তখন তার বাবা বেকার। বাবা-মা কেউই তখন সন্তান কামনা করেনি। তবুও সে ভুল করে চলে এসেছিল। জন্মলগ্নেই বাব-মাকে সে বিদ্রূপ করেছিল। বড় হয়ে এটা জানার পর তার খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু সে জন্মানোর অল্প দিনের মধ্যেই তার বাবা একটা স্কুলে চাকরি পায়। তখন বাড়িতে তার কিছুটা আদর বাড়ে। কিছুদিন পরে তার একটি ভাই হয়। তাকে ইতিমধ্যেই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্কুলের পড়া সে বুঝতে পারে না। দিদিমণিরা বাড়ি থেকে পড়া করে আনতে বলে। সে এসে মাকে বলে। মা বাবাকে দেখিয়ে দেয়। বাবার কথাও রিনা বুঝতে পারে না। দু-একবার বললে বাবা বিরক্ত হয়ে যায়। পিঠে গুম গুম করে কিল পড়ে। তাই বাবার কাছে পড়তে বসতে সে চায় না। নিজে যতটা পারে পড়ে। পরীক্ষায় কোনো রকমে পাস করে যায়। ভালো ফল করতে পারে না। বাবা-মা ভাবে, ও মেয়েকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। ভালো ঘরে ওর বিয়েও দেওয়া যাবে না। বিয়ে দিতে অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। তাদের মনের কথা ব্যবহারে প্রকাশ পায়। কখনো কখনো মুখেও চলে আসে। রিনা সব কিছুর জন্য নিজেকেই দায়ী ভাবে। স্কুলে বন্ধু-বান্ধবীরা তার সঙ্গে বেশি মেশে না। সে একা একা ঘুরে বেড়ায়। সে মনে করে এটাও তার অযোগ্যতার জন্য। যে নিজেও ভাবতে শুরু করে সে কোনো কাজের নয়।

এমন সময় তার মেসোমশাই মারা যায়। মাসি অন্য জায়গায় বিয়ে করে। মাসির একমাত্র মেয়ে পলিকে মা নিয়ে আসে। পলি এসে সবার মন জয় করে নেয়। সে দেখতে যেমন ফুটফুটে ফরসা, তেমনি চটপটে। পলি বাপ-মরা মেয়ে, দেখতে গেলে মা-হারাও বটে। সে জন্যও বাবা-মা ওর প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন। কিন্তু রিনার মনে হত পলি দেখতে সুন্দর বলেই এত আদর। আর সে দেখতে ভালো নয় বলেই কেউ তাকে ভালোবাসে না। মামারা এলে পলিকেই আদর করত। পলির গুণ নিয়ে অনেক আলোচনা হত। কিন্তু তার কথা কারো মনেই হত না। তার কেবলই মনে হত সে কোনো কিছুর উপযুক্তই নয়। একটা সর্বগ্রাসী হীনমন্যতা তাকে পেয়ে বসেছিল। এমনি করে বাবা-মা আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহেলা, আর সে অবহেলাকে সয়ে হীনমন্যতা নিয়ে রিনা বড় হতে লাগল। প্রাইমারি স্কুল থেকে হাইস্কুলে এল। হাই স্কুলেও ফাইভ-সিক্স করতে করতে নাইনে উঠল। এই সময় স্কুলে একজন খেলাধূলার মাস্টার এল। সে মাস্টার তাকে খুব ভালোবাসে। সে সকলকেই ভালোবাসে আর খেলা শিখিয়ে দেয়। রিনার খেলার মাস্টারকে খুব ভালো লাগে। তার সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করে যে ভাব করা যায় সে বুঝতে পারে না। তবে এখন স্কুলে যেতে তার ভালো লাগে। বাড়িতে সে পাত্তা পায় না। পলিও ততদিনে ফাইভে উঠেছে। সে তুলনায় অনেক সহজে পড়া বুঝতে পারে। রিনার পলির ওপর রাগ হয়। পলির জন্য রোজ তাকে বাবার কাছে বকুনি খেতে হয়। শুনতে হয়, পলি যা বুঝতে পারে, তা রিনা কেন পারবে না। কিন্তু রিনা কেন বুঝতে পারে না, তাকে যে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার আছে সেকথা কেউ মনে করত না। তাই রিনাও কারো কাছে যেত না। যা পারত একা একা পড়ত। এই করেই সে নাইন থেকে টেনে উঠল। মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়ে দিল। এখন তার হাতে অফুরন্ত অবসর।

এই সময়ে বীরুকাকা তাদের বাড়িতে এল। বীরু বাবার সব থেকে ছোট ভাই—রিনার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে সে তখন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বি. ই. পড়ছে। বীরু রিনার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিল। রিনার একটা ধারণা ছিল, তাকে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। কেউ তাকে বুঝছে না। বীরু সেটা পুরোপুরি কাজে লাগাল। সে প্রতিটি ব্যাপারে পলির থেকে রিনাকে প্রাধান্য দিল। সে এমন অভিনয় করল যে, রিনার প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি কথা সে বোঝে। রিনার ধারণা হল পৃথিবীতে একমাত্র বীরুকাকাই তাকে বোঝে। বীরুকাকা বলতে সে পাগল। বীরুকাকা তাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যায়। সে যা চায়, তাই এনে দেয়। ভূটান থেকে সে রিনাকে ল্যাম্পস্ট্যান্ড এনে দিয়েছে। সুন্দর কাজকরা সালোয়ার-কামিজ এনে দিয়েছে। সুন্দর বিছানার চাদর এনে দিয়েছে। অবশ্য বাবা তার দাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এনে দিয়েছে তো বীরুকাকাই। সে বীরুকাকার ভক্ত হয়ে গেছে। রিনার বাবা করিম সাহেব এতদিনে বকুলপুর কলেজে কাজ পেয়ে গেছেন। কলেজ নিয়েই তিনি মেতে আছেন। মেয়ের দিকে নজর দেওয়ার তাঁর সময় নেই। মা বাড়িতে আছে বটে। তবে তিনিও বীরুর বশ। সুন্দর সুন্দর কথাতে কে না বশ হয়?

সুযোগ বুঝে বীরু রিনাকে দেশের বাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। রিনা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। সে মাকে বলে, 'বীরুকাকার সঙ্গে দেশের বাড়ি যাব।' দেশের বাড়িতে তখন করিম

সাহেবের মা-বাবা ছাড়া আর কেউ থাকে না। ভাইয়েরা কেউ চাকরি করে, কেউ বাইরে থেকে পড়ে। কখনো দু-একদিনের জন্য আসে। আবার ফিরে যায়। বীরু রিনাকে গরমের ছুটিতে সেখানে নিয়ে যেতে চায়। রিনা একপায়ে খাড়া। কিন্তু বাবা মত দেন না। আবার ভাইকেও কিছু বলেন না। রিনাকে যেতে মানা করেন। বলেন, 'যাওয়ার কথা বললে বলবি, আমি যাব না।' রিনা বুঝতে পারে না, সে তা বলবে কেন? সে তো খুবই যেতে চায়। বীরুকাকা সঙ্গে থাকবে। আর কি চাই? বীরুকাকা বলে, 'তাহলে তুই তৈরি হয়ে থাকিস। আমি দুদিন পরে এসে নিয়ে যাব।' রিনা আবার বাবার কাছে যায়। বাবা কোনো কথা বলে না। রিনা এসে বীরুকাকাকে বলে, 'তুমি এসো, আমি যাব।' ঠিক দুদিন পরে বীরু আসে। কিন্তু বাবা বেঁকে বসেন। তিনি রিনাকে যেতে মানা করেন। তবে সেই পুরানো পন্থা। ভাইকে কিছু বলবেন না। বলেন, রিনাকেই বলতে হবে। রিনা বলল, 'যেতে দেবে না তো আগে বললে না কেন? আমি যাব।' সে কাপড়-চোপড় পরে বীরুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। করিম সাহেব রাগ করলেন কিন্তু বাধা দিলেন না। মাও কিছু বললেন না। পচাগড় স্টেশনে নেমে বীরুকাকা একটা রিক্সা করল। সেই রিক্সা করে তারা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছল। রিনাকে দেখে তার দাদি যে খুব খুশি হলেন, তা নয়। তবে ব্যবহার খারাপ করলেন না।

দেশের বাড়িতে এসে রিনার খুবই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। বাবা নেই, মা নেই, পলি নেই, তার ভালো লাগল না। পরের দিনই সে বাড়ি যাবে বলল। কিন্তু কাকা তাতে কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। সে তখন বাবাকে একটা চিঠি লিখে তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। চিঠি ডাকে ফেলতে দিল বীরুকাকাকে। বীরুকাকা সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল। বাবা রিনাকে নিতে এল না। তখন সে আরো একটি চিঠি লিখল মাকে। বলা বাহুল্য, সে চিঠিরও একই দশা ঘটল। রিনার তখন মা-বাবার ওপর ভারি অভিমান হল। সে আর চিঠি লিখবে না। আর কেউ না থাক, বীরুকাকা তো আছে। বীরুকাকা তাকে দিনের সমস্ত সময়টা দিতে লাগল। সঙ্গে করে নিয়ে খাওয়া থেকে চুল আচড়ে দেওয়া সবই করতে লাগল। আস্তে আস্তে দেশের বাড়িতে রিনার মন বসে গেল।

সারাদিন সে বীরুকাকার সঙ্গে গল্প করে। রাতে খাওয়ার পর যতক্ষণ ঘুম না আসে, গল্প করে। ঘুম এলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। বীরুকাকা ঐ ঘরেই ওপাশে আরেকটা খাটে গিয়ে শোয়। ভেতরের দিকের ঘরটায় দাদো আর দাদি শোয়। বীরুকাকা আর সে রাস্তার ধারের ঘরটায় থাকে। বিকেলে কখনো ছাদে ওঠে। কোনোদিন বা পুকুরপাড়ে বা মাঠের দিকে বেড়াতে যায়। পাশাপাশি বেড়াতে কখনো কখনো কাকা তার হাতের মধ্যে রিনার হাতটা নিয়ে নেয়। রিনার বেশ ভালো লাগে। বসে বসে গল্প করার সময়ও কাকা তার হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। রিনার খুবই ভালো লাগে। কখনো পাশাপাশি বসে বা দাঁড়িয়ে থাকার সময় বীরুকাকা তার হাতটা রিনার ঘাড়ের ওপর দেয়। রিনার খারাপ লাগে না। কিন্তু দাদো ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন না। সেদিন দাদোর সামনেই বীরুকাকা রিনার কাঁধের ওপর হাত দিয়েছিল। দাদো রাগ করে বলেছিলেন, কাঁধ থেকে হাত নামা।' বীরুকাকা সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাতেও দাদোর রাগ পড়েনি। রিনার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি ওর সঙ্গে বাইরে যাবা না!' রিনা ভয় পেয়ে ওখান থেকে এসে ঘরে ঢুকেছিল। বীরু আসতেই সে জিজ্ঞেস করেছিল,

'দাদো রাগ করছে কেন?' বীরু বলেছিল, 'ওসব বুড়ো-হাবড়াদের কথা বাদ দে। চল আমরা দানি পুকুরের পাড় থেকে বেড়িয়ে আসি।' বীরুর হাত ধরে রিনা বেরিয়ে গেল। দানি পুকুরের পাড়ে গিয়ে তারা পাশাপাশি বসল। বীরু হাত দিয়ে রিনাকে আরো কাছে টেনে নিল। রিনার ভালো লাগল।

বীরুকাকার সঙ্গে সময় কাটাতে এখন রিনার বেশ ভালোই লাগে। বাড়ি যেতেও আর ইচ্ছে করে না। এই দেশের বাড়িতেই যদি তাকে কেউ সারাজীবন থাকতে বলে, তাহলে সে তক্ষুনি রাজি হয়ে যাবে। সদিন সন্ধ্যাবেলায় রিনা ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। একটু একটু আঁধার নেমেছে। বীরুকাকা এসে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। রিনার সমস্ত শরীর অবশ। সে কিছু বলতে পারল না। একটু পরে কাকা তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু আরো কিছু করলেও তার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। মনে হল সে পড়ে যাবে। সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। বীরুকাকা মনে করল রিনা রাগ করছে। তাই সে ভয় পেয়ে রিনার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল। রিনা যতক্ষণ রান্নাঘরে দাদির কাছে বসে থাকল ততক্ষণ সেও কাছাকাছি থাকল। তার শুধু ভয় করতে লাগল, পাছে রিনা বলে দেয়। কিন্তু রিনার তো আদৌ খারাপ লাগেনি। সে কিছুই বলল না। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর তারা আবার গল্প করতে লাগল। এবার রিনা ইচ্ছে করেই বীরুকাকার গা ঘেষে বসল। কেন জানে না, বীরুকাকার কাছাকাছি থাকতে তার খুবই ভালো লাগছে। অনেক রাত পর্যন্ত তারা গল্প করল। কিন্তু পরের দিন বীরুকাকার জ্বর এল। দাদি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রিনা সারা রাত বাতাস করল। রিনার সেবায় মুগ্ধ হয়ে বীরুকাকা রিনার হাত ধরে বলল, 'এইজন্যই তোকে এত ভালোবাসি।', রিনা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি।' রিনার ভালোবাসায় অথবা সেবার জন্যই হোক পরের দিন বীরু সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় রিনার মাথা ধরল।

সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। টেবিলের ওপর হ্যারিকেন জ্বলতে লাগল। বীরু এসে বিছানায় বসে রিনার মাথা টিপে দিতে লাগল। রিনা ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখল বীরুকাকা তার বুকের ওপর। বাঁ হাত দিয়ে সে রিনাকে জড়িয়ে আছে। ডান হাতটা কামিজের তলা দিয়ে বুকে মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছে। আর পাগলের মতো ঘন ঘন চুমু খাচ্ছে। রিনার হাত-পা অবশ লাগছে। ইচ্ছা করেও সে হাত-পা নাড়তে পারছে না। তার গলা দিয়েও কোনো রকম স্বর বেরুচ্ছে না। তার হাত দুটো বীরুকাকাকে জড়িয়ে আছে। তার ভয় করছে। কিন্তু অদ্ভুত ভালো লাগছে। কিন্তু বীরুকাকা তার কামিজের বোতামগুলো খুলে ফেলছে। কামিজটাকেও সে খুলে ফেলছে। তাহলে তো সে পুরো ন্যাংটা হয়ে যাবে। কি লজ্জা! সে যেন নিজেরই অজান্তে স্বতপ্রবৃত্তভাবে বলে ফেলেছে, 'ওরকম করছ কেন?' বীরুকাকা সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নেমে তার বিছানায় চলে গেল। রিনার সমস্ত শরীর তখনো অসাড়। বুকের মধ্যে তোলপাড়। অনেকক্ষণ সে চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকল। যখন শান্ত হল তখন তার খুব খারাপ লাগতে লাগল। দেখল, হ্যারিকেনটা নেভানো। দরজাটা বন্ধ করা। জানালাগুলোও লাগানো। রিনার খুবই অস্বস্তি লাগতে লাগল। সে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করল। সে এটুকু বুঝতে পারল, যা ঘটেছে, তা খুবই অন্যায়। অনেক দিন পরে তার মার কথা মনে পড়ল। মা বলত, যেমন আছ, স্বামীর কাছে যেন তেমনিভাবে যেতে পার। কোনো ছেলে

যেন না ছুঁতে পারে। সে এতদিন সেরকমই ছিল। কিন্তু এখন তো ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। তাহলে তো অন্য কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না! বীরুকাকা তো তাকে ভালোবাসে। সে বীরুকাকাকেই বিয়ে করবে। এরকম ভাবতে তার একটু ভালো লাগল। কিন্তু সে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না।

সকালবেলায় বীরুকাকার সামনে যেতে তার খুবই লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু বীরুকাকা এমন ব্যবহার করছে যে, যেন কিছুই হয়নি। বীরুকাকার ব্যবহার দেখে তার মনে হল, তাহলে কাজটা এমন কিছু অন্যায় নয়। সেও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল। দুপুরে একফাঁকে সে বীরুকাকাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন করা কি ঠিক হচ্ছে? কাকা-ভাইঝির কি বিয়ে হতে পারে?' বীরু এর জন্য প্রস্তুতই ছিল। সে বলল, 'কাকা-ভাইঝিতে বিয়ের অনেক উদাহরণ আছে। বিখ্যাত ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের এক বংশধরও নিজের ভাইঝিকে বিয়ে করেছিলেন।' রিনা বলল, 'সে তো অন্য দেশে। আমাদের দেশে কি হয়?' বীরুকাকা বলল, 'কেন, কৃষ্ণ? কৃষ্ণর তো রাধা মামি! মামির সঙ্গে ভাগ্নের যদি বিয়ে হয়, তাহলে ভাইঝির সঙ্গে কাকার বিয়েতে আপত্তি কি?' রিনা বলল, 'ও তো অন্য ধর্মের কথা। আমাদের ধর্মে কি?' বীরু বলল, 'আমাদের ধর্মেও হয়। হজরত আলি আর ফতেমা তো কাকা-ভাইঝিই।' রিনার তবুও যেন মন মানতে চায় না। কাকার সঙ্গে ভাইঝির কি বিয়ে হয়? সে ভাবার চেষ্টা করে। যখন সে সম্বন্ধ ধরে ভাবে তখন মনে বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু সম্পর্ক বাদ দিয়ে কাকাকে যখন একজন ছেলে হিসেবে ভাবে তখন আর বাধো-বাধো লাগে না। সে সেরকমভাবেই শুরু করে। সে ভাবে বীরুকেই সে বিয়ে করবে। তাহলে আর অন্যায় হবে না।

এই ভাবতে ভাবতে বীরুর ছুটি শেষ হয়ে গেল। রিনাকে নিয়ে সে বকুলপুর রওনা হল। রিক্সা করে পচাগড় এল। কিন্তু কি একটা গণ্ডগোলের ফলে ট্রেন-চলাচল বন্ধ। কি করা যায়? বীরু রিনাকে নিয়ে বাসে উঠল। বাসে তারা পাশাপাশিই বসল। রিনা কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরুর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটা রিক্সা নিয়ে তারা বাড়িতে গেল। বাড়িতে বীরুকে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু বাবা রিনাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। মাও রিনার সঙ্গে ভালো করে কথা বললেন না। বীরুকাকা চুপিচুপি বলল, 'মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' পরের দিন বীরুকাকা চলে গেল। মা এবার রিনাকে নিয়ে পড়লেন। বলেন, 'ওখানে গিয়ে কি বেলেল্লাপনা করেছিস? সারা দিন রাত কি করতিস?' রিনা ভয়ে মায়ের কাছে সব কথা গোপন করল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় হল বীরুকাকা যদি বলে দেয়! সে বীরুকাকাকে হাতে রাখার জন্য তোয়াজ করতে লাগল। তোয়াজ করে মন রাখার মতো সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে চিঠি লিখতে লাগল। তবে একথাও ঠিক, রিনা বীরুকে ভালোবাসত। তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে নিজের মুখে সে প্রস্তাব দিতে পারত না। সে চাইত বীরু নিজেই প্রস্তাব দিক। কিন্তু বীরু প্রস্তাব করত না। বরং যখনই আসত, সব সময় রিনার সঙ্গে সময় কাটাত। অনেক রাত পর্যন্ত তারা গল্প করত। সেদিন তখন রাত বারোটা কি একটা হবে। বীরুকাকার সঙ্গে গল্প করতে করতে রিনা বাইরে এসেছে। শুনতে পেল, মা রেগে বাবাকে বলছেন, 'এরা যখন এত চাইছে, হোলই বা কাকা, তুমি বিয়ে দিয়ে দাও।' শুনে বাবা অত্যন্ত রাগ করে বললেন, 'চুপ কর। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি।' মায়ের কথা শুনে রিনার যে

আশাটুকু জেগে ছিল, বাবার কথা শুনে তা মুছে গেল। যে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে গেল।

এই করতে করতে বছর দেড়েক কেটে গেল। রিনা এগার থেকে বারো ক্লাসে উঠল। কিন্তু বীরু বিয়ের প্রস্তাব দিল না। একদিন তাদের ক্লাসের একটি মেয়ের কাছে জানল যে, তার বীরুকাকা আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করেছে। গ্রামের কাছেই একটি মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য তারা বীরুকে মেরে গোয়াল ঘরে বেঁধে রেখেছিল। গ্রামের লোকেরা গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পরে তাকে ছাড়িয়ে আনে। শুনে রিনার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। বাড়িতে এসে মার সঙ্গে কথা বলে বুঝল মা-রা এসব ব্যাপার জানে। রিনার মনে হল, তাহলে বীরুর এটাই স্বভাব। সে রিনাকে ভালোবাসেনি। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ব্যবহার করেছে। নিজের প্রতি তার অত্যন্ত ঘৃণা হল। ঘৃণা হল বীরুর প্রতিও। সেবার ছুটিতে বীরু আসতেই রিনা তার ব্যাগ খোঁজ করল। ব্যাগে অন্য মেয়েদের ছবি ও চিঠি পাওয়া গেল। রিনা তাকে জিজ্ঞাসা করলে। বীরু বলল, ওরা মেশে, আমিও মিশি। আমার দোষ কোথায়? রিনা তখন বাধ্য হয়ে বলল, 'এই যে আমার সঙ্গে ওরকম করেছ, তার জন্য তোমার খারাপ লাগে না?' বীরু বলল, 'কিন্তু তার জন্য কি আমি একাই দায়ী?' রিনা আর ভাবতে পারল না। তার মানে বীরু ঘটনার জন্য তাকেও দায়ী করছে। সে তখন প্রতিবাদ করতে পারেনি। এই তার অপরাধ। কিন্তু আর কেউ না জানুক, বীরু তো জানে যে, সে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে বীরুর সঙ্গে মেশেনি। সে বীরুকে আর কোনো কথা বলল না। বীরুর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিল। ঠিক করল একদমই কথাবার্তা বলবে না। কিন্তু এলে, কথা না বলে থাকতে পারে না। কিন্তু বীরু যে একটা একনম্বরের চরিত্রহীন তা সে জানে, তাই আন্তরিকভাবে আর মেশে না। কিন্তু যতটা মিশেছিল, তার জন্যই পাপ বোধ হয়। তখন সে মনে করার চেষ্টা করে যে, সে যা করেছে ভুল করে করেছে। ইচ্ছে করে করেনি। এতে তার মনটা হাল্কা হয়।

এরপরে সে বারো ক্লাস পাস করে বি. এ. পড়ে। বি. এ. পাস করে এম. এ.-তে ভর্তি হয়। এই সময় আয়ানের সঙ্গে তার আলাপ হয়। এই আয়ানকে তার খুব ভালো লাগে, একজন আদর্শবান যুবক বলে মনে হয়। আয়ানের সঙ্গে সে আগ্রহ নিয়ে মিশতে থাকে। কিন্তু আয়ান একদিন জানায় যে, সে অন্য একজনকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু তখন রিনার ফিরে আসার আর পথ নেই। সে অপেক্ষা করতে থাকে। সেই মেয়েটির সঙ্গে আয়ানের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয় না। আয়ানের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে আয়ানের কাছে আসে না। তখন আয়ান রিনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, কিন্তু কয়েক মাস পরে বিয়ে করব বলে। রিনার সব সময়ই ভয়, কখন সেই মেয়েটি আবার চলে আসে। এদিকে আবার বাবা-মা আয়ানের কাছে যেতে দেয় না। বিয়েটা হলেই এই দু'রকম ভয়ই দূর হতে পারে। সেইজন্যই রিনা আয়ানকে নাছোড়বান্দার মতো বিয়ের জন্য চাপ দেয়। আয়ান বিয়ে করে। কিন্তু রিনাকে ভুল বোঝে। আয়ান মনে করে রিনার বাবা-মা আয়ানকে ফাঁদে ফেলে, চাপ দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। ফলে প্রথম থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়।

সমস্যা দেখা দেয় রিনার ব্যক্তিগত জীবনেও। আয়ানের সঙ্গে বিয়ের পর তার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন সে বীরুর সঙ্গে মেলামেশার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে। আয়ান

তাকে তার জীবনের কথা খুলে বলে। তার মনে হয়, আয়ানকেও তার জীবনের কথা, বিশেষ করে বীরুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সব খুলে বলা দরকার। কিন্তু মা মানা করে। মা বলে, 'পুরুষের মনে একবার সন্দেহের বিষ ঢুকলে আর ভুলতে পারে না। আর তাছাড়া তুই এমন কিছু অন্যায় তো করিসনি। ওসব আর বলে কাজ নেই।' রিনা সত্যি ভয় পেয়ে যায়। তার অনি যদি তাকে ভুল বোঝে! সব শোনার পর যদি তাকে আর আগের মতো ভালো না বাসে! রিনা বলতে পারে না।

হঠাৎ একদিন বীরু বহরমপুরে তাদের বাড়িতে চলে আসে। রিনা তাকে দেখে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারেনি। যদি বীরু সব অনিকে বলে দেয়! অনি কলেজে চলে গেছে। বীরু তার সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রিনা সব সময় ভেবেছে কি করে তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায়। বীরুকে দেখে রিনার মনে হয়েছে যে, তাদের সংসারটা যেন একটা বারুদের কারখানা। বীরুর একটা কথার আগুনেই একটা মস্ত বিস্ফোরণ হয়ে যেতে পারে। বীরু এমন ব্যবহার করছিল যেন, সে রিনার সংসারকে, তার স্বামীকে অবজ্ঞা করে করুণার চোখে দেখছে। বীরু আগে সিগারেট খেত। কিন্তু রিনা সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না। সে বীরুকে নিষেধ করেছিল. তারপর থেকে বীরু কোনদিন রিনার সামনে সিগারেট খেত না। কিন্তু আজ তার কাছে দিয়াশলাই থাকতেও সে রিনার কাছ থেকে দিয়াশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস?' যেন ভালো থাকা. খারাপ থাকা তারই ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। রিনা বীরুকে এড়ানোর জন্যই তাড়াতাড়ি রান্না করতে লাগল। অনি ফিরে এলে রিনা একটু সাহস পেল। আবার ভয়ও করতে লাগল। তাই তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে বলতে গেলে ধাক্কা দিয়ে বীরুকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। পরের দিনই অনি কলেজে গেলে সে মাকে পুরো ব্যাপার জানিয়ে চিঠি লিখল। এও লিখল যে, বীরুকে যেন এখানে আসতে মানা করা হয়।

কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হল না। অনি কি করে ব্যাপারটা জেনে গেল। সে যখন রিনাকে প্রথম জিজ্ঞেস করে, তখন যদি সব খুলে বলে তাহলেও বোধ হয় এত ভুল-বোঝাবুঝি হয় না। কিন্তু অনির প্রশ্ন শুনে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে আর লজ্জায় সমস্ত অস্বীকার করে বসল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেও থাকতে পারল না। অনি সব জেনে ফেলেছিল। সে বার বার যখন ঘটনার উল্লেখ করে জেরা করতে লাগল, তখন রিনা স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু যেহেতু রিনা প্রথমে সব কিছুই অস্বীকার করেছিল. আয়ানকে সবকিছু বলার পরও সে বিশ্বাস করল না যে, আর কিছু নেই। অনির মনে অবিশ্বাস দানা বেঁধে রইল। তারপর আয়ান বীরুকে বকুলপুরে নিয়ে এল। মা বার বার বলেছিল, যেন সে কোন কিছুর মধ্যে না থাকে। কিন্তু বীরু যখন সবকিছু অস্বীকার করল, তখন কেন জানে না, রিনার মনে হল যে, বীরু তাকে বাঁচানোর জন্যই এরকম করছে। তার হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গেল। অনি মনে করল, রিনা এখনো বীরুকে ভালোবাসে। কিন্তু রিনা বীরুকে বাঁচাতে চেয়েছিল, যাতে করে অনি কোনো খুন-খারাবিতে না জড়িয়ে যায়। কিন্তু অনি তা বিশ্বাস করে না। অনি বলে, তখন এত ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় ছিল না। রিনা যা করেছে তা তাৎক্ষনিক প্রবৃত্তির খেয়ালে করেছে। মনে বীরুর প্রতি সহানুভূতি অনুভব করেছিল। তাই প্রবৃত্তি বীরুকে বাঁচানোর

আদেশই দিয়েছে। হায়! অনি যদি একবার শুধু তার মনের ভেতরটা দেখতে পেত! তাহলে নিশ্চয় সে বুঝতে পারত। কিন্তু তা হয় না। রাত শেষ হয়ে যায়।

রিনা হাত-মুখ ধুয়ে উনুন ধরায়। অনির জন্য খাবার তৈরি করে। শাশুড়ি-দেওরকে খেতে দেয়। তারপর হাসপাতালে যায়। ডাক্তার অনিকে ছেড়ে দেয়, বলে কোনোরকম অসুখ নেই। দুশ্চিন্তা আর অনিদ্রায় এরকম রয়েছে। পেট ভরে খেয়ে দুদিন ভালো করে ঘুমোলেই সেরে যাবে। আয়ান মাকে বলে, 'শুনলে তো, ডাক্তার বলল, আমার কোনো অসুখ নেই। তুমি বাড়িতে না থাকলে ওদিকে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। তুমি বাড়ি চলে যাও।' সালমার কথাটা মনে ধরে। সে ছেলেকে একবার যেতে বলে বাড়ি রওনা হয়। ছোট ভাইও মার সাথে যায়। রিনা আয়ানকে নিয়ে বাড়িতে আসে। বাড়িতে পৌঁছেই রিনা জিজ্ঞাসা করে, 'আসলে তোমার কি হয়েছিল?' আয়ানের যতটা মনে ছিল বলে। রিনা শিউরে ওঠে। আয়ান জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ওগুলো কোথায় রেখেছ?' রিনা বলে, 'পুড়িয়ে ফেলেছি।' আয়ান জানতে চায়, 'কেন?' রিনা বলে, 'তোমার কাছে চিঠিগুলো তো মোটেই সুখকর ছিল না। বরং দুঃখের। তবুও তুমি বারে বারে বের করে দেখতে। তাই!' আয়ান তবুও প্রশ্ন করে, 'শুধুই সেজন্য?' রিনা এখন কোনো কথা গোপন করতে ভয় পায়। গোপন করে তার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। সে আর কিছুই গোপন করবে না। সে বলে, 'না, মা বলেছিল, তুমি ওগুলো দেখিয়ে কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে পার, তাই।' আয়ান এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ওঠে। রিনা বলে, 'হাসছো কেন?' আয়ান বলে, 'তোমার মা জানেন না যে, বিয়ের আগের এরকম কোনো চিঠি দেখিয়ে বিচ্ছেদের মামলা আনা যায় না। আর আমি যদি বিচ্ছেদই চাই, তবে প্রমাণের জন্য তা আটকে থাকবে? ধর কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। কোর্ট তার জন্য আমার আয় থেকে খোরপোশ দিতে পারে, আমাকে জেলে পাঠাতে পারে, কিন্তু তোমার সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করতে পারে না। কোন সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না।' রিনা জানতে চায়, 'তাহলে বিনা দোষেও কাউকে ত্যাগ করা যায়!' আয়ান বলে, 'যায়। তার পরিবর্তে তার জরিমানা বা জেল হতে পারে, কিন্তু যায়। কেন, সম্প্রতি এক সিনেমা অভিনেত্রীর কোর্টের রায় শোননি? তার বিবাহিত স্বামী তার কনযুগাল রাইট রেস্টোর করার জন্য কোর্টে আবেদন করেছিল। কিন্তু কোর্ট তা বর্বরোচিত বলে খারিজ করে দিয়েছে। এ জন্য ভদ্রলোক বিচ্ছেদ চাইতে পারে। কিন্তু তাই বলে মহিলাকে দাম্পত্য সম্পর্কে বাধ্য করতে পারে না।' রিনা চুপ করে ভাবতে থাকে। বোধ হয় ভাবে, এ কিরকম আইন! ভাবে, এও কি সম্ভব? কেউ কোন দোষ করল না, তবুও তাকে ত্যাগ করা যাবে!

তেরো

আয়ানের ঘুমের ওষুধের ঘোর এখনো কাটেনি। তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে। সে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। রিনাও গতকাল সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। তারও শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সেও আয়ানের পাশে শুয়ে পড়ল। দুজনেই শুয়ে আছে। কারো ঘুম আসছে না। একই বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু দুজন দুরকম ভাবছে। আয়ান ভাবছে, সে চিঠিগুলো দেখিয়ে

কোর্টে যাতে বিচ্ছেদের মামলা আনতে না পারে তার জন্যই মার পরামর্শে রিনা ওগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। সে যেকোনোভাবে কাছে থাকতে চায়। তার জন্য আইনের স্বীকৃতিটা সে হারাতে চায়নি। আইনের স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটাই কি সব! চিঠিগুলো পোড়ানোর আগে তাকে একবার জিজ্ঞেসও করল না। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করলে সে কি বাধা দিত? আয়ান নিজেই বুঝতে পারে না, সে কি করত! রিনা বুঝতে পারে না, অনি এখন কি ভাবছে। অনি কি তাকে ত্যাগ করার কথা ভাবছে? ভাবতেও পারে। অনি আর আগের মতো তাকে ভালোবাসে না। ত্যাগ করলে সে কোথায় যাবে? বাবা-মার কাছে? বাবা-মাও কি তাকে ভালোবাসেন? বাসবেন কি করে? বাবা-মার কথাও তো সে শোনেনি। বাবা দেশের বাড়িতে যেতে মানা করেছিলেন। মানা করেছিলেন বীরুকে চিঠি লিখতে। সে শোনেনি। মা বীরুর কথা অনিকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। সে শেষ পর্যন্ত না বলে পারেনি। মা চিঠিগুলো পোড়ানোর কথা অনিকে বলতে মানা করেছিলেন। কিন্তু রিনা তার মার পরামর্শের কথা বলে দিয়েছে। এরকম করলে কোন বাবা-মা ভালোবাসতে পারেন? তাছাড়া বাব-মা তো তার বিয়ে দিয়ে দেননি। সে ভালোবেসে, নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। সে কোন্ মুখে আবার বাবা-মার কাছে ফিরে যাবে? সে বরং মুখ বুজে অনির কাছেই পড়ে থাকবে। তারপর সে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তবে স্বামী বা বাবা-মা কারো কাছেই থাকবে না। সে স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেরকম জীবন তো সে চায়নি। সে অনিকে নিয়েই সুখের সংসার গড়তে চেয়েছে। অনিকে ছেড়ে একা একা তো সে সুখি হতে পারবে না। তার থেকে অনিটা ভালো হয়ে যাক....।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। রিনা এসে দরজা খোলে। করিম সাহেব বলেন, 'আমি আসছিলাম। তোর মা বলল পলিকেও নিয়ে যাও। তা আয়ান কেমন আছে?' রিনা বলে, 'ভালো। আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এসো, তোমরা ভেতরে এসো। পলি আয়।' পলিরা ভেতরে ঢোকে। রিনা আবাব দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পলি বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধোয়, জামা-কাপড় ছাড়ে। পলি বেরিয়ে এলে করিম সাহেব ঢোকেন। রিনা আয়ানের কাছে এসে বলে, 'বাবা এসেছেন, পলি এসেছে।' আয়ান চোখ খুলে তাকায়। পলি গিয়ে আয়ানের মাথায় হাত রাখে। আয়ান পলির মুখের দিকে তাকায়। তার খুব ভালো লাগে। পলি এখন আরো সুন্দর হয়েছে। যদি রিনার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে পলির সঙ্গেই তার বিয়ে হত! তাহলে বেশ হত। এখনো কি আর হয় না? এই যদি কোনো কারণে রিনার মৃত্যু হয়! আর পলি তাকে বিয়ে করে? ছি-ছি, সে এসব কি ভাবছে! সে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে, 'না না।' পলি জিজ্ঞেস করল, 'কি হল দাদা?' আয়ান বলল, 'না, কিছু হয়নি।' সে আবার ভাবতে লাগল। কেন এই বিশ্রী ভাবনাগুলো তার মাথায় আসছে? তাছাড়া সে পলির ইতিহাসও জানে না। পলির সুন্দর মুখের আড়ালে আবার কি লুকিয়ে আছে! আজকাল যে কোনো মেয়েকে দেখলেই আয়ানের মনে হয়, এর পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। আগে কোনো মেয়েকে দেখলেই তার পবিত্র-পবিত্র মনে হত। সৌন্দর্যের আধার মনে হত। স্নেহ-মমতার প্রতিভূ মনে হত। কিন্তু এখন তার মনটা এমন বিষাক্ত হয়ে গেছে যে, কোনো মেয়ে দেখলেই, তার পেছনে কাম-ক্রীড়ার একটি পূর্ব ইতিহাস তার চোখে ভেসে ওঠে। পলির পেছনেও এমনি একটা ইতিহাস থাকতে পারে। আয়ান ভাবতে থাকে। রিনা পলিকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে যায়।

বিছানায় শুয়ে আয়ানের অনেক কথা মনে পাড়ে। আয়ান গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। সততা সম্পর্কে সেখানে যে ধারণা প্রচলিত, সে তারই মধ্যে বড় হয়েছে। সুস্থ সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজেকে পবিত্র রেখেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু দাম্পত্য পবিত্রতার ক্ষেত্রে সে অচল থেকেছে। বাইরের খোলা হাওয়ার প্রভাবে সে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়েছে। সে কাকলিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। সে সাধ তার পূর্ণ হয়নি। সে কাকলির কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে। কিন্তু রিনার সঙ্গে বিয়ের আগে কাকলির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে রিনাকে খুলে বলেছে। কিন্তু রিনা তার পূর্ব-জীবনের স্খলন গোপন করেই তাকে বিয়ে করেছে। আয়ানের পবিত্রতা বোধ কোনো মর্যাদা পায়নি। কি লাভ এইসব মূল্যবোধের? মাঝে মাঝে তারও উচ্চৃঙ্খল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। সে শুয়ে থাকতে পারে না। বিছানার ওপর উঠে বসে। জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে আয়ানের কি মনে হয়, সে একটা রিক্সা নিয়ে নেয়। কাশীশ্বরী স্কুলের সামনে গিয়ে নামে। তাদের সঙ্গে পড়ত রঞ্জিনী। সে এখন এই স্কুলের শিক্ষিকা। আয়ানের ভাল লাগে রঞ্জিনীকে। এতদিন সংকোচ করে মিশতে পারত না। কিন্তু আজ তার কোনো সংকোচ নেই। সে আজ রঞ্জিনীর সঙ্গে গল্প করেই কাটাবে। কিন্তু রঞ্জিনী কোনো রকম আগ্রহ দেখায় না। সে বলে, 'আমার ক্লাস আছে। তাছাড়া, সন্ধ্যায় একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।' আয়ান বলে, 'তার সঙ্গে পরে দেখা করলেও তো হবে। আজ লালদীঘির পাড়ে বসে একটু গল্প করা যাবে।' রঞ্জিনী বলে, 'কেন, তোর কোনো কাজ নেই? আর বাড়িতে তোর বৌ নেই? তাকে নিয়ে আসলেই তো পারিস!' আয়ান রঞ্জিনীর ওপর চটে যায়। বৌয়ের কথা সে ভুলে থাকতে চায়। সেজন্যই সে এখানে এসেছিল। কিন্তু রঞ্জিনীটা সব মাটি করে দিল। আগে কিন্তু মেয়েটা এরকম ছিল না। দেখা হলেই ভালো করে কথা বলত! কিছু না খাইয়ে ছাড়ত না। কিন্তু আজ সে আয়ানকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

আয়ান ক্ষুণ্ণ মনে তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। সে তার কলেজেই যায়। সহকর্মীরা তাকে পেয়ে হাজারো প্রশ্ন করে। সকলেই তার কি অসুখ হয়েছিল জানতে চায়। কিন্তু অসুখটা যে কি, তা কি সে নিজেই জানে ছাই! সে বলে তার অসুখ কিছুই হয়নি। একটু শরীর খারাপ করতেই শুভদা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। কাল থেকেই সে কলেজ করবে। কলেজও তার ভালো লাগে না। সে কলেজ থেকে বেরিয়ে কালেক্টরিতে যায়। চক থেকে গণেশবাবু এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। গণেশবাবু চকের অনেক কথা বলেন। বাসন্তীরা কলকাতায় চলে গেছে। সমীরবাবু বি. ডি. ও. হয়েছেন। সুধীরবাবু বাঁকুড়ায় বদলি হয়েছেন। গত মাসে তিনি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে নতুন লোক এসেছে। গত মাসেই অবিনাশবাবুর মেজো মেয়ের বিয়ে হল। জামাই ডাক্তার। শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে কাজ করে। আয়ানের মনে হয়, তাহলে কাকলি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে! নিজেকে তার অনেকটা হাল্কা মনে হয়। গণেশবাবুকে বলে, 'একদিন আমাদের বাড়ি আসুন!' গণেশবাবু আসবেন বলেন। আয়ান কালেক্টরি থেকে বেরিয়ে স্কয়ার ফিল্ডের মাঝে এসে বসে। কলেজ জীবনে এই মাঠের মাঝ দিয়েই প্রায় ছুটতে ছুটতে সে কলেজ যেত। সেসব দিনগুলো কত ভালো ছিল। ও মাঠেই

ললিতার সঙ্গে বসে একদিন গল্প করেছিল। আয়ান উঠে সেই জায়গাটায় গিয়ে বসল। দেখল, জায়গাটা সেই একইরকম আছে, কিন্তু সে কত পাল্টে গেছে। আয়ান জানে না ললিতা কেমন আছে। তবে সেও নিশ্চয় আর তেমনটি নেই। সেও অনেক পাল্টে গেছে। শুধু স্কয়ার ফিল্ডটা তেমনি আছে। এখনো বিকেলে ছেলেমেয়েরা তার ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরছে। এখনো পাখিরা তার চারপাশের গাছগুলিতে বসে কিচির-মিচির করছে। এখনো দু'পাশের কোয়ার্টারগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। আয়ানের নিজেকে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো লাগে। দু-একটা গাড়ি পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যায়। আয়ান আবার সেই কলেজ-জীবনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে হবে। সে উঠে পড়ে। বরং বাড়িতে গিয়ে সে পলির সাথেই গল্প করবে। টেক্সটাইল কলেজের সামনে এসে সে রিক্সা ধরে।

বাড়ি পৌঁছে আয়ান দেখে রিনা, পলি, করিম সাহেব---সব বসার ঘরে বসে গল্প করছেন। আয়ানকে দেখে করিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন বোধ করছ?' আয়ান বলল, 'একদম ঠিক। আমি কাল থেকেই কলেজ করব।' রিনা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?' আয়ান বলল, 'কলেজে। ভালো লাগল না। তাই কলেজেই গেলাম। তবে আজ ক্লাসে যাইনি।' আয়ান ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। রিনা জিজ্ঞেস করল, 'রাতে কি খাবে?' আয়ান বলল, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আজ কিছু খাব না।' পলি ইলেকট্রল গুলে নিয়ে এল। আয়ান সেটা খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল। ঘুমের ইনজেকশানের ঘোর তার এখনো পুরোপুরি কাটেনি। শুতেই চোখটা ঘুম ঘুম করতে লাগল। রিনা বাবা এবং পলিকে নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিল। বাইরের ঘরে বাবাকে বিছানা করে দিল। পলিকে বলল, 'তুই আমাদের কাছেই শুয়ে পড়।' আয়ান ঢুলুঢুলু চোখে বলল, 'না, তোমরা দুই বোনে এখানে শোও। আমি বরং বসার ঘরে সোফাটা সেট করে নিই।' রিনা আপত্তি করল, 'তোমাকে আর উঠতে হবে না। এখন বিশ্রাম কর।' আয়ান তবুও উঠতে যাচ্ছিল। আজ মনটা তার ভালো নেই। সে একাই থাকতে চায়। কিন্তু রিনা ছাড়ল না। অগত্যা আয়ান চুপ করে শুয়ে পড়ল। রিনাও শুয়ে পড়ল। পলি বসে আয়ানের মাথায় হাত বোলাতে লাগল। আয়ান বলল, 'পলি ছাড়ো।' কিন্তু পলি ছাড়ল না। সে হাত বোলাতে লাগাল। আয়ানের আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু বেশি ভালো লাগা ভালো নয়। সে পলির হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। ঐ অবস্থাতেই পলি শুয়ে পড়ল। তার হাতটা আয়ানের হাতের মধ্যে থাকল।

ঘুমের ঘোরে আয়ান স্বপ্নের দেশে চলে গেল। আয়ানের মনে হল তারা দীঘায় বেড়াতে গেছে। সেখানে একটা ঝাউগাছের ছায়ায় পলির কোলে মাথা দিয়ে সে শুয়ে আছে। পলি তার চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বিলি কাটছে। দূরে সমুদ্রের ঢেউ তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে। আরো দূরে ঝিকিমিকি বেলায় পাখিরা ঘরে ফিরছে। পশ্চিমাকাশে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্যটা রক্তিম হয়ে গেছে। পলি গুনগুন করে একটা গান গাইছে আর তার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে। আয়ানের খুবই ভালো লাগছে। হঠাৎ সে পলিকে বুকের কাছে টেনে নিল। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। পলি তাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

আয়ানের ঘুম ভেঙে গেল। দেখে, সে এখনো পলির হাতটা ধরে আছে। বুকের মধ্যটা এখনো তোলপাড় করছে। পলির হাতটা তার কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বরং আরো

জোরে চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। সে চোখ বন্ধ করে পলির হাতে চাপ দেয়। বুকের মধ্যে একটা সুখের অনুভূতি হয়। শরীরে একটা চাপা উত্তেজনা জাগে। পলি হাতটা তুলে বুকের ওপর রাখে। আয়ানের হাতটা তার বুকের স্বর্গের ওপর পড়ে। আয়ানের কেমন একটা অনুভূতি হয়। সে এই অনুভূতিটা আরো নিবিড়ভাবে পাবার চেষ্টা করে। আয়ানের খুবই ভালো লাগে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে পলিকে অনুভব করে। শিরায় শিরায় তীব্র উত্তেজনা হয়। বুকের গভীরে একটা গভীর সুখের অনুভূতি। আচ্ছা, পলিও কি ওরকম অনুভব করছে! পলি হঠাৎ তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে। আয়ানের ঘোর কেটে যায়। সে কি করছে! পলি ডাকে, 'দিদি, দিদি, শোন তো!' আয়ান রিনাকে বাধা দেয়, 'পলি যা বলবে ঠিক নয়।' রিনা বিরক্ত হয়। সে উঠে চলে যায়। আয়ান হাত কামড়ায়। রিনা এসে আয়ানকে টেনে তোলে। ঝঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পলির সঙ্গে কি করেছ?' আয়ান মনস্থির করে নেয়। সে বলে, 'না, আমি কিছু করিনি তো?' পলি কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মিথ্যা কথা। করেছে।' রিনা বলে, 'তুমি যে বীরুকাকাকে মারতে যাও। এখন তোমাকে কে মারে? তোমাকে আচ্ছা করে পেটাই করা দরকার।' বীরুর সঙ্গে তুলনায় আয়ান মনে মনে শিউরে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। রিনার মুখে যা আসে বলে যায়, 'তুমি যে এরকম অসৎ চরিত্র, ভণ্ড তা আমি জানতাম না। মনে করতাম, আমি নিজে খারাপ হলেও একটা ভালো স্বামী পেয়েছি। তা স্বামীর নমুনা এখন বাঁধিয়ে রাখার মতো বেরুচ্ছে।' রিনার প্রতিটি কথা আয়ানের বুকের মধ্যে কেটে বসে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। চুপ করে শোনে আর যন্ত্রণায় ছটফট করে। রিনা গিয়ে করিম সাহেবকে ওঠায়। তাঁকে সে ওঘরে ধরে নিয়ে আসে। করিম সাহেবের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেন 'কি হয়েছে?' রিনা পলিকে বলে, 'বল্ কি হয়েছে।' পলি কাঁদতে থাকে। বাবার সামনে কিছুই বলতে পারে না। রিনা পলিকে উত্যক্ত করে। পলি লজ্জায় মাথা নিচু করে। করিম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে বলবি তো?' তখন রিনাই বলতে সুরু করে। করিম সাহেব শুনে বিস্মিত হয়ে যান। আয়ান লজ্জায় অসম্মানে মাটিতে মিশে যায়। ভাবে, এই মুহূর্তে তার মৃত্যু হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু মৃত্যু তাকে বাঁচাতে আসে না। করিম সাহেব বলেন, 'জঘন্য ব্যাপার! আয়ানের এটা খুবই অন্যায়। পলিটা ওকে দাদার মতো ভক্তি করে।' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে করিম সাহেব চলে যান। পলিকে নিয়ে রিনাও অন্য ঘরে চলে যায়। আয়ান একাই পড়ে থাকে। তার আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে ইচ্ছে হয়। না হয় সে অন্য কোথাও চলে যাবে। সকালে কি করে রিনা বা পলির মুখোমুখি হবে! ভাবে আজ তার কিছু নেই। তার জীবনে ভালোবাসা কোনদিন ছিল না। ছিল না ভালো লাগাও। গত সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সততার অহঙ্কারটুকু ছিল। এখন তাও নেই। পৃথিবিতে সে এখন ভিখারিরও অধম।

কিছুতেই ঘুম আসে না। অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করে। তার চোখের ওপর দিয়ে আঁধার গড়িয়ে পড়ে। জজকোর্টের মাঠে কাকগুলো ডেকে ওঠে। ঘুঘুরা একসাথে ডাকে। দূরে কোন্ পাড়ায় একটা মোরগ বাঁক দেয়। রিনারা উঠে বাথরুমে যায়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পলিকে নিয়ে করিম সাহেব বেরিয়ে পড়েন। রিনাও তাদের সঙ্গে যায়। আয়ানকে কেউ কিছু বলে না। সে ভেতরের ঘরে পড়ে আছে। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কেউ খোঁজ নেয় না। সকলেই

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রিনা আয়ানকে কত উপদেশ দিত, তত্ত্বকথা শোনাত, শুধু শরীরিক পবিবত্রতাই সব কিছু নয়। হঠাৎ করে একটা ভুল হয়ে গেলেই সে একেবারে খারাপ হয়ে যায় না। কিন্তু যাবার সময় সেও একবার আয়ানের কথা মনে করল না। একবার ফিরে দেখলও না আয়ান কেমন আছে। তবুও আয়ানের ভালো লাগল। যে কারণেই হোক রিনা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সকালবেলায় তার আর পলির সামনে যেতে হয়নি।

আয়ান বিছানা থেকে উঠল। অনাহারে, অনিদ্রায় তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। মনেও এতটুকু শক্তি নেই। টলতে টলতে সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসল। পুবের দিকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নতুন সূর্য উঠছে। আয়ানের মনে হচ্ছে, আজ পৃথিবীতে তার কেউ নেই— বন্ধুও নেই, সখাও নেই। মাথার চুলগুলো বড় ভারি মনে হয়। সে জামাটা গায়ে গিয়ে নাপিতের কাছে যায়। মাথাটা নেড়া করে বাড়ি ফেরে। ন্যাড়া মাথায় বাতাস লেগে কেমন শিরশির করে। সে ভেতরের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। হাসপাতালের ঘুমের ওষুধটা একটু বেশি করে খায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

চোদ্দ

পরের দিন আয়ানের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। তখনো মাথাটা ঝিম ধরে আছে। তবে শরীরটা হাল্‌কা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আয়ান উঠে হাত-মুখ ধুয়ে এল। উনুন জ্বালিয়ে সিদ্ধভাতও রাঁধল। ভাত খেয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। পরের দিন স্নান-খাওয়া করে সে কলেজে গেল। স্টাফরুমের পিওনকে সে বার বার জিজ্ঞেস করল, তার কোনো চিঠি এসেছে কি না! না, কোনো চিঠি আসেনি। বেশ কিছুদিন থেকে তার কোনো চিঠি আসছে না। আগে কত চিঠি আসত। কিন্তু এখন কেউ লেখে না। সেও কাউকে লেখে না। আয়ান বাড়ি ফেরার সময় কতকগুলো খাম আর ইনল্যান্ড কিনল। বাড়ি গিয়ে সে চিঠি লিখবে। ঘরে ঢোকার সময় তার চিঠির বাক্সটা ভালো করে দেখল। না, বাড়ির ঠিকানায়ও কোনো চিঠি আসেনি। সে বাড়িতে ঢুকল। হাত-মুখ ধুয়ে ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে বসল। আজ সে চিঠি লিখবে। কাকে লিখবে ভাবছে। এমন সময় গার্লস কলেজ থেকে এক পিওন একটা চিঠি নিয়ে এল। চিঠিটা হাতে দিয়ে সে পিওন বইটা আয়ানের দিকে এগিয়ে দিল। আয়ান সই করে দিতেই সে চলে গেল। আয়ান চিঠিটা খুলে দেখল। রিনা গার্লস কলেজে পার্ট টাইম লোকচারারের জন্য দরখাস্ত করেছিল। সেটা মঞ্জুর হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে তারা কাজে যোগ দিতে বলেছে। আয়ানকে আবার বেরুতে হল। রিনার বকুলপুরের ঠিকানায় চিঠিটা রেজিস্ট্রি করে সে আবার বাড়ি ফিরল। কিন্তু চিঠি লেখা তার হল না। একটু পরেই ভাই এসে হাজির হল। মায়ের জ্বর হয়েছে—শরীর খুব খারাপ। মা আয়ানকে দেখতে চাইছে। বাবা আয়ানকে না দেখতে পেয়েই মারা গেছে। মায়ের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটুক, আয়ান তা চায় না। সে ভাইয়ের সঙ্গেই বাড়ি যায়। মা আয়ানকে দেখে কাঁদতে থাকে। 'বড় সাধ ছিল, একটা নাতি-পুতি দেখে যাব। কিন্তু আর বোধায় হোলো না।' আয়ান কোনো কথা বলে না। ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে আবার বহরমপুরে ফিরে আসে।

দিন তিনেক পরেই রিনা আসে। এসেই সে গার্লস কলেজে জয়েন করে। ক্লাস থাক, আর নাই থাক সারাদিন সে এখন কলেজেই থাকে। আয়ানও সকালে স্নান-খাওয়া করে কলেজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যায় ফেরে। ফিরে কোনোদিন দেখে রিনা এসেছে, কোনোদিন দেখে, ফেরেনি। সে রান্না চড়িয়ে দেয়। রান্না হয়ে গেলে মেসে শুভদার কাছে যায়। শুভদার দেখা না পেলে গঙ্গার ধারে চলে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস বয়। জলে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। আয়ান একা একা বসে থাকে। খানিক রাত হলে বাড়ি ফেরে। রিনা ভাত বাড়ে। আয়ান গিয়ে খেতে বসে। খেয়েদেয়ে পরের দিন ক্লাসের জন্য পড়ার দরকার হলে বই খোলে। না হলে দুজনেই শুয়ে পড়ে। এক বিছানায়ই শোয়। কিন্তু কথাবার্তা কিছু হয় না বললেই চলে। সকালে উঠে আয়ান বাজারে যায়। যা খুশি কিনে নিয়ে আসে। রিনা কিছু বলে না। বাড়তি কিছু দরকার হলে সে নিজে বাজার থেকে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে রিনা কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার দু-একজন বন্ধু-বান্ধবী বাড়িতে আসে। সব থেকে বেশি আসেন রমেনবাবু। আয়ানের পূর্ব-পরিচিত। তিনি গার্লস কলেজে ইতিহাস পড়ান। তবে এখন রিনার সহকর্মী। কাজেই রিনার সঙ্গে তাঁর দরকার থাকে। আয়ান কোনো কোনো দিন ফিরে দেখে, রমেনবাবু রিনার সঙ্গে গল্প করছেন। কোনো কোনো দিন ফিরে দেখে, রিনা তখনো ফেরেনি। সে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রিনা রমেনবাবুর রিক্সা থেকে নেমে আসে। আয়ান ভাবে, জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু আর ভালো লাগে না। রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার তদারকি করে। নয়ত একটা বই খুলে বসে। সকালে উঠে স্নান-খাওয়া করে কলেজে চলে যায়। ক্লাস না থাকলেও কলেজে বসে থাকে। সেদিন কে যেন মারা গেলেন। হঠাৎ দুপুরবেলা কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বাড়ি চলে গেল। কিন্তু আয়ানের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। সে জেলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহুয়া সিনেমার কাছে এল। কি একটা হিন্দি বই চলছে। আয়ান নামটা পড়ার চেষ্টা করল। নাকাবন্দী। মানে কি সে বুঝতে পারল না। তবুও ঠিক করল দেখবে। সে কাউন্টারের কাছে গেল। পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বলল, 'দাদা ব্যলকনির একদম পেছনের লাইনের একটা টিকিট আছে? কেটেছিলাম, কিন্তু সিনেমা দেখা হচ্ছে না। বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে। যদি নেন।' কাউন্টার ক্লার্ক বলে, 'টিকিটটা ঠিক আছে। আপনি নিতে পারেন।' আয়ান টিকিটটা নিয়ে হলে ঢুকে পড়ে।

হলের আলো তখন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়ান গিয়ে টিকিটটা দেখাতে টর্চের আলো ফেলে লোকটি আয়ানকে তার সিটটি দেখিয়ে দিল। আয়ান সিটে বসে পর্দার দিকে তাকাল। পর্দায় তখন স্থানীয় বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। একজন দুজন করে লোক আসছে। লোকটি টর্চের আলো ফেলে তাদের বসার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিন পর সিনেমা দেখতে এসে তার অনেক পুরানো কথা মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে লোকটির হাতের টর্চটা জ্বলে উঠছে। হলটা যেন একটা রূপকথার জগৎ। আর লোকটির হাতের টর্চটি একটি রহস্যময় বাতি। জ্বললেই অদ্ভুত কিছু চোখে পড়বে। আয়ান বাতিটার দিকে চেয়ে থাকে। বাতিটা এবার জ্বলে উঠতেই দেখে তার তিন লাইন সম্মুখে পাশাপাশি বসে আছে রিনা আর রমেনবাবু। আয়ান যেন নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারে না। সে আবার দেখার জন্য অপেক্ষা করে। লোকটি অন্য দিকে আর কয়েকবার টর্চ জ্বালিয়ে এসে আবার এখানে একজনকে সিট দেখায়। আয়ান স্পষ্ট

দেখে, রমেনবাবু রিনার পাশে বসে। তার আর সিনেমা দেখার ইচ্ছে থাকে না। সে সিট থেকে উঠে পড়ে। তরপর হল থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে বাড়িতে চলে আসে।

বিকেল পাঁচটার সময় রিনা আসে। সঙ্গে রমেন। রিনা রমেনের জন্য মিষ্টি আনায়, চা করে। সাতটা নাগাদ রমেন ওঠে। আয়ান আর থাকতে পারে না। সে রিনার কাছে এসে বলে, 'রমেন কেন এত ঘন ঘন এ বাড়িতে আসে?' রিনা প্রশ্ন করে, 'তাতে কি হয়েছে?' আয়ান বলে, 'আমি যদি কারো স্ত্রীর সঙ্গে এমনি করে সময় কাটাই তবে কি তোমার ভালো লাগবে?' রিনা বলে, 'খারাপ লাগার কি আছে?' আয়ান বলে, 'কিন্তু আমার ভালো লাগে না।' রিনা বলে, 'তোমার মনটাই ছোট। তুমি সকলকে তোমার মতো করে বিচার কর। সেজনই খারাপ লাগে।' আয়ান কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। আয়ান দরজা খুলে দেখল, সামেদ। সামেদ বলল, 'হাসপাতালে আসেছিনু। বড়ভাজ ভর্তি আছে। ফিরে যাবো বুল্যা বাস স্ট্যান্ডে গেনু। কিন্তুক শ্যাষ বাসটা নাই, আজ রাতটা তুমার এখ্যানেই থাকবো!' রিনা মুখ ভার করে রান্নাঘরে চলে গেল। এরকম উটকো মানুষ আসা সে মোটেই পছন্দ করে না। থাকবে খাবে তো বটেই। আবার পায়খানাটা নোংরা করবে। যেখানে-সেখানে থুথু ফেলবে। মেঝেতে ময়লা লাগাবে। সেগুলো পরিষ্কার করতেই আবার এক সপ্তাহ। তাই মানুষ এলেই আয়ান সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। গ্রামের লোক এসব বোঝে না। পাশের গ্রাম, কি তার পরের গ্রামের লোকও দরকার পড়লে তার বাড়িতে চলে আসে। রিনা তাদের কিছু বলতে পারে না। আয়ানের ওপরে রাগ ঝাড়ে। আর আয়ানও তাদের কিছু বলতে পারে না। আবার রিনাকেও কিছু বলতে পারে না। মাঝখানে কেমিস্ট্রির বাফারের মতো কাজ করে। সামেদকে বাথরুমে গিয়ে আয়ান হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বলে। তারপর একটা চপ্পল এগিয়ে দেয়। সামেদ চপ্পল পরে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বসার ঘরে এসে বসে। রাতে খাওয়ার পর বসার ঘরে সোফার ওপর তাকে বিছানা করে দেওয়া হয়। সকালে উঠে সামেদ চলে যায়।

সন্ধ্যায় তোতন আসে। সে বলে, 'পলির বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে। সামনের মাসের দশ তারিখে বিয়ে। বাবা আপনাদের দিন সাতেক আগে যেতে বলেছেন।' রিনা তাকে কাছে বসিয়ে খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞেস করে। ছেলের নাম কি? বাড়ি কোথায়? ছেলে দেখতে কেমন? কে কে দেখতে এসেছিল? ছেলে দেখা হয়ে গিয়েছে কি না? কি কি দিতে হচ্ছে? পলিকে ওরা কি কি দেবে? পলি কেমন আছে? পলি ছেলেকে পছন্দ করেছে? তোতন বেচারা কি করে জানবে যে, ছেলে পলির পছন্দ হয়েছে কিনা। ওকে কি পলি বলেছে! সে বলে, 'তুই একবার যাস না, বাবা।' রিনা থামে। 'যাব রে যাব। পলির বিয়ে হবে, আর আমি যাব না! আমি অবশ্যই যাব।' সে ভাইকে রান্নাঘরের দিকে টানে। কিন্তু তোতন আয়ানের ভক্ত। সে আয়ানের কাছে এসে বলে, 'চলুন না দাদা, গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।' তোতনের কণ্ঠে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, আয়ান না করতে পারে না। তোতনকে নিয়ে বের হয়ে যায়। ফেরার পথে স্বর্ণকারের দোকান হয়ে আসে, পলির জন্য একটা হারের অর্ডার দেয়। তোতন বাড়িতে এসে দিদিকে সেকথা বলে দেয়। রিনা অনেক দিন পর আয়ানের প্রতি খুশি হয়।

পরের দিন সকালে আয়ান তোতনকে বাসে তুলে দেয়। বাসস্ট্যান্ড থেকেই সে কলেজে

যায়। বিকেলে এসে দেখে রিনা অনেক আগেই বাড়ি ফিরে গেছে। আয়ানকে পেয়েই সে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে আমরা কবে যাব?' আয়ান প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দেয়, 'তুমি ঠিক কর, কবে যেতে চাও।' রিনা জানতে চায়, 'তোমার ছুটি নিতে কোনো অসুবিধা হবে না?' আয়ান বলে, 'আমার ছুটির প্রশ্ন উঠছে কেন?' রিনা প্রশ্ন করে, 'তাহলে কি ছুটি না নিয়েই যাবে?' আয়ান বলে, 'আমি যাব না।' রিনা থমকে যায়। সে আয়ানকে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে হার তৈরি করতে দিলে কেন?' আয়ান উত্তর দেয়, 'তুমি তো যাবে।' রিনা রেগে যায়। সে বলে, 'তুমি না গেলে আমিও যাব না। সবাই জিজ্ঞেস করবে জামাই কৈ? জামাই কৈ? আমি হাজার জনকে কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।' আয়ান বলে, 'সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে তুমিও না গেলে সবাই বলবে, মেয়ে-জামাই কেউই এল না।' রিনা ফোঁস করে উঠল, 'তুমি কি ভেবেছ, তুমি না গেলে আমার বোনের বিয়ে হবে না?' আয়ান বলল, 'আমি মোটেই সেসব ভাবতে যাইনি। আমি শুধু ঠিক করেছি, বিয়েতে আমি যাব না।' রিনা কোনো উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বিয়েতে শেষ পর্যন্ত রিনা একাই গেল। তবে আয়ানের তৈরি হার নিল না। নিজে একটা আংটি কিনে নিয়ে গেল। আয়ান বহরমপুরে বসে দিন গুনতে লাগল। সাত-আট-নয় করে দশ তারিখ চলে এল। আজ পলির বিয়ে। পলি নিশ্চয় এতক্ষণ বেনারসী শাড়ি পড়েছে। পলিকে দেখতে কেমন লাগছে? আয়ানের অনেক দিনের ইচ্ছে পলিকে শাড়ি পড়লে কেমন লাগে দেখতে। একদিন সে রিনার একটা সিল্কের শাড়ি নিয়ে পলিকে পরতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু পলি কিছুতেই পরতে রাজি হয়নি। আয়ান তার জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিল। তারপরে পলি যখন সত্যিই শাড়ি পড়তে লাগল, তখন আয়ান ওর দিকে তাকাত না। শাড়িপরা পলিকে সে দেখবে না। রাগ করে বলেছিল যে, বিয়ের দিনও শাড়ি পড়লে পলিকে দেখবে না। পলি হাসতে হাসতে বলেছিল, সালোয়ার-কামিজ পরে বিয়ে করণে। আজ সত্যি কি পলি সালোয়ার-কামিজ পরে বিয়ে করছে? কিন্তু তার দরকারই বা কি? আয়ান তো বিয়ের অনুষ্ঠানে নেই। সে কি পরে বিয়ে করছে আয়ান দেখতেও যাচ্ছে না। সত্যি, শাড়িপরা পলিকে তার আর দেখতে হল না। তার অভিমান অভিমানই থেকে গেল।

পনেরো

খুব ধুমধাম করে পলির বিয়ে হয়ে গেল। রিনা বহরমপুরে ফিরে এল। কিন্তু আয়ানের সঙ্গে তার সদ্ভাব স্থাপিত হল না। মেসে দুজন মেম্বারের মধ্যে যেটুকু সমঝোতা থাকে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ততটুকু সমঝোতাও এল না। এই রকম করেই কয়েক মাস কেটে গেল। রিনা সন্তান-সম্ভবা হল। আয়ান শুভদার মাধ্যমে হাসপাতালে কথা বলে এল। কিন্তু রিনা এখানে থাকতে রাজি নয়। সে বকুলপুর চলে গেল। মাসখানেক পর একদিন তোতন এসে খবর দিল যে, তার ভাগ্নে হয়েছে। আয়ান তোতনকে মিষ্টি খাওয়াল, সিনেমা দেখাল, তারপর পরের দিন বাসে তুলে দিল। বিকেলবেলায় তার মা এসে হাজির। 'বিহাই চিঠি লিখ্যাছে, আমার লাতি হয়্যাছে। আমাকে একটা সুনার জিনিস কিন্যা দ্যাও। লাতির মুখ দেখবো।' আয়ান মুশকিলে

পড়ল। সে চায় না তার মা বকুলপুর যাক। কিন্তু কি বলে নিষেধ করবে সে বুঝতে পারে না। সে বলে, 'তোমার শরীর খারাপ। অসুস্থ শরীরে অতদূর যাওয়া ঠিক হবে না।' মা বলে, 'আমি কি আর চিরদিনই বাঁচবো? লাতির মুখ দেখে না হয় মোরেই যাবো।' আয়ান তখন অন্য কথা তোলে। সে সালমাকে বলে, 'এতদিন বিয়ে হল, তোমার বেয়াই তোমার বাড়ি গিয়েছে?' সালমা বলে, 'না। তুমি মানা কোরেছো। তাল্লাগে যায়নি।' আয়ান কি করে বোঝাবে যে, সে মানা করেনি। কিন্তু তার মার ধারণা, তারা গরীব, সাধারণ মানুষ বলে আয়ান তার শ্বশুর-শাশুড়িকে তাদের বাড়ি যেতে নিষেধ করেছে। আয়ান অনেক চেষ্টা করে তাদের এ ভুল ভাঙাতে পারেনি। তাই আজ আর নতুন করে চেষ্টা করল না। সে বলল, 'তারা যদি তোমার বাড়িতে না আসে, তাহলে তুমি তাদের বাড়ি যাবে কেন?' সালমা মনে করে, আয়ান তাকে তার শ্বশুরবাড়ি যেতে দিতে চায় না। অভিমান ভরেই সে বলে, 'তাহলে তুমি বোকে পাঠালে ক্যানে? আমাধের ছেলে আমধের বাড়িতেই হোতোক!' আয়ান কিছু বলতে পারে না। মা রাগ করে বসে থাকে। আয়ান মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রেখে আসে। গ্রামের সবাই খবরটা জেনে গেছে। সবাই আয়ানের কাছে ঠাট্টা করে মিষ্টি খেতে চায়। আয়ান তাদের ছানার মিষ্টির পরিবর্তে কথার মিষ্টিতে সন্তুষ্ট করে বহরমপুর ফিরে আসে।

করিম সাহেব মেয়ে এবং দৌহিত্রকে বহরমপুর রেখে যান। আর রেখে যান একটি কাজের মেয়েকে। মেয়েটি সব সময় বাচ্চাটিকে নিয়ে থাকে আর বাচ্চু বাচ্চু করে সোহাগ করে। তাহলে রিনা তার ছেলের নাম রেখেছে বাচ্চু। আয়ান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সেদিনও সে দেখছিল। মেয়েটি বাচ্চুকে এনে তার কোলে দিল। আয়ান কোলে নিল। কিন্তু তার খুব অসুবিধা হতে লাগল। এত ছোট যে, ভালো করে ধরা যায় না। সে দুহাত দিয়ে আলতো করে ধরে। বাচ্চু তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। আয়ানের কত কি মনে আসে। এখন এই শিশুটি কত সুখি। খেতে পেলেই তার আর কিছু চাই না। একদম সদানন্দ। কারো প্রতি ওর এতটুকুও হিংসা নেই। রাগ নেই। এই শিশুই একদিন বড় হবে। ভালাবাসবে। দুঃখ পেতে শিখবে। লোককে দুঃখ দেবে। লোকের কাছ থেকে দুঃখ পাবে। তারপর তার মতো রেচেড ক্রিয়েচার হয়ে যাবে। আয়ান দেখে ছেলেটি চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। বাচ্চু কি তাহলে তার মনের কথা বুঝতে পারছে? তা কি করে সম্ভব? বাচ্চু তো কিছু বুঝতেই শেখেনি। সে বাচ্চুর নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয় ছেলেটা বড্ড বেশি কালো হয়েছে। অবশ্য রিনা কালো গায়ের রঙ পছন্দ করে। কিন্তু রিনা ফরসা। আয়ান অতটা ফরসা নয়। তবে কালোও তো নয়। তাহলে বাচ্চু এত কালো হল কি করে? আয়ানের মেন্ডেলের সূত্র যা পড়া আছে, তাতে তো এরকম হওয়ার কথা নয়! অবশ্য সে সূত্রেরও ব্যতিক্রম আছে। আর অনেক সময় ছেলেমেয়েরা সাতপুরুষ পর্যন্ত আগের গুণাবলী পেয়ে থাকে। অর্থাৎ সেরকম কোনো কারণে বাচ্চু কালো হতেই পারে। কিন্তু সন্দেহটা তার মন থেকে যায় না।

হাসপাতালে ছেলেকে টিকে দিতে নিয়ে যেতে হয়। বাচ্চুকে রিনাই নিয়ে যায়। সেদিন তার শরীর খারাপ ছিল। আয়ানই টিকে দিতে নিয়ে গেল। টিকে দেওয়ার পর একফাঁকে সে বাচ্চুর রক্তটা পরীক্ষা করে নিল। পরীক্ষার রিপোর্ট তার সন্দেহকে ঘনীভূত করল। বাচ্চুর

রক্তের গ্রুপ 'ও'। আয়ানের রক্তের গ্রুপ 'এ', রিনার 'এ বি'। তাহলে বাচ্চুর রক্তের গ্রুপ 'ও' হল কি করে? এ হতে পারে, বি হতে পারে, এ বি হতে পারে। কিন্তু ও তো হতে পারে না। পরীক্ষায় গ্রুপিং করতে ভুল করল না তো? রিপোর্ট যদি ঠিক হয়, তাহলে তো বাচ্চু তার ছেলেই নয়। রিনার প্রতি অবিশ্বাস তার বাড়তেই থাকে। বাড়তে থাকে বাচ্চুর প্রতি বিদ্বেষও। কিন্তু বাচ্চু কি করবে? তার তো কোন হাত ছিল না। তার কোনোরকম দোষ নেই। যত মনে হয় দোষ নেই, তত আয়ানের রাগ বেড়ে যায়। মেয়েটি এখন প্রায়ই বাচ্চুকে এনে আয়ানের কোলে দেয়। আর বাচ্চুও আয়ানের কাছে আসবার জন্য হাঁকপাঁক করে। 'রিনা দূর থেকে বলে, 'ও ছেলে বাবার মতোই হবে। বাবাকে চিনেছে এখনই।' আয়ানের সারা শরীর জ্বালা করে। তার মনে হয়, সে যেন একটা কাক। সারাদিন নোংরা আবর্জনা ঘেঁটে বেড়ায় আর বাসায় ফিরে অন্যের বাচ্চা মানুষ করে। শুধু কাকগুলো যেমন সকালে-সন্ধ্যায় কা-কা করে লোকের কান ঝালাপালা করে, সে সেটা করতে পারে না। বাচ্চুকে কোলে নিয়ে থাকতে আয়ানের একদম ভালো লাগে না। বাচ্চার প্রতি যার আগ্রহ নেই, তার কোলে বাচ্চাও থাকতে চায় না। আয়ানের কোলে থাকতে বাচ্চুরও ভালো লাগে না। সে ট্যা-ট্যা করে কাঁদতে থাকে। মেয়েটি এসে বাচ্চুকে আয়ানের কোল থেকে নিয়ে যায়। আয়ান একটু স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তুর বাচ্চুর পিতৃত্বের সন্দেহ থেকে সে মুক্তি পায় না। সন্দেহটা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। সন্দেহটা মন থেকে দূর করানোর জন্য বাচ্চুর রক্তটা ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার। তার জন্য বাচ্চুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু রিনাকে না জানিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আয়ানের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। তাদের কলেজে তো জীব বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রক্ত পরীক্ষা, বিশেষ করে গ্রুপিং কিভাবে করতে হয়, তা শেখানো হয়। ভবেশবাবুই শেখান। তাহলে ভবেশবাবুকে বললেই তো হয়। কিন্তু পাছে ভবেশবাবু আবার মনে না করেন যে, বাইরে পয়সা খরচের ভয়ে আয়ান কলেজের ল্যাবে রক্তের গ্রুপিং করিয়ে নিতে চাইছে। সেদিন দেড়টার ক্লাস তার অফ ছিল। সে ভবেশবাবুর ল্যাবে হাজির হল। ভবেশবাবু তখন তাঁর ছাত্রদের পায়রার পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করা শেখাচ্ছিলেন। পাচকতন্ত্রটা বের করে দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। আয়ান কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘণ্টাখানেক পরে ভবেশবাবু অবসর পেলেন। তিনি এসে বলেন, 'কি আয়ান, কিছু বলছ?' আয়ান যখন এখানে ছাত্র ছিল, ভবেশবাবু তখন থেকেই এ কলেজে আছেন। তাই তিনি আয়ানকে নাম ধরেই ডাকেন। আয়ানও তাঁকে স্যার বলে। আয়ান বলল, 'স্যার, আমার ছেলের ব্লাড-গ্রুপিংটা জেনে রাখতে চাই। বাইরে একবার করিয়েছি। তবে ঠিক আস্থা হচ্ছে না। তাই আপনি যদি একবার দেখে দিতেন? ভবেশবাবু বললেন, 'ওটা আবার একটা সমস্যা হল? তুমি যে কোনো দিন নিয়ে এসো। দেখে দেব।' আয়ান মুশকিলে পড়ল। আনার অসুবিধে। না হলে তো সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েই করিয়ে নিতে পারত। কিন্তু ভবেশবাবুকে তো আর তা বলা যায় না। তাই সে মাথা চুলকে বলল, 'স্যার, একেবারে বাচ্চা ছেলে তো! আনতে গেলে চিল্লিয়ে পৃথিবী মাথায় করবে। আমি যদি রক্তটা নিয়ে আসি তাহলে হয় না?' ভবেশবাবু বললেন, 'হয়, কিন্তু ঠিকমত আনতে না পারলে গ্রুপিং ঠিকমতো

হবে না। তার থেকে রামচরণ গিয়ে রক্তটা নিয়ে আসবে।' রামচরণকে ডেকে তিনি বললেন, 'বাবুকে চেনো তো?' রামচরণ ঘাড় নাড়ল। সে চেনে। ভবেশবাবু বললেন, 'বাবুর বাচ্চার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। গ্রুপিং হবে। তুমি ঠিক করে রক্তটা নিয়ে আসবে, কেমন?' রামচরণ আবার ঘাড় নাড়ল, আনবে। ভবেশবাবু বললেন, 'তাহলে তুমি বাবুর সঙ্গে চলে যেও।' আয়ানের ভয় হল, এক্ষুনি আবার ভবেশবাবু কোনো একটা সময়ের কথা বলে দেয়! আর রামচরণ রিনার বাড়িতে থাকার সময়ই গিয়ে হাজির হয়! সে তাড়াতাড়ি করে বলে 'কখন যেতে হবে তা আমি রামচরণের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব স্যার।' ভবেশবাবু বলেন, 'বেশ, তাই নিও।' আয়ান সটান স্টাফরুমে চলে আসে। খাতাটা নিয়েই সে ক্লাসে চলে যায়। তার মনে হয়, এবার সে সত্যিকারই বুঝতে পারবে, বাচ্চু তারই ছেলে কিনা!

পরের দিন আয়ান দুপুরবেলা রামচরণকে নিয়ে বাড়িতে আসে। বাচ্চু তখন ঘুমুচ্ছিল। রামচরণ তার বুদ্ধিতে ভাবে, ভালোই হল। ঘুমন্ত শিশুর হাত থেকে রক্ত নেওয়া অনেক সুবিধে। সে সুঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু উঠে পড়ে। তাতে সুঁচটা অনেকটা ঢুকে যায়। বাচ্চু চিৎকার করে ওঠে। মেয়েটি ছুটে আসে। মেয়েটির সাহায্যে রামচরণ কোনোরকমে রক্ত নেয়। কিন্তু বাচ্চুর হাতটা ফুলে যায়। বাচ্চু ট্যা-ট্যা করতে থাকে। রিনা এসে মেয়েটিকে বকাবকি করে। মেয়েটি তখন আসল ব্যাপার বলে দেয়। রিনা বুঝতে পারে আয়ান কি করতে চায়। সে আয়ানের ওপর ক্ষেপে যায়। আয়ান বাড়ি ফিরতেই সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'তুমি বাচ্চুকে কেন এমন করেছ? আমাকে তো মেরে রেখেছ। আবার ছেলেটাকে না মারলে তোমার শান্তি হচ্ছে না?' আয়ান কিছু বলতে পারে না। এই অশান্তির ভয়েই সে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা ভাবেনি। কিন্তু রামচরণ এমন করল যে, তার আর কিছু করার থাকল না। রাতের মধ্যে বাচ্চুর হাত ফুলে ব্যাঙ ফোলা হয়ে গেল। সকালে রিনা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। রিনা খুবই রেগে গেল। কলেজে গিয়ে সে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবা নারী-মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী। তিনি শুনে বললেন, 'এটা শুধু তোমার নয়, সমস্ত মহিলা সমাজের অপমান। এমনি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তুমি থানায় ডায়েরি কর।' তিনি নিজেই ও. সি.-কে ফোন করলেন। 'হ্যালো, বড়বাবু বলছেন? আমি গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বলছি। হ্যাঁ। আমার একজন লেকচারার আপনার কাছে যাচ্ছে। হ্যাঁ, স্বামী খুব হ্যারাসমেন্ট করছে। না, ব্যবসায়ী নয়, স্বামীও লেকচারার। লেখাপড়া জানলেই তো আর শিক্ষিত হয় না। ভালো করে ট্রিট করা দরকার। হ্যাঁ, একটু দেখবেন। নমস্কার।' ফোন রেখে তিনি বললেন, 'যাও আমি বলে দিয়েছি। তুমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে ডায়েরিটা করে এস।' রিনার থানা-পুলিশ করার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল যা করলেন তাতে থানায় না গিয়ে তার আর কোনো উপায় থাকল না।

রিনা থানায় গেল দুপুরে। বিকেলেই বাড়িতে পুলিশ এল। বড়বাবু নিজেই এলেন। এসেই তিনি বাচ্চুকে দেখলেন। হাতটা তখন অনেকটা সেরে গেছে। সে যে মিথ্যা কথা বলেনি, সেটা প্রমাণ করার জন্য রিনা বলল, 'সকালবেলায় কেমন ছিল ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন।' বড়বাবু তখন কাজের মেয়েটিকে ডাকলেন। মেয়েটি বলল, 'দুলাভাই একটা

লোককে আন্যাছেলো। সেই সূঁচ ফুটিয়্যাছে।' বড়বাবু তখন আয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাকে এনেছিলেন?' আয়ানের মনে হল, সে তো ঝামেলায় পড়েছেই। তার জন্য আবার ভবেশবাবু বা রামচরণ আবার ঝামেলায় পড়েন কেন? সে বলল, 'আমি বলতে চাই না।' বড়বাবু কিছু বুঝতে পারেন না। চাষা-ভূষা নয়, যে দুচার চড়-থাপ্পড় মেরে বের করে নেবেন, প্রফেসর মানুষ। কিছু বলতে গেলেই কাল কলেজ স্ট্রাইক, থানা ঘেরাও। তখন বসে বসে সামলাও। বধূ নির্যাতন হলে এক কথা ছিল। তাহলে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু এত সহজেই বা তিনি কি করে হাল ছাড়েন? এত বড় বড় চুরি-ডাকাতি আর মার্ডার কেসের সুরাহা করে ফেলছেন। আর এই সামান্য ব্যাপারটার কিছু করতে পারবেন না? বড়বাবু সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রফেসরটার মাথা খারাপ। আর মাথা খারাপ বলেই সে নিজের ছেলেকে খুন করতে চায়। এমন লোককে বাইরে রাখা যায় না। তিনি আয়ানকে বললেন, 'আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।' রিনা এতটা আশা করেনি। কিন্তু আয়ান আশা করেছিল। আশা ঠিক নয়, আশঙ্কা করেছিল। সে তৈরিই ছিল। সে বলল, 'চলুন।' রিনা কিছু বোঝার আগেই সে থানার গাড়িতে উঠে পড়ল। বড়বাবু উঠে বসতে গাড়ি চলতে লাগল। রিনা ছুটল প্রিন্সিপ্যালের কাছে। প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ধরে নিয়ে গেছে তো! হাজতে এক রাত থাকলেই সব টাইট হয়ে যাবে। ফিরে এলে দেখবে কিরকম ভালোমানুষ হয়ে গেছে।' রিনা তখন প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে ছুটল শুভদার মেসে। শুভদা গিয়ে আয়ানকে জামিনে ছাড়িয়ে আনল।

রিক্সায় উঠেই শুভদা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?' আয়ান চুপ করে থাকল। শুভদা কি বলতে যাচ্ছিল। আয়ান বলল, 'আমি এখন আপনার মেসে যাব।' শুভদা তাকে নিয়ে মেসে উঠল। রাতের খাবার খেয়ে আয়ান তাস খেলতে লাগল। শুভদাকে বলল, 'আজকের রাতটা আমি এখানেই শোব।' তাস খেলা চলতে লাগল। রাত বারটা নাগাদ আয়ান শুভদার সঙ্গে শুতে গেল। শুভদার ঘরের সুশান্তবাবু বাড়ি গেছেন। আয়ান তাঁর বিছানাতেই শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুভদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল বল তো!' আয়ান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুভদা, মানুষের এমন কথাও থাকে, যা আর কাউকে বলা যায় না। কথাটা এমনই যে, আপনাকেও বলতে পারছি না। আমাকে আর জিজ্ঞেস করবেন না।' শুভদা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর জিজ্ঞেস করব না।'

শুভদা আর জিজ্ঞেস না করলেও কথাটা ছড়িয়ে পড়ল যে, আয়ান তার ছেলেকে খুন করতে গিয়েছিল। কেন খুন করতে গিয়েছিল, তা কেউ জানে না। বিশেষত বড়বাবুর ব্যাখ্যা যে, আয়ান পাগল হয়ে গেছে তা কেউ বিশ্বাস করল না। ফলে যে যেরকম পারল ব্যাখ্যা করে নিল। আর অন্যদেরও বলতে লাগল। ক্রমে কথাটা বকুলপুর আর ডোমকলেও পৌঁছাল। ডোমকল থেকে সফিউল আর কালাম এল আয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। একথা-সেকথার পর তারা ঐ কথাটাও তুলল। আয়ান বলল, 'একথা ঠিক নয় যে, সে বাচ্চুকে খুন করতে গিয়েছিল। তবে ব্যাপারটা কি তা তাদেরও বলা যাবে না।' তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। বকুলপুর থেকে রিনার মা চিঠি লিখলেন। রিনা উত্তর দিল, গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা। রিনা মিথ্যা বললেও, সকলেই জানল আয়ান তার ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিল। পুলিশ রিপোর্টে তাই লেখা হল।

ষোল

পরের দিন আয়ান কলেজে গেল। তাকে কলেজে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়। সবাই জানতে চায়, কি হয়েছিল। নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে সবাইকে বলতে তার রুচিতে বাধে। তাছাড়া তার নিজের পক্ষেও সেটা খুব সম্মানজনক নয়। সে কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু সকলেই একটা সহজ সমাধান চায়। পুলিশ কেন ধরল? তার কারণ জানা যাবে না, সেটা কেউ মেনে নিতে পারে না। বার বার প্রশ্ন করে। থানার ব্যাপার-স্যাপার জানার জন্যও তাদের অপার কৌতূহল। হ্যাঁ মশাই, নিয়ে গিয়ে বসাল, না হাজতেই পুরে দিল? ভেতরে অনেক রাইফেল রাখা আছে, না? তা আপনাকে কি কি জিজ্ঞেস করল? নিজে থেকেই ছেড়ে দিল? প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আয়ান স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এল। যার জন্য এত ঝামেলা আয়ান এবার তার কাছেই গেল। তবে রামচরণ নেই। ভবেশবাবু বললেন, 'তোমার ছেলের ব্লাড গ্রুপ 'ও' হে। আমি নিজে দেখেছি।' আয়ানের মনে হল, তা হলে এই জন্য রিনা এত চটেছে। বাচ্চু তাহলে তার ছেলে নয়! আয়ান আর ভাবতে পারে না। ভবেশবাবু বলেন, 'কি হয়েছিল বল তো? রামচরণ গিয়ে রক্ত নিয়ে এল। তারপরেই শুনি পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর শুনলাম তুমি তোমার ছেলেকে খুন করতে গিয়েছিলে। আসলে কি হয়েছিল?' আয়ান এর কি উত্তর দেবে! সে শুধু একটু হাসল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। ভবেশবাবু ভাবলেন, তাহলে কি আয়ানটা সত্যি পাগল হয়ে গেছে! আয়ান আর ফিরে তাকাল না। ক্লাসে যেতেও তার ইচ্ছে হল না। সে বাড়ি রওনা হল।

রিনা তার আগেই বাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়ির সামনে দুটো রিক্সা দাঁড় করানো। কাজের মেয়েটি রিনার কাপড়-চোপড়গুলো এনে তাতে রাখছে। আয়ান বাড়িতে ঢুকল। আয়ানকে দেখে রিনার কোনো ভাবান্তর হল না। জিনিসপত্র সব নেওয়া হয়ে গেলে, বাচ্চুকে কোলে করে রিনা বেরিয়ে গেল। কাজের মেয়েটি এসে আয়ানের হাতে বাড়ির চাবিটা দিল। বাড়ির একটি করে চাবি রিনার কাছে থাকত। চাবি ফেরত দেওয়ার অর্থ রিনা একেবারে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি রিনা বকুলপুর চলে যাচ্ছে! কিন্তু তাহলে তাকে চাবি দিয়ে যাবে কেন? আয়ান মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস?' মেয়েটি মুখ ভার করে বলল, 'আপা নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে। আজ থেকে ওখানেই থাকবে।' মেয়েটি চলে গেল। আয়ান বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রিক্সা দুটি মোড় থেকে লাল সড়ক হয়ে উত্তর দিকে লালদীঘির দিকে চলল। রিনা গিয়ে উঠল গার্লস কলেজের হোস্টেলে। ওখানে একটি কোয়ার্টার খালি পড়ে ছিল। আরো প্রার্থী ছিল। তবে প্রিন্সিপ্যাল বিশেষ প্রয়োজন বলে রিনাকেই দিয়েছেন। আয়ান রিনার রিক্সায় উঠে চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে। দেখে, ছোট ভাই হন্ত-দন্ত হয়ে রিক্সা থেকে নামছে। সে আয়ানের সামনে এসে গেছে। আয়ান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। ছোট ভাই কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন, মা আর নেই।' ভাই কাঁদতে কাঁদতে অনেক কথা বলতে লাগল। অনেক দিন থেকেই মা অসুস্থ ছিল। অনেকবারই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। যতবার খারাপ হয়েছে ততবার আয়ানের কাছে খবর এসেছে। বাবা মারা যাওয়ার সময় আয়ানের সঙ্গে দেখা হয়নি।

তাই আয়ান বার বার ছুটে গেছে। মা যেন তাকে না দেখে মারা না যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হল। মায়ের সেদিন খুব শরীর খারাপ। মা আয়ানকে খবর দিতে বলল। লোক পাঠানো হল। লোক খবর তো দিতে পারল না, উল্টে খবর নিয়ে গেল যে, আয়ানকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। মা শুনে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদাতে দাঁত-কপাটি লেগে গেল। আর জ্ঞান ফিরল না। ডাক্তার ডাকা হল। কিন্তু ডাক্তার বলল, নাড়ী খুব দুর্বল। শরীরও খারাপ। আর বাঁচবে না। মা আর সত্যিই বাঁচল না। আজ সকালেই মারা গেছে।

আয়ান ভাইয়ের সঙ্গেই বাড়ি রওনা হল। বাস থেকে নেমে ডোমকলে ভাইকে দিয়ে কাফন কিনল। তারপর হাঁটতে লাগল। বাড়িতে যখন পৌঁছল তখন মেয়েরা মায়ের মৃতদেহকে স্নান করাচ্ছে। অনেকে সুর করে কাঁদছে। আয়ানের মা'র কথা মনে পড়ছে। বাবাকে কবর দিয়ে ফেরার সময় মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল যে, সেও মরার সময় আয়ানের দেখা পাবে না। সত্যি পেল না। মাকে কাফন পরানো হল। এবার জানাজা পড়তে হবে। লোকেরা ওজু করতে লাগল। ইমাজুদ্দিন এসে তাকে ওজু করে নিতে বলল। কিন্তু আয়ান আর জানাজায় দাঁড়াবে না। পলির সঙ্গে সেদিন রাত্রে সেই ঘটনার পর আয়ানের সমস্ত অস্তিত্বকে অপবিত্র লাগে। অপবিত্র-কলুষিত মন নিয়ে সে মায়ের জানাজায় দাঁড়াবে না। ইমাজুদ্দিন ভাবল, শোকে বেসামাল হয়ে পড়েছে। সে তাকে বাদ দিয়েই জানাজা পড়তে লাগল। জানাজার পর মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। কবরে নামিয়ে মুখটা একবার খোলা হল। আয়ান মুখ বাড়িয়ে দেখল। শেষবারের মতো দেখে নিল। আর সেই স্নেহময়ী মুখখানা সে দেখতে পাবে না। আর কেউ তার বাড়িতে না আসা নিয়ে অনুযোগ করবে না। আর কেউ তার নিরাপত্তা নিয়ে রাতদিন চিন্তিত থাকবে না। আয়ানের আজ মনে পড়ে, যখন সে অনেক রাতে কলেজ থেকে ফিরত, মা তার খাবার আগলে জেগে বসে থাকত। আবার সকালে উঠে যা হোক শাক-পাতা যোগাড় করে দু-মুঠো চাল সেদ্ধ করে দিত। কত দুঃখের দিন ছিল সেগুলো! অথচ কত সুখ ছিল মনে। মনে সুখ ছিল, তার মা ছিল। আজ আয়ানের মনে সুখ নেই। সব সময় বঞ্চনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মা হয়ত সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাই চলে গেল। খাপাচি দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে সবাই সালমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য অন্তিম প্রার্থনা করল। তারপর সকলেই চলে গেল। আয়ান অনেকক্ষণ কবরস্থানে দাঁড়িয়ে থাকল। আজ তার এই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে গিয়ে বসতে পারে এমন একটি লোকও গ্রামে নেই। নাদের বক্স নেই। ইছারুদ্দিন ফকির নেই। আয়ান ইছারুদ্দিনের কবরটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আশ্চর্য মানুষ ছিল এই ফকির। বুকে হাজারো দুঃখ নিয়ে সে হাসত। হেসে বলত, সুখের উপর সুখ না হলে সেই বা কুন সুখ। আর দুখের উপর দুখ না হলে সেই বা কুন দুখ। সুখ-দুঃখ দুইই যেন তার কাছে সমান ছিল। আয়ানের মনে হয় সে যদি অত দুঃখ নিয়েও হাসতে পারে, তাহলে আয়ানই বা পারবে না কেন? সেও হাসবে। সে হো হো করে হাসতে লাগল। তাদের পাড়ার একটি ছেলে বাজার থেকে ফিরছিল। আয়ানকে ওরকমভাবে হাসতে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। দৌড়তে দৌড়তে পাড়ায় পৌঁছেই বলতে লাগল, 'আয়ান ভাই পাগোল হোয়ে গেলছে। গোরস্থানে দাঁড়িয়ে হো হো কোরে হাসছে।'

ইমাজুদ্দিন গিয়ে দেখল, আয়ান হাসছে না। তবে গোরস্থানে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সে গিয়ে আয়ানকে বাড়ি দিয়ে এল। বলল, 'তুমি বড়। তুমি এরকম করলে চলবে ক্যানে?' আয়ান কোনো উত্তর দিল না। বৈঠকখানায় চুপচাপ শুয়ে থাকল। পরের দিন মেজো ভাইয়ের হাতে খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে সে বহরমপুর রওনা হল। রওনা হয়ে তার বুকের মধ্যেটা হু হু করতে লাগল। আজ মা আর পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসছে না। বার বার একই কথা বলছে না, সাবধান থাকো! বলছে না, দেরি কোরো না, আবার টপ কোর‍্যা আসো। আর কেউ কোন দিন তাকে এমন করে বলবে না। সে ভালো থাকছে, না, মন্দ থাকছে তা কেউ আর খোঁজ নেবে না। খোঁজ নেবে না সে খেয়ে আছে, না, না খেয়ে আছে। আয়ান আর একথা ভাবতে পারবে না যে, যেখানেই হোক, দুটো চোখ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বহু দুঃখের দিনে মা সালমা আয়ানের সঙ্গে ছিল। তার খুব আশা ছিল সুখের দিনেও থাকবে। কিন্তু আয়ানের জীবনে সুখের দিন শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল। বাচ্চুকে দেখার জন্য মা অনেক ধরাধরি করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা হল না। না হয়ে ভালোই হয়েছে। পরের ছেলেকে নিজের ছেলের ছেলে ভেবে নাই বা দেখাল! আয়ান একটু শক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। ডোমকলে এসে বাসে উঠল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটা রিক্সা নিয়ে জজকোর্টের মোড়ে বাড়িতে এল। সমস্ত বাড়িটা হাহাকার করছে। শুধু যেন ইট, কাঠ আর পাথর। কোথাও এতটুকু প্রাণ নেই। এমন সময় মানুষ প্রিয়জনের কাছে যায়। প্রিয়জন। আয়ানের হাসি পায়। প্রিয়জন তার নেই। হয়তো কোনোদিনই ছিল না। কারোরই থাকে না। যে যার স্বার্থে একে অপরের প্রিয়জন হয়। স্বার্থ ফুরালে কেউ কারো নয়। এখন আয়ানের দ্বারা কি কারো স্বার্থ সাধিত হয় না? বাড়িতে থাকতে তার ভালো লাগে না। সে মেসে শুভদার কাছে যায়।

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিসে ছুঁলে আঠাশ ঘা। বাঘের আঘাত কোন্‌টা নখের থেকে আসে, কোন্‌টা মুখের থেকে আসে ঠিক বোঝা যায় না। পুলিসের আঘাতও কোন্‌টা কোন্ দিক থেকে আসে বোঝা যায় না। রিনা অনুগ্রহ করে তাকে পুলিশের হাল হেফাজতে পৌঁছে দিয়েছে। এবার একের পর এক আঘাতগুলি আসছে। কলেজে যেতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, 'থানার বড়বাবু এসেছিলেন। আর গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যালও ফোন করেছিলেন। আপনি আপনার নিজের ছেলেকে খুন করতে গিয়েছিলেন!' আমি তো প্রথমে শুনে বিশ্বাসই করিনি। কিন্তু বড়বাবু তাই বললেন, আর সেকথা থানায় বলার জন্য আপনি আপনার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন? এটা খুবই অন্যায়। অবশ্য আপনার স্ত্রীরও থানায় যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু তাই বলে আপনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন? এটা অসামাজিক কাজ। শিক্ষকরা মশায়, সমাজে বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু তাদের ব্যবহার যদি ডোম চাষা ঝাড়ুদারের মতো হয়, তাহলে সে শিক্ষক পদের অযোগ্য।' আয়ান বুঝতে পারে, প্রিন্সিপ্যাল খুব রেগেছেন। কিন্তু গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যালের ব্যবহারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে কেন তার প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করে মিথ্যা অভিযোগ করতে গেল? শুভদা বলেছিল, তিনি নাকি রিনাকে থানায় যেতে পরামর্শ দেন। সেটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু এটা? তাহলে রিনাই গিয়ে বলেছে যে, আয়ান তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে? আয়ান বসে বসে ভাবতে থাকে। তাকে নীরব থাকতে দেখে প্রিন্সিপ্যাল আরো রেগে যান। আয়ান তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসে।

বিকেলবেলায় পার্টি অফিসে ডাক পড়ে। নেতারা বলে, 'তুমি ছেলেকে খুন করতে গেলে, পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, তুমি আবার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে—এতে আমাদের পার্টির দুর্নাম হচ্ছে। আসল কথা কি আমাদের বল, যাতে কেউ জানতে চাইলে আমাদের কর্মীরা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারে।' কিন্তু আয়ান আসল কথা বলতে পারে না। সে বলে, 'বলা যাবে না।' পার্টির নেতারা তার অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়। তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। অফুরন্ত অবসর সময়টা যে সে পার্টির কাজে দেবে সে সুযোগও আর থাকে না। আয়ান শূন্য বুকে জজকোর্টের মোড়ের বাড়িটায় ফিরে আসে। অনেকদিন পরে সে কাকলির চিঠিগুলো বের করে পড়তে থাকে। সেবার কেউ আয়ানের প্রতি কাকলির মন বিষিয়ে দেওয়ার জন্যে আয়ানের নাম দিয়ে খারাপ চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাকলি আয়ানকে চিঠি লিখে বলেছিল, আমার ধারণা এ চিঠি আপনার নয়। আপনি জানান। সে চিঠিটাও খামের মধ্যে পুরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাকলি তাকে ঠিকই চিনেছিল। কিন্তু রিনা চিনল না। আয়ান রাজিয়ার চিঠিটাও বের করল। আয়ান জানে না, রাজিয়া এখন কোথায় আছে বা কেমন আছে। তবে সুমিতার চিঠি থেকে জেনেছে একটি ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ছেলেটি আফ্রিকার কোনো একটি দেশে কাজ নিয়ে আছে। বছর-অন্তর আসে। বড় খারাপ সময়ে রাজিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। রাজিয়া যদি তখনই আয়ানকে জানাত যে, সে আয়ানকে ভালোবাসে। তাহলে হয়ত তার জীবনটাই অন্যরকম হত। কিন্তু রাজিয়া তা জানাল না। যখন জানাল তখনো একটুও জোর করল না। দূর থেকে মনের ইচ্ছেটা জানিয়ে আবার দূরেই চলে গেল। আয়ান না পারল তাকে বিশ্বাস করতে, না পারল তার ইচ্ছার মর্যাদা দিতে। রাজিয়া তার জীবনে একটা দূরতম দ্বীপ হয়েই থাকল। যে নদী তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল তাতে জল নেই, শুধুই হলাহল। আয়ান না পারল তা পান করে নীলকণ্ঠ হতে, না পারল তাকে দূরে সরিয়ে দিতে। গরল তাই তার সমস্ত জীবনটাই ঝরঝরে করে দিল। আয়ানের খুব ইচ্ছে হল হলাহলের সাথে সাথে খানিকটা সুধাও পান করে শুদ্ধচিত্ত হয়ে কোথাও পড়ে থাকে। খুব ভালো হয় স্কয়ার ফিল্ডে পড়ে থাকতে পারলে। কিন্তু তার আজীবনের সংস্কার তা হতে দিল না। সেই ছোটবেলা থেকে সে জেনে এসেছে নেশা করা খারাপ। সে মদের দোকানে যেতে পারল না। আয়ানের মনে হল, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। বেঁচে থাকা মানেই অশান্তি। কিন্তু কি করবে? আজীবন জেনে এসেছে, বিশ্বাস করে এসেছে আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা। আয়ান মরতে পারে, কিন্তু কাপুরুষ হতে পারে না। সে আত্মহত্যার কথা ভাবতেও পারে না। সে শুধু পালিয়ে যেতে পারে। জীবন থেকে নয়, জনপদ থেকে। সে তাই গেল। শহরের বুকে যখন উনুনের ধোঁয়ার মতো অন্ধকার নেমে এল, তখন আয়ান বহরমপুর থেকে কোথায় চলে গেল। জজকোর্টের মোড়ের বাড়িটা শূন্য পড়ে থাকল।

সতের

এর আগে আয়ান একবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন তার চোখে স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য তার একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে

গৃহশিক্ষকতার মতো কাজও বেছে নিয়েছিল। এবার আয়ানের চোখে কোনো স্বপ্ন নেই। বুকে কোনো আশা নেই। মুখে ভাবের ভাষাও ফুরিয়ে গেছে। আগেরবার জীবনকে জয় করার জন্য রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল। এবার জীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য ঘর ছেড়েছে। তাই তার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যবস্তু নেই। জলের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। যেখানে জল ঘুরপাকে খাচ্ছে, সেও ঘুরতে থাকছে। আয়ান ছোটবেলায় মাঠের কাজ করত। উত্তর জীবনে দূর থেকে মাঠের কাজকে ভালোও লাগত। সে ভাবল মাঠের কাজেই সে আনন্দ পাবে। রেজিনগর স্টেশনে জন মুনিষের সঙ্গে সে ভিড়ে গেল। একটা দলের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি কাজ করব, আমাকে আপনাদের সাথে নেবেন?' দলপতি মুনিষটি বলল, 'আপনাকে তো ভদ্দোর লোক লাগে। আপনি কাম-কাজের কি জানেন?' আয়ান ছোটবেলায় কাজ করেছে। সেই সাহসে সে বলল, 'আমিও কাজ জানি।' দলপতি তাকে দলে নিয়ে নিল। একখানা নিড়ানিও দিল। কিন্তু দূর থেকে যা সুন্দর দেখায়, কাছে গেলে আর তত সুন্দর থাকে না। তার খারাপ দিকটা প্রকট হয়ে ওঠে। ক্ষেতের ভ্যাপসা গরম, কাদার চটচটি, কোমরের কটকটিতে জগৎটা দুর্বিষহ মনে হয়। আয়ানের বাড়তি অসুবিধা তার লুঙ্গি নেই। পাজামা পরে নিড়ানি চালাতে অসুবিধা হয়। আয়ানের মাঠের কাজের বাসনা শেষ হয়। সে আবার ট্রেনে চাপে। এবারে নতুন কাজ জোটে। মালদায় এক আমবাগানের পাহারদার হয় সে। দিনের দু বেলা খাওয়া আর দিনরাত আমবাগান পাহারা দেওয়া। কিন্তু তাতেও বিপদ। একদিন তার এক ছাত্র এসে হাজির হয়। সে আয়ানকে চিনে ফেলে। কিন্তু আয়ান অজ্ঞতার ভান করে। সে রাতেই সে মালদা থেকে গা-ঢাকা দেয়। পথ তার শেষ হয় না।

পথে পথে শূন্য হাতে তার জীবনের অনেকটা সময় কেটে যায়। যে শান্তির জন্য সে ঘর ছেড়েছিল, সে শান্তি সে পায় না। ধর্মে তার মতি নেই। না হলে কোনো আশ্রমে বা মঠে গিয়ে উঠতে পারত। সংসারে চাওয়ারও তার কিছু নেই। না হলে কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে সে সব কিছু ভুলে যেত। কিন্তু তা হয় না। ফলে যে কথা সে ভুলতে চায়, সেই কথাই বেশি করে মনে পড়ে। রিনার কথা মনে পড়ে। কাকলির কথা মনে পড়ে। আয়ান শুনেছিল, কাকলির স্বামী শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে চাকরি করে। কাকলি তো এখন স্বামীর সঙ্গেই থাকে। কিন্তু সে কি এখনো তেমন আছে? আয়ানের কাকলির সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেখা করতে গেলে, তার স্বামী যদি কিছু মনে করে? না, সে দেখা করতে যাবে না। সে বরং কাকলিকে দূর থেকে একবার দেখেই চলে আসবে। শিলিগুড়ি হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই একটা কোয়ার্টারে নাকি তারা থাকে। আয়ান সন্ন্যাসীর বেশ ধরে হাসপাতালের গেটের সামনে গিয়ে বসে। কাকলির স্বামীকে তো সে চেনে না। কাকলি বেরুলেই সে চিনতে পারবে। সারাদিন সে বসে থাকে। রাতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কাকলি বের হয় না। রাতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। একটা পাহাড়। পাশেই হ্রদ। হ্রদের তীর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেষে একটা পথ। সে পথের ওপর ঝরণার জল এসে পড়ছে। বিকেলের সোনার মতো রোদে ঝরণার জল ঝকঝক করছে। আয়ান কাকলির পাশাপাশি সেই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটু দূরেই সাগরের তীর। তারা বালুকাবেলায় এসে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বার বার কাকলির শরীরের সঙ্গে আয়ানের ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে। কাকলি তো

এখন পরস্ত্রী। আবার মনে হচ্ছে, কিসের অন্যায়? কাকলি কি তার থেকে আর কারো বেশি আপন হতে পারে? কাকলি যেন তার একান্ত আপন। আয়ান কাকলির গায়ে গা লাগিয়ে হেঁটে চলেছে হাওয়ায়। একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। তীক্ষ্ণ একটা বিদ্যুৎঝলক খেলে গেল। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। ঘুম ভেঙে আয়ান দেখে প্রবলবেগে মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। আয়ান উঠতে উঠতেই ভিজে গেল। সে হাসপাতালের ভেতরে ঢোকার জন্য দৌড়তে লাগল। কিন্তু গেটের কাছ আসতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কয়েকজন লোক তাকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল।

আয়ানের মাথাটা এখনো ভারি হয়ে আছে। কানের মধ্যে শনশন করে শব্দ হচ্ছে। চোখে এখনো ঝাপসা দেখছে। মাঝে মাঝে চোখের ওপর কি ভেসে যাচ্ছে। দু-একজন নার্স আসছে-যাচ্ছে। ওষুধের তীব্র ঝাঁঝ নাকে লাগছে। সমস্ত শরীর অবশ লাগছে। একটা যাঁতার মতো বিরাট পাথর যেন তার ওপর চেপে বসে আছে। আবছা অন্ধকার লাগছে। আয়ান অলসভাবে তাকাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। সে পলিকে শাড়িপরা অবস্থায় দেখলেই চোখ বন্ধ করে নিত। তাহলে এ মেয়েটি কি পলি! কিন্তু সে পলিকে দেখল আর নাই দেখল তাতে পলির কি এসে যায়! পলি তো তাকে গ্রাহ্যই করে না। আয়ানের মনে হয় এটা তার পাগলামি। কিন্তু সে চোখ খোলে না। নার্স বলে, 'একবার তাকান। দেখুন কে এসেছে?' আয়ান বলে, 'সিস্টার, আমার কেউ নেই। আমি একটু একা থাকতে চাই। আমাকে একা থাকতে দিন।' সে চোখ বুজে পড়ে থাকে।

—